ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী

সূচী

লেখক	বিষয়		পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সাহিত্যে ব্যঙ্গ কথাটা আধুনিক কালে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার সূত্রপাত ইংরেজী সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও প্রথমে কবিতা ও প্রহসন জাতীয় অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটে।

আমাদের দেশে কবিতায়, আধুনিক অর্থে ব্যঙ্গ রচিত হয়নি, কিন্তু তার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণেই এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মেলে। অঙ্গদ রাবণের কাছে দৌত্য কার্যে গিয়েছিলেন। সে সময় রাবণ তাঁকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সভার যাবতীয় লোককে মায়াপ্রভাবে রাবণাকৃতি করে দিলেন। একমাত্র ইন্দ্রজিতের রূপান্তর ঘটালেন না, কেননা পুত্র হয়ে পিতার মূর্তি ধরা পাপ। অঙ্গদ তাঁকে দেখেই রাবণ পুত্র বলে চিনতে পারলেন, এবং অতগুলো রাবণের মধ্যে আসল রাবণকে জানবার উদ্দেশ্যে এক কৌশল অবলম্বন করলেন—

> "অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
> এই যত সব বসি আছেন সব কি তোর পিতা॥
> কোন্ বাপ তোর দিগ্বিজয় কৈল তিন লোকে।
> কোন্ বাপ তোর"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর অনুরূপ বহু প্রশ্নের পর বললেন—

> "একে একে কৈলাম তোর সব বাপের কথা।
> সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা"॥

বাপ তুলে এমন অসুবিধাজনক কথা বললে কোন্ পুত্র না লজ্জা পাবে? তাই পুত্রের এই দুরবস্থা দেখে রাবণ মায়া ভঙ্গ ক'রে আদি ও অকৃত্রিম রাবণ রূপে অঙ্গদের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। তিনি অঙ্গদকে চ্যালেঞ্জ করলেন, তুই কে? সব বল তোকে মারব না, ভয় নেই। তখন অঙ্গদ বলছেন—'তুই কোন্ ঠাকুরের পো, তোরে ভয় কি?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাল্কা ব্যঙ্গ কৌতুকের আরম্ভ এটি।

এই পাঁচশ বছরের বাংলা সাহিত্যে আমরা হাস্যকৌতুকের (ব্যঙ্গ সাহিত্যের নয়) কয়েকটি বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। বাংলার সর্বত্র কত পল্লী ছড়ায়, গানে, কাহিনীতে কতকাল ধরে কৌতুক রসের প্রচলন আছে তা আমাদের ঠিকমতো জানবার উপায় নেই। করুণ রসের সঙ্গে এইসব কৌতুক রস পাশাপাশি রচিত হয়েছে, এবং প্রচারিত হয়েছে মুখে মুখে।

মঙ্গল কাব্যের যুগও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু। এর বিস্তার চলেছে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগের কাব্যগুলিতে গ্রাম্য ছড়ার যুগের মৃদু কৌতুক ও অনুবাদ যুগের অনাবিল হাস্যরস থেকে শুরু ক'রে বুদ্ধিবৃত্ত কৌতুক-হাস্য শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুচিহীনতার ধাপে গিয়ে পৌঁছেছে। মঙ্গল কাব্য সমূহে হাস্য রসের বিশেষ সন্ধান মেলে। এ সময়ের অনেক কাব্যেই নারীদের মুখে তাদের পতিনিন্দা বিশেষ কৌতুককর। মালদহের গম্ভীরা গানে ব্যঙ্গকৌতুক প্রায় সর্বত্র। শিব বন্দনার একটি গানে দেখা যায় মালদহের ধানের ফলন দেখে বুড়ো শিব কৈলাস থেকে মালদহ এসেছেন ধান লুট করতে। তাঁকে ধনীদের ঘরে যেতে বলা হয়েছে:

যারা চাকরি বাকরি কর‍্যা
ব্যারায় দ্যাশ বিদেশে ঘুর‍্যা
তারখে ধরগা না তুই ত্যাবা।
তোকে খাওয়াবে প্যাট ভোর‍্যা
তারা ম্যালাই ট্যাকা উর‍্যাছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কন চণ্ডী বহুস্থানে স্নিগ্ধ হাস্যরসে উদ্ভাসিত। সিংহলের কয়েকটি দৃশ্যে, সপত্নীদের কলহে, ভাঁড়ু দত্তের কাহিনীতে। তা ভিন্ন কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ, পশুদের রোদন ইত্যাদিতে করুণতার সঙ্গে কৌতুকরস মিশিয়ে আছে। ভালুকের আবেদন—

বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নই না কবি তালুক।

এই জাতীয় হাস্যরস সর্বত্র। মাধবাচার্যের চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত কাহিনী বেশ মজার।

এর পর এসেছেন ভারতচন্দ্র। বুদ্ধিবৃত্তি বেশি, হৃদয় বৃত্তি কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত সহদেব চক্রবর্তীর মঙ্গল কাব্যে—

"শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল
সরিষা ধরাধরি করে
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল
পুঁই শাক হাসিয়া মরে।"

ইত্যাদি রূপ কৌতুক। এরপর এলো এক বিস্ময়কর যুগ—কবিগানের যুগ। রাম বসু, হরু ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই, ভোলা ময়রা, অ্যাণ্টুনি সায়েব ইত্যাদি। অসাধারণ রচনাপটুত্ব, কিন্তু অধিকাংশই কিছু নিম্ন রুচি, এবং সেজন্য জন-উপভোগ্য। এঁরা নিঃসন্দেহে পরবর্তী ব্যঙ্গ যুগের পথকে প্রশস্ত করে গেছেন।

বাংলাসাহিত্যে নির্মল হাস্য কৌতুকের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পরে। পৃথক ব্যঙ্গ বা কৌতুক সাহিত্য তার আগে রচিত হয়নি। কিন্তু ইংরেজী প্রভাবের পূর্ব মুহূর্তে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এইবার আধুনিক ব্যঙ্গ সাহিত্যের কথায় আসা যাক।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে ব্যঙ্গের মূল উদ্দেশ্য সংস্কার সাধন। সমাজে সংস্কারকের বহু রূপ। তারই একটি রূপ হচ্ছে ব্যঙ্গ স্রষ্টার।

যে সব লেখক আপন কালে ও পরিবেশে নিজেদের কোনোমতে খাপ খাওয়াতে পারেন না, যাঁরা চিন্তার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন বলে সমসাময়িক কালের হাতে অনেক সময় লাঞ্ছিত হন, তাঁদের মধ্য থেকেই ব্যঙ্গ রচয়িতার উদ্ভব হয়ে থাকে। তাঁরা সত্যের অগ্রিম দ্রষ্টাদের দলে। তাঁরা তাঁদের দেখা নানা অসঙ্গতিকে হাস্যকর রূপে ফুটিয়ে তুলে সবার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করাব চেষ্টা করেন। সমাজ যেখানে আপন অসঙ্গতির জালে জড়িয়ে এগোতে পারছে না, আপন জালে মুগ্ধ হয়ে আবিষ্ট হয়ে এগিয়ে যাবার প্রয়োজনই বোধ করছে না, সেখানে তাঁরা সেই জালটাকে ব্যঙ্গের আঘাতে ছিঁড়ে দেবার চেষ্টা করেন।

সংস্কারকের বহু রূপ আগেই বলেছি। এঁরা সবাই, বর্তমানের 'যা আছে সব ঠিক আছে' না মেনে, এগিয়ে যেতে চান। তাঁরা কেউ ধর্ম সংস্কারক রূপে, কেউ সমাজ সংস্কারক রূপে, কেউ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারক রূপে, কেউ চিত্র-শিল্পী রূপে, অথবা সাহিত্য স্রষ্টা রূপে দেখা দেন। এই শেষোক্তদের একটি দল ব্যঙ্গ সাহিত্যকেই তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে সব চেয়ে উপযুক্ত মনে করেন। এই উদ্দেশ্য কখনো খুবই সঙ্কীর্ণ হয়। যেমন হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যঙ্গের প্রয়োগ করলে। কিন্তু তা উচ্চ সাহিত্য হয় না। কিংবা উচ্চ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অন্ত্যজ হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাজের বা অন্য কোনো ব্যাপক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হলে তার উচ্চ ব্যঙ্গ এবং উচ্চ সাহিত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অবশ্য ব্যঙ্গ সাহিত্য সব সময়েই তার নিজস্ব উচ্চতার দ্বারা সীমায়িত, এবং তা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উচ্চতায় কদাচিৎ ওঠে।

সংস্কারকের ভূমিকায় যিনি নামেন, তিনি যে-কোনো বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যদিও সবাই ব্যঙ্গ স্রষ্টা হন না।

ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক ও বিজ্ঞানী রোজার বেকনের কথাই ধরা যাক। তিনি সেই যুগের গোঁড়ামির অন্ধকারে একটু একটু জ্ঞানের আলো আনতে গিয়ে কারাগার বরণ করেছিলেন একাধিক বার। এ ইতিহাস পরে আরও অনেকের ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। রোজার বেকনের কথা থেকে জানা যায়—তাঁর সময়ের কোনো লেখকই সমসাময়িক কালকে পছন্দ করতে পারেন নি। আজ থেকে সাতশ বছর আগের যুগের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির কথা এটি। বলা বাহুল্য সমসাময়িক কালে অতৃপ্ত রোজার বেকনের ব্যঙ্গ রচয়িতা হবার সম্ভাবনা ছিল, কেননা তার উপযুক্ত মনোভাব তাঁর ছিল।

এর দুই শতাব্দী পরে বাংলাদেশের বিশ্বম্ভর মিশ্র প্রথম বয়সে ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় খ্যাতি লাভের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং মতিগতিতে। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল সে সময়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন পণ্ডিত অথচ সংস্কারকমনা ব্যক্তি মাত্রেরই স্যাটারারিস্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বম্ভর মিশ্রেরও ছিল। কিন্তু তিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে সংস্কারের উদার পথ বেছে নিয়েছিলেন, এবং এই পথে তিনি বড় সাফল্য লাভ করেছিলেন চৈতন্যদেব নামে।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য, আগেই বলেছি, সবার ক্ষেত্রেই এক অর্থাৎ আপন পরিবেশকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গেরও আবার নানা ভাগ আছে। আমি উদ্দেশ্যগত ভাগের কথা আগে আলোচনা করছি। ব্যঙ্গের আক্রমণ সব সময়ে যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই হয় তা নয়। গোঁড়া মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় বৃহত্তর সত্যকে মেনে নিতে না পেরে, সংস্কার কাজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণ করতে থাকেন। এঁদেরই সংখ্যা সবকালে সব দেশে বেশি। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ রচনা করেছেন অরসিকদের বিরুদ্ধে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণকারীদের সংখ্যা অনেক। তাঁর 'ছন্দ-জ্ঞান-হীনতা'র বিরুদ্ধে, তাঁর কল্পনাশক্তির 'ক্রটি'র বিরুদ্ধে, তাঁর 'দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে এবং তাঁর 'দেশদ্রোহিতা'র বিরুদ্ধে নিয়মিত আক্রমণ হয়েছে ১৯৩০–৩২ পর্যন্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রবীন্দ্র বিরোধীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও রবীন্দ্র-নাথই তাঁকে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে বড় স্বীকৃতি দেন তাঁর কাব্যের সমালোচনা লিখে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রূপ সম্ভবত তাঁর 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের মুখে সীতার অপমানকর উক্তি বসানো উপলক্ষে। সাময়িকভাবে শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্র বিরোধী দলে ভর্তি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ-

জ্ঞানহীনতা'র বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, প্রথম যুগে কবির পক্ষ নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেন, মদীয় পিতৃদেব বিহারীলাল গোস্বামী তাঁদের অন্যতম। পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিপক্ষকে চরম আক্রমণ করেন এক কবিতার সাহায্যে।

এইভাবে, ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য জগতে সুইফট ড্রাইডেন পোপের যুগে যেমন পরস্পর ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ বর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ইউরোপে অষ্টাদশ শতকে ভোলতেয়ররই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দুঃখ ভোগ করেছেন ব্যঙ্গ রচনার জন্য। তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী সংস্কারক, এবং আপন ধর্ম রক্ষা করতে তিনি দুবার বাস্তিলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো একজন সংস্কারপন্থী, জীবনের প্রথম থেকেই ব্যঙ্গের সাহায্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করলে রুসোর স্বাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা নীতি দাঁড়াত কোথায়? ব্যঙ্গ সাহিত্যের সাহায্যে এত বড় সাফল্য আর কোনো একক ব্যক্তি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য এই সঙ্গে আর এক মহৎ শিল্পীর কথা মনে আসে। ইনি বিশ্বহৃদয়জয়ী চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর ব্যঙ্গের মাধ্যম সাহিত্য নয়, অভিনয়, কিন্তু তিনি সমাজের শোষণকারীদের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের পক্ষ নিয়ে যে ব্যঙ্গ ফুটিয়েছেন তার সমস্ত অঙ্গের পরিকল্পনা, তাঁর নিজের। শাস্তি ভোগও তিনি কিছু করেছেন এবং এ যুগে বাস করেও।

কিন্তু এ যুগেও ব্যঙ্গস্রষ্টা শাস্তি ভোগ করেন, তাতে একটি বড় জিনিস প্রমাণ হয় এই যে, মানুষের সমাজে ত্রুটিবিচ্যুতি প্রতি যুগেই থাকবে এবং সেই সেই যুগকে অতিক্রম ক'রে দৃষ্টি চালনা করতে পারেন এমন নিজ-কালে-অতৃপ্ত সংস্কারকের আবির্ভাবও সকল যুগেই ঘটবে। সমাজ তো কখনো স্থির হয়ে থাকতে পারে না। বিশ্ব বিধানেই সব বস্তু চলমান, পরিবর্তনশীল।

যে সব কারণে সামাজিক চলা ত্বরান্বিত হয় তার মধ্যে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ একটি শক্তিশালী কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যঙ্গ স্রষ্টাকে লোকে বড়ই সমীহ ক'রে চলে। আবার ব্যঙ্গের সাহায্যেই ব্যঙ্গ এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বড় স্থান জুড়ে বসেছে। ব্যঙ্গই নিজ পক্ষের বাধা অনেকখানি দূর করেছে, মানুষের মনকে উদার করেছে, তাই এখন আর ব্যঙ্গস্রষ্টা মাত্রকেই শাস্তি ভোগ করতে হয় না আগের মতো। তাঁরা এখন নির্ভয়ে পথ চলেন। এ যুগের ব্যঙ্গস্রষ্টারা পূর্ব শতাব্দীতে জন্মালে কঠিন শাস্তিই পেতেন। তখন যে সব ব্যঙ্গ লোকে উপভোগ করেছে তাতে দেশের অধিকাংশের সমর্থন ছিল, যাঁরা ব্যঙ্গের লক্ষ্য, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বড়ই অল্প। কারণ তা প্রায় সবই তখনকার নতুন-আসা ইংরেজী হাবভাব ও খ্রীস্টিয়ান ধর্ম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে। তাতে

দেশের জনসাধারণের সমর্থন ছিল। তাই তখনকার ব্যঙ্গ রচয়িতাদের শাস্তি পেতে হয় নি। কিন্তু যাঁরা পরে ইংরেজী শিক্ষা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ ক'রে, এবং দেশী নানা সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীনপন্থী সংখ্যাগুরুদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন, তাঁদের প্রতি দেশ বিরূপ ছিল। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে নেমে সমস্ত দেশের বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের ভাষার আক্রমণ সহ্য করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্পাকারে, বা মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র নাট্যাকারে, বা ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে যে জাতীয় ব্যঙ্গ ফুটিয়েছেন, তার সবই জনমতের দিক দিয়ে খুব নিরাপদ ব্যঙ্গ, সবই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বর্ষিত। কাজেই সাধারণ পাঠক তাঁদের আপন লোক ব'লে মনে করেছেন।

সংস্কার মুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন, তাতে তিনি অনেকের সন্দেহভাজন ছিলেন। শুধু বেদান্ত তাঁকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তিনি সমাজে যে সংস্কার চেয়েছিলেন তা আজও সাধিত হয় নি। মজাটা এইখানে।

সংস্কার সাধনের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল নেই কিছু। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সরল ভাষায় সোজা চাবুক মেরেছেন, রবীন্দ্রনাথ মেরেছেন ব্যঙ্গের চাবুক। সামাজিক গোঁড়ামি, বিয়ের ব্যাপারে পাত্র পক্ষের বর্বরতা, নববধূর উপর শ্বশুরকুলের অত্যাচার, তাঁর নানা গল্পে কঠিন ব্যঙ্গের আকারে ফুটে উঠেছে। কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর তোতা কাহিনীটি হীরকের মতো ধারালো ব্যঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ উগ্র আধুনিকতার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু আক্রোশবশে কদাচিৎ। তিনি এমনই কঠোর রুচিবান ছিলেন যে তাঁর পক্ষে আক্রোশ প্রকাশ ব্যতিক্রম মাত্র, স্বাভাবিক আদৌ নয়।

দুদিকেই অর্থাৎ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, ও সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে, সমান ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর একঘরে নামক বইতে অতি নিষ্ঠুর আক্রমণ করেছিলেন গোঁড়া সমাজকে। বিলেত থেকে এসে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এমন কথা উঠেছিল সমাজে। তিনি বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছি, কিন্তু বিলেত গিয়েছি ব'লে নয়, তোমাদের সমাজে ছিলাম ব'লে।

কিন্তু তাঁর আসল ব্যঙ্গ তাঁর কবিতায়। তাঁর বিলাতফের্ত্তা, Reformed Hindoos, হিন্দু, গীতার আবিষ্কার, প্রভৃতি ব্যঙ্গ সমাজের সংস্কারের কাজে অনেকখানি কাজ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। গীতার আবিষ্কার, তা

সে হবে কেন, সালসা খাও, নসীরাম পালের বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যঙ্গ হিসেবে সফল।

আধুনিক যুগে এই সব ব্যঙ্গ রচয়িতাদের ভাগ্য অনেকটা ভাল, কারণ দেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমন ক্রমশ উদার হয়েছে, এবং আধুনিক শিক্ষার বা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে এখন আর একটি কথাও কেউ উচ্চারণ করেন না। সব দিক দিয়েই সহনশীলতা এসেছে জাতীয় চরিত্রে। তা যদি না হত, যদি ইউরোপের রোজার বেকন বা এমন কি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক ব্যঙ্গ রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হলে সংখ্যাগুরুর সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর নরকের কীট পড়লেই বোঝা যাবে আক্রমণের কি প্রবলতা তার প্রতিটি ছত্রে। তাঁর যে উদ্দেশ্যে কলম ধরা, সে উদ্দেশ্য এখনও সময়কে অতিক্রম ক'রে যায় নি। তাই আজও তার মূল্য অনুভূত হবে। সমাজ যখন যুক্তির পথে চলতে শিখবে, (কখনো শিখবে কি ?) তখনও এ লেখার সাহিত্য মূল্য কমবে না, কেন না ভাষার উপর তাঁর দখল অসামান্য, তাই তাঁর রচনা প্রকৃত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এটি আক্রমণ, এবং অনেক স্থানে নিষ্ঠুর আক্রমণ, কিন্তু এ আক্রমণের গভীরে তাঁর অন্তরের বেদনা, তাই তা কোথায়ও ভারসাম্য হারায় নি। আর ঠিক এই কারণেই তা ব্যঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।

এইবার ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারকে আরও একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

বাংলা ভাষায় 'ব্যঙ্গ গল্প', ব্যঙ্গ রচনা', 'ব্যঙ্গ কৌতুক' বা 'রঙ্গব্যঙ্গ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। রস, রঙ্গরহস্য, ইয়ার্কি, ঠাট্টা, হাসি-ঠাট্টা, হাসিতামাসা, বেশি প্রচলিত। ব্যঙ্গ নিতান্তই কেতাবী শব্দ। ইংরেজী স্যাটায়ারের প্রতিশব্দ রূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ কথাটি ব্যবহার করেছেন, যদিও স্যাটায়ার বলতে ইংরেজী সাহিত্যে যে স্বীকৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ কথাটিতে পুরোপুরি সেই স্বীকৃতি দিতে চান নি মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে স্যাটায়ারে বিদ্বেষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তার প্রমাণ পাই তাঁর ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কীয় রচনায়। সেখানে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে স্যাটায়ারিস্ট রূপে স্বীকার করেছেন এই অর্থে যে ঈশ্বর গুপ্তের কোনো রচনায় বিদ্বেষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতা পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে

দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, হুতোম পঁ্যাচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে লেশমাত্র বিদ্বেষ নাই।"

"হুতোম পঁ্যাচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ" কি না বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ যুগে আমাদের মতভেদ স্পষ্ট। কিন্তু "ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষ প্রসূত"—এই কথাটি স্যাটায়ার সম্পর্কে ইংরেজ সমালোচকের সঙ্গে তাঁর মতভেদের দৃষ্টান্ত। কারণ স্যাটায়ারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার জন্মই বিদ্বেষ থেকে। অর্থাৎ সব সময়েই তা বিদ্বেষ প্রসূত। তবে 'বিদ্বেষপরিপূর্ণ' হ'লে তা যে উচ্চ-শ্রেণীর স্যাটায়ারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো উপন্যাসের প্লট যেমন উপন্যাস নয়, গানের স্বরলিপি যেমন গান নয়, তেমনি শুধু-বিদ্বেষ স্যাটায়ার নয়, অর্থাৎ ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়। স্যাটায়ারের মূলে বিদ্বেষ, কিন্তু সেই বিদ্বেষ একটা বিশেষ চেহারায় প্রকাশিত হলে তবে তা' স্যাটায়ার হয়, ব্যঙ্গ হয়। অবশ্য স্যাটায়ারের শ্রেণীভেদ আছে, এবং বিশুদ্ধ বিষাক্ত আক্রমণ থেকে বিশুদ্ধ হাস্যরসের আক্রমণ, সবই ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কোন্‌টি উচ্চস্তরের ব্যঙ্গ তার অভিধা রচনা বড়ই কঠিন। কেননা ব্যঙ্গ যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে, তবেই তা ব্যঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা অভদ্র আক্রমণ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও তার সাহিত্য মূল্য বেশি হয় না। মাথায় ইঁট মারা ব্যঙ্গ হতে পারে—কিন্তু তা ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়। বিশুদ্ধ হাস্যরস উদ্দেশ্যমূলক নয়, তাই তা ব্যঙ্গ নয়। নর্মান ফার্লং তাঁর ইংলিশ স্যাটায়ারে বলেছেন—"Satire is by nature practical".

ব্যঙ্গ সমালোচক রোনাল্ড নক্স বলেছেন, আইরনি বা ভাগ্যের পরিহাসে হাস্যরস থাকে না, কিন্তু স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গে থাকে। 'Satire borrows its weapons from the humorists. Yet the laughter which satire provokes has malice in it always.'

এই যে ম্যালিস বা বিদ্বেষ, এ বিদ্বেষ ক্ষতিকর নয়, তা উপভোগ্য এবং কল্যাণকর। ব্যঙ্গের উৎপত্তি আক্রমণের বাসনা থেকেই, আঘাত হেনে প্রতি-পক্ষকে সিধে করার বাসনা থেকেই। এই ব্যঙ্গ হচ্ছে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে শত্রুপুরীতে তীর নিক্ষেপ করা, শুধু তীরটি যাতে বাইরের দৃষ্টিতে উপভোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ ব্যঙ্গ এমন একটি অস্ত্র যা পুলিসের চোখের সামনে ব্যবহার করা যায়, এবং পুলিসের সমর্থনে।

এ বিষয়ে প্রশ্নটা শুধু রুচির। কেউ বলেন আক্রমণটা একটু হিংস্র হ'লে ভাল হয়, কেউ বলেন হিংস্র আক্রমণের চেয়ে হাসতে হাসতে মারাই ভাল। মালুগ্রেভ হাসতে হাসতে মারার পক্ষে—

"In satire too the wise took different ways
To each deserving its peculiar praise ..
...Men aim rightest when they shoot in jest".

স্যাটায়ারের রাজা পোপ ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ও অমোঘ কার্যফলের প্রসঙ্গে বলেছেন—

"I must be proud to see
Men not afraid of God, afraid of me :
Safe from the Bar, Pulpit and the Throne.
Yet touch'd and sham'd by Ridicule alone".

মানুষ বিধাতাকে ভয় করে না, কিন্তু ব্যঙ্গ লেখককে ভয় করে। সব দিকে মানুষ নিরাপদ, কিন্তু ব্যঙ্গের আঘাতে ধরাশায়ী।

ড্রাইডেন এ কথার সমর্থন করেছেন—

Of the best and finest manner of Satire 'tis the sharp, well-mannered way of laughing a folly out of countenance'.

আদর্শ স্যাটায়ার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হবে এই শেষোক্ত দুই ব্যঙ্গ-গুরুর উদ্ধৃতি থেকে। ড্রাইডেনের 'ওয়েল-ম্যানার্ড' কথাটি মূল্যবান অর্থাৎ আক্রমণের ভঙ্গিটি যেন ভদ্র হয়, শালীনতার সীমা না ছাড়ায়। তা হলেই, যে-অন্যায় বা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে আক্রমণ, তা লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

ব্যঙ্গ রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ তো শেষ বয়সে স্পষ্টই ব'লে গেছেন—

"তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে,
পণ্ডিতের মূঢ়তায় ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব।"

মূঢ়তা মানুষের হোক বা অপদেবতার হোক, তার প্রতি হাস্য বর্ষণই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ।

আয়রনিতে হাস্যরসের স্থান স্বভাবতই নেই। আয়রনির মাধ্যমে সফল ব্যঙ্গ ফোটানো যায়। যাঁরা বলেন স্যাটায়ার হাস্যরস মণ্ডিত হওয়া আবশ্যক, তাঁরা স্যাটায়ারের এই শাখাটিকে বিশেষ আমল দেননি। আয়রনির আকারে ব্যঙ্গের শক্তি কম নয়। এই সংকলনে অন্তত তিনটি ব্যঙ্গ রচনা আছে যা আয়রনির শ্রেণীভুক্ত করা চলে। একটি, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নরকের কীট'। 'নরকের কীট' সমাজের প্রতি অতি প্রবল আক্রমণ, নির্মম আক্রমণ, স্যাটায়ারের শ্রেণীবিভাগের একেবারে গোড়ার দিকে এর স্থান, তিক্ত বিষাক্ত আক্রমণ, কিন্তু তবু এ আক্রমণ ব্যক্তিগত নয় ব'লে এটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ এবং শেষ

ছত্রে পৌঁছে এটি আয়রনি। আক্রমণকারী যেখানে শ্মশান ঘাট বাঁধানোর এস্টিমেট চাইছেন। এঁর সম্পর্কে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। বনফুলের 'মানুষের মন' আয়রনির একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত। ত্রুটিহীন সম্পূর্ণ একটি ছোট গল্প, কিন্তু গল্পের শেষে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ঘৃণা করছে সেই ব্যক্তি তারই কাছে আত্মসমর্পণ করল। যুক্তির উচ্চাসন থেকে যুক্তিবাদী ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল, এই অবস্থাই হচ্ছে ব্যঙ্গের পক্ষে আদর্শ।

নক্স বলেছেন—Irony is content to describe men exactly as they are, to accept them professedly, at their own valuation, and then to laugh up its sleeve. It falls outside the humorous literature altogether.

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্যাটায়ার অনেক সময় প্রসঙ্গত বা ইনসি-ডেণ্টাল। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তোলা। মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে পোঁচা মেরে যাওয়া। কিন্তু শেষ লক্ষ্য হচ্ছে কৌতুক-হাস্যের। তাঁর রচনা কৌতুক প্রধান, যদিও তাঁর সমগ্র রচনা থেকে ব্যঙ্গ অংশ বেছে নিলে তাকে জাত-ব্যঙ্গ ব'লে চিনতে দেরি হবে না। কিন্তু তাঁর মনের অতিউদারতা, কোমলতা, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, ও তাঁর স্বভাবজাত কৌতুকপ্রিয়তা, তাঁকে সংস্কারকের দৃঢ়তায় অটল থাকতে দেন না।

ব্যঙ্গ সাহিত্য-অস্ত্র না হয়ে যদি বস্তু-অস্ত্র হ'ত তা হ'লে বলা যেত তার এক দিকে টিয়ার-গ্যাস অন্য দিকে নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস। দুই-ই আক্রমণে ব্যবহার্য।

এ থেকে বোঝা যায় ব্যঙ্গের লক্ষ্য মানুষ বা মানুষের সমাজ। মানুষের অসঙ্গতিই ব্যঙ্গের বিষয়। মনুষ্যেতর প্রাণী বা অপ্রাণী ব্যঙ্গের বিষয় হয় না যদি না তারা মানুষের গুণপ্রাপ্ত হয়। এই অর্থে মনুষ্যেতর শুধু নয়, মনুষ্যোত্তর প্রাণীও ব্যঙ্গের বিষয় হতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গে মনুষ্যোত্তর প্রাণী এন্তার। লুল্লু, মিভির জা, সাহেব ভূত, ঘ্যাঁঘোঁ, এবং আরও অনেকে।

ইংরেজী স্যাটায়ার কথাটি এসেছে লাটিন sature থেকে। এক রকম নাটক অভিনীত হ'ত তার কোনো নির্দিষ্ট প্লট ছিল না, সঙ্গে নাচ গান থাকত প্রচুর। তারপর নানা ছন্দে রচা সাধারণের উপভোগ্য কতগুলি কবিতার গুচ্ছকে বলা হত সাটুরা। এর অর্থ, "বিবিধ"। এতে পূর্ব্বের নাটকের চেহারাও কিছু মিশ্রিত ছিল, সংলাপে কিছু কিছু ব্যঙ্গও ছিল। অর্থাৎ মূল অর্থে স্যাটায়ার হচ্ছে পাঁচ মিশেলি বা খিচুড়ি। এই খিচুড়ি দু হাজার আড়াই হাজার

বছর ধ'রে পরিবর্তনের পথে বর্তমান স্যাটায়ারে এসে পৌঁছেছে। তারপর আমরা বাংলায় তার নাম দিয়েছি ব্যঙ্গ, যদিও সাধারণত আমরা ব্যঙ্গ বলতে তার সঙ্গে একটু রঙ্গও আশা করি। ইংরেজী স্যাটায়ার কাব্য এবং নাটকে বেশি সমৃদ্ধ, বাংলা স্যাটায়ারও তাই। এর কারণ সর্বত্রই এক। গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ হয়েছে কাব্য সাহিত্যের পরে। কিন্তু ব্যঙ্গ করা মানুষের একটি ধর্ম। অতএব গদ্যের প্রসার হেতু গদ্যে ব্যঙ্গের প্রসারও স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজীতে অনেক ব্যঙ্গ বা হাস্য-রসাত্মক বড় গল্প বা উপন্যাস লেখা হলেও, বাংলায় অতি সামান্যই হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ছোট গল্পের সংখ্যা বরঞ্চ বেশি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ গল্প—তোতাকাহিনী, সফল ব্যঙ্গ। বুদ্ধিবৃত্ত রচনা (স্যাটায়ারের এটি একটি লক্ষণ), এবং হিউমারের গা ঘেঁষে গিয়ে লক্ষ্য বস্তুকে আক্রমণ। দেখতে ছোট কিন্তু ফলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

প্রমথ চৌধুরীর স্যাটায়ার গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্ন ভাষায় উইট ও হিউমার রচনা। রসস্রষ্টা অমৃতলাল বসু নতুন এলেন এবারে। অবনীন্দ্রনাথের স্যাটায়ার স্নিগ্ধ সহৃদয় হাস্যমণ্ডিত। রাজশেখর বসুর স্যাটায়ারে আক্রমণ এবং কৌতুক অঙ্গাঙ্গি মিশেছে। তাতে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য সফল ক'রেও তার উপভোগ্য অংশটি বরাবর উদ্বৃত্ত থেকে যায়। ব্যঙ্গের সঙ্গে রাজশেখর বসুর নাম এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে রাজশেখর বসুর এখন আর সীরিয়াস গল্প লেখবার উপায় নেই, পাঠক হতাশ হবে। প্রমথনাথ বিশী একজন শক্তিশালী স্যাটায়ারিস্ট। তাঁর 'শিখ' গল্পটি বাঙালী চরিত্রের একটি দিকের প্রতি ব্যঙ্গ হিসেবে সার্থক। যেমন সার্থক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রাম সংস্কার'। খুব জোরালো ব্যঙ্গ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর গল্পের শরটি যথাস্থানে গিয়ে অবশ্য বিঁধবে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জীবনে যত গল্প লিখেছেন সবই ব্যঙ্গ গল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কৌতুক সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত মৃদু খোঁচা আছে ব্যঙ্গের। লীলা মজুমদারের সরস গল্প, যেমন সরস গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং দেবেশ দাশের। তবে এঁদের মধ্যে দেবেশ দাশের বিশেষ বক্রব্যঙ্গ দৃষ্টিটি লক্ষণীয়। কিন্তু জগদীশগুপ্তের 'অন্নাভাবের দিনে' নামক ছন্দে লেখা গল্পটি একটি বহু মূল্যবান ব্যঙ্গ গল্প, মনে রাখবার মতো। শ্রেণীবিচারে প্রথম।

অচিন্ত্যকুমারের 'আর্টিস্ট' গল্পটি সফল ব্যঙ্গ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যঙ্গ গল্প লিখেছেন, তাঁর 'উড়ুম্বর' সার্থক ব্যঙ্গ

গল্প। অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—দুজনেই ব্যঙ্গে সিদ্ধহস্ত। সজনীকান্ত দাস ব্যঙ্গ কবিতার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি কিছু ব্যঙ্গ গল্প রচনাও করেছেন গদ্যে, কিন্তু ছন্দে তাঁর হাত খোলে ভাল। এবারের ছন্দে গল্পটি কতখানি ব্যঙ্গ, এবং কার প্রতি তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সরস গল্প হিসেবে জমেছে ভাল। শিবরামের মানসিক গঠন আক্রমণের অন্তরায়। তিনি বিশুদ্ধ কৌতুকস্রষ্টা। তাঁর হাতে অতি অভাজনও অতি প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে। 'পাঞ্চজন্য' গল্পে কৌতুক সজারুর কাঁটার মতো গল্পের সর্বাঙ্গে খাড়া হয়ে উঠেছে।

ভাস্করের গল্প মাত্রেই ব্যঙ্গ গল্প—আক্রমণ মাধুর্য মণ্ডিত, আক্রান্ত ও আক্রমণকারী একত্র হাসে। অক্রূরের ব্যঙ্গেও মধুরতা বেশি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনাকে একটু বাঁকা চোখে দেখেন, তাঁরও আক্রমণ অত্যন্ত কোমল, এবং অসহায়ের আক্রোশ, ঘরোয়া ভাষায় লেখা, আবৃত্তি ক'রে পড়ার উপযুক্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মানসিক গঠন স্যাটায়ারিস্টের উপযোগী নয়। তাঁর মধুর ঔদার্য সরস চিরবর্ণী, তাঁর ব্যঙ্গের বিজলী, বাঁকা-রেখায় আকাশকে বিদীর্ণ করে না, ছড়িয়ে যাওয়া আলোর উদ্ভাসিত করে। রাগিয়ে দিলে কি হয় জানি না, হাসিয়ে দিলে আর মারতে পারেন না।

বিনয় ঘোষ জাত-ব্যঙ্গ-লেখক। তির্যক দৃষ্টি নিয়েই তিনি সাহিত্যে নেমেছিলেন, হুতোমের অনুকরণে, কালপেঁচা নাম নিয়ে। তিনি এখন পেঁচার বিজ্ঞতায় বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ভারী ও কঠিন বই লিখছেন।

সম্বুদ্ধও জাত ব্যঙ্গ লেখক, কিন্তু সম্বুদ্ধ এখন প্রায় অতীতকাল, তিনি বুদ্ধের মহানির্বাণ লাভে বেশি উৎসুক মনে হচ্ছে। তাঁকে অতীত থেকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে ফিরিয়ে আনা দরকার। বিমল মিত্রের নতুন গল্প এলো এবারে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ লেখক। তাঁকে নতুন স্থান দেওয়া হল এবারে। ইতিমধ্যে আরও যাঁরা ব্যঙ্গ গল্পে যথেষ্ট নাম করেছেন, এমন দুজন তরুণ—গৌরকিশোর ঘোষ ও দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল নব সংস্করণে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

এ সংকলনের প্রধান লক্ষ্য বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গ গল্প রচনার ধারাটি অনুসরণ করা। ব্যঙ্গ গল্প কথাটি লক্ষণীয়—আধুনিক অর্থে যা গল্প বা ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ কবিতা বা নাটকের প্রাচুর্যের কথা আগেই বলেছি। এদেশে ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাসও প্রাচীন—কিন্তু গল্প রচনা আধুনিক; এটি ইংরেজী শিক্ষার পর থেকে। এবং ব্যঙ্গ গল্পের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ কারণ ব্যঙ্গ লেখকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। অবশ্য ব্যঙ্গ-মহাজাতির বহু উপজাতি আছে, এবং সমগ্রকে ধরলে প্রত্যেক গল্প লেখককেই এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

বাংলা ছোট গল্পের উৎকর্ষ আজ পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের ছোট গল্পের সমপর্যায়ের এবং লেখক সংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং যেহেতু গল্প মাত্রেই জীবনের চিত্র (যদিও তা আংশিক), সেই হেতু এমন গল্প লেখক থাকতেই পারেন না যিনি জীবনকে কোনো না কোনো সময়ে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেননি ব্য ব্যঙ্গ লেখেননি। তাঁদের সবাইকে এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়, এবং অনেক ব্যঙ্গ লেখককেও বাদ দিতে হয়েছে অনিবার্য কারণবশত। এই বইয়ের সব রচনাই যে ছোট গল্পের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই সে কথাটিও উল্লেখযোগ্য। গল্প, গল্পকল্প, অনুগল্প, প্রায়গল্প, গল্পের মতো, সবই এতে আছে। এবং দ্বিতীয় সংস্করণে আরও এক ধাপ এগিয়ে ছন্দে লেখা গল্পও তিনটি দেওয়া হয়েছে। ছন্দের ছোট গল্প যে গল্পই, কাব্য নয়, আশা করি একথাটা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

কিন্তু ব্যঙ্গ গল্প বলতে আমরা সব সময়ই তার মধ্যে একটুখানি হাস্যরসও পেতে চাই মনে মনে। কেন, জানি না ; হয় তো সংস্কার, হয় তো সার্থক ব্যঙ্গ রচনার ওটি একটি চিহ্ন। সেইজন্য যাঁরা ব্যঙ্গ কৌতুক লেখায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের দিকেই টেনে চলতে হয়েছে বেশি এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে দু একটি এমন রচনা দেওয়া হয়েছে যা বিশুদ্ধ স্যাটায়ার, যার পিছনে চাবুকও আছে চোখের জলও আছে। ভারী নাটকে যেমন মাঝে মাঝে দু একটি হাল্কা রিলীফ দৃশ্য দেওয়ার রীতি আছে, এখানে তেমনি লঘু গল্পগুলির ফাঁকে ফাঁকে রিলীফ হিসেবে ভারী স্যাটায়ার কিছু দেওয়া হয়েছে।

নাটক বা নাট্যাংশ, প্রবন্ধ ও কবিতা, এ সংকলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে সব ব্যঙ্গ গল্পে, এই সঙ্কলনে, ব্যঙ্গ এবং গল্প এ দুইয়ের যথেষ্ট মিল ঘটেছে সেই সব গল্পই সঙ্কলনের লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও সে লক্ষ্য থেকে কিছু সরতে হয়েছে নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃই। কেননা গোড়ার দিকে ঐ দুটি বস্তু মেলেনি, এর বিরলতা তখনকার যুগে উল্লেখযোগ্য। অথচ প্রকৃত ব্যঙ্গ গল্পের সন্ধানে যাত্রা করতে হলে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতপূর্ণ পূর্ব-রচনার একটুখানি নমুনা বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু বঙ্কিম পূর্বে যুগে যত ব্যঙ্গকার দেখা দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে স্থান দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি, পরবর্তী যুগ সম্পর্কেও অনেকটা তাই। কারণ ধারাবাহিকভাবে সকলের লেখার নমুনা দেবার মতো নমুনাও যেমন বিরল, তার প্রয়োজনও তেমন বোধ করিনি। রুচি রক্ষার জন্য উদ্ধৃত নমুনা থেকেও কিছু কিছু বাদ দিয়েছি। প্রথম যুগে যখন গল্প রচনার প্রয়াস মাত্র শুরু হয়েছে—এবং যা প্রবন্ধ এবং গল্পরে মাঝামাঝি অবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় শুধু এক বা একাধিক ব্যঙ্গ্য চরিত্রের দাবীতে ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাস রচনা করছে, সেই যুগের সামান্য কয়েকটি রচনাংশ প্রথম দিকে স্থান পেয়েছে। এই কারণে

যে, তাতে আধুনিক যুগের রচনারীতির সঙ্গে ঐ যুগের সম্পর্ক কতখানি তা এর সাহায্যে বিচার করার সুবিধে হবে।

এর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের একটি অনুবাদ করা নীতি গল্পও স্থান পেয়েছে—রচনার ব্যঙ্গ্য এবং মৃত্যুঞ্জয়-ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ-হুতোম-বঙ্কিম মধ্যবর্ত্তী গল্প-রচনার একটি ধাপ দেখানোর জন্য। আরও একটি কথা—সংস্কারক যে নীতি প্রচার করেন, স্যাটায়ার তারই উল্টো পিঠ। চেহারায় কিছু তফাৎ হলেও দুইয়েরই উদ্দেশ্য সংস্কার। সে হিসেবে দুই কালের দুই ব্যঙ্গ রীতির মাঝখানে সংস্কারক বিদ্যাসাগরের নীতি গল্পটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরেরই প্রবলতম স্যাটায়ারিস্ট হবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু আধুনিক ব্যঙ্গ গল্প বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু। টেকচাঁদ লিখেছেন শিক্ষা-মূলক কাহিনী, হুতোম লিখেছেন নক্সা। হুতোমের ব্যঙ্গোচিত বক্র দৃষ্টির মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' বাংলা ভাষায় লেখা অসম সমাজ ব্যবস্থার উদ্দেশে প্রথম ব্যঙ্গ গল্প। ব্যাপ্তি দেশ কালের বাইরে। দুর্গাচরণ রায় মৃদু ব্যঙ্গের খোঁচা সহ সুন্দর কৌতুক রচনা করেছেন, এবং অনায়াসে করেছেন। এ কাহিনীটি দেবগণের মর্ত্তে আগমণ নামক তাঁর বিখ্যাত বই থেকে নেওয়া।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুটকি রচনায় সিদ্ধহস্ত।

এ বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী। এর ধ্বনিতে প্রথমাংশে একটুখানি ব্যঙ্গ আছে। বাকীটুকুর যোগে রূপকথার দুটি প্রসিদ্ধ পাখীর—বেঙ্গমা বেঙ্গমীর (বিহঙ্গম বিহঙ্গমী) নামের ধ্বনি। ওর বানান পৃথক ব'লেই 'ধ্বনি' বলছি। চলতি কথায় ঐ দুই প্রসিদ্ধ পাখী বেঙ্গমা বেঙ্গমী অথবা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, যদিও আমার মতে রূপকথার ও দুটি পাখী একটি বৃহৎ ব্যঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানুষের ভাগ্যফল বলছে পাখীতে, এর চেয়ে বড় ব্যঙ্গ আর কি আছে।

এ বইয়ের ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী নামটি আসলে ব্যঞ্জনা ব্যঞ্জনী অথবা ব্যঙ্গ্যমা ব্যঙ্গ্যমী—অর্থাৎ রচনাগুলি সবই বিভিন্ন জাতীয় ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা।

কিন্তু নাম নামই। এ নামে যদি কেউ ঐ দুটি পাখীকেই স্মরণ করেন, অথবা এ বইখানাকে যদি কেউ রূপকথার গল্প মনে করেন, তবে পাঠক বা প্রকাশক কেউ যে খুব ঠকবেন এমন মনে হয় না। কোন্ গল্পকে কোন্ পাঠক কি ভাবে নেবেন তা তাঁর পাঠ সময়ের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন অনেক মধুর প্রেমের গল্প এ যুগের অনেক পাঠকের কাছে ব্যঙ্গ গল্প মনে হয়, এবং স্যাটায়ারের যুগও তখনই দেখা দেয় যে যুগে রোমান্স বিদ্রূপের স্তরে নামে।

সঙ্কলন যে আদর্শ হয়েছে বা ঠিক পরিকল্পনানুরূপ হয়েছে এমন দাবী নেই। অনেকগুলি লেখা লেখকেরাই পছন্দ ক'রে দিয়েছেন। রুচিভেদ থাকবেই। চেষ্টা ক'রেও সংগ্রহ করা যায় নি, কিন্তু তবু আশা করি ৫২ জন লেখককে যখন একত্র করা গেছে, তখন নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটি দৃঢ় ব্যূহের আশ্রয়ে থেকে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

পরিশেষে শ্রী বাসুদেব লাহিড়ীকে তাঁর এই সঙ্কলন পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। পাঠক মহলের সম্ভাবিত মতভেদ সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্যঙ্গ রচনার এই বৃহৎ সঙ্কলনটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব একা তিনিই নিয়েছেন, এজন্য পাঠকেরাও তাঁকে অবশ্য ধন্যবাদ দেবেন। এবং এ সঙ্কলন যে পাঠকদের প্রিয় হয়েছে তা এর সংস্কারান্তরই প্রমাণ করে। এই নতুন সংস্করণে অনেক লেখার অদল বদল ঘটেছে। নতুন সংযোজনও ঘটেছে। কিন্তু ছাপার ভুল এড়ানো গেল না, এটি দুঃখের বিষয়।

কলিকাতা
জানুয়ারি ১৯৬০

পরিমল গোস্বামী

বিশ্ববঞ্চক

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(১৭৬২—১৮১৯)

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয়, সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয়, তাহা কি কহিব? ইহার কাহিনী।—ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে। তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া। পুত্রের নাম ঠক্। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাইধূলা অঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিয়মিতবেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াসুদ্ধ তৌলায় দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না। বলে যে, এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমে উপযুক্ত। আমি ঐ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না। যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে, তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয়, তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়াসমেত দিতে পারি; কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্বদা দিতে পারি না। কেননা, যদি কিছু দেই, তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবেন না,—কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস্। কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস; অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেওয়া হয় না। তবে লইয়া কি করিব?

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে,—আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন। দুই এক সের যদি আজও দিতে, তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায়, কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ড সমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায়। এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ একদিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর একজন বিশ্বভণ্ড নামে, এক কূপাতে পাঁক কাদা পূরিয়া, তদুপরি কতক গুড় দিয়া, ঐ কূপা মাথায় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃত ঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল,—গুড়ের কূপা মাথায় করিয়া কত বেড়াব? উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয়। এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে আসিতে আমি আপন গুড়ের কূপা ছাড়িয়া উহার ঘৃত পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করা ভাণ্ড গাছের তলায় ফেলিয়া

বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে মনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃত কুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল,—আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে, ঈশ্বর-বিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয়। আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল, সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল,—ও ঠকের মা। ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল,—ওগো, আমি যাইতে পারিব না। আমার হাত জোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল,—আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে, দিব্য সার গুড় এক কূপা পাওয়া গিয়াছে। এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলিয়া আমার সেই ঘি-এর ঘড়া জানিসতো। তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে, আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম। পশ্চাৎ টের পাইবে। যা, শীঘ্র রাঁধা বাড়া কর; আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে, স্ত্রী কহিল,—গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়; তৈল নাই, লুন নাই, চাউল নাই, তরকারি পাতি কিছুই নাই, কাঠগুলা সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে? ....তৎপতি কহিল,—আজ কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ-দেখি, খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল,—বটে,—পিঠা করা বুঝি বড় সোজা, জাননা—পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা,—শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেদের মাউগের মত মাউগ পাইতে, তবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তবে কি আজ খাওয়া হবে না? ক্ষুধায় কি মরিব? তৎপত্নী কহিল,—মরুক ম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি দেখি হাঁড়ি কুঁড়ি—খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদ কুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল,—শীলটা ভাল বটে, লোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকন বাটনা হয়? মরুক যেমন হউক, বাটিত। ইহা কহিয়া খুদ কুঁড়া বাটিয়া কহিল, বাটাতো এক প্রকার হইল, আলুনি পিঠা খাইবা না, লুন তেল আনিতে হইবে? গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া, বিশ্ববঞ্চক কহিল—ওরে বাছা ঠক। তৈল, লবণ কোথা হইতে গোছে গাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছেলিয়াকে, 'আয় আমার সঙ্গে,

তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আসিল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল, হাঁ মোর বাছা এই তো বটে, না হবে কেন,—আমার পুত্র, ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রকে ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল,—ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা, ক্ষুধাতে বাঁচিনা।......পিষ্টক পাক করিয়া থালেতে পরিবেশন করিয়া কূপা হইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া, তদুপরি এক কালে কতকগুলা পংক কর্দম পড়িল।

ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল, খাও এখন পিঠা খাও, যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল,—যা, যা, তুই আর পোড়াসনে। যার যেমন কপাল, তার তেমনি সকলি মিলে, কিন্তু যা হউক, বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকে বঞ্চনা করিল, বাপের বেটা বটে; এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে ডাকিতে লাগিল,—ওহে বন্ধু! থাক থাক, তোমাকে কোল দিয়া, আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া, আপাতত তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল,—আইস আইস, তোমাকেও আমি মনে মনে তত্ত্ব করিতেছি, ভাল হইল! তোমার সঙ্গে দেখা হইল। কহ,—গুড় কেমন খাইলা! বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তুমি যেমন ঘৃত খাইলা; কিন্তু ভাই তুমি আমাকে জিতিয়াছ; আমি গুড় কিছুই পাই নাই। তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা। সে যা হউক আইস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া, অন্যান্য মুখাবলোকনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই! তোমার নাম কি? সে কহিল,—আমার নাম বিশ্বভণ্ড। ইহা শ্রবণ মাত্র হী হী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল,—তবেতো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,—তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল,—না ভাই! আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোহার নাম শব্দতঃ সমান না হইক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল,—ভাল, সমানে সমানে মিলন বিহিত বটে,—যদি উভয়ে সরল হয়। উভয়ে কুটিল হইলে, বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন

হয় তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে, যা' হউক; কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেননা, তুমি আমার গুণ জানিলে। আমিও তোমার গুণ জানিলাম। কেহ কাহারও কথা কোথাও কহিব না।....কেবল ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ। অতএব চল, কোন দূরদেশে গিয়া এমন জীবিকা করি, যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুর্জরাট দেশে গেল। তথায় গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—হে মিতা। তুমি এক কর্ম কর। এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া ধোবা-কাচা চাদর গায় দিয়া, এ শহর-বাসি চিত্রগুপ্ত নাম মহাজনের বাটী যাও। পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি; কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কাহাকেও কিছু দিবে না, আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে, আপনি হেথায় কেন? তখন তুমি কহিও যে, পিতার সহিত কর্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি। ইচ্ছা আছে, যদি ইনি সাহায্য করেন, তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথায় গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া, বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল,—একি আশ্চর্য্য। আপনি এস্থানে কি নিমিত্ত? সে কহিল,—তাত বিমাতার বশতাপন্ন, এ প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্যক্রমে বিবাদ হইল—এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল,—সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্ম-পতি নামে মহাজনের পুত্র ইনি। হে চিত্রগুপ্ত! তোমার বড় ভাগ্য যে, ইনি তোমার বাটী আছেন। একথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল, বটে। তাঁহার পুত্র ইনি। আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল, এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন? সে কহিল,—ইঁহার নাম শুনিয়া এস্থানে আসিয়াছি। ইনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে স্ব-জাতি জীবিকা বাণিজ্য কর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল,—তুমি যদি এই নগরে কুঠি করিয়া ব্যবসায় কর, তবে আমি তোমায় সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথামত উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া-দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া, এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—ওহে বন্ধু! শুন, বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভাল নয়। স্ত্রী পুত্রাদি-পরিবারবর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে, আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে। এ সকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল,—সে উপায় কি? বিশ্ববঞ্চক কহিল,—দীর্ঘপ্রস্থে বড়ো কতকগুলা ঘর করি। দুই এক হাজার টাকার তূলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পুরিয়া নিশীথে সেই ঘরে

আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন আমার টাকার কি? তখন তুমি কহিও তাহার ভাবনা কি? আমার সঙ্গে লোক দেও, আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া কড়া কড়া দাম দাম এককালে সকল ছিঁড়াইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দিবেন, তাহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব। তদবধি তুমি পাগল হইবে। মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে, তখন তুমি 'ভু-ভু' কেবল এই শব্দ করিবে। মহাজনের লোকেরা কিছুদিন এইরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,—টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে? বিশ্ববঞ্চক কহিল,—খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুইজনে ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া রাখি,—যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। একথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল,—টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা, সে কেবল কালনেমির লংকার বাঁটের মত। আকাশের পক্ষির মাংস পাকার্থে বেসর বাটা, মূর্খের কর্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন। 'এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল' যখন এমত বুঝা যাবে, তখন বাঁটের কথা—এখন কি? কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছ, সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয়, এতদ্রূপ তূলা প্রভৃতি সামগ্রী আন গিয়া। আমি বড় বড় দাঁড়ঘরা কতকগুলা প্রস্তুত করি। এইরূপ দুইজনে নির্জ্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তূলা কার্পাসদিগর সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া স্ব ভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্ত রূপকাবশিষ্ট তংকা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী সকল আনিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত বস্ত্র মাত্রাবিশিষ্ট উভয়ে অতি প্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার লোক সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথ হইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল, বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল। মহাজনের লোকেরা যখন টাকার তাগাদা করে তখন কেবল 'ভু ভু' এই কহে—আর কিছু কহে না।

এইরূপ কিছুদিন দেখিয়া সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সদাগর 'অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম' এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধি লাঘবের জন্য অপ্রতিষ্ঠা ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তুষ্ণীম্ভূত

হইয়া থাকিলেন। তদন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল,—মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম। এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ববৎ পাগল হইয়া 'ভু-ভু' কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল—যাও যাও। ভাই, আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই। আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও 'ভু-ভু' এইমাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছুদিন সেথায় থাকিয়া নানা প্রকার ভয় ভীতি প্রদর্শন দ্বারা যতই তাগাদা করে, তাহাতে কেবল 'ভু' পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ব-বঞ্চক কহিল,—ভাল রে বেটা ভাল, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও ভাঁড়াইলি। তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্, 'যে শিখাইল ভু,—তারেই দিলি ভু।' এই কহিয়া চোরেরা লাজে কাঁদে না।—এতন্ন্যায়ে কেবল ভোকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন। একথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ সকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন।
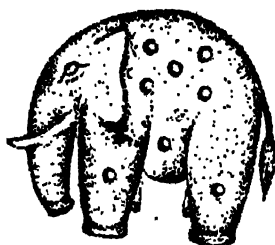
বাবুর উপাখ্যান

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৭৮৭—১৮৪৮)

বাবু লেখাপড়া কিছু শিখলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচার করতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালীর ধারা, ব্যবহার বিদ্যা, নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি সকল কর্ম্মও করা হইয়াছে। এইক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা, ব্যবহার, পুরুষার্থ, ধার্ম্মিকতা, সৌজন্য, বিচার বাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে, সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন, চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন। তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইল সুতরাং উঠিতেই হইল। সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন, দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন, ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠ হইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলে, বাবু ছাই গাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন। ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে, যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না। ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন ২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন, তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালীর মত করিতে কহ, একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না মানুষের একই কথা।

সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন, তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন; ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয়, তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুসা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিষ্টল লে আও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখীরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

সাহেব লোক রবিবার২ গির্জায় গিয়া থাকেন, অন্যবারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা কয়িা সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের যাত্রা খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্‌গ্রস্ত হয়, তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানে পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া, স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন; ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

সাহেব লোক আদালত হইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় আদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কিনা বিবেচনা করিবেন।

মতিলালের ইংরাজী শিক্ষা

প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)

(১৮১৪—১৮৮৩)

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্ত্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানব স্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রিম কোর্ট্ স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজী চর্চ্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও আনন্দিরাম দাস অনেক ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুলমাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্ডিস্ পড়িত, ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে আইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাহবা দিতেন।

ফ্রেন্কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাহারা যে স্কুলে পড়ুক আপন২ পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমন২ অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি এখানে—কালি ওখানে ঘুরে২ বেড়ায়—মনে করে, গোলমালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলাম। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দুই একদিন পড়িয়া, কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য্য এই, যে সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্ম্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাহিরে সকল কর্ম্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে—করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে

হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবে থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে, সে তাহা শুন্‌বে কেন? বাপ অসৎ কর্ম্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। যাহার বাপ ধর্ম্মপথে চলে তাহার পুত্রের উপদেশ বড় আবশ্যক করে না—বাপের দেখাদেখি পুত্রের সৎ স্বভাব আপনা আপনি জন্মে ও মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মিষ্ট বাক্যে, স্নেহে এবং মুখচুম্বনে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয়রূপে জানে যে এমন২ কর্ম্ম করিলে আমাকে মা কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সৎ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য, যে শিষ্যকে কতকগুলা বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন। যাহা পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি বুদ্ধির জোর ও কাজের বিদ্যা না হইল, তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধারা ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে—কেবল তাঁইস করিলে হয় না।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে থাকিয়া মতিলাল কিছুমাত্র সুনীতি শেখে নাই। এক্ষণে বহুবাজারে থাকাতে হিতে বিপরীত হইল। বেচারাম বাবুর দুইজন ভাগিনেয় ছিল, তাহাদের নাম হলধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবধি পিতা কেমন দেখে নাই। মাতার ও মাতুলের ভয়ে এক এক বার পাঠশালায় গিয়া বসিত, কিন্তু সে নামমাত্র, কেবল পথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—হুটোহুটি করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন শুনিত না—মাকে বলিত, তুমি এমন করো ত আমরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই একজন। দুই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়। পরস্পর এ ওর কাঁধে হাত দেয় ও ঘরে দ্বারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাবুর ব্রাহ্মণী তাহাদিগকে দেখিয়া এক এক বার বলিতেন—আহা এরা যেন এক মার পেটের তিনটি ভাই।

কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধা, ক্রমাগত চুপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবে যে তাহারা খেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। খেলাধূলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে. শরীর

তাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—যাহা শেখা যায় তাহা মনে ভেসে ভেসে থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু খেলারও হিসাব আছে, যে২ খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই খেলাই উপকারক। তাস, পাশা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ফল নাই—তাহাতে কেবল আলস্য স্বভাব বাড়ে—সেই আলস্যেতে নানা উৎপাত ঘটে। যেমন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয়। কেন না খেলায় কেবল শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছুমাত্র শাসন হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবে, এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে বই কি সুপথে যাইতে পারে? অনেক বালক এইরূপেই অধঃপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়—যাহা মনে যায় তাই করে—কাহারো কথা শুনে না—কাহাকেও মানে না। হয় তাস—নয় পাশা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা—নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সর্ব্বদা আমোদেই আছে—খাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই—বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে, অমনি বলে—যা বেটা যা, আমরা যাব না। দাসী আসিয়া বলে, অগো মা ঠাকুরাণী যে শুতে পান না—তাহাকেও বলে—দূর হ হারামজাদি। দাসী মধ্যে মধ্যে বলে, আ মরি, কি মিষ্টি কথাই শিখেছ! ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া—উনপাজুরে—বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবা রাত্রি হট্টগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতা ভার—কেবল হো২ শব্দ—হাসির গর্‌রা ও তামাক চরস গাঁজার ছর্‌রা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক্ দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য যে মানা করে। বেচারাম বাবু এক২ বার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন আর বলেন—দূঁর২।

সঙ্গোদোষের ন্যায় আর ভয়ানক কিছুই নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্ব্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষে সব যায়, যে স্থলে ঐরূপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষে কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে সকল সঙ্গী পাইল, তাহাতে তাহার সুস্বভাব হওয়া দূরে থাকুক, কুস্বভাব ও কুমতি দিন২ বাড়িতে লাগিল। সপ্তাহে দুই এক দিন স্কুলে যায় ও অতিকষ্টে সাক্ষিগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকে। হয় তো ছেলেদের সঙ্গে ফট্‌কি নাট্‌কি করে—নয় তো সেলেট লইয়া ছবি আঁকে—পড়াশুনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। সর্ব্বদা মন উড়ু২, কতক্ষণে সমবয়সিদের সঙ্গে ধুমধাম ও আহ্লাদ

আমোদ করিব। এমন২ শিক্ষকও আছেন যে, মতিলালের মত ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন। তাঁহারা শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার ধারা জানেন—যাহার প্রতি যে ধারা খাটে, সেই ধারা অনুসারে শিক্ষা দেন। এক্ষণে সরকারী স্কুলে যেরূপ ভড়ঙ্গে রকম শিক্ষা হইয়া থাকে, কালুস সাহেবের স্কুলেও সেইরূপ শিক্ষা হইত। প্রত্যেক ক্লাশের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না—ভারি২ বহি পড়িবার অগ্রে সহজ২ বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইত না—অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যক বোধ হইত না এবং কি কি শিক্ষা করাইলে উত্তরকালে কর্ম্মে লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না। এমত স্কুলে যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যা শিক্ষা কপালের বড় জোর না হইলে হয় না।

মতিলাল যেমন বাপের বেটা—যেমন সহবত পাইয়াছিল—যেমন স্থানে বাস করিত—যেমন স্কুলে পড়িতে লাগিল তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। এক প্রকার শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহ বা গোঁপে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়। বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস সাহেবের সোণার-কাটি রূপার-কাটি ছিলেন। তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্ব্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর! স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। এ কথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ডিক্সনেরি দেখ্। ছেলেরা যাহা তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না, কার্য্য শব্দ কাটিয়া কর্ম্ম লিখিতেন, অথবা কর্ম্ম শব্দ কাটিয়া কার্য্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও? মধ্যে মধ্যে বড়মানুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন—তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত—অমুক তালুকের মুনফা কত? মতিলাল অল্প দিনের মধ্যে বক্রেশ্বর বাবুর অতি প্রিয় পাত্র হইল। আজ ফুলটি, কাল ফলটি, আজ বইখানি, কাল হাতরুমালখানি আনিত, বক্রেশ্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের মত ছেলেদিগকে হাতছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার

বেগুন ক্ষেত হইবে। স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটিনাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষী দিবে?

৺শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানি ধরে—একবার এদিকে দেখে ওদিকে দেখে—একবার বসে—একবার ডেস্ক বাজায়,—এক লহমাও স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপ্‌স্কুল করিয়া বাটি যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়ালা ও ঘুড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অম্লান মুখ, কাহারও প্রতি দিক্‌পাত নাই, ইতিমধ্যে পুলিসের একজন সারজন ও কয়েকজন পেয়াদা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সারজন কহিল—তোমারা নাম পর পুলিসমে গেরেফ্‌তারি হুয়া—তোমকো জরুর জানে হোগা। মতিলাল হাত রগড়া রগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। সারজন বলবান্—জোরে হিড়২ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতিলাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীর ছড়িয়া গিয়া ধূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক এক বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মধ্যে মধ্যে দুই এক কিল ও ঘুসা মারিতে লাগিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া বাপকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এক২ বার তাহার মনে উদয় হইল যে কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম—কুলোকের সঙ্গী হইয়া আমার সর্ব্বনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল—এ ওকে জিজ্ঞাসা করে —ব্যাপারটা কি? দুই একজন বুড়ি বলাবলি করিতে লাগিল, আহা কার বাছাকে এমন করিয়া মারে গা—ছেলেটির মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠে।

সূর্য্য অস্ত না হইতে২ মতিলাল পুলিসে আনীত হইল, তথায় দেখিল যে হলধর, গদাধর ও পাড়ার রামগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও ধরিয়া আনিয়াছে। তাহারা সকলে অধোমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিয়র সাহেব মাজিষ্ট্রেট—তাঁহাকে তজ্‌বিজ্‌ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বাটিতে গিয়াছেন এজন্য সকল আসামীকে বেনিগারদে থাকিতে হইল।

শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১৮২০—১৮৯১)

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানীর অধীশ্বর আলেগ্‌জাণ্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল ; এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম ; খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে ষাটটি মোহর আছে ; লোক-মুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ক্রিয়ুলি নামক সওদাগরের ; তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম ; এবং মোহরের থলিটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া, তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলয় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে, আপনার নিকট, বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ক্রিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, পুরস্কার-দানের অঙ্গীকার করিয়াছিলে কি না ? আর যদি অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন ? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে ; এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না ; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনার পুরস্কার করিয়াছে মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা করি, তখন ঐ থলিতে ষাটটি মোহর আছে বলিয়া আমার বোধ ছিল ; বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্ব্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না ? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্ব্বে আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি ; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে।

ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটটি মোহর আছে; কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এ থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার; তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলির দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় দিলেন।

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৩৮—১৮৯৪)

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়ন-গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্‌ মিট্‌ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিত-লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা ? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল্‌ 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে,—আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই ; এক্ষণে মার্জার-সুন্দরী নির্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল ; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি এখন বল কি ?' বলি কি ? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই ; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার-স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতি-মণ্ডলে কমলা-কান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে ? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুকা নামাইয়া অনেক

অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না ; কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও'। প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জারীর বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন ? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি। এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন ? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি ? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই ? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়-সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি ? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে ? হায়! দরিদ্রের জন্য

ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজার ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?"

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়লঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মানী লোক। পণ্ডিত বা মানী বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!"

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।"

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল!

যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারীকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল।

রেলওয়ে

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম)

(১৮৪৭—১৮৭০)

টুনুনাং ণ্টাং টুনুনাং ণ্টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ুরপঙ্খীর ছাড়বার সংকেতঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং অফিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্‌ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে, তথাপি নিবৃত্তি নাই। 'মশাই শ্রীরামপুর।' 'বালি বালি!' 'বর্ধমান মশাই!' 'আমার বর্ধমানেরটা দিন না' শব্দ উঠচে, চারিদিকে কাঠের বেড়া-ঘেরা বুকিংক্লার্ক সন্ধ্যা পূজার অবসরমত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলচেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো', কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চিৎকার কচ্চে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কমফর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্‌ ঝড়াক্‌ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, শিস দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন, পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানলাটুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চিৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেণ্টেও এই প্রকার গোল। সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফার্স্ট্‌ক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবরবেশে থার্ড ক্লাস বুকিং আপিসের নিকট যাচ্ছেন, এমন সময় টুনুনাংণ্টাং টুনুনাংণ্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে ইস্টিমারের ইস্টিম ছাড়তে লাগলো, লোকেরা রল্লা বেঁধে, জেটি দিয়ে ইস্টিমারে উঠতে লাগ্‌লো—জল্‌দি! চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁক্‌তে লাগ্‌লো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ঝ্যাপ্‌ ঝ্যাপ্‌ শব্দে ইস্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ 'মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন শীঘ্র দিন ইস্টিম খুললো ইস্টিম চললো' বলে চিৎকার লাগালেন, কিন্তু কাটা কপাটের হুজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই, শিস দিয়ে 'মদন আগুন জল্‌চে দ্বিগুন কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী' গান ধল্লেন—'মশাই শুন্‌ছেন কি?

ইস্টিম খুলে গেল, এরপর গাড়ি পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই। ক্লার্ক 'আরে থামো না ঠাকুর' বলে এক দাবড়ি দিয়ে অনেকক্ষণের পর কাটা দরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে পুনরায় 'ইচ্ছা হয় যে উয়ার পরে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন—' 'মশাই বাকি পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে ?' সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে ? 'জমাদার ভিড় সার্ফ্ করো, নিকালো, নিকালো' বলে ক্লার্ক সেই কাঠগড়ার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, রেল পুলিশের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবল সমেত টরমিনাস্ হতে বার করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং আপিসের দিকে চাইতে লাগলেন। এদিকে ক্লার্ক কাটা দরজার ফাটল দিয়ে মদন আগুনের শেষটুকু গাইতে২ উঁকি মাত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনাস্ পরিহার করে অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময় পাশের ঘাটের গহনার ইস্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতিকষ্টে সেই ইস্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়লেন—গহনার ইস্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্‌টানে হটপ্রেসের ফরমার মত ও ইস্ক্রু কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে, পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই এস্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুনুনাংণ্টাং টুনুনাংণ্টাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজলো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজবার উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন, সুতরাং এবার মুকিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা কত্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেনের পথ দেখছেন, জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্যে শামুকটা ট্যাঁক হতে বার করবার সময় দ্যাখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটি নাই। 'দাঁদাঁ সর্বনাশঞ হলঁ। সর্বনাশঞ হলঁ। আমার গেঁজেটি নাই' বলে কাঁদ্‌তে লাগলেন; প্রেমানন্দ, ভায়ার চিৎকার ও ক্রন্দনে যারপরনাই শোকার্ত হয়ে চিৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা 'চপ্‌রাও' 'চপ্‌রাও' করে উঠলো, সুতরাং পাছে পুনরায় এস্টেশন হতে বার করে দ্যায় এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে মনের খেদ মনেই সংবরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও ততই নস্য নিয়ে নিয়ে শামুকটা খালি করে তুললেন।

এদিকে হস্ হস্ করে ট্রেন টর্‌মিনাসে উপস্থিত হল, টুনুনাংণ্টাং টুনুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকের রল্লা গাড়ি চড়তে লাগলো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো, ভেতর

থেকে 'আর কোথা আস্‌চো।' 'সাহেব আর জায়গা নাই' 'আমার বুঁচকি। আমার বুঁচকিটা দাও।' 'ছেলেটি দেখো। আ মলো মিন্‌সে ছেলের ঘাড়ে বসেছিস্‌ যে।' চিৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চিৎকারে কর্ণপাত করেন না। এক একখানি থার্ড ক্লাস কাঁকড়ার গর্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই একজন এস্টেশন মাস্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকি মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফেলবার স্থান থাকে, তা হলে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্লাক্‌-হোলের যন্ত্রনা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাশ দেখলে একদিন এঁদের এজেণ্ট ও লোকোমোটিব সুপরি-ণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়।

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দলবল নিয়ে একখানি গাড়িতে উঠলেন, ধপাধপ্‌ গাড়ির দরজা বন্ধ হ'তে লাগলো, 'হরকরা চাই মশাই। হরকরা সার হরকরা, 'ডেলিনু সার। ডেলিনুস।' কাগজ হাতে লোকেরা ঘুচ্চে—লাবেল। ফালো লাবেল। লাল খেরোর দোবুজান কাঁধে চাচারা বই বেচ্চেন—টুনুনাংণ্টাং টুনুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, এস্টেশন মাস্টার ক্ষুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কমফর্টার জড়িয়ে বেরুলেন, 'অল্‌রাইট। বাবু?' বলে গার্ড হজুরের নিকটস্থ হল—'অল্‌রাইট। গুট্‌মর্নিং স্যার' বলে এস্টেশন মাস্টার নিশেনটা তুললেন—এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে যাবার সংকেত করে পকেট হতে খুদে বাঁশীটি নিয়ে শিসের মত শব্দ কল্লে, ঘটাঘট্‌ ঘটাস্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘটাস্‌ শব্দে গাড়ি নড়ে উঠে হস্‌ হস্‌ হস্‌ করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দনগরের আমদানী পেরু ও মোরগের মত থার্ড ক্লাসবদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে কত্তে চললেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুসহ বিরাজ করায় রসুনের খোস্‌বোয় জয়দেবের বংশধর যারপর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়ছে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি? পেছন দিকে দুজন চীনেম্যান হাত রুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েচে। প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু এখনো পদার্পণ করতে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্যন্ত শূন্যেই রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড় চড় কল্লে এক একবার কারু কাঁধ ও কারু মাথার হাত উপর দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা

কচ্ছেন, কিন্তু ওতে সাব্যস্ত হয়ে উঠচে না—তাঁর পাশে এক মাগী একটি কচি ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েচে, বাবাজী হাত ফেল্‌বার পূর্বেই মাগী 'বাবাজী করো কি ? করো কি ? আমার ছেলেটি দেখো।' বলে চিৎকার করে উঠচে, অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটি জড়োসড়ো করে ধোপার বুঁচ্‌কি ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্চেন—ঘর্মে সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে। গাড়ির মধ্যে একদল গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া—'বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেঁসে যায়' বলে পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায় গাড়ির মধ্যে একটা হাসির গর্‌রা পড়ে গেল—'প্রভো। তোমার ইচ্ছা' বলে প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সংবরণ করে থাম্‌লো, বাইরে 'বালি! বালি! বালি!' শব্দ হতে লাগ্‌লো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান। টেকচাঁদের বালির বেণীবাবুও বিখ্যাত লোক আলালের ঘরের দুলাল মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান ; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ। বালির যাত্রীরা বালিতে নাবলেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটা বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—দলের ছোঁড়াগুলো নাব্‌বার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা চিম্‌টি কেটে গেল। উত্তরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্টের কল্যাণে উত্তরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত। বিশেষতঃ উত্তর-পাড়ার মডেল জমিদারের নর্ম্যাল ইস্কুলের কোর্সলেক্‌চরর ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্ডর, শুন্‌তে পাই, গুরুজীর দু-একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্মা হয়ে বেরিয়েচেন।

বাবাজীরা যে সকল এস্টেশন পার হতে লাগলেন, সেই সকলেরই এস্টেশন মাস্টার, সিগনেলার, বুকিংক্লার্ক ও অ্যাপ্রিনটিসদের এক প্রকার চরিত্র, এক প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে 'পুলিশম্যান পুলিশম্যান' করে চিৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন। কেউ দুটি গরীব বেওয়ার জীবনসর্বস্ব স্বরূপ পুঁটলিটী নিয়ে টানাটানি কচ্চেন—ওজন কচ্চেন। কোথাও বাঙালগোছের যাত্রী ও কোমরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর টিকিট নিজে নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্যে পেড়াপেড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিশম্যান হাজির। কোন এস্টেশনের এস্টেশন মাস্টার কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে চীনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন —অ্যাপ্রিন্‌টিস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে, হঠাৎ হুজুরের কমাণ্ডিং আস্‌পেক্‌ট দেখে একদিন 'ইনি কে হে ?' বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইসপর কত্তে পারে। বলতে কি, হজুর তো কম লোক নন —দি এস্টেশন মাস্টার।

যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কল্‌কেতার চীনে বাজারে 'কম স্যার! গুড্‌ শপ্‌ স্যার! টেক্‌ টেক্‌ নটেক্‌ নটেক্‌ একবার তো সি!' বলে সমস্ত দিন চিৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্‌টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাত্‌ড়ান আরসূলার কাঁচপোকার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে 'দি এস্টেশন মাস্টার, হয়ে পড়েচেন—যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলওয়ে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে একবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাক্‌টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের সর্বদাই কমপ্লেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট যেন 'পুলিসম্যানের 'ভয়েই এগুতে ভয় করেন' শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনে নাই, কেবল লাল সাদা গ্রীন্‌ সিগন্যাল—এস্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু। ও আগেই স্বজাতির অপমান কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর।
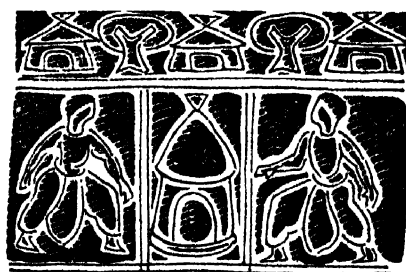
বিদ্যাধরীর অরুচি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭—১৯১৯)

গোলাপী ঝি বলিল—"দেখ বিদ্যাধরী! বাবুর মুখে তুমি আর চুণকালি দিও না। আমাদের বাবু এক জন বড় উকীল। নীলাম্বর ঘোষের নাম কে না জানে? তাঁর বাড়ীর ঝি হইয়া তুমি মুদীর দোকানে একটু গুড়, উড়ের দোকানে একটি ফুলুরী, ময়রার দোকানে একটু চিনির রস, রায় বামনীর কাছে একটু মোচার ঘণ্ট, যার তার কাছে যা তা জিনিস মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর অপমান হয়। বাবুর কথা দূরে থাক্, আমাদের পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়। তোমার মাগার জ্বালায় লোকের কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।"

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—"তোমরা সকল তাতেই আমার ছল ধর। মা আমাকে একটু ভালবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখীর আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ী কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুঁড় দিয়া, যা দিয়া পারি এক মুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ রসগোল্লা কিনিব? মুদী আমাকে ভালোবাসে, তাই সে দিন সে আমাকে একটু গুড় দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সে দিন আমাকে শালপাতের ঠোঙা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি?"

পিতেম বলিল,—"তোমার অরুচি। পাথরটি টই-টুম্বর করিয়া বামন ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তার পর দুই বার তিন বার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত তোমার অরুচি; এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগন্তড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামুন ঠাকুর! তুমি বল দেখি, এ মাগী তিন জনের খোরাক একলা খায় কি না।"

ছিদেম বলিল,—"দেখ বিদ্যাধরী! লোকের কাছে গিয়া যা তা মাগা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায়?"

গোলাপী বলিল,—"নোলা যদি সামলাইতে না পার, সন্দেশ-রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাওনা কেন? তুমি গরীব,

তোমার পয়সা নাই? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা। আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমার খোলার ঘরে তক্তোপোষের খুরোর নীচে তুমি ছয়শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছ। সর্ব্বশুদ্ধ তোমার সেই যার নাম—হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়া-কড়ি নাই। এই পিতেম ছেলেবেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে? ছিদেম বামুন ঠাকুর দেশে জমী বাঁধা দিয়া বে করিয়াছে। এখনও সে, সে দেনা শোধ করিতে পারে নাই। তবে তার মেয়েটি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই মেয়েটিকে বেচিয়া যদি সে কিছু সমস্থান করিতে পারে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার পৃথিবীতে কে আছে? এক দিন এক মুঠা ভাত দেয়, এমন আর কেহ নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয়; ধার-ধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাই-পো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজখবর লইবে।"

ছিদেম বলিল,—"সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"তুমি আমায় খুঁড়িলে! তোমার মা'গ মরুক, তোমার মেয়ে মরুক। মেয়ে বেচিয়া টাকা করিবার অহঙ্কার তোমার ঘুচুক।"

ছিদেম ব্রাহ্মণ বলিল,—"দেখলে পিতেম! দেখলে গোলাপী! আমি এমন কি বলিয়াছি যে, মাগী আমাকে এমন শক্ত গালি দিল। গিন্নী মায়ের মাগিশো ঝি, তাই জন্য এত অহঙ্কার। গিন্নী-মা বলেন যে, আমার মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড় ফড় করে, আমার তিনশ ষাটখানা ব্যায়রাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নী-মা ইহাকে এত ভালবাসেন। কিন্তু সকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুই দিন এখানে থাকিতে পারে না। হাঁ রে মাগী! সে দিন গিন্নী-মায়ের জন্য চা করিবার সময় এক থাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার এক পাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক একটি নল করিয়াছি। সেই নল দিয়া সকলেই আমরা এক আধ ঢোক দুধ খাই-ই। কিন্তু সে দিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল? সে দিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কই মাছের পেট থেকে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?"

গোলাপী বলিল,—"পূর্ব্বে চাউল, দাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম,

সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও। এ কি ভাল? আমরা কি চাকরী করিতে আসি নাই? সে দিন মোচার ঘণ্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেল-কোরা আসিয়াছিল। তাহার অর্দ্ধেক-গুলি তুমি নিজে খাইলে। তারপর, এক দিন সকাল বেলা গিন্নীর জন্য টাটকা গরম গরম জিলিপি আসিয়াছিল। তার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী। তুইও দুই একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিস খাইতে আমাদের সাধ হয় না?"

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারি জনে এইরূপ তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি। একদিকে তিন জন, অন্য দিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নী-মায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—"মা! বামুন ঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই,—সব ঠাট। তোমার মাথা ঘোরে না, তোমার বুক ধড় ফড় করে না। সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছ্‌লাইয়া পড়ে।"

গিন্নী বলিলেন,—"বটে! বামুনের তো আস্পর্দ্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা।" বিদ্যাধরী বলিল,—"আমিও মা, সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুন ঠাকুর, মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, মাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তাঁর যে কত অসুখ, সে কথা আর বলিব কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ার-মুখো বামুন আমাকে কেবল ধরিয়া মারে নাই। কত গালি দিল, কত কুকথা সে যে আমাকে বলিল,—সে কথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ারমুখো পিতেম, আর আঁটকুড়ী গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল। তুমি আমার মা, একটু ভালবাসো, সেই জন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা। আর তোমার কাছে থাকিতে চাই না। তুমি মা, অন্য ঝি দেখিয়া লও।"

পরদিন নিলাম্বর বাবু ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিস্‌মিস্ করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী নিজে মনোনীত করিয়া আর এক জন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল।

এ ব্রাহ্মণের যেরূপ মুখশ্রী লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্ত্তে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে, দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি যেন দুইটি কূপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হাঁ বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। চক্ষু ও চুলের বর্ণ তাম্রের ন্যায়; হাজার তেল মাখিলেও চুলের রুক্ষতা যায় না। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশে।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদী ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই।

দুই দিন পরে সে পুরুষোত্তমকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর। আমাকে তুমি যেমন তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ, গলায় আমার কেমন সোনার দানা; এই দেখ, হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকাল বেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি। কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে। আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন্ কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা হউক, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না। আমার গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল—"না, না,—তুমি এখন অনেক দিন বাঁচিবে। তোমার ব্যায়রাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমার সেবা করিব। সময় অসময়ে আমি তোমাকে দেখিব।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"সে আর অধিক দিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তা ছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাব। বাবু উকীল; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নীর নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে লিখিলেই হইবে যে, অমুককে আমি আমার টাকা গহনা দিয়া যাইলাম। তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিও না।"

সেই দিন হইতে পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে

চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সে জন্য তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্য ঝগড়া করিতে পারিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। পুরুষোত্তম সেই কাগজ কোন লোককে দিয়া পড়াইয়া দেখিল। বিদ্যাধরীর মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজকে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্য লোলকে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই দিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধরীর জন্য সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেই দিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাই-মোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বিদ্যাধরীকে খাওয়াইতে লাগিল।

এক দিন বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে,—'বিদ্যাধরী। দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস্। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে, বড় জোর আর তিন মাস।' আমি বলিলাম,—'কবিরাজ মহাশয়! বাঁচিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আপনি আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বড় পুণ্য হয়।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—"না রে না। তা আর করিতে হইবে না। তোর নাড়ির গতিক যেরূপ, তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।"

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্ব্বে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার সেবা করিতেছিল। আজ তিন মাস সে আপনার মাহিনা দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

চন্দন নগর

দুর্গাচরণ রায়

(১৮৪৭—১৮৯৭)

দেবগণ একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নগরের শোভা সন্দর্শনে এত মুগ্ধ হইলেন যে, গাড়োয়ানকে কোন স্থানে থামাইতে হইবে বলিতে ভুলিয়া যাইলেন। গাড়োয়ানও বিনাবাক্যব্যয়ে একেবারে তালডাঙার ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবু। নেমে ভাড়া দিন।"

ব্রহ্মা,—বরুণ এ কোন্ স্থানে আনিয়া নামাইয়া দিলে?

বরুণ,—এ স্থানের নাম তালডাঙ্গার ফটক। এই তালডাঙ্গার ফটক হইতেই ফরাসী রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এ নগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টেরই আধিপত্য বেশী। ইহা ফরাসীদিগের রাজ্য বলিয়া নগরটীর অপর নাম ফরাসডাঙ্গা। ফরাসডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে ইংরাজ রাজ্য; মধ্যস্থলে গঙ্গার পশ্চিমকূলে বিন্দুমাত্র চন্দননগর বিরাজ করিতেছে। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা এই নগর নির্মাণ করে। এই নগরের একাংশ ইংরাজ গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত। ফরাসী চন্দননগরে প্রায় একলক্ষ পচিঁশ হাজার লোকের বাস।

কিছু দূরে যাইয়া উপ চিৎকার করিয়া কহিল, "বরুণকাকা, ও কি! কতক-গুলো লোক কাঠের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে কেন"?

বরুণ। চুপ্ কর্। গোল করলে তুড়ুম ঠোকাবে।

নারা। তুড়ম কি?

বরুণ। একখণ্ড কাঠের ফুটার মধ্যে পা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আর একখণ্ড ফুটো কাঠ তদুপরি রাখিয়া খিল আঁটিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখার নাম তুড়ুম ঠোকা। যে গৃহে ঐ কাণ্ড হইতেছে তাহার নাম কোতোয়ালি। ইংরাজরাজ্যে কোন ব্যক্তি দোষ করিলে হাজতে দেয়। ফরাসী রাজ্যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামে নালিশ করিলে অগ্রেই তুড়ুম ঠোকায়। তৎপরে বিচারে দোষী হইলে সাজা পায় ও নির্দ্দোষ হইলে মুক্তিলাভ করে। ফলতঃ অভিযোগ হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী হউক আর নির্দ্দোষ হউক, অগ্রে তুড়ুম ঠুকিতে হয়।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইয়া দেবগণ দেখেন—একখানি ভাঙা ঘরের মধ্যে ২০।২৫ জন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের অষ্ট অঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উদ্যোগ হইয়াছে, সকলেরই

সম্মুখে এক একটি কলসীর কাণার উপর এক একটী ডাবা হুঁকা নল্‌চের মাথার দিক অর্দ্ধেক আন্দাজ কাটা। তদুপরি এক একটি ভাঙা কল্কের বাঁট। হুঁকায় এক একটী এক-হাত দেড়-হাত আন্দাজ নল লাগান। প্রত্যেকে ধূম্রপান করিতেছে ও এক একবার শোলা চুষিতেছে; কখন কখন পরস্পরে সোহাগ করিয়া নলের মধ্য দিয়া উজান ফুৎকার পাড়িয়া পরস্পরকে গুলি মারিতেছে এবং সকলে নানারূপ গল্প করিতেছে।

একজন কহিল, "একটা ঢোঁড়া সাপ বড় আফিং খাইত, কিন্তু আফিং খাইলে দুগ্ধের প্রয়োজন। তজ্জন্য সে প্রত্যহ রজনীতে এক গো-শালায় প্রবেশ করিয়া দুগ্ধবতী গরুর পশ্চাৎভাগের পা-দুইখানি নিজ ল্যাজের দ্বারা ছাঁদিয়া স্তন্যপান করিত। কিছুদিন পরে গরুটি মরিয়া যাইল। তখন দুগ্ধ অভাবে সাপটা পেট ফেঁপে মারা যায় আর কি! একদিন গর্ত হইতে মুখ বাহির করিয়া চোঁয়া ঢেকুর তুলিতেছে, এমন সময় দেখে, এক গোয়ালিনী তাহার গর্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গোয়ালিনী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল, এজন্য তাহার স্তনে বেশ দুগ্ধ ছিল। সাপটা গোয়ালিনীকে দেখিয়া আস্তে আস্তে গর্তের বাহির হইয়া ল্যাজ দিয়া তাহার পা ছাঁদিয়া ফেলিল; এবং স্তনে মুখ দিয়া চক্ চক্ শব্দে দুধ খাইতে লাগিল। গোয়ালিনী ভয়ে মুর্চ্ছা গেল।"

আর একজন কহিল, "গুয়োটার সাপ আফিং ছেড়ে গুলি খেতে শিখ্‌লে না কেন? দেখ ভাই—সেদিন এইখান দিয়া একটা রাজা গিয়াছিল দেখিয়াছিলে? তার নাম সিং।" তৎশ্রবণে একজন কহিল, "ভাই। সিং নাম হইল কেন?" অপর ব্যক্তি কহিল, "ঐ রাজার বাল্যকালে দুটি সিং হয়। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সেই সিং দুইটি কাটিয়া লইয়া এসিয়াটিক মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়া উহার নাম দিয়াছেন সিং"।

ব্রহ্মা। বরুণ, এরা কারা?

বরুণ। গুলির আড্ডার গুলিখোর।

এই সময় গুলিখোরেরা গান ধরিল—

গুলি ছাড়ি কেমনে, বিনা মরণে।
সেয়াকুলের কাঁটা যেন জড়িয়ে ধ'র্‌ছে বসনে॥
একবার মনে করি তোড় জোড় ফেলে দিয়ে।
ব'সে থাকি বোবা হ'য়ে (কিন্তু) জাস্থ ভাজি স্বপনে।

একজন কহিল, "হায়! হায়! দেখ ভাই, সম্প্রতি চন্দননগরের এক তাঁতি তার স্ত্রীর সঙ্গেবিবাদ ক'রে নটে-শাকের তলায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।" আর একজন কহিল, "সত্যি নাকি?" বক্তা কহিল, "আমি কি

মিথ্যা কথা বলছি। মাগী, মিন্সের সঙ্গে বিবাদ ক'রে যেমন জল আনতে গিয়েছে, মিন্সে অমনি নলি থেকে এক খাই সূতা নিয়ে শাকের ক্ষেতের কাছে ছুটে গিয়ে নিজের গলার সঙ্গে আর নটে গাছের সঙ্গে বেঁধে চুপ করে বসে আছে"। একজন কহিল, "কেউ ছাড়িয়ে দিলে না?"

বক্তা। তাঁতি বৌ জল নিয়ে এসে দেখে সর্ব্বনাশ। স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে জিভ্ বা'র করে ব'সে আছে। তখন মাগী তাড়াতাড়ি কাঁখের কলসী ফেলে মিন্সের পিঠে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে লাথি মারতে লাগল। মিন্সে অনেকগুলি লাথি খেয়ে ব'ল্লে, "লাথিই মার, আর যাই কর, কর্ত্তা মরে গেছে।"

একজন কহিল, "বেটা তাঁতি ফরাসী রাজ্য বলে বেঁচে গেলেন। ইংরাজ-রাজ্য হলে বাছাকে শুরকি ভাঙ্গাতো। বাবা! আত্মহত্যা ক'রতে যাওয়া সহজ নয়!"

ব্রহ্মা। বরুণ। তুমি বল্লে "ইহারা গুলির আড্ডার গুলিখোর।" কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পার্‌লাম না।

বরুণ। আজ্ঞে, আপনার সৃষ্ট আফিং মর্ত্ত্যে দুই মূর্ত্তিতে ব্যবহৃত হয়। এক মূর্ত্তি কাঁচা,—অপর মূর্ত্তি পাকা। কাঁচার নাম আফিং, পাকার নাম গুলি। সেই গুলি যাহারা খায়, তাহাদিগকে গুলিখোর কহে।

ইন্দ্র। গুলিখোরদিগের সরঞ্জাম ত বেশ।

বরুণ। ঐ সমস্ত সরঞ্জামের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। ঐ যে কলসীর কানার উপর ডাবা হুঁকা আছে, ঐ হুঁকা এবং নলটির নাম তোড়জোড়, এবং ঐ ভাঙ্গা কল্কের নাম মেরু।

এই সময় একজন গুলিখোরকে ছিটা অন্বেষণ করিতে দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, "লোকটা কি অমূল্য দ্রব্য হারাইয়াছে।"

বরুণ। অমূল্য দ্রব্য অর্থাৎ চারি কড়া আন্দাজ মূল্যের একটি গুলি। গুলিখোরেরা সর্ব্বস্ব দিতে পারে; কিন্তু প্রাণ ধ'রে একটি ছিটা কাহাকেও দিতে পারে না।

নারা। ছিটা তৈরী করে কেমন ক'রে?

বরুন। পেয়ারা পাতা কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটিয়া প্রথমে ভাজনা খোলায় ভাজিয়া লয়। তৎপরে একটি পাত্রে জল দিয়া আফিং গুলিয়া সেই জল অগ্নির উত্তাপে ফুটিলে ভাজা পেয়ারা-পাতা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মুড়কি-মাখা করে, তৎপরে নামাইয়া সেইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে পাকাইয়া ছিটা প্রস্তুত করে।

উপ। রাজা-কাকা। রাজাকাকা। একটা গুলিখোর গুলি টেনে আধ খানা কলা মুখে দিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেল্লে।

বরুন। কলা উহাদের উপাদেয় চাট। গুলির ধুম পেটে প্রবেশ করলে নেশা হয়; কিন্তু কর্কশ দ্রব্য চিবাইতে হইলে ধুম বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য গুলি টানিয়া কলা চটকাইয়া সেই কলা অতি সতর্কতার সহিত মুখে দিয়া গিলিতে পারিলে কলার সহিত ধুম পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। গুলি-খোরেরা পাকা কলা এত ভালবাসে যে, ষ্টেশনে যদি কোন যাত্রী কলা লইয়া আসে, ঐ সামান্য দ্রব্য চাহিলেই পায়, কিন্তু তাহা না করিয়া চুরি করিবার চেষ্টা দেখে। চাটনীর অভাবে ইহারা সময়ে সময়ে শোলা জলে ভিজাইয়া চুষিতে থাকে। গুলিখোরের অনেকগুলি চিহ্ন আছে। যথা—প্রায়ই চক্ষু বুজাইয়া থাকে,—নেশা ছুটিবার আশঙ্কায় সহজে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। গোলমালে বড় বিরক্ত হয়,—কেহ কথা কহিলে "আস্তে আস্তে" বলিয়া তাহাকে নিষেধ করে। যখন ইহারা চলিয়া যায়, পায়ের গোড়ালি উঁচু হইয়া থাকে। যে রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করে, তাহাতে একটি ঢেলা থাকিতে দেয় না,—পাছে হোঁচট লাগিয়া নেশা ছুটিয়া যায়। যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে, ঐ গৃহের কোন স্থানে ছাতা বা ব্যাগ টাঙ্গাইয়া রাখিতে দেয় না,—পাছে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। দুগ্ধে এত লোভ হয় যে, শিশু সন্তানকে রাত্রিতে খাওয়াইবার দুগ্ধ ঢাকা থাকিলে চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। গুলিখোর গুলি টানিয়া যে রাস্তা দিয়া বাটী আইসে, ঐ রাস্তার দুইপাশে দড়া পাকাইবার ভঙ্গিতে যদি দুইজন দাঁড়াইয়া থাকা যায়, প্রানান্তে সোজা হইয়া আসিবে না,—পাছে দড়ি গলায় লাগিয়া মারা পড়ে, এই শঙ্কায় হেঁট হইয়া আসে। ইহাদের নজর অতি ক্ষুদ্র হয়। গুলিখোরেরা মাতালকে বড্ড ভয় করে। মাতাল দেখিলে সে রাস্তায় প্রানান্তেও অগ্রসর হয় না। এই চন্দননগরে গুলিখোরের সংখ্যা বড় বেশী।

এখান হইতে দেবগণ একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—কতকগুলি লোক আপনার কান আপনি মলিতেছে। কেহ বা সাত বার উঠা-বসা করিতেছে, কাহারও বা কান ধরিয়া ঘোড় দৌড় করান হইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এখানে কি হইতেছে?

বরুণ। পণ্ডিতের কাছে দোষীদিগের বিচার হইতেছে। ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের একজন দুইশত টাকা বেতনের বিচারক আছেন, তাঁহাকে পণ্ডিত কহে। উঁহার নিকট সামান্য সামান্য দোষের বিচার হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দোষের সাজা নিজের কান নিজে মলা, উঠা-বসা করা এবং কান ধরিয়া ঘোড় দৌড় করান।

এখান হইতে তাঁহারা একস্থানে উপস্থিত হইলেন। নারায়ন কহিলেন, বরুণ! সম্মুখে ঐ বাড়ীটি কি "?

বরুণ। ফরাসীদিগের গভর্ণমেণ্ট হাউস। এই গভর্নমেণ্ট হাউসের দ্বারে একজন মাত্র পাহারা আছে। এখানকার গভর্ণর পণ্ডিচারীর গভর্ণরের অধীন। এখানকার গভর্ণর পাঁচশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এখানকার মধ্যে যাহারা বড় সাহেব, তাঁহাদিগের প্রাসাদের দ্বারে কেরোসিন তৈলের আলো জ্বলে।

এই সময় দেবগণ দেখিলেন "জয় রাধাকৃষ্ণ" বলিয়া একদল বৈষ্ণব রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইল। পিতামহ তদ্দৃষ্টে কহিলেন, "বরুণ। এত বৃন্দাবন নয়, এখানে এত রাধাকৃষ্ণের দল কেন?

বরুণ। উহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহে। ইংরাজ রাজ্যের ফেরারী আসামীরা গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়া বৈষ্ণব বেশে বাস করিয়া থাকে। পিতামহ, ওদিকে দেখুন ফরাসী জেল।

সকলে জেলখানার নিকটে উপস্থিত হইলে উপ চিৎকার করিয়া কহিল, "কর্ত্তা—জেঠা চেয়ে দেখ! মিন্সেগুলোর পিছনদিকে এক এক গাছি লম্বা লম্বা শিকল ঝুলান। শিকলগুলোর মাথায় আবার এক একটা লোহা লাগান। উহারা অতিকষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতেছে"

বরুণ। দেবরাজ! চেয়ে দেখ--দায়মালী কয়েদীরা ফরাসী জেলে কিরূপ দণ্ডভোগ করিতেছে। ঐ যে শৃঙ্খলাগ্রভাগে লৌহের এক একটি গোলা দেখিতেছ, উহা যাহার যত বৎসর মেয়াদ, তাহাকে তদনুরূপ ভারি বহন করিতে দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! ওদিকে ওকি?—একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত কাঠগড়ার মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া চাহিয়া আছে এবং উহার মস্তকের উপর একগাছি দড়ি ঝুলিতেছে?

বরুণ। উহা হাফ ফাঁসীর স্থান। লোকের অর্ধ প্রাণদণ্ডের হুকুম হইলে এই স্থানে ঐরূপ সাজা দেওয়া হয়।

ইন্দ্র। হাফ ফাঁসী কি?

বরুণ। অপরাধীকে সমস্তদিন ঐ কাঠগড়ার মধ্যে অতি সংকীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। সূর্য্য যখন যে দিকে ফিরিবেন, দোষী ব্যক্তিকেও তখন সেইদিকে ফিরিতে হইবে। এইরূপে সূর্য্য অস্ত যাইলে সে ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ ফাঁসীকেই হাফ ফাঁসী বা অর্ধ প্রাণদণ্ড কহে। এই চন্দননগরে অনেকগুলি থানা আছে, প্রত্যেক

থানাই এক একজন কোতোয়ালের অধীন। ঐ কোতোয়ালেরাই থানার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এখানে নয়টা রাত্রির পর কাহাকেও রাস্তায় বাহির হইতে দেওয়া হয় না। বিবাহাদি উপলক্ষ্যে কিংবা কোন উৎসবাদি উপলক্ষ্যে রাত্রিতে বেড়াইবার পাস করিয়া লইতে হয়। বিনাপাসে রাস্তায় বাহির হইলে তুড়ুম ঠোকায়।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটি বাসা স্থির করিলেন এবং চারিজনে স্নান করিতে চলিলেন। উপ বাসায় থাকিয়া দ্রব্যাদি আগলাইতে থাকিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! ফরাসীদিগের কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখুন। এই কেল্লাটি নদীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

সকলে স্নান আহ্নিক সারিয়া বাসায় আসিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গুলিখোর ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল, "বাবা! চাট্টি খেতে দেও তো খাই।" পিতামহ স্বভাবতঃ অতিথি সৎকার করিতে ভালবাসেন; তিনি ব্রাহ্মণের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া মহা-সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিল, "একটু তৈল দেন, স্নান করে আসি," নারায়ণ তৎশ্রবনে তাহার সম্মুখে তেলের বাটি প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল "হাতে দেও বাবা!" নারায়ণ তৎশ্রবনে তৈল প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইল।

নারা। বরুণ! ব্রাহ্মণকে তৈল দিতে "হাতে দেও বাবা কহিল কেন?"

বরুণ। চক্ষু খুলিয়া তৈল মাখিলে পাছে নেশা ছুটিয়া যায়, এই জন্যই হস্তে তৈল চাহিয়াছে।

আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ফিরিলনা। পিতামহ অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া শেষে দেবগণের উপরোধে তাহার অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া আহারে বসিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর পুনরায় নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন।

একস্থানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ কহিলেন, "বরুণ! সম্মুখে এ সুন্দর বাড়ীটি কাহার?

বরুণ। কুরুজং সাহেব নামক একজন ইংরাজ জমিদারের। ইহার বিলক্ষণ সংগতি আছে।

এখান হইতে সকলে নদীর তীরে যাইলে বরুণ কহিলেন, "পিতামহ! সম্মুখে ইটালা দেশীয় মিশনরিগনের চার্চ্চ দেখুন"। চর্চ্চ দেখিয়া সকলে নদীর ঘাটের প্রতি চাহিয়া দেখেন—তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছেন।

ব্রহ্মা। বরুণ! দেখ—চুপ করে বসে আছে, এ পর্য্যন্ত জলে নামে নাই।

বরুণ। গুলিখোরেরা জলকে বাঘের ন্যায় দেখে, তাই কিরূপে জলে নামিবে—বসিয়া ভাবিতেছে।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ একটি কেল্লা দেখিলেন। কেল্লাটীতে সর্ব্বসমেত ৫০।৬০ জন সিপাহী আছে। কেল্লা দেখিয়া বাসায় আসিয়া দেখেন—তাঁহাদের গুলিখোর অতিথি বসিয়া আছে। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভাত দিয়া গল্প করিতেছেন এমন সময় ব্রাহ্মণ চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। দেবগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে?"

ব্রাহ্মণ। এমন অতিথি সৎকার না করিলেই নয়? আমার কত কষ্টের বাদসাহি পেটটা বাবা কাঁচকলা খাইয়ে জন্মের মত খারাপ করে দিলে।

ব্রহ্মা। বরুণ! বলে কি?

বরুণ। মাছের ঝোলে কাঁচকলা ছিল, কাঁচকলা খাইলে গুলিখোরদের অত্যন্ত পেট খারাপ হয়। ব্রাহ্মণ ভ্রমবশতঃ খাইয়া কাঁদিতেছে।

ব্রহ্মা। উপ! ওঁর পাতে ঘি ঢেলে দে। বাবা! খুব ঘি খাও, তোমার পেট সেরে যাবে। কাঁচকলায় যে পেট খারাপ করে, তাত আমরা জানি না, জানলে মাছের ঝোলে কাঁচকলা দিতাম না।

ব্রাহ্মণ। হাজার ঘি খাই—এ বাদসাহী পেট শীঘ্র শোধরাবে না।

সন্ধ্যা হইলে গুলিখোর চলিয়া গেল। দেবতারাও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া একটু একটু জলযোগ করিলেন। তৎপরে সকলে শয়ন করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

নারায়ণ কহিলেন, "মর্ত্ত্যে আসিয়া আমি আছি ভাল। যতই নুতন নুতন স্থানে যাইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখিতেছি, ততই আমার নুতন নুতন স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

দেবরাজ কহিলেন, "বলিতে কি—আমিও এক প্রকার আছি ভাল। তবে, জয়ন্ত ছেলেমানুষ বলিয়া রাজকার্য্য কিরূপ চলিতেছে, না জানিয়া সময়ে সময়ে মনটা একটু চঞ্চল হয়।"

পিতামহ কহিলেন, "আমার বাড়ীতে যদি একটি সাত বৎসরের ছেলে থাকিত, তোমরা আমাকে যতদিন মর্ত্ত্যে রাখিতে থাকিতাম।" নানা কথায় দেবগণ রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রাতে উঠিয়া আবার নগর ভ্রমণে চলিলেন। বাসা হইতে কিছু দূরে যাইয়া দেখেন—একস্থানে লোকে লোকারণ্য। এক ব্যক্তি চীৎকার শব্দে কহিতেছে, "দোহাই ফরাসী গভর্নমেণ্টের, দোহাই ফরাসী গভর্নমেণ্টের! প্রাণ যায় রক্ষা কর।" তাহার নিকটে এক যুবতী হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি চীৎকার করিতেছে, তাহাকে পথের লোকে

জুতা, ঝাঁটা—যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তদ্বারা প্রহার করিতেছে। দেবরাজ ছুটিয়া গিয়া একজনকে কহিলেন, "মহাশয়! ব্যাপারখানা কি? সে ব্যক্তি কহিল, "হয়েছে কি জানেন—যে ব্যক্তিকে সকলে প্রহার করিতেছে, উনি গুরু। যে বৃদ্ধ ঘন ঘন প্রহার করিতেছেন উনি শিষ্য। হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্যকন্যা। গুরু কয়েক দিবস হইল শিষ্যবাড়ী আসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে উনি শিষ্যের বিধবা কন্যাকে হাত করিয়া গত রজনীতে উহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছেন। মনে মনে বিশ্বাস আছে, ইংরাজ রাজ্যে পাপ করিয়া আসিয়া ফরাসী রাজ্যে আসিয়া নিস্কৃতি পাইব।"

ব্রহ্মা। য্যাঁ! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ, বলে কি হে? গুরু—শিষ্যকন্যা, য্যাঁ!

দেবগণ চাহিয়া দেখেন—পিতামহ নিকটে নাই, দ্রুতপদে একদিকে ছুটিয়া যাইতেছেন। তখন দেবগণও অগত্যা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কহিলেন, "ঠাকুরদা, কোথায় যান?"

ব্রহ্মা। ভাই! যে রাজ্যে গুরু শিষ্য কন্যা হরণ করিয়া পলাইয়া আসিয়া নিস্কৃতি পায়, সে রাজ্যে তিলার্দ্ধও থাকিতে নাই। থাকিলে মহাপাপ স্পর্শে; অতএব আমি এই মুহুর্ত্তেই চন্দননগর পরিত্যাগ করিলাম।

"তবে চলুন" বলিয়া দেবগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন, "দেবরাজ! ঐ যে স্ত্রীলোকটি যেস্নড়ে-দিগের নিকট বসিয়া হাস্য করিতেছে, উহার অবস্থা—শুনিবার উপযুক্ত। উহার পিতা কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ও বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় দুইকন্যাকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিয়া যান, উহাদের দুই ভগ্নীরই চরিত্র বড় মন্দ ছিল। তন্মধ্যে জেষ্ঠ্যা গৃহে থাকিয়া উপপতি করেন। ইনি বাটীর পুরাতন খানসামাকে লইয়া বাহির হইয়া যান এবং খানসামার বাটীতে তাহার স্ত্রীর সপত্নীর ন্যায় বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তথায় ইহার এক পুত্র ও দুই কন্যা হয়। খানসামা কৌশলে টাকা ও গহনাগুলি লইয়া এক্ষনে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আপাততঃ যেস্নড়ে উপপত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ব্রহ্মা। আরে ছিঃ ছিঃ! শ্রীবিষ্ণু! বরুণ, আমায় কোথায় এনেছিস?

উপ। বরুণকাকা! কি হইয়াছিল আর একবার বলনা?

ষ্টেশনে যাইয়া সকলে দেখেন—টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। তখন পিতামহ কহিলেন, "বরুণ! চন্দননগরের অপরাপর বিষয় সংক্ষেপে বল।"

বরুণ। এই নগরটিতে অনূন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের বাস,

গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় প্রায় আড়াইলক্ষ টাকা। এই আয় ভূমির কর দ্বারা হইয়া থাকে। এখানকার প্রজাদিগকে ভূমির কর ব্যতীত অপর কোন কর দিতে হয় না। কেবল কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে মাসিক আটআনা হিসাবে কর দিতে হয়। ঐ কর দ্বারা প্রতি বৎসর চৌদ্দ পনের হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। এখানকার জমির খাজনা অতি সামান্য, শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। জমির মধ্যে অনেক লাখরাজ। চন্দননগরের ফরাসীদিগের একজন গভর্ণর ভিন্ন একজন কালেক্টর ও একজন সাবজজ আছেন। ইহাঁদের বেতন অতি সামান্য। রাস্তায় ঘাটে ফরাসী ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গান আছে। আদালতেও ফরাসী ভাষা প্রচলিত। রজনীতে এখানকার রাস্তা কেরোসিন তৈলের লণ্ঠনের দ্বারা আলোকিত করা হয়। এ নগরে মুসলমান প্রায় নাই। অধিবাসীরা সাধারণতঃ অলস ও আমোদ প্রিয়। গুলির আড্ডা বিস্তর আছে। এখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যাও বিস্তর। ১৭৪০ অব্দে এখানে প্রায় চারি হাজার ইষ্টকনির্মিত গৃহ ছিল। সেই সময় কলিকাতায় কুটির মাত্র দেখা যাইত। ফরাসী গভর্ণর ডিউপ্লে ইহার যাহা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। ঐ ডিউপ্লের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ভারতে নেপোলিয়ানের মত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন। এক্ষনে ইহাতে যাহা কিছু আছে, পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে ইহা কিছুই নহে। ১৭০৪ অব্দে ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিয়া পুনরায় ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পন করেন এবং ১৭৫৭ অব্দে এড্‌মিরেল ওয়াটসন সাহেব আর একবার এই নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দননগর হইতে গোঁদলপাড়া নামক আর একটি স্থানে যাওয়া যায়। ঐ স্থানের কুকুরে কামড়ান ঔষধ বড় বিখ্যাত। তৎপরে তেলেনীপাড়া নামক একটি স্থান আছে। তেলনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিখ্যাত ধনী জমিদার। ঐ বাবুদের একটি দেবালয় আছে,—সেখানে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেবালয়ে প্রত্যহ শতশত অতিথির সেবা হইয়া থাকে।

এই সময় দেবগণ দেখেন—দুটী বাবু গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন, একজন কহিতেছেন, "মহাশয় বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।" অপরে কহিতেছেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার লোকের কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা করে। আবার না দেখাইলেও চলে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ, বাবুটির কী হইয়াছে?

বরুণ। হইয়াছে কি জানেন—ঐ বাবুরা তিন ভ্রাতা। অপর ভাতৃদ্বয়

নাবালক, উঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। বাবুর এক সময় বেশ ভাল চাকুরী ছিল ; সেই সময় যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং ভ্রাতাদিগকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত টাকায় স্ত্রীর নামে বিষয় খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে বাবুর কর্মটি নাই—বেকার বসিয়া আছেন। বাবুর স্ত্রীর পূর্ব্ব হইতেই একটু চরিত্র দোষ ছিল। সম্প্রতি সে উপপতির পরামর্শে বাবুকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে বাবু কিরূপে স্ত্রীধনে দখল পান, তজ্জন্য কলিকাতায় উকিলদের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন।"

এই কথা শ্রবনে বৃদ্ধ পিতামহ আর হাসিয়া বাঁচেন না। নারায়ণ কহিলেন, "মাগী উচিত বিচার করিয়াছে।"

এই সময় "টিট্রিং ল্যাবাং—টিট্রিং ল্যাবাং" শব্দে টিকিট দিবার ঘণ্টা দিতে লাগিল। দেবগণ বৈদ্যবাটীর টিকিট লাইয়া ট্রেনে উঠিলেন। ট্রেন হুপাহুপ্ শব্দে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

যে গাড়ীতে তাঁহারা বসিলেন, সেই গাড়ীতে একটি বাবুও বসিয়াছিলেন। ইহাকে দেখিলে বোধ হয় বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইবেন। বাবুটি একে সুন্দর পুরুষ, তাহাতে যৌবনকাল, বিশেষতঃ নানারূপ পরিচ্ছদ পরিধান করায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহার মস্তকে সোজা সিঁথি, হস্তে তিন চারিটি অঙ্গুরীয় এবং বক্ষস্থলে চেন সহিত ঘড়ি শোভা পাইতেছে। বাবুটি রেলিং ঠেস দিয়া অপর কামরায় এক যুবতীর প্রতি চাহিয়া হাসিতেছিলেন। যুবতীর নিকটে তাহার স্বামী অকাতরে ঘুমাইতেছিল। ইহারও বিষয়বৈভব একসময় কম ছিল না ; কিন্তু এক্ষণে মদে ও বেশ্যায় প্রায় সমস্তই গিয়াছে। বাবুটি দেখিতে অতি কাদাকার। স্ত্রী স্বাধীনতা ইনি বড় ভালবাসেন, এজন্য স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাবু এক্ষণে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভাবে অপর পুরুষের সহিত গল্প করিতেছেন।

বাবু। আমি ভাই এবার নামব।

স্ত্রী। আহা! বেশ দুজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম। তুমি নেমে গেলে কি করে থাকবো ?

বাবু। যদি না থাক্‌তে পার—আমার সঙ্গে চলনা কেন ?

স্ত্রী। তুমি যদি নিয়ে যাও, যেতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু কি রকমে যাই ?

বাবু এই কথা শুনিয়া অতি মৃদুস্বরে কি পরামর্শ দিলেন। উপ নিকটে বসিয়াছিল, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। এদিকে ট্রেন আসিয়া ভদ্রেশ্বরে থামিল। পুনরায় যেমন ট্রেন ছাড়িবার উদ্‌যোগ করিতেছে—বাবু অম্‌নি স্ত্রীলোকটিকে ইঙ্গিত করিয়া নামিয়া পড়িলেন। যুবতীও যেমন নামিতে

যাইবে, অমনি উপ চীৎকার করিয়া কহিল, "ও ঘুমান বাবু! উঠে দেখ্—তোর বৌ পালাচ্ছে!" বাবু "য়্যাঁ য়্যাঁ!" শব্দে যেমন উঠিলেন, তাঁহার গৃহিনীও অমনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। বাবু ক্ষীপ্র হস্তে যেমন স্ত্রীর অঞ্চল ধরিলেন, নীচেকার বাবু ছুটিয়া আসিয়া শপাসপ্ শব্দে তাঁহার হস্তে অমনি ছড়ির আঘাত করায় বাবু অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। পাছে উপরের বাবু লাফাইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় নিম্নের বাবু গাড়ীর দ্বার চাপিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন "রাস্কেল! আমার স্ত্রীর অঞ্চল ধরলি যে? জানিস তোর নামে আমি নালিস্ ক'রবো!"

আরোহী বাবু চীৎকার করিয়া কহিল, "পুলিশম্যান! পুলিশম্যান! আটক কর আমার বৌ নিয়ে যায়।" স্ত্রী কহিল, "মর মিন্সে—তুই আমার স্বামী, না ইনি আমার স্বামী?"

এদিকে ট্রেনও পোঁ শব্দে বংশীধ্বনী করিয়া হুপাহুপ শব্দে ছুটিতে লাগিল। বাবু কত চীৎকার করিলেন, কিন্তু সে চীৎকার অরন্যে রোদন হইল।

বরুণ। পিতামহ! এই ষ্টেশনটির নাম ভদ্রেশ্বর। এই স্থানটির একদিকে রেলওয়ে, অপরদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এই স্থানে অনেকগুলি মহাজনের গদি আছে। শস্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য ভদ্রেশ্বর বড় বিখ্যাত। এখানে ভদ্রেশ্বর নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা চৈত্র মাসে একলক্ষ বিল্বপত্র দিয়া পূজা দিবার মনন করিয়া থাকেন। এই সময় পিতামহ বাবুটিকে রোদন করিতে দেখিয়া রেলিংয়ের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিলেন, "বাবা, কেঁদোনা! নিজের দোষে হারালে, এখন কাঁদলে কি হবে? তোমার অর্থবল নাই, শরীরে বল নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে যাওয়া কেন? অগ্রে সাহেবদের মত বলবান্ হও, সাহসী হও, তৎপরে এ কাজে প্রবৃত্ত হইও। তুমি স্ত্রীস্বাধীনতা দিবে অথচ ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাবে; তাতে কি কাজ চলে!"

বাবু। আমি বৈদ্যবাটীতে নামিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া আটক করাবো।

বরুণ। তারা এক্ষনে ভদ্রেশ্বর হ'তে ৩২ ক্রোশ রাস্তা দূরে গিয়ে পড়েছে। টেলিগ্রাফ করে আর কেন লোক হাসাবে? বাড়ী গিয়ে প্রচার করগে বৌ মরে গিয়েছে।

বাবু। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। যাহা হউক, আপনারা, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

নারা। আমরা প্রকাশ করবো, না করলে লোকের উপকার হবে কিসে?

চৈতন্য হবে কিসে? তোমার মত বোকা বাবুরা যদি তোমায় দেখে শিক্ষা পান, সাবধান হন, সে ভাল নয়?

বরুণ। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রিয় রামহরি মুখোপাধ্যায়কে ডেভিড হেয়ার সাহেব যেরূপ কান মলিয়া দিয়াছিলেন, আজ তোমায় ঐরূপ দিলে তবে জ্ঞান হইত।

ব্রহ্মা। বরুণ, রামহরির বিষয় বল।

বরুণ। স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় রামহরি বাবু একদিন সাহেবী পোষাক করে রেলওয়ে ২য় শ্রেণীতে স্ত্রীকে মেম সাজাইয়া ব্যারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট দেখাইতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দমদমা ষ্টেশনে তিনজন গোরা সেই গাড়ীতে উঠিল। তাহারা দেখিল—রামহরিবাবু সাহেব নন, কালা বাঙালী, ক্রমে পরস্পরে হাস্য পারহাস করিয়া রামহরির স্ত্রীকে আক্রমণ করিতে যাইল; বাবু হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রাণের দায়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ট্রেন ক্রমে পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে হেয়ার সাহেব সেই গাড়ীতে উঠিলেন ও রামহরির বিপদ দেখিয়া গোরাদিগকে মিষ্ট কথায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ঘুসি ধরিলেন। তৎপরের ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি রামহরিকে সস্ত্রীক নামাইয়া দিয়া রামহরির উত্তমরূপে কান দুটি মলিয়া দিলেন এবং "বলিলেন, (When you will be so strong as we are then imitate) যখন তুমি আমাদিগের ন্যায় বলবান হইবে, তখন আমাদিগের নকল করিবার চেষ্টা করিও।"

ব্রহ্মা। আহা, হেয়ার সাহেবের মত ভদ্র ও দয়াবান্ আর আছে!

ক্রমে ট্রেন আসিয়া বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। দেবগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন।

বিলি ব্যবস্থা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর)

(১৮৪৯—১৯১১)

একদিন আষাঢ় মাসে রথ যাত্রার পরেই,—এখন ত আর সে সাবেক শিবদুর্গা নাই, এখন সকলেই সভ্য ভব্য হ'য়েছেন—চুলোর মুখে, সন্ধ্যাবেলা সপরিবারে বসিয়া খোশগল্প হইতেছে। চুলোর মুখে বসা, সভ্যতার একটা বাঁধা ব্যবস্থা; বিলেতে সবাই বসে। শিব, বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন, ক্ষণে বা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। দুর্গা শিবের একপাটি ছেঁড়া মোজার মুড়ি সেলাই করিতেছেন। "গুরুমা" হার্মোনিয়মে সুর দিয়া কাশ্মীরি খেমটা তালে তালে "মনে করো শেষে রো সে দিনো ভয়ঙ্কর" ধরিয়াছেন। গণেশ একপাশে জয়ার গালের কাছে শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুস ফুস করিয়া কি বল্‌তেছেন্, আর জয়া মুখে রুমাল দিয়ে হাস্‌চে। কার্ত্তিক যেন বিজয়ার সঙ্গে একটু বেলেল্লাগিরি করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ফলে মজলিশ পুরা। সভ্য, নির্দ্দোষ, গার্হস্থ আমোদ যেমন হইতে পারে, তাহাই হইতেছে।

এমন সময়ে দুর্গা হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলেন—"নন্দী?"

দরজার বাহিরেই পর্দ্দার ঠিক ওপিঠেই বসিয়া নন্দী কি একটা সেলাই করিতেছিল। তলবমাত্রে প্রবেশ করিয়া মাথাটি নোয়াইয়া যোড় হাতে বলিল —"হুজুর।"

দুর্গা একটু হিন্দী করিয়া—কেন না, খানসামাদের সঙ্গে বাঙ্গলা কথাটা সভ্যতার রীতি-বিরুদ্ধ—নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেঁ রে, এই সময় আমরা একবার বাঙ্গালায় যেতাম না?"

হিন্দী আমাদের আসেনা, বাঙ্গালাতেই বলিয়া যাই।

"খোদাবন্দ! সেত সেপ্টেম্বর, অক্টোবরে, এখন নয়।" দুর্গা বলিলেন—"বহুৎ আচ্ছা।" নন্দী সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে গিয়া সূচ সূতা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিল।

শিব একটু হাসিয়া বলিলেন—"সে যে পূজার ছুটিতে।"

দুর্গা। তাই বটে, সময়টা ঠিক আমার মনে আস্‌ছিল না। বর্ষার কাছাকাছি, তাই মনে হচ্ছিল।

গুরুমা। পৌত্তলিক কাণ্ডে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। এবার কোন মতেই যাওয়া হোতে পারে না।

দুর্গা। আমি প্রায় যাচ্ছি!

গণেশ। আমার ত যাবার ইচ্ছা থাকলেও ফুর্‌সুৎ নেই। সেই সময়েই আমাদের সোশ্যাল কন্‌ফারেন্স বোসবে।

কার্ত্তিক। আমি ত টেঁক্যে রেখেছি, কুকেরা অর্থদক্ষ হিন্দু টুরিষ্ট পার্টি অর্গেনাইজ কোচ্চে, আমি এবার ছুটিতে বিলেত বেড়িয়ে আস্‌ব।

শিব। ভাল কথা, তোমাদের কনফারেন্সে সহবাসের বয়সের কি কোচ্চো বলো দেখি?

গণেশ। আমিত বোধ করি যে, নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে সহবাসে সম্মতি দিতে পার্ব্বোনা, এই নিয়ম হওয়া উচিত। বারো চোদ্দ কি ষোল বছরেও আমি নিরাপদ মনে করিনা। তবে কি না ভোটের কাজ, ভোটে যা হবে, তাইত হবে।

শিব। তুমিই ত গণপতি হে। তোমার দলেই ত যারা মানুষের মতন, তারা সকলেই আছে?

গুরুমা। লেডীদের সামনে নয়, ও কথাটা এখন নাই হলো।

ঝাঁ করিয়া অমনিই গল্পটা ফিরিয়া গেল। আবার পূজার কথা; পূজার কথা হইতে পথের কথা, যাতায়াতের অসুবিধার কথা, আলোচালের নৈবেদ্যের কথা,—নানান কথা আরম্ভ হয়ে গেল। স্থির হইল যে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যাওয়া হইতেই পারে না। কার্ত্তিকমাসে যাওয়াই স্থির।

শিব যে এখন সওদাগর হইয়াছেন, সে কথাটা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। বড় গোছের একটা ডিস্‌পেন্সারি করিয়াই শিবের কিছু সংস্থান হইয়াছে, ব্যবসা-বুদ্ধিটাও খুব পাকিয়া উঠিয়াছে। শিব প্রস্তাব করিলেন যে, বুড়া ষাঁড়ে ত কোন কাজ হয় না, ওটাকে কসাইদের কাছে বেচিলে হয় না? দুর্গার তাহাতে আপত্তি নাই, তিনি এখন পাকা গৃহিণী। সিংহটা এখন কোথায় বিক্রী হয় কি না তাই ভাবিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের ঘরে ঘরেই একটা 'জু' হইতে পারে,—এত জানোয়ার আমাদের আছে'।

কথোপকথন এইরূপ হইতেছে, ষাঁড়টা, কুঠির হাতাতেই চরিয়া বেড়াইতে-ছিল, পরামর্শটা শুনিতে পাইল। তবু শিবের ষাঁড়, বুদ্ধিশুদ্ধি এক রকম আছে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই মিউনিসিপাল অফিসে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গেই ময়লার গাড়ীতে অনররী বাহাল্ হইয়া গেল। ষাঁড় ঠিক ঠাওরাইয়াছিল যে, এক ত অনররী পদটা ভাল, তা যাই কেন হউক না। তাহার উপর নির্ব্বাচন প্রণালী যখন প্রচলিত আছে, কালে মিউনিসিপাল

চেয়ারম্যান হইয়া অনবারী রাজাগিরির ভরসা পর্যন্ত থাকিতে পারে। শিবের পাল্লায় থেকে শেষে কসাইয়ের হাতে প্রাণটা কেন যায়?

ষাঁড়তো সটান সটকান দিল। সিংহও বুঝিল বেগতিক, সেও প্রস্থান করিল। কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে মহিষাসুরের কাছে গিয়া উপস্থিত।

সিংহকে দেখিয়াই ত মহিষাসুরের চক্ষুস্থির। ভাবিল—"বেটা এবার এত সকাল সকাল ধোর্ত্তে এল কেন?"

মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মহিষাসুর সিংহকে সমাদর পূর্ব্বক বসিতে দিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর মহিষ বলিল—"দেখুন সিংহ মশাই অনেকদিন থেকে একটা কথা আপনাকে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে করি, তা বলবার সুযোগটা হয়েই ওঠে না।"

সিংহ অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"হাণি-কি! বলই না!"

মহিষ। বলি, তাই বোলচি যে আপনার ত দেখা পাবার যো নাই। যা দেখা পূজোর কটা দিন।

সিংহ। তা বৈ কি? ফুরসুৎ ত নেই।

মহিষ। আপনারা বড় লোক, বড়লোকের কাছে থাকা। আপনাদের কি ফুরসুৎ হয়? তা সে পূজোর কদিনও না-দেখারই মধ্যে। আমায় কামড়ে আপনারও সে কদিন মুখ জোড়া থাকে, আর আমার ত কথাই নেই।

সিংহ। তা বটে হে। তোমার ত অসুখ বটেই, আমারও ত সুখ নেই।

মহিষ। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অসুখ। অসুখ যা তা আপনারই। দেখুন কত নৈবিদ্দি, ভোগ-রাগ, লুচি, সন্দেশ, পাঁটা, মোষ,—তা আপনার ত কিছু করবার যো নেই। সেই আমার হাতে কামড় মেরেই মুখ জুড়ে বসে থাক্‌তে হয়, গিলতেও পান না, ওগ্‌লাতেও পান না। সত্যি বলছি সিংহমশাই আপনার জন্যে আমার কান্না পায়।

সিংহ। হ্যাঁ হে, তুমি ত বড় ভাল লোক দেখচি। এমন তরো লোক তুমি জানলে যে তোমার একটা—তা আমায় দিয়ে তোমার কি উপকার হোতে পারে বল দেখি?

মহিষ। দেখুন দেখি আপনি মনে কল্লে কি না হোতে পারে? আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

সিংহ। বলই না, কি কত্তে হবে? তাই করা যাবে এখন।

মহিষ। তা কি কর্ব্বেন?

সিংহ। কর্ব্বো না কেন? বলো।

মহিষ। বোল্‌চি কি, আপনি আমায় ছেড়ে পারেন!

সিংহ। তা কেমন করে হোতে পারে?

মহিষ। আজ্ঞে আমিও ত তাই বোলছিলাম, তা কেমন কোরে হবে? তা হবেনা কেন, হয়; আপনি মনে কোল্লেই হয়।

সিংহ। মনের কথাটাই ছাই ভেঙে বলো না?

মহিষ। বোল্‌ছিলাম কি, বলি, ওদের কাকেও না যেতে দিয়ে আপনি আর আমি যদি পূজোর বাড়ীতে যাই, সে কেমন হয়?

সিংহ। তাঁরা তা শুন্‌বেন কেন?

মহিষ। তাঁদের শোনাশুনির ভার আমার। আপনি রাজি হলেই হোলো।

সিংহ। দেখিল শাপে বর। পরামর্শটা সর্বাংশেই ভাল। আরও একটু স্থবিধার চেষ্টায় বলিল,—"ভাল আমি যদি রাজি হই, পূজোর ব্যাপারটা কি রকম হবে?"

মহিষ। পূজো যা হবে, তা আপনারই; আমি বোসে বোসে আপনার লেজে তেল দিতে থাক্‌ব তখন। ভোগ রাগ নৈবিদ্দি যা হয়, সবই আপনার, প্রসাদটা আস্‌টা দেন ভালই, না দেন, নেই। পূজোর কদিন কামড় খোস্‌বে, সেই যে আমার পরম লাভ। তায় আবার অমনতরো কোরে আপনার কাছে ঘেঁসে বোস্‌তে পাবো, আমার মান বৃদ্ধি হবে কত?

সিংহ। ভাল, দুর্গাকে যেন মানালে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, তারা অন্য জায়গা হোতে আসে, তারা ছাড়বে কেন?

মহিষ। আপনি মাত্র রাজি থাকুন, ছাড়বে সবাই। আমার আস্থরী বুদ্ধিখানাই দেখুন না। আপনি যেখানে সহায়, সেখানে আমি লাগ্‌লে লক্ষ্মীকেও ছাড়াবো, সরস্বতীকেও তাড়াবো। সব ভার আমায় দিন, আপনি কেবল যথা-কালে অনুগ্রহ কোরে লেজটি দিবেন, আর কিছুই ভাবতে হবে না।

সিংহ বলিল—"তথাস্তু!" "সন্ধি হইয়া গেল। সিংহের পোয়াবারো: ষোল আনাই লাভ। লেজে তেল দিতে পাইয়াই অস্থর পরিতুষ্ট।

পরবিদ্যা

অমৃতলাল বসু

(১৮৫৩-১৯২৯)

বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত কলকারখানা একশত জনকে ধনী করে—এত ধনী যে, তাহাদের প্রত্যেককে কোটিপতি বলিলেও যেন অবজ্ঞা করা হয়, আর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঙাল কাঙালিনী করে; অশিক্ষিত বেচারারা ঐ একশতের মোট বয়, কাঠ কাটে, জল তোলে, অথবা জুতা সাফ করে। সাধারণ ডাকাতেরা লাঠির জোরে পরস্বাপহরণ করে আর শিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধির কৌশলে ঐ কায্য সমাধা করেন; সাধারণ ডাকাতের জন্য পুলিশ আছে, আর এই Intellectual dacoity-র বাহবা পৃথিবী শুদ্ধ foolish মুখ হইতে নিগত হয়; বিদ্যাবন্ত বধকর্ত্তাকে তার বধ্যও বাহবা না দিয়া থাকিতে পারে না। একশত টাকার দাবীতে ১000 টাকা খরচ করিয়া হারিয়া গেলেও মক্কেল বলিয়া থাকেন, "হারি আর যাই করি, আমার উকিল ক্রসে আসামীকে যে নাস্তানাবুদ করেচে, তার চরিত্তিরের কথা যেরকম আদালতে বার করে দিয়েচে তাতেই আমার টাকা উঠে গেছে।"

আগে বলিয়াছি, দুই দশজন নির্বোধকে বাদ দিলে, জগতের বুদ্ধিমান সাধারণ এখন বিদ্যার্জ্জন করেন আপনাকে বড় করিবার জন্যেই। পদে, প্রতাপে, সম্ভ্রমে, মর্য্যাদায়, ঐশ্বর্য্যে, মাৎসর্য্যে, ভোগে, এমন কি, রোগেও আপনাকে প্রতিবেশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদ্যা বিদ্বানের পেটে ঢুকিয়া কামড়াইতে থাকে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান সাধককে যে শক্তি প্রদান করে, তাহাতে উচাটন ও মারণ প্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী হয়; কামনার বিরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই; আর মারণ—ভাতে মারা ত আছেই, তাহার উপর, বেশী নয়, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই, মানুষকে প্রাণে বধ করিবার কত রাসায়নিক, কত যান্ত্রিক উপায়ই না সৃষ্টি করিয়াছে।

সমগ্র জগতে বিদ্যাবিস্তারের ফল ত' হইল এই। তাহার পর আমাদের এ দেশের, বিশেষ বঙ্গদেশের কথা। প্রথমে ইংরাজ আসিল, তাহার ধোপদস্ত সফেদ রঙ দেখিয়াই আমরা মোহিত হইলাম, প্রাণ বিলাইয়া দিলাম, যুগযুগান্তরের শ্যামরূপের মোহিনী ভুলিয়া ধবলের কবলে আত্মসমর্পণ করিলাম। "সাহেব" বলিলেন, "তোমরা মূর্খ আছ," আমরা বলিলাম, "যে আজ্ঞে।"

তাহার পর এক ঘোঁট বসিল, তাহাতে জনকতক 'সাহেব' রহিলেন, ও জনকতক মাথাল মাথাল বাঙালীও রহিলেন। তর্ক এই আমরা কোন্ বুলি

বলিয়া বিদ্বান্ হইব। জন কতক সাহেবের মত যে, আমরা যেন জাতিগত অভ্যাসে কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ করি, সেই কঁ্যাক কঁ্যাকটাই একটু ভাল করিয়া করিতে শিখি তাহার পর নিজের ডানা নাড়িয়া কখন বা মাটির ধান কুড়াগুলি খুঁটিয়া খাই, আর কখন বা গাছের ফলটা আসটায় ঠোকর মারি। আর জনকতক 'সাহেবের' মত হইল, না আমরা "রাধাকৃষ্ণ" বলিতে শিখি; পাখার কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ পাখীই বুঝে, ও ত' স্বাভাবিক, ও ত' আর বিদ্যা নয়; বিদ্যা হ'ল "রাধাকৃষ্ণ" বলা। অধিকাংশ বাঙালী বলিলেন, "হঁ্যা হঁ্যা আমাদের "রাধাকৃষ্ণ"ই বলাও"; তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ করিলে আমাদের কোন লাভ নাই, নিজের ডানায় ভর দিয়া চিরকালটা উড়িয়া বেড়াইতে হইবে। একটা গাছ টাছ দেখিয়া নিজের বাসা নিজেই বাঁধিতে হইবে, আপনার আহার্য্য আপনিই অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার উপর ঝড় আছে বৃষ্টি আছে, কুকুরের দাঁত ও বিড়ালের পেটও আছে; কিন্তু "রাধাকৃষ্ণ" বুলি শিখিলে আমরা দরে বিকাইব, সৌখীন লোক আমাদের কিনিয়া লইবে, চক্চকে পিতলের তার ঘেরা খাঁচার ভিতর আমাদের বাসা দিবে, ছোলা দিবে ছাতু দিবে, পিড়িং দিবে—কোন্ না দু-এক দিন পাতের কেক্ ভাঙ্গাও দিবে; পাঁচজনকে ডেকে আমাদের দেখাইবে, বুলি শুনাইবে। সুতরাং ধার্য্য হইল আমরা 'রাধাকৃষ্ণ' বুলিই শিখিব।

শঙ্করাচার্য্য যেমন শিবস্তোত্র লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, সেকেলেও তেমনি অমর হইয়াছেন বাঙালী-স্তোত্র লিখিয়া। সেই কলের দেশের মেকেলে বলিলেন, "দাও বাঙালীকে বিদ্যার কলে ফেলে।" আজ একশত বছরের উপর সেই বিদ্যার কল চলিতেছে; যেমন যাঁতার ময়দার কল ঘুচিয়া এখন রোলার মিল হইয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহারও চাকাটা রডটা পিস্টনটা বদলিয়া দেন—আর কল হইতে বাঙালীর ছেলেরা একের নং, দুয়ের নং, তিনের নম্বরের ময়দা আটা সুজি ভুসি হইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া বস্তাবন্দী হয়। বিদ্যা মাথার গুদামের ভিতর হরেকরকমের পুরানো আসবাব ভরিয়া দিতেছে। আমরা চলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উড়িতে ভুলিয়া গিয়াছি, খুঁটিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ঠোকরাইতে ভুলিয়া গিয়াছি। ক্ষেতের ধান, বনের ফল, ঝরণার জল, সকলের আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল শিকল পায়ে দাঁড়ে বসিয়া বলিতেছি "রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ", আর এক একবার গুমরে পর্‌গুলা ফুলাইয়া তুলিতেছি।

প্রথম দশ বিশ বৎসর দু' দশটা পাখী একরকম দামে বিকাইত মন্দ নয়, তাহার পর স্টীমার দেখা দিল, সুয়েজখাল খুলিল, Bird of Paradise,

Macaw, Magpie, Canary, আরও কতকি আমদানী হইল; তাহারা শিশ দেয়, কেহ গান করে, কেহ বলে 'পলি পলি'; আর এদিকে হাজার হাজার "রাধাকৃষ্ণ" বলা টিয়ে গলি গলি; সুতরাং দু আনা জোড়াও হাটে বিকায় না; কিনিলেও খাইতে দেয় বোরো ধান—দুটো ছোলাও আর মিলে না। একে ত' সর্বনেশে অহং সব মানুষের মনের মধ্যে বসিয়া নাস্তানাবুদ করিতেছে, তাহার উপর ইংরাজী শিখিয়া আমাদের অহংটা একেবারে সাত হাত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই কারণ নাই, কেন না ইংরাজীতে আমি—জ্ঞাপক আই (I) টা বড় অক্ষরে (Capital-এ) লিখিতে হয়; পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় লিখন প্রণালীতেই বোধহয় এ নিয়ম নাই।

দশটায় হাজির পাঁচটায় ছুটি, বেশভূষা বেশ পরিপাটী; চেয়ার টেবিল সাজিয়ে রাখা, মাথার উপর টানা-পাখা; কোনও হাঙ্গামা নাই; কোনও দায়িত্ব নাই; ঝঞ্ঝাটের মধ্যে 'সাহেবকে' একটু কোমর নোয়াইয়া সেলাম দেওয়া, চাপরাশীকে চাচা বলা; কাজের মধ্যে একটা Carried over থেকে আর একটা Carried over পর্য্যন্ত ঠিক দেওয়া; কিসের হিসাব, কত হিসাব তার ঠিক ঠিকানার দরকার নাই; আর না হয়, "সাহেবে"র draft করা চিঠির নকল করা (তা মৃত মক্ষিকার দেহস্পর্শের ছোপটুকু পর্য্যন্ত); তার উপর মাস গেলেই মাহিনা, নগদ কড়্‌করে টাকা। এমন শান্তিপূর্ণ সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া কে যায় চাষের ক্ষেত তদারক করিতে, কে বসিয়া দোকানের পিঁড়িতে দাঁড়ী ধরে, কে যায় গতর খাটাইয়া, মাথা ঘামাইয়া লাভ লোকসানের বনের ভিতর দিয়া অন্নসংগ্রহের অর্থ খুঁজিতে?

"রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলিতে শিখিয়া আরও একটা ভারী রকম লাভ হইল; পক্ষিসমাজে বুলি বলা পাখীর একটা বড় রকম নূতন জাতি হইয়া দাঁড়াইল, সে জাতের নাম হইল Babu (বাবু)। যার বাপ—কোন ব্যাবুকে কামাইতে আসিয়া ফরাসের উপর পা দিলে ব্যাবু খাপ্পা হইয়া তাহাকে দূর দূর করেন—তাঁরই ছেলে জুতো পায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিয়া "Good Morning, Sirs, hope I am not Intruding বলিলেই, ব্যাবু অমনি তাহাকে হাত বাড়াইয়া শেকহ্যাণ্ড করিয়া তাকিয়ার ধারে বসিতে দেন। সুতরাং তাঁত ছাড়িয়া, কামার হাতুড়ি ছাড়িয়া, পড়িতে বসিল—"I am up রাধাকৃষ্ণ" "You are in রাধাকৃষ্ণ" আর একেবারে পৈতৃক জাতি ছাড়িয়া হইয়া গেল—ব্যাবু। এখন উমেদারী গুদামে এত বাবু জমিয়াছে যে বাবুরা বস্তা-পচা হইতেছে, আর বাবু নামে একটা দুর্গন্ধ উঠিয়াছে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে যে মহানৈবেদ্য

সাজান হয় তাহারই কুচো নৈবেদ্য লইয়া এদেশে সরস্বতী-পূজা আরম্ভ হইল। সকল বিদ্যারই একটু একটু করিয়া আমাদের গলধঃকরণ করান হইল, বিদ্যার আর কিছুই বাকি রহিল না ;—

"কোন শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
'নোকরি'-বিদ্যা সেই ক্ষণে শিখিলেন রাম ॥"

ডিগ্রিধারী দেশী-মস্তিষ্ক উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার স্মৃতিরক্ষায় যদি কেহ যোগ-দৃষ্টি নিপাতিত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার কি বিচিত্র সম্ভারই সেখানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে। একটা ঠ্যাং-ভাঙ্গা সাহিত্যের উপর একটা ঘাড়-ভাঙ্গা সায়েন্স, আড়কাটায় টাঙান খানিকটা ধূলা-পড়া লজিক্, আরও কতকি—ব্লটিং ছাপার উপর সব হরপ কি বুঝা যায়? সে মস্তিষ্ক দেখিলেই বহুবাজার ষ্ট্রীটের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিষের দোকান মনে পড়ে; দু-খানা গদি ছেঁড়া কৌচ—দোকানদার বলছে "এ আসল এডমণ্ডের বাড়ীর, আর কারুর দোকানে পাবেন না।" খানকতক হাতভাঙ্গা পিঠভাঙ্গা কেদারা—একেবারে খাস আমেরিকান, যেন এমার্সনের মাঝখানকার দেড় Chapter; গোটা কতক ডবল্‌উইক কেরোসিন ল্যাম্প—গ্লোবটা ফাটা, ঘুরালে পলতে উঠে না, কিন্তু আসলে অসলারের বাড়ীর; দুইটা চীনের ফুলের টব; মস্ত এক বাণ্ডিল ছাতা-ধরা ম্যাটিং; একখানা উইয়ে খাওয়া জাপানী স্ক্রীন; চাকা-ভাঙা বাইসাইক্‌ল, ফুটো ফুটবল, সেজের পায়া; প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ ছেঁড়া টানাপাখা ও ১৮৯৩ সালের থ্যাকারের ডাইরেক্টারী। এরূপ দোকানের বেসাতী কয়দিন চলে? তাই বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে প্রায় বাজারের সীমানার পর হইতেই আরম্ভ করিয়া হুজুরী মলস্ ট্যাঙ্ক লেনের মোড় পর্য্যন্ত একদিন সারি সারি যে Second hand conglomeration-এর দোকান ছিল তাহার প্রায় একখানিও আর দেখা যায় না। ঐরূপ দোকান দু পাঁচখানা আজও পেনসেনের অপেক্ষায় প্রাচীন জীবন কোনও মতে রক্ষা করিয়া আছে।

এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিদ্যার অসারত্ব ও নিরর্থকতার কথা এখন ছেলেরা বুঝিতেছে, যুবকেরা বুঝিতেছে, অভিভাবক পদে প্রতিষ্ঠিত প্রাচিনেরাও বুঝিয়াছেন। উকীল অনেকদিন বুঝিয়াছিলেন যে, শামলা আর মামলা আনে না; তাই গাউন পরিলেন, কিন্তু তাতেও টাউনের খরচ চলে না; ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে মোটর চলিলেও চলিতে পারে কিন্তু "এম্ বি"-র বিদ্যা কম্পাসে

মোটেই চলে না ; 'এম-এ'র শেষ ভরসা (যদি ডেপুটী করিয়া দিবার জন্য M.L.C. কি সরকারী ব্যারিষ্টার শ্বশুর না থাকে) মফঃস্বলের ষাট টাকার মাষ্টারী ; বি,এ দেখিতেছেন বিয়ের বাজারেও পাস আর—রঙের তাস ব'লে—বেশী দিন ধর্ত্তব্য হইবে না ; কিন্তু তবু ছাত্রের বন্যা যে, কলেজের গেট, মেডিকেল কলেজের গ্যালারী, আর্ট কলেজের হল ভাসাইয়া দিতেছে। কি করে, কোথায় যায়, আর অন্য পথ নাই।

কৌতুক-কণা

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

(১৮৫৪—১৯০৫)

বাবু মোহনবাঁশী বি, এ,-ফেল মহোদয়ের নিবাস আপাতত কলিকাতায়। পিতা সব্‌জজ ছিলেন,—কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান,—সুতরাং বাঁশীবাবুর অন্নচিন্তা ছিল না। সংসারে তাঁহার মা, স্ত্রী এবং এক কন্যা ছিল। বাঁশীবাবু বহুকাল হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন ;—কিন্তু সে পরীক্ষা-সাগর কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এমতে প্রতিবেশীমণ্ডলী তাঁহাকে 'বি, এ,-ফেল' উপাধি প্রদান করেন। সুতরাং অধুনা তাঁহার নাম দাঁড়াইয়াছিল,—"বাবু মোহনবাঁশী বি, এ,-ফেল।"

মোহনবাঁশীর ধারণা ছিল,—তিনি পিতা অপেক্ষা সমধিক গুণবান্, জ্ঞানবান্ এবং বুদ্ধিমান্। সেকেলে পিতা কেরাণীগিরি হইতে মাষ্টারি, মাষ্টারি হইতে মুন্সেফী, অবশেষে মুন্সেফী হইতে ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া সব্‌জজরূপে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠেন। অল্পবুদ্ধিধারী পিতা যখন এত উচ্চপদ পাইয়াছিলেন,—অগাধ-বুদ্ধিধারী পুত্র তখন সহজেই যে হাইকোর্টের জজ হইতে পারিবেন,—তৎপক্ষে বাঁশীবাবুর কোনও সংশয় ছিল না। সংশয় ছিল না বলিয়াই, বাঁশীবাবু পঠদ্দশায় বন্ধুবান্ধবগণকে বলিতেন,—"মনে কর, হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া মাসে আমি আট নয় হাজার টাকা করিয়া পাইতেছি ;—এমন সময় বড়লাট আমাকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বল দেখি, এ সময় আমি কি উত্তর দিব? হাইকোর্টের জজের মাসিক মাহিনা বড়-জোর না হয় চারি হাজার টাকা। কিন্তু আমি এদিকে ওকালতীতে মাসে আট নয় হাজার টাকা রোজগার করিতেছি। করি কি? তবে জজিয়তিতে সম্মান অধিক। কি বল, —হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণ করা উচিত নয় কি?"

শুধু বন্ধু বান্ধবকে এ কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। পঠদ্দশায় একবার তিনি ইংরেজীতে একটী "এসে" লেখেন—"উচ্চপদের সম্মান অধিক না, টাকার সম্মান অধিক?" এ প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করেন, উচ্চপদেরই সম্মান অধিক। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "যথা,—হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিলদের ও বারিষ্টারদের অপেক্ষা জজেদের সম্মান অধিক। কেন না, জজ সাহেব বেলা এগারটার সময় আদালত-গৃহে উপস্থিত হইলে, যত উকীল এবং বারিষ্টার তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না জজ বসেন, ততক্ষণ তাঁহারা কেহ বসিতে পান না।"

ক্রমশঃ কিন্তু মূলে ফাঁক হইয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষক মূষিকগণ, মোহন-বাঁশীরূপ মহান্ মহীরুহের মূল-শিকড় কাটিয়া দিল। উপর্য্যুপরি সাত বার তিনি বি, এ, ফেল হইলেন। ঘুড়ি, সদম্ভে আকাশ-পথে উড়িতেছিল—হঠাৎ কে যেন তাহার সূতা কাটিয়া দিল। ঘুড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিকলাঙ্গ হইয়া, ভূতলে পড়িয়া গেল। মোহনবাঁশী মনে মনে ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন স্থায়িরূপে বসিবার উদ্যোগে ছিলেন,—কিন্তু পিচ্ছিল পর্ব্বতে বসিতে সক্ষম না হইয়া, ক্রমশঃ গড়াইয়া গড়াইয়া, নাকে মুখে চোকে বুকে আঘাত পাইয়া, ধড়াস্ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার উপরপাটীস্থ সম্মুখের দুইটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহনবাঁশী বি, এ,—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, সুতরাং বি, এল পাশ দিয়া হাইকোর্টের উকীল হইবেন কিরূপে? মোহনবাঁশী ফেল হইলেন বলিয়া যে, আপন বিদ্যাবুদ্ধির প্রভা কিঞ্চিৎ কম উজ্জ্বল মনে করিতেন,—তাহা নহে। তিনি কাহাকেও বলিতেন,—"পরীক্ষায় পাস হওয়া আর সূত্তি খেলায় অর্থলাভ করা—এ দুইই সমান। এখানে গুণের বিচার নাই। পড়িল পাশা, তো জিতিল কোদালের বাঁট।" কাহাকেও আবার বলিতেন,—"পরীক্ষকগণ মহামূর্খ। তাহারা আমার প্রশ্নোত্তরের মহিমা বুঝে না। বানর মুক্তামালার অর্থ কি বুঝিবে?"

মোহনবাঁশী মুখে দড় হইলেও, মনে মনে মনকে বুঝাইয়া এক রকম ঠাণ্ডা করিলেও, হৃদয়ের অন্তস্তলে কিন্তু তিনি নিদারুণ কেমন এক আঘাত পাইলেন। সংসারে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিলেন না,—হাইকোর্টের জজ হইতে সক্ষম হইলেন না,—ইহজগতে সম্মানরূপ সার সুখ পাইলেন না,—কাজেই তিনি ধরাধাম শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মন কেমন 'উদাস' হইল। কিছুই ভাল লাগে না। ক্ষুধাও মন্দ হইয়া আসিল। লোক দেখিলেই,—বিশেষতঃ শ্বশুর-বাটীর লোক দেখিলেই,—কেমন এক অনির্ব্বচনীয় লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি সহজে লোপ পায় না। শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, মোহনবাঁশী সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিলেন। বলিতেন,—"সঙ্গীতের ন্যায় সুখ আর কিছুতেই নাই। সঙ্গীত ব্রহ্ম। সঙ্গীতে একবার মন মজিলে, সংসারের সমগ্র সামগ্রীরই শুভদর্শন হয়। সু-সঙ্গীতে এবং সু-সঙ্গতে পুত্রশোকও তিষ্টিতে পারে না।"

বাবু, মুখে ঐরূপ বক্তৃতা করেন এবং ওস্তাদ রাখিয়া গান শেখেন। কয়েক মাস পরে, সঙ্গীতও আর তাঁহাকে ভাল লাগিল না। কেন না, গলায় সুর

তাঁহার আদৌ আসিল না। তাহলেও তথৈবচ জ্ঞান জন্মিল। ওস্তাদ, তাল-বোধের কথা বাবুকে বলিলে, তিনি বড়ই বেজার হইতেন।

সঙ্গীত ছাড়িয়া, অনন্যোপায় হইয়া, তিনি শেষে কবিতা-দেবীর সেবা আরম্ভ করিলেন। বলিতেন,—"ধন্বন্তরির কলসের অমৃত, শারদীয় চন্দ্রের সুধা, প্রফুল্ল-পঙ্কজের অনাঘ্রাত মধু,—এ সমস্ত কবিতারসের কাছে কিছুই নহে। হাইকোর্টের জজিয়তিপদ পার্থিব, নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর এবং জলবিম্ববৎ; কিন্তু কবিতা-রস পান করিয়া বাল্মীকি অমর, কালিদাস মৃত্যুঞ্জয়, বেদব্যাস চারি যুগেই সমভাবে বর্ত্তমান। বিশেষ হাইকোর্টের জজ স্বদেশেই পূজ্য; কিন্তু কবি সর্ব্বত্রই সমাদৃত।"

মোহনবাঁশী, মৃত্যুঞ্জয় এবং সর্ব্বত্র পূজিত হইবার জন্য কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়াছিলেন, স্বভাব-কবিই শ্রেষ্ঠ কবি। আরও শুনিয়া-ছিলেন, মহাকবিগণ কখন ভাষার জন্য ভাবিত হন না; শুদ্ধাশুদ্ধ, ষত্বণত্ব হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রতি মহাকবিকুলের দৃষ্টিপাত নাই; তাঁহাদের লেখনীমুখে যাহা নির্গত হইবে, তাহাই ভাষা, তাহাই শুদ্ধ, তাহাই ব্যাকরণ।

একদিন তালগাছ দেখিয়া মোহনবাঁশী কবিতা লিখিলেন,—

রে তালগাছ! কেন এত লম্বা, যেন প্রেম-কাম্বা,
নাহি কিছু ঢম্বা তব।
দেখি এই আম্বা, ভীত জগদম্বা,
আকাশ স্পর্শম্বা হব॥
নাহি শাখা নাহি প্রশাখা নাহি সখা নাহি বিসখা,
সংসারে দেখি তোর সকলি ফাঁকা।
তোর দোয়ারে নাইক আকা, তোর মাথায় বসি কাক ডাকে কা-কা,
যেন মূর্ত্তিমান দুঃখের ছবি আঁকা॥
আমি শুনেছি পুরাণে, নারিকেল গাছ সনে,
আছে তোর মাখা-মাখি ভাব।
সেই তোর কেবা হয়,—সহোদর ভাই নয়?
তোর তাল ভাল কিংবা ভাল তার ডাব?
খর্জ্জুর সুপারি, দুই গাছ ভারি,
সম্বন্ধি কি ভায়রা-ভাই বুঝিবারে নারি।
রূপ মনোহারি, যাই বলিহারি,
তাল গাছ কাছে কিন্তু উভয়েরই হারি॥
তাল! তোর নাইক মাতা, নাইক পিতা, মাথায় দিবার নাইক ছাতা,
নহিলে, বর্ষায় এত ভিজিস্ কেন?
তাল! তোর ভাত খাইবার নাই কলাপাতা, পায়ে দিবার নাইক বুটজুতা,

নহিলে তোর, গোড়ালীতে এত কাদা কেন?
তাল! তোর জমা খরচের নাইক খাতা, শয়নের তোর নাইক কাঁথা,
নহিলে দিন রাত এত দাঁড়ায়ে কেন?
সত্য করে বল্ রে তাল, কেন তোর এই বদ্‌হাল?
চোরে কি লুঠেছে তোর সব মালামাল?
তোর তাল-শাঁসে কি নাইক রস, তাই তুই হয়েছিস এত বিরস,
আমি থাক্‌তে দুঃখ কিরে ওরে কানাইলাল॥

শ্রীমোহনবাঁশী বি, এ,-ফেল
(অঙ্কশাস্ত্রে সিকি নম্বরের জন্য)

এই মহাকবিতা প্রকাশিত হইবামাত্র, সমগ্র জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অর্থাৎ জগতের অর্দ্ধেক লোক মোহনবাঁশীর "তালগাছ" পাঠে মুক্তকণ্ঠে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গেটে, বার্জিল, কালিদাস, সেক্‌সপীয়র, পাতঞ্জল, বা আবুলফজলে এরূপ কবিত্বপূর্ণ পদ্য দেখা যায় না। মোহনবাঁশী বাবু তালগাছ ব্যতীত ইহজীবনে যদি আর একটিও পদ্য না লেখেন, তাহা হইলেও সংসারে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া মহাকবি বলিয়া গণ্য হইবেন। কোহিনুর হীরক এক খণ্ড মাত্র পাওয়া যায়; সিংহ একটি সন্তান প্রসব করে; মনুমেণ্ট কলিকাতায় একটাই আছে। সার-সামগ্রী পৃথিবীতে একটা করিয়াই হয়। যেমন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।"

তোতা কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১—১৯৪১)

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

০ ২ ০

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

০ ৩ ০

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অল্প-পুঁথির কর্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথিলেখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

০ ৪ ০

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়া মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

০ ৫ ০

শিক্ষা যে কী ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেঁরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবীশ আর মামাতো পিসতুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন।"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমনসময় নিন্দুক

ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।"

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন "ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

০ ৬ ০

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরী হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

০ ৭ ০

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।

নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়।"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে।"

"না।"

"আর কি গান গায়।"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

বলবান জামাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮৭৩—১৯৩১)

প্রথম পরিচ্ছেদ

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসান প্রায়; আফিসে নলিনী-বাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস,—সম্মুখে পূজা,—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যাইবেন। জিনিষপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes ?"

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনীবাবু হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকিটাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)

নিম্নে সোনার জলে মুদ্রিত—

"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্য আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখো, ভুল না।

তোমারই সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা

দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইহার আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেই জন্যই বিশেষতঃ এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে,—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক,—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজদির নামটির উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিষ ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে;—পুরুষ মানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভাল মানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠ-দেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরী-মুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আপিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মতলবের উদয় হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন,—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন

না,—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা-কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে ; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায়! নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত। নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কৈ, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম * একটি পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা পেঁৗছে নাই কি? কুলি ডাকিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকিলকা বাসা জানতা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই, এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল।

বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ, সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কড়াই মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ী ?"

হাঁ বাবু।"

"না। তিনি কিদার বাবু উকিলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও,—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যাটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে! জামাইবাবু?"—বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে এক দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালক বালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি ?"

নলিনী বলিল, "হাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালি ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল ছিলেন ত ?"

"হাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে ?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?—জামাইবাবু কবে আসবেন গো ?'—দিদিমণি বলেন, 'এই ছুটি হলেই আসবেন।' তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন ; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না,—জলটল কিছু খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে চান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন

*দিনকতক এইরূপ টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এগুলি ছিল চিঠির অধম।

জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের কি গহনা টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।”—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, “তুই বকশিস লিবি, হামি বুঝি বখশিস লেব না ?”

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালক বালিকা তাহার বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প কয়েক-মাস বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জ্বলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, “দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।” নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, “বাঃ—বেশ ছেলেটি ত।”—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, “বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।”

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা! ওমা! ওকি ? নোকে বলবে কি গো ? রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা।”

সমবেত বালক বালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, “সোনা ত আনি নি।” মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও ?

ঝি বলিল, “সে কথা শোনে কে ? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোনার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না।”

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল ; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। ‘ছেলের বাপ হলেই হয় না’—ইহার অর্থ কি ? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ না কি ?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালক বালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালক বালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময় একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবৎ খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জল খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী, বাটী, গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

"কি ভাই, এতদিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষ-মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই তিনাটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক!"

"অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জোচ্চোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ—ওমা, কি সর্ব্বনাশ হল গো? ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি? যা, শীগ্‌গির বাবুকে খবর দে।"

রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোণার জলে নাম লেখা—এম, এন, ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে সে ভ্রমক্রমে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে, নিশ্চিন্তমনে, একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদার বাবু উকিলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য

এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল "বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া, ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "কেন রে —কারুর অসুখ বিসুখ?"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বলিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হবে কি পাগলা আদ্‌মি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোগকো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?"—বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন "জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকিল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না, পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধ'রে পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল,—বাড়ীতে পোঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কই? কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পোঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। 'মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী' গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চ'লে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মহিনের জামাই তুমি? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দু'জন মহেন্দ্রবাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল, আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম।"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প গুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্নে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক রকম আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া, চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ঈজি চেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু, চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু।"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই 'জামাই' শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি, বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না? বেটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা।"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দেও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার। হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ যো হাম্‌কো ছুঁয়েগা, উসকা হাড্ডি হাম্ চূর চূর কর ডালেঙ্গে।"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

এ কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশ্‌মে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো ষ্টেশন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ না কি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর।"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দু'জনেরই এক নাম,—বাড়ী ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য নয়?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এ সকল কথার ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে যদি হ'ত—তা হলে খবর দিয়ে আসত—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সেটা জুয়াচোর—জুয়াচোর।"

"কেন আসবার কথা থাকবে না। আসবার কথা ত রয়েছে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি,—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুই দেখেছিস নাকি? বল্ ত!—বল্ ত!—কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতালায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপর বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন মিরজাপুরী গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা ব'লে এমনই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'বাবু টেলিগেরাপ এসেছে।'"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল 'ষ্টেশনে চল'। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে আছে। যাই, গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম,—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পায় না।"
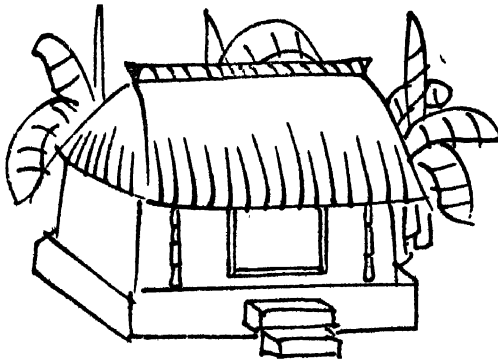
দাদার দুরভিসন্ধি

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৩—১৯৪৯)

নিরঞ্জন ঘোষালের বাড়ী বেলঘরে। তিনি গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করতেন। অঙ্ক-বিদ্যায় তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল।—শুভঙ্কর ঘোষাল বললেই সকলে তাঁকে বুঝে নিত, তাঁর কাছে বুদ্ধি নিতে আসত। পণ্ডিতি ক'রে আর বুদ্ধি বিতরণ ক'রে সংসার চলত মন্দ নয়।

দুটি ছেলে—জগৎ আর শশীকে ইংরেজী পড়িয়ে আর তার সঙ্গে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি মিশিয়ে মানুষ ক'রে তোলবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। জগৎ ম্যাট্রিক পাস করল বটে, কিন্তু হিসেবে আর বুদ্ধিতে বাপের প্রিয় হতে না পেরে একটি চাকরী জোগাড় ক'রে আগরায় চলে গেল।

ঘোষাল মশাই বলতেন, "জগৎ কেবল একটা নিরীহ জেণ্টেলম্যান হয়ে গেল, তাতে সংসার কি সমাজের কোন উপকারই হয় না, আর দশজনের মত বাজে জিনিস হয়ে রইল।"

*   *   *   *   *   *

শশী দিন-দিন শশীকলার মত বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে উৎপাত-অশান্তিও বাড়তে লাগল। পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল শশীর দলই দখল ক'রে রইল। ঘোষাল মশাইকে কেউ কিছু জানালে, তিনি বলতেন, "ভুলে গেলে চলবে কেন গো, ও-বয়সে সব ছেলেই ও-রকম ক'রে থাকে। ওটা চিরকেলে নিয়ম, ওতে বুদ্ধি খেলে কত। ও'না থাকলে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর হতেন না। যে-সব ছেলের বুদ্ধি খেলে না, তারাই বাড়ী থেকে নড়ে না। ওটা দরকার, ওতে বাধা দিতে নেই। আচ্ছা, আমি বারণ ক'রে দেব, কিন্তু দেখে নিও, ও শুনবে না।"

ক্রমেই চিরকেলে নিয়মে বুদ্ধি খেলাতে খেলাতে শশী কৈশোরে পৌঁছে গিয়েছে, ইস্কুলেও ফোর্থ ক্লাসে উঠেছে। শশী যে ক্লাসে ঢোকে, তা থেকে নড়তে চায় না। বিধু মাস্টারের খুব প্রিয়, তিনি পড়া দেন, পড়া নেন না। সর্বদা তাকে এ-কাজে ও-কাজে ইস্কুলের বাইরেই থাকতে দেন, কারণ সে ক্লাসে থাকলে অন্য ছেলেগুলির কিছু হবেনা, এই তাঁর ধারণা। অথচ তাকে প্রমোশনও দেন, বলেন, "ও বুদ্ধির জোরে 'মেক আপ' করে নেবে।" তাঁর উদ্দেশ্য, সত্বর তাকে ডগায় ঠেলে দিয়ে ইস্কুলের বার ক'রে দেওয়া, নচেৎ নবাগত ছেলেদের কিছু হবে না। বাড়িতে বাপ তাকে গণিত শেখান, বলেন, "গণিত যার জানা

আছে, তার কাছে আর সব তো জলবৎ,—বুদ্ধি বাড়াতে এমন বিদ্যে আর নেই।" শশীর লেখা পড়াও জলবৎ হয়ে চলল।

ঘোষাল মশাই শশীকে নাবালক রেখেই ইহলোক ত্যাগ ক'রে গেলেন, অবশ্য শশীকে তার বুদ্ধিটুকু যথাসম্ভব দিয়ে, এবং বড় ছেলে জগৎ যে মানুষ হয়নি—এই দুঃখ নিয়ে।

জগৎ সপরিবারে আগরা থেকে এসে পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ ক'রল। শশীর ইচ্ছা ছিল, পঞ্চাশের বেশী খরচ না করা হয়। জগৎ তা পারলে না, আড়াই শো প'ড়ে গেল।

গ্রামের সকলে বললে, "জগৎ করবে বৈকি, তার সময় ভাল, মানসম্ভ্রম বজায় রেখেই করেছে।"

পশুপতিবাবু জ্ঞাতি খুড়ো, তিনি বললেন, "তা করুক না, তবে শশী নাবালক, তার শেয়ার থেকে না গেলেই হ'ল।"

শশী বল পেয়ে বললে, "শর্মা পঁচিশের বেশী এক পয়সা দেবেন না।"

পশুপতিবাবু বললেন, "তা পার তো বলব বাপের বেটা, তিনি বাজে খরচের বিপক্ষে চিরদিনই ছিলেন। একদিন ভাগ বাঁটরা হবেই, তোমাদের এক অন্ন, জগতের রোজগার ব'লে আলাদা কিছু থাকতে পারে না। যা-ইচ্ছা খরচ সে করতে পারে না। অর্ধেকে তোমার পুরো দাবি রয়েছে। আমি ন্যায্য কথাই কব।"

শশী মনে মনে দৃঢ় হয়ে রইল।

আগরায় ফেরবার আগে জগৎ শশীকে বললে, "একটু খেটে কোন প্রকারে ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে ফেল ভাই। তা হ'লেই আমি সাহেবকে ধ'রে তোমাকে একটা কাজে বসিয়ে দিতে পারব।" জগৎ চলে গেল।

শশী একটু মুচকে হেসে মনে মনে বললে, "হুঁঃ, আমি খেটে এণ্ট্রেস পাস করি, আর উনি কর্তামি ক'রে বাহাদুরিটা নিন। এত মুখ্খু শশী নয়। খাটব আমি, পাস করব আমি, আর নাম কিনবেন উনি। যদিও করতুম, এই খতম।"

০ ২ ০

পিতার মৃত্যুর পর, সংসার দেখবার ভার নিলে শশী, আর বড় ভাই জগৎ আগরা থেকে মাসিক পঁচিশ টাকা পাঠাতে লাগল। তখন গ্রামে পঁচিশ টাকায় দু-তিনটি লোকের ভালই নির্বাহ হ'ত।

কিন্তু জ্ঞাতি পশুপতি খুড়ো বললেন, "তুমি যে-রকম বুদ্ধিমান হিসেবী ছেলে, ওই পঁচিশ টাকাতেই ডাল-ভাত খেয়ে কাটাতে পারবে, আমাদের সাধ্য

কিন্তু ছিল না। জগৎও যদি ওই রকম সমঝে চলে, তা হ'লে আর ভাবনা কি, যথেষ্ট টাকা হুড়হুড় ক'রে জ'মে যাবে। আমরা তো জানি, ওসব আপিসে পাওনা-গণ্ডা বেশ আছে। তাছাড়া পশ্চিমে সবই সস্তা-গণ্ডা। সেখানে ক'টাকাই বা সংসার খরচ লাগে। কাশী গিয়ে তা দেখে এসেছি। তবে জগতের ঠিক ঠিক আয়টা তোমার জানা থাকলে তোমার মনটায় বল থাকে। সে আর কি ক'রে জানবে?"

শশী বললে, "আমিও শুভঙ্কর ঘোষালের ছেলে, দেখুন না, এক চালে সব বার করে নিচ্ছি।"

খুড়ো সস্নেহে বললেন, "তোমার উপর ভালবাসা আর বিশ্বাস আছে ব'লেই সব কথা কই,—তুমি পারবে। তবে বাবুরা স্ত্রীটিকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে বাড়ির কথা ভুলে যান। তখন অনাবশ্যক চাকর-দাসী পোলাও কালিয়া ঘি-দুধ-রাবড়ি না হ'লে চলে না। তাই এক-একটি কুপো ব'নে যেতে দেরিও হয় না। দয়া ক'রে দেশে আসেন কেবল মেয়ের বিয়ে দিতে। মনে ক'রো না, সেরেফ জল-হাওয়ার গুণে অমন শরীর হয়। বাংলা দেশে জল-হাওয়ার অভাব নেই, বরং অতিরিক্তই আছে। যাক, খ্যাঁটের আর বিলাসিতার খরচ কি এখান থেকে ধরা যায়? এ তো তোমার বাড়ির গাছের ঝিঙে-ভাতে খেয়ে থাকা নয়। ভরসা কেবল, হিঁন্দুর ছেলের ধর্মজ্ঞান, ছোট ভাইকে কি আর পথে বসাবে?"—

শশী বাধা দিয়ে বললে, "বাবা ব'লে গেছেন, 'খবরদার, বিষয়-কর্মের মধ্যে ধর্মচিন্তা যেন স্পর্শ না করে,—অতবড় মুখ্‌খুমি আর নেই। ওটা স্ত্রী আচার ব'লে জেনে রেখো। গজ হিসেবে যাঁরা টিকি রাখেন, আদালতে ধর্মসাক্ষী ক'রে কিছু বলবার সময় মতলবের আর সুবিধের কথাই তাঁরা কন। ধর্ম স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে, মর্ত্যে কিন্তু ডোবায়। ওটা নির্বোধের জন্য।' আমার জন্যে দাদার ধর্মভাব আসবে ভাবেন?"

খুড়ো হুঁকো রেখে উঠতে উঠতে বললেন, "যাক আমি নিশ্চিন্ত হলুম। ঘোষালদা তোমাকে কিছু বলে যেতে বাকি রাখেন নি দেখছি; ওই সঙ্গে আমারও কর্তব্য কমিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে যে মানুষ হয়েছে, তার আর মার নেই।"

শশী দাদাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে খরচ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিলে। শেষ বললে, "কোন্ ব্যাঙ্কে কত জমা আছে এবং কোন্ কোম্পানিতে কত টাকার জীবন বীমা করা হয়েছে,—আমাদের দুজনেরই সব জেনে রাখা উচিত। কারণ কে কখন আছে বা নেই তার কোন স্থিরতা নেই—বাবা এ কথা সর্বদাই বলতেন।

আরও বিশেষ করে বলতেন, স্ত্রী বুদ্ধিতে চললে পুরুষ পৌরুষ খোয়ায়, অধঃপতিত হয়।"—ইত্যাদি।

* * * * * *

শশীর যে কথা সেই কাজ। সে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করলে। কারণ দরকারী যা কিছু তা শেখা হয়ে গিয়েছে। বাপ তাকে হিসেবে পাকা ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, সুদকষা পর্য্যন্ত। ইংরেজী যা শেখা হয়েছে, তাতে চাকরী আটকায় না; চিঠিপত্র সাহেবেরাই লেখে—বাবুদের কপি করা কাজ।

বিধু মাস্টার সানন্দেই তার সব কথা সমর্থন করলেন। বললেন, "যাদের নষ্ট করবার টাকা আছে তারা চিরদিন পড়ুক না, তা না তো আমাদের চাকরি থাকবে কেন? তোমার সঙ্গে তো সে কথা নয়, তুমি আমাদের নমস্য ঘোষাল মশাইয়ের ছেলে। যা শিখেছ তা গেরস্থর ছেলের জন্য যথেষ্ট। ওর ওপর গেলেই—কবিতা লেখা আর কাগজে জেঠামি করা বাড়ে বই তো না। তোমাকে সে কুপরামর্শ দিয়ে আমি পাপ বাড়াতে পারব না। লেখাপড়া যদি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে হয় আর ঘোষাল মশাইয়ের বুদ্ধির যদি এক কাঁচ্চাও পেয়ে থাক তো কোনও মাড়োয়ারী-বাচ্চাও তোমাকে ঠকাতে পারবে না—এ আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলতে পারি। আর যদি রোজগারের কথা তোল, পশুপতিবাবুর কাছে শুনেছি, জগৎ বেশ দু'টাকা কামাচ্ছে। তোমার চারদিকে চটকলের কুলি আর কন্যাদায়গ্রস্থ কেরাণী, সেই টাকা আনিয়ে মোটা সুদে ছাড়লে একটা হৌসের মুছুদ্দির মোটা রোজগার ঘরে ব'সেই করতে পারবে। হিসেব যখন হাসিল করেছ, তোমার আবার ভাবনা কি, টাকা লাফিয়ে বাড়বে। বুদ্ধির 'টেসট' টাকা রোজগারে।"

বিধু মাস্টার প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন। ইস্কুলটা যেতে বসেছিল, তাঁর দুশ্চিন্তা গেল।

পাঁচজনকে হাতে রাখা চাই। শশী বার-বাড়িতে অপেরার রিহার্সেল বসিয়ে দিলে। নানা পক্ষী এক বৃক্ষে এসে জুটল। গ্রাম সরগরম। শশী বাঁয়া তবলা বাজায়। বন্ধুরা বলে, হাত বড় মিঠে। পথে বেরিয়ে বলে, "কন্দকাটা হ'লেই ভাল ছিল, মাথা-নাড়ার চোটে তিন হাতের ভিতর কারুর ঘেঁষবার জো নেই। আবার ও-চেহারায় পার্ট দিয়ে যে এড়ানো যাবে তার উপায়ও নেই।"

মূলোজোড়ে অভিনয় ক'রে এসে শশীকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। কোনও ওষুধেই তা বাগ মানলে না। শেষ রক্তমাংস সব গুড়িয়ে পেট-জোড়া পিলেতে দাঁড়াল। পেট আর কান দুইটি লোকের নজরে পড়ে।

পশুপতি খুড়ো এসে পরামর্শ দিলেন, আগরায় জগতের কাছে গেলে এক সপ্তাহে সেরে যাবে, আর শশীর যা-যা জানবার আছে তাও সহজে আদায় হয়ে যাবে, কাজ গুছিয়ে আসতে পারবে।

শুনে শশীর আগরা যাবার উৎসাহ বাড়ল। সেই দিনই অবস্থা জানিয়ে জগৎকে পত্র দেওয়া হ'ল। টেলিগ্রাফে টাকা এল। মা, 'ছোট লোকের মেয়ে' সম্বন্ধে অর্থাৎ বড় বধূ সম্বন্ধে বার বার সাবধান ক'রে দিয়ে সাশ্রুনয়নে "এস বাবা" ব'লে শশীকে বিদায় দিলেন।

০ ০ ০

জগৎ স্টেশন থেকে শশীকে নিয়ে বাসায় পৌঁছতেই, বড় বউ ছুটে গিয়ে শশীর চেহারা দেখেই কেঁদে ফেললেন।—"এর আগে আমাদের খবর দাওনি কেন ঠাকুরপো?" স্বামীকে বললেন, "আজই সাহেব ডাক্তারকে এনে দেখানো চাই, সাণ্ডেল মশাইও সঙ্গে থাকবেন।"

শশীর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, পথ্য রীতিমত চলতে লাগল। ব্যবস্থা সবই প্রথম শ্রেণীর। বড় বউ গৃহকর্ম ত্যাগ ক'রে দিনরাত শশীর সেবাতেই রইলেন। রন্ধনাদির জন্য একজন ঠাকুরকে রাখা হ'ল।

ঔষধে পথ্যে আর সর্বোপরি বড় বউয়ের আন্তরিক সেবা-যত্নে শশী দেড় মাসের মধ্যে সেরে উঠল। এখন চলল শুধু পথ্যের পালা। দিনে রাতে ছটা ডিম, এক পাউণ্ড লোফ, পাঁচ পো মাংস, এক আউন্স পোর্ট, দুটো লেবু, একটা বেদানা ইত্যাদি। যেমন যেমন ক্ষুধা বাড়বে, সেই মত পথ্যও বাড়বে।—বড় বউয়ের ইচ্ছা ও আগ্রহ জগৎ ক্ষুন্ন করলে না।

শশীর স্বাস্থ্য ও চেহারার দিন দিন উন্নতি দেখে বড় বউয়ের আনন্দ ধরে না। জগতের মুখে কিন্তু দিন দিন চিন্তার চিহ্ন ধরা পড়তে লাগল। বড় বউ আর থাকতে না পেরে একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন, "সব মিটিয়েও তিন শোর ওপর দেনা, তার ওপর নিত্য বাড়তি খরচ তো দু টাকার কম নয়। ভাবছি, আমার সত্তর টাকায় কোন্ দিক সামলাব?"

বড় বউ বললেন, "ও-কথা মুখে আনতে নেই, ঠাকুরপোকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের। তুমি ভেবোনা, আমার খান-দুই গহনা কালই বেচে চিন্তা মুক্ত হও। শশী ঠাকুরপো লেখাপড়া শিখেছে, হিসেবে সিদ্ধহস্ত, সে শিগ্‌গিরই রোজগারে লাগবে। সংসারের জন্যে তার চিন্তা কম নয়। প্রায়ই আমাকে আয়-ব্যয়ের কথা সব জিজ্ঞাসা করে। বলে, দাদা ব্যাঙ্কে কত রাখতে পেরেছেন, খোঁজ নিও দিকি। বাড়াবাড়ি খরচ সব কমানো চাই।"

"বলে নাকি ?" ব'লে জগৎ একটু হাসলে।

বড় বউ বললেন, "তবে ছোকরা বয়স কিনা, যাত্রা থিয়েটারের বাই একটু আছে। যাক, তুমি ও নিয়ে ভেবো না, যা বললুম তা কালই করা চাই। এই মাসটা বাদে ঠাকুরকে আর রাখব না ; ঠাকুরপোরও সেই মত। আমার নরেশকে ইস্কুলে দিয়ে আসা, আর নিয়ে আসার জন্যে আর লোকের দরকার নেই, তাই ভাণ্টা চাকরটাকে তো জবাব দেওয়াই হয়েছে। একা ছক্কনই সংসারের সব কাজ করতে পারবে।"

জগৎ বললে, "ভাল কথা, ভাণ্টার হিসেব যে চুকিয়ে দেওয়া হয়নি। সে আজ সকালে এসেছিল।"

"ওর জন্যে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবেনা। আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে হিসেব করিয়ে কালই তার পাওনা চুকিয়ে দেব। হিসেবের কাজ ঠাকুরপোর মুখে মুখে।"

"তবে তাই ক'রো, গরিবকে ফেরাফেরি না করা হয়।"

শশী আগরায় পেঁ ৗছে পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করছিল, তার তো কেবল অসুখ সারাতে আসা নয়। সে দেখছিল; সাহেব ডাক্তার, ডাক্তার সান্ন্যাল, পেটেণ্টফুড, ঔষধ পথ্য-ফ্রুট্যুস, ডিম, সূপ ইত্যাদি। আবার ঠাকুর, চাকর, দাসী, ভাইপো নরেশকে বাড়িতে পড়াবার মাস্টার। সবই তো অনাবশ্যক খরচ দেখছি! কই, আমাকে তো বাড়িতে পড়াবার জন্যে কোন দিন মাস্টার দরকার হয়নি, তাতে কি লেখা পড়া আটকেছে, না, কম হয়েছে ? এত বাড়া-বাড়িতে আর টাকা থাকবে কি ? ওই সঙ্গে আমাকেও যে ডোবানো হচ্ছে, এক অন্নের টাকা যে! আমার জন্যে যেটা খরচ করা হচ্ছে সেটা তো ওঁর শেয়ার থেকে যাবে, উনি ওঁর কর্তব্য করছেন। আমি চাই নি, বলতেও যাই নি। সেরে উঠে আমি সব কাজ ফেলে ন্যায্য খরচের লিস্ট বানাব, তা হ'লেই বাড়তিটা বেরিয়ে আসবে। সেই ধরে গোড়া থেকে বোঝাপড়া। হিসেবের কড়ি বাবা বলতেন, বাঘে হজম করতে পারে না। তার ওপর লাটসাহেবের কথা চলেনা। সেরে উঠি আগে।

০ ৪ ০

শশী আর এখন সে শশী নেই, চেহারা ফিরে গিয়েছে। বেলঘরের ফতুয়া দোলাই আর চটি চাকররা পেয়েছে। দাদার পরিচিত দোকানে তার দরাজ অর্ডার চলছে, কামিজ, কোট, চেষ্টারফিল্ড, শু—সবই ফার্ষ্ট ক্লাস। দাদার কর্তব্যে কেউ না খুঁত ধরতে পারে। মনেও বেশ স্ফুর্তি দেখা দিয়েছে। আগরার

বেঙ্গলী থিয়েটার ক্লাবে যায় আসে। পথ্য পূর্ব্ববৎই আছে, কেবল লোকের পরিবর্তে দুধ রুটি চলছে। বড় বউ দুখানা ক'রে বাড়িয়ে সেটা দু'জনের ওপর তুলে দিয়েছেন। আহারের সময় নিজে কাছে ব'সে গল্প করেন আর শশীর স্বাস্থ্যের ও শরীরের উন্নতি দেখে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেন, 'শাশুড়ী দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

আজ শশীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলে তিনি বললেন, "একটা কাজ ক'রে দেবে ভাই? ওঁর সময়ও হয়না আর হিসেবের কাজে বিরক্তও হন, বলেন, সারাদিন ওই ক'রে এসে আর ভাল লাগে না।"

শশী বললে, "কি, বলই না, কাজটা কি? হিসেবের কাজ কি সকলের আসে! বাবা তা বুঝেছিলেন, তাই তাঁর নামটা বজায় থাকবে বলে আমাকে হিসাবে পাকা ক'রে গিয়েছেন। ওটা আমার শখের কাজ, ওই তো খুঁজি। তা না পেয়েই তো ওই আনাড়ি ছোঁড়াদের ক্লাবে গিয়ে বসি। সব একদম, বালি-পাউডার-ছাতু, ওরা আবার প্লে করবে! দু-হপ্তা চেষ্টা করে কেউ জটায়ুর পার্ট করতে পারলে না! দেখিয়ে দিয়ে মুশকিলে পড়েছি, এখন আমাকেই ধরে বসেছে। আমারই ভুল, কথায় কথায় একদিন বলে ফেলি 'তরণীসেন-বধে' তরণীর কাটা মুণ্ড সাজতে হয়। কাটা মুণ্ড যখন 'রাম রাম' বলতে বলতে স্টেজের উপর গড়িয়ে বেড়ায়, অডিয়েন্স স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেই ট্রাজিক ব্যাপার সইতে না পেরে সব উঠে যায়। তাকে বলে প্লে, ভারি কসরতের কাজ। জটায়ু সাজাও সোজা নয় বউদি। শুধু ডানায় আর ঠোঁটে তিরিশ সের বইতে হয়, ইস্পাতের 'সেট্' কিনা—"

"না ঠাকুর পো, ও তিরিশ সের বোঝা বওয়া হবে না ভাই, কত ভাগ্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি! ও আর কেউ করুক।"

"কেউ পারলে তো! আমরা কলকাতা-ঘেঁষা ছেলে, একটা কিছু দেখিয়ে দিয়ে যাব না? ঠোঁট তোয়ের করতে দিয়েছি ইস্পাতের, কেন জান? রাবণকে যখন শূন্য পথে তেড়ে তেড়ে আক্রমণ করব—করতালি বাজাব ওই ঠোঁটেই। তবে না সব তাক মেরে যাবে। নাম করবে না, তবে আর প্লে কি?"

বড় বউ দেখলেন, হিসেবের গয়া হয়ে যায়। বললেন, "তবে তো দেখতেই হবে ভাই।"

"আলবৎ, তুমি দেখবে না! আমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, খাতিরটে দেখো একবার।'

"এখানে কিছুই দেখতে শুনতে পাইনে। ভাগ্যে যদি এমন সুযোগ এল,

এই সময় পোড়ারমুখো ভণ্টার মাইনের হিসেবের জন্য মনে এতটুকু-স্বস্তি নেই। সকাল-বিকেল এসে দাঁড়ালে কি কিছু ভালে লাগে?"

শশী হেসে বললে, "কি বিপদ, ও আবার একটা কাজ নাকি? শশী শর্মা শুনেছে কি হয়ে গেছে। তামাক টানতে টানতে সেরে রাখছি, সকালেই বেটার নাকের ওপর ধরে দিও।"

"আঃ বাঁচালে ঠাকুরপো। ছক্কন তামাক দিক, আমি কাগজ পেন্সিল বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"এই হিসেবের জন্য কাগজ পেন্সিল চাই নাকি। কত পাঁজাকালি, পুকুর-কালি খালি হাতে করলুম, পেন্সিল ছুঁলুম না।—ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব সারলুম, আর এই ইতু পূজোতে ঢাকের ব্যবস্থা। দেখলে বাবার আত্মা যে স্বর্গে ছি-ছি ক'রে উঠবে।"

শুনে বড় বউ অপরাধীর মত এতটুকু হয়ে গেলেন, বললেন, "আমি কি ক'রে জানব ঠাকুরপো, উনি যে ধোপার হিসেবটাও কাগজ-পেন্সিল না নিয়ে করতে পারেন না, দেখেছি কিনা। তাই—"

হাসিমুখে শশী সোজা হ'য়ে বললে, "সে কথা বাবাও জানতেন, তাই না আমাকে তাঁর সব বিদ্যেটুকু দিয়ে নিশ্চিন্তে দেহ ত্যাগ করতে—। 'নিশ্চিন্তে' বলতে পারি না বোধ হয়, বাঁশকালিটে বলতে বলতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ও-বিদ্যেটা তিনি ভিন্ন বাংলায় আর কারও জানা ছিল না। কি করি, তাঁর ছেলে হয়ে পারব না, তাই বুদ্ধির জোরে—। যাক, সে কথা। এখন, আমাকে কেবল ব'লে দাও—ভাণ্টার মাইনে ছিল কত, সে কদিনের পাবে, গর হাজরি প্রভৃতি আছে কি না, বাস্।"

বড় বউ এক টুকরো কাগজে সব টুকে রেখেছিলেন, উঠে গিয়ে এনে শশীর হাতে দিলেন।

শশী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "তোমাদের না লিখে বুঝি কোনও কাজ হয় না!" পরে শিস্ দিতে দিতে, যেন 'শণ্ট' ক'রে বাইরে চ'লে গেল।

বড় বউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

০ ৫ ০

ছক্কন তামাক সেজে-নিয়ে এল। শশী চেয়ারে ঠেস দিয়ে হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, "তাওয়া দিয়েছিস তো হ্যায়?"

ছক্কন "হাঁ হুজুর" ব'লে সটকার নলটি শশীবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাজ করতে গেল।

চক্ষু বুজে সটকায় মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে শশীর মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডল সহসা

আরামের হাসিতে মেঘলা-রাতের জ্যোৎস্নার মত আভা দিলে, "এই এক হিসেবেই বউঠাকরুণকে দাদার বিদ্যেটার বহর বুঝিয়ে দিয়ে যাব।"

আত্মপ্রসাদ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে টানটাও দ্রুত দাঁড়িয়ে গেল। টানের প্রথম ঝোঁকটা মিটিয়ে, "বেটার বেশ মিষ্টি হাত তো—সেজেছে খাসা। টানতে টানতেই কাজটা সেরে রাখা যাক।"

বউঠাকরুণের লেখা কাগজখানা হাতেই ছিল।—"সেকেলে সংসারের মেয়ে, সবিস্তার সব লিখে রেখেছেন;—কি আবশ্যক কি অনাবশ্যক, সে জ্ঞান নেই। প'ড়েই দেখা যাক।"

আজ মাসের ১৯শে, বেস্পতিবার সন্ধ্যে পৌনে ছয়টার সময় ভাণ্টাকে ব'লে দেওয়া হ'ল, কাল থেকে তাকে আর দরকার নেই। এর মধ্যে তার তিন বেলা কামাই আছে। একদিন সওয়া-দশটা বেলায় এসেওছিল। তা হোক, বেচারাকে যখন ছাড়িয়েই দেওয়া হ'ল, সে সব আর ধ'রে কাজ নেই, কতই বা পাবে। পায় ত মাসে স-পাঁচ টাকা আর সাত আনা জলপানি।"

বড় বউ নিজের মন্তব্যসহ ওই সব লিখে রেখেছিলেন। স্বামী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেন না। কিন্তু ভাণ্টার ভাগ্যে হিসেবের ভারটা অভাবনীয়ভাবে পড়ল পাকা লোকের হাতে।

পাঠান্তে শশী নিজে নিজেই বললে, "তা তো বটেই। কামাইগুলো আর ধ'রে কাজ কি। এই ক'রেই দুজনে মিলে আমার সর্ব্বনাশটা ক'রে আসছেন। কতক যাচ্ছে হিসেব জানেন না ব'লে, আন্দাজে রাউণ্ড সম্ দিয়ে সারেন,—বাহবা নেন, অথচ তার আধাআধি যাচ্ছে শশীর মুণ্ডে। তার বেলা তো দয়া নেই, যত দয়া ভাণ্টার গরহাজরির দাম দেবার বেলা। তা আর হতে দিচ্ছেন না শর্ম্মা, তা যতই মেওয়া আর কালিয়া পোলাও খাওয়াও। হিসেবের কড়ি, কড়ায় গণ্ডায় ক'ষে ধ'রে দেব। এবার আর মুখ্খুর হাতে হিসেব পড়ে নি।"

সটকার নলটা তুলে নিয়ে শশী টানের দ্বিতীয়াঙ্ক শুরু করলে, "বাঃ বেটার হাত কি মিষ্টি,—বাঁয়া—তবলা শেখে না কেন। অনায়াসে আতাহুসেন হ'তে পারত। যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে শোয়াই ভাল।"

কাগজখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে "অ্যাঃ, সব মাটি করেছে। মেয়ে-মানুষের কাজ কিনা, আসল কথাটাই যে নেই,—মাস কোথায়?—৩০ কি ৩১ কি ২৮শে মাস, জানা চাই তো। তা থাকলে তো হয়েই গিয়েছিল। যাক্, সকালেই হবে, দু মিনিটের মামলা।"

* * * * *

রোগমুক্তির পর বল বাড়ায় স্ফূর্তিও বাড়ে। শশী চেস্টারফিল্ড চড়িয়ে

মর্নিং ওয়াকে বেরোয়, আধ মাইলের আদেশটাকে তিন মাইলে প্রমোশন দিয়েছে। ভাইপো নরেশও আজ দু-দিন তার সঙ্গ নিয়েছে। "এসেই চা খেতে খেতে পাপ মিটিয়ে দেওয়া যাবে, মাসটা জানা চাই তো।" উভয়ে বেরিয়ে পড়ল। কথা কইতে কইতে তাজমহলে হাজির।

নরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কাদের বাড়ি কাকা?"

"আ মুখ্যু, বাড়ি কিরে? বাড়ির কি চূড়ো থাকে?—মন্দির রে, মন্দির দেখিস নি? এই দিকেই তো হিঁদুর যত দেবতার স্থান। বোধ হয় শাক্যসিংহের বাড়ি, এখান থেকেই নমস্কার কর।" নিজেও করলে।

ফিরে এসে দেখে ভাণ্টা হাজির। বিরক্ত হয়ে বললে, "তোমারা কি রাত পোয়াতে তর সয় নেহি? একটু বইসো। চা খাকে দিচ্ছি। হাঁ, কি মাস মনমে হ্যায়, বলতে পারতা? তা হ'লে দাঁড়াকে দাঁড়াকে সেরে দেতা।"

"ফেরবুয়ারি হুজুর।"

শুনে শশী আপনা আপনি উচ্চারণ করলে "Febuary has 28 days"। নরেশ নিজের বই গুছিয়ে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছিল। শুনতে পেয়ে বালক বললে, "না কাকা twentynine। এ-বছরটা leap year যে।"

"ওঃ, Leap year, আচ্ছা—No fear।"

ছক্কন চা এনে দিলে। তাকে তামাক দিতে বলা হ'ল, "তেইয়া দেকে কালকা মতন সাজানা।" চায়ে চুমুক দিয়ে, "হুঁ, ফিগারগুলো মাথায় গুছিয়ে নিই" ব'লে কাগজখানা বার ক'রে—

(১) উনত্রিশ দিনে মাস।

(২) উনিশ দিনের (পুরো নয়) সন্ধ্যা পৌনে ছটা পর্যন্ত।

(৩) তিন বেলা কামাই (শর্মা সেটা কাটবেনই)।

(৪) একদিন সওয়া—দশটার পরে আসে—(বেটার খুশি নাকি?) —কখন সকাল হয়েছিল সেটা তো জানা চাই, পাঁজি দেখলেই বেরিয়ে আসবে।

(৫) মাস—মাইনে স-পাঁচ, আর সাত আনা জলপানি; একুনে ৫৷৶০ আনা।"

"বাস্, এই তো মামলা। এই তো মুঠোর মধ্যে এনে ফেললুম। বাকি রইল—গুড়ুক টানতে টানতে টপাটপ বসিয়ে দেওয়া।"

গুড়ুকে টান দিয়ে, "দু-একটা ফিগার টোকা দরকার হবে দেখছি। খোঁচ খাঁচ গুলো সাফ করা চাই। না হ'লে খোট্টাকে বোঝান যাবে না,—মুখ্খুর সঙ্গে কারবার। কিন্তু পাঁজিখানা চাই তো, সুর্যোদয়টা দেখতে হবে। হতভাগা

সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় কাজ ছেড়ে মরেছে যে! বেস্পতিবার ভর সন্ধ্যাবেলায় এমন কাজও করে। এঁদেরই বা আক্কেল কি? হিসেব জানলে আর—"

ভাণ্টার প্রতি "দেখ্ ভাণ্টু, আমি খারা মনুষ্য হ্যায়, কাজমে গোঁজাকা মিল পাবে না। তোমারা একটি কানাকড়ি তঞ্চক হতে দেঙ্গা নেহি। কিন্তু একটু বিলম্ব হোঙ্গা। পঞ্জিকাটা দেখতে হোগা কিনা। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করকে রাখেঙ্গা,—তুমি বৈকালমে আও।"

ভাণ্টা বাঙালীদের সংসারে কাজ ক'রে বাংলা বলাটা বেশ সড়গড় ক'রে ফেলেছিল। বললে, "আপনি ভাবতা কেনো বাবু, হামি খোকাবাবুকে দেখতে আসে, ঘড়ি ঘড়ি ইচ্ছা হোয় কিনা। আপনি হিসাব দিবে, আমি তাহাই নিবে।"

"এই তো ভাল মানুষকা বাক্য। আচ্ছা, এখন বাড়িকা মধ্যসে পঞ্জিকা আনকে দিয়ে যাও।"

ভাণ্টা পাঁজি এনে দিয়ে চ'লে গেল।

"এইবার ক ঘণ্টা ক মিনিট বার ক'রে নিয়ে শ্রাদ্ধটা সেরে রাখি।—উদয় দেখছি ছয়টা তিপ্পান্ন মিনিট। আর যাবে কোথায়?

"নাঃ, খোট্টার দেশ,—শুভঙ্কর চলবে না,—কাগজ চাই। তা না তো ওদের মাথায় ঢুকবে কেন। ছেলেটা দেখছি খাতা নিয়ে স'রে গেল। আচ্ছা, দেয়ালে অ্যাল্‌ম্যানাক আর কিসের জন্যে ঝোলে? কাজে লাগুক।" টেনে নিয়ে তার উলটো পিঠে হিসেব শুরু ক'রে দিলে।

"দুত্তোর ইংরাজী শিখে কি মুখ্‌খুমিই করা হয়েছে। একেই বলে—দুকূল খোয়ান, ওরা কি আমাদের ভাল করতে এসেছে? এমন এক আট এনে ছেড়ে দিয়েছে যা আমাদের চিরকেলে চার। কখনও সেটা চার হয়েও যাচ্ছে কখনও আট। লেখবার সময়ও যে তা না হয়েছে, তা এখন কে বলবে? মাথা ঘুলিয়ে দিলে। দূর কর, এখন থাক্ স্নানাহার ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে হবে। কাগজও চাই—

"ইস, আজ যে আবার বাঘা—রিহার্সেল রয়েছে। এই সময় যত আপদ জুটল। একটা ব্রেন, ক দিক সামলাবে? নাঃ, আজ ভাণ্টা—টাণ্টা নয়—" শশী স্নানাহার ক'রে গুড়ক টানতে টানতে শয্যা নিলে। "ও হবেই 'খন—বসলেই উড়িয়ে দেব।"

বেলা চারটেয় ঘুম ভাঙল।

"যাক, অনামুখো বেটা আসে নি—বাঁচা গেছে আজ হাঁড়িকাবাব রাঁধতে বলেছি। সাড়ে আটটার মধ্যে লুচি—সংযোগে ভোগ লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ব,

আজ ঝাটাপটি রিহার্সেল। এক চক্কোর যমুনার হাওয়া লাগিয়ে এলেই বেশ 'জাষ্টিস' করা যাবে। ইকোয়েল শেয়ারার, অর্ধেক ওড়ানো চাই। ওই যমুনার হাওয়া লাগিয়েই তো কেষ্ট হাঁড়ি-হাঁড়ি ননী সামলাত।"

বাইরে পা বাড়াতেই বারান্দায় ভাণ্টাকে দেখে প্রাণ বিগড়ে গেল।—এখানে কলেরায় এত লোক মরছে, আর এ বেটা—! "কিরে ভাণ্টা, আসা হায় কেত্তা 'খন? এই তোমার কথা ভাবতা থা—গরিব লোকের এক পয়সা না যায়। কিন্তু যো দিনমে কোই গরু জরু নেই দোড় দেতা, আর তুমি কি বোলকে নোকরি, যা গরু-জরুকা বাবা বললেই হয়, সেটা ছোড় দিলে? হিঁদুকা বাচ্চা একটু শাস্ত্রজ্ঞান তো থাকা উচিত থা—"

"হামি কি করবে বড়বাবু ছোড়িয়ে দিলে—"

"হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা আমি ইসকা বিহিত করবে। সেই জন্যেই তো ইতস্ততঃ করকে বিলম্ব করতা হায়।"

"দোকানদার তাগাদা ছোড়ছে না; তাই দিক করতে হোতা বাবুজী। আচ্ছা আমি কাল আসবে।"

* * * * *

চঞ্চুবাদ্য রিহার্সেলে সকলকে তাক লাগিয়ে এসে শশী শুয়ে পড়ল। স্ফুর্তি ফুট কাটতে লাগল, "জটায়ুর যদি একখানা গান থাকে—of course 'কানাড়া' তা হ'লে সবাইকে 'বড়ালের নাম ভুলিয়ে দিই। পাখিতে যখন কথা কয়, জটায়ু গাইবে না কেন??" নাসিকাধ্বনি।

ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটায়। "ইস কখন কি করব! বিদ্যের চেয়ে বিপদ আর নেই। অঙ্কটা ভাল জানি ব'লে আমার ঘাড়েই জুলুম! কই, এত মিয়া রয়েছেন তো—"

"পায় লাগি বাবুজী।"—কানে আসায় শশীর সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল। হারামজাদার কি আর কোনও কাজ নেই। প্রকাশ্যে "বইসো ভাণ্টু, বহুৎ কথা হায়। তোর কে কে হায় বল দিকি? জরু, কাচ্চাকে-বাচ্চা, তারা সব কেমন হায়?"

ভাণ্টা আজ সাতদিন ঘুরছে, সে আজ যা-হয় একটা কিছু না ক'রে উঠবে না, এই ভেবেই এসেছিল। কিন্তু শশী স্নেহ-সুরে কুশল জিজ্ঞাসা করায় গরিব জল হয়ে গেল। কাতর কণ্ঠে বললে, "কিষনজী সব সাফাই কোরকে দিছে বাবু। দোঠো বিটিয়া ছোড়কে, জরুকো লিছে।" সে কেঁদে ফেললে। আহা-হা "দুঃখ করিস নি ভাণ্টা, কিষনজীর কামই ওইরূপ হায়। সুচিন্তে

আর কি হোগা বাবা। মেয়েদের সাদির সময় যেন খবর পাই, ভুলিস নি ভাণ্টা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—"আচ্ছা, বারাণ্ডামে মাজদুরখানা পাতকে, ওই কাগজ পত্তোরগুলো রাখ্। আমি মুখ হাত ধোকে আসতা হায়, আজ তোর হিসেব সারকে তবে অন্য কাজ। দেখতা তো কাগজকা ডাঁই ,।

কাগজ, নরেশের খাতা অ্যালম্যানাক—অঙ্ক কষার দাপটে সত্যই একটু মোটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যের অন্তরালে শশীর চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু মাথায় পুঙ্খানুপুঙ্খের সদিচ্ছা ঢোকায় সামলাতে পারছিল না। অতিষ্ট হয়ে উঠছিল।

শশী 'আতা হায়' বলে বাড়ির মধ্যে যেতে যেতে "হারামজাদা আমাকে আবার রোগে না ফেলে ছাড়বে না।

কথাগুলি অনুচ্চে উচ্চারিত হ'লেও বড় বউ শুনতে পেয়ে —"কি গো ঠাকুরপো, কার রোগের কথা বলছ? রোগের কথা শুনলে প্রাণ চমকে ওঠে।"

"চমকে তো ওঠে, কিন্তু সেই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে দেখছি। হিসেব তো নয়,—কন্টিকারির ঝাড়।"

"সে বুঝি এখনও—?" ব'লেই বড় বউ থেমে গেলেন।

"ক'রে দিন না বড়বাবু।"

"হাঁ, তাঁর মুরোদ ভারি। পারলে তো।" ব'লে বড় বউ নিজের ভুলটা সামলালেন। "না না, অত কষ্ট ক'রে আবার অসুখে পড়তে হবে নাকি? ওকে গোটা পাঁচেক টাকা ফেলে দাও ভাই, পাপ মিটুক। মায়ের কৃপায় কত ক'রে তোমাকে—"

শুনে শশী খুশি হ'লো বটে, কিন্তু বললে, "তোমার ওই বড়মানুষিটা ছাড় দিকি। ওতে যে গরিবকে ডোবানো হচ্ছে। ও বেটার যা নায্য পাওনা, তার এক পয়সা বেশি দেওয়া হতে পারে না। ওদের মাইনে দস্তুর মত সর্বত্রই—'এফ-ও-আর-ই' (Fore), চার টাকা, তা নেপালেই কি আর ভূপালেই কি, তা জান? যাক, ওসব আর চলবে না।"

"সে তো ভাল, তা হ'লে যে বাঁচি। ওই যে কি বললে, 'এফ-ও-আর-ই,' তাই কর তো ভাই। ইস, ডিমগুলো চড়িয়ে এসেছি যে।" বলতে বলতে তিনি দ্রুত চলে গেলেন।

শশী হাতমুখ ধুয়ে—"কই, হালুয়া কই?"

"এই যে ভাই।" ব'লেই বড় বউ দুটো ডিমসিদ্ধ আর এক প্লেট হালুয় হাজির ক'রে দিলেন। চা-টা খেয়েই যাও ভাই।"

"দাও, ব্রেনটা বাগিয়ে নেওয়াই ভাল। আজ ফিনিশিং টাচ্ দিতে হবে। ফ্রাক্‌শনগুলো রিডক্‌শন করলেই খতম।"

দাদার কর্তব্য শশী কোন দিনই ক্ষুণ্ণ করছিল না।—ডিম, হালুয়া, কোনটাতেই ভুল হতে দিচ্ছিল না।

ভাণ্টা সেই হিসাবের তাড়া বারান্দায় সাজিয়ে হতাশ হয়ে ব'সে ছিল।

শশী উপস্থিত হয়ে বললে, "কি রে ভাণ্টা, কি দেখতা হায়? এই ইসকোই বলে হিসেব। এ যা কর দেতা হায়, মোক্ষোম। যা, তামাক সাজকে আন্ দিকি।"

ভাণ্টা তামাক সাজতে গেল, শশী চুল ফিরুতে ঘরে ঢুকল।

একটা গরু চ'রে বেড়াচ্ছিল। ফাঁক পেয়ে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে চর্বণে মন দিলে।

ভাণ্টার চীৎকার শুনে, সিল্কের চাদরখানায় মুখ মুছতে মুছতে শশী বাইরে এসে, গরুটার অভদ্রতা দেখে, চাদরখানা চট ক'রে তার গলায় দু-পাক জড়িয়ে, "আর যাবে কোথায়? ভাণ্টা, থানামে দিয়ে আয় তো। আমি ছাড়বার পাত্তর নই।"

ভাণ্টাকে দেখে আর তার চীৎকারে গরুটা চার-পা তুলে ছুটল। শশী গেল প'ড়ে, চাদর রইল গরুর গলায়। ভাণ্টা ছুটল তাকে ধরতে।

"শখের ফরমাশী জিনিস, সাত টাকার চাদরখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে না আনে। ইস্, হিসেবের খানিক খানিক যে খাবলে নিয়েছে দেখছি। মাথা খেলে, কি অভদ্রাই পড়েছে! হবে না, বেহস্পতিবারের ব্যাপার।—

"বারোটা বাজল, ভাণ্টা যে ফেরে না! যাক, বেটাকে যতক্ষণই না দেখি, ততক্ষণই ভাল। কিন্তু চাদরখানা যে—"

ভাণ্টা হিসাব সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই অনেক কষ্টে চাদরখানি গরুর গলা থেকে উদ্ধার ক'রে, ঘরে রেখে, বৈকালে মুখ শুকিয়ে, মাথায় পটি বেঁধে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির।

"কি রে, কি হুয়া?"

সে অতি কষ্টে বুঝিয়ে দিলে, গরুর পিছে দেড় কোশ দৌড়েছে, তিন বার গিরেছে, মাথায় চোট খেয়েছে, তবুও কুছু করতে পারে নি। গরু রেলপার গায়েব হয়ে গিয়া। সে নড়তে পারছে না, সর্বশরীরমে বড়া দরদ।—"কুছু দাওয়াই দেন হুজুর।"

তার অবস্থা দেখে শশীর আর কথা সরলো না। তার হাতে একটা সিকি দিয়ে বললে, "সর্বাঙ্গকা দরদ মারনা চাই। ভাঙের চেয়ে দাওয়াই নেই। কিন্তু, আচ্ছা করকে বানানো চাই। সব মসলা জানতা তো? তার পরে বেশ করকে পিষণ, পিছে ঘুণ্টন।"

"উসব হামি খুব জানছে বাবু। মথুরাজীমে হামার ঘর আছে।"

"তবে আর কেয়া, আজই আচ্ছা হয়ে যাবি।"

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

শশীর মনে কিন্তু সারা দিন সুখ নেই। এই অবস্থায় ভাইপো নরেশ ইস্কুল থেকে এসে হাসতে হাসতে বললে, "আজ কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যেতে হবে কাকা।"

"আমি আজ বেরুব না, কাজ আছে।"

"হিসেব হয় নি বুঝি?" কথাটা নরেশ সহজভাবেই কয়েছিল। শশীর মাথায় তা আগুন ছড়িয়ে দিলে। সে সরোষে বললে, "ছেলেমানুষ ছেলে-মানুষের মত থাক্, ফের যেন—"

বালক ধীরে ধীরে বিমর্ষ মুখে চ'লে গেল।

শশীর মগজে তখন নানা সন্দেহ ফুট কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সে ভাইপোর ওই কথার মধ্যে বিদ্রূপ আবিষ্কার করলে, "এ তো ওই বাচ্চার কথা নয়, নিশ্চয় বাড়িতে ধাড়ীদের মধ্যে এ নিয়ে কথা হয়। তা হোক, আমি কিন্তু তা ব'লে নিজের শেয়ারের কড়ি দাতব্য করছি না, হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ না ক'রে ছাড়ছি না। বাবা বলতেন, 'নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে অন্যের কথা কানে নিয়েছ কি ঠকেছ।"

এই ব'লে হিসেবের তাড়াটা টেনে নিয়ে ছড়িয়ে ফেললে। প্রত্যেক ছোট-বড় কাগজে চোখ বুলিয়ে, "তাই তো, পেজ-মার্ক দেওয়া হয় নি, কলম চললে তো আর জ্ঞান থাকে না! কোথা থেকে আরম্ভ, খুঁটটা একবার খুঁজে পেলে যে হয়।" খুঁট মিলল না, সব একাকার হয়ে ব'সে আছে। শশীর মাথাটা বোঁ ক'রে উঠল।

চাকরদের ঘরে ভাণ্টা ভাং ঘুণ্টনে ঘর্মাক্ত। সিদ্ধি না খেলে বুদ্ধি খুলবে না, এক ঢোঁক চড়িয়ে দেখি।—"কি রে ভাণ্টা, কেত্তা দূর! বাঃ বেশ খুসবু ছেড়েছে! একটু দে দিকি, চাক্কন করি, ভক্ষণ পরমে হোগা।"

ভাণ্টা মনের মত এক বাটি দিলে।

"জয় ত্র্যম্বকজী! বাঃ, তুই এমন সুন্দর বানাতা, এত্তা দিন বলিস নি?"

পাঁচ মিনিটেই শশীর বুদ্ধি খুলতে আরম্ভ হয়ে গেল।—"ব্যস্, মেরে দিয়েছি,

'শ্রীশ্রীহরি সহায়' না লিখে শমা কোন দিন এক অক্ষরও ফাঁদেন না। যেখানে শ্রীহরি, সেখানেই তো আরম্ভ! এই তো শ্রীহরি রয়েছেন...কিন্তু মাঝমধ্যিখানে শ্রীহরি এলেন কি ক'রে?"

শশীর ভাবের উদয় হয়ে পড়ল। খাতার পৃষ্ঠা, আল্‌ম্যানাকের পৃষ্ঠা, মায় ম্যাপের পৃষ্ঠা সর্বত্রই শ্রীহরির বিকাশ। শশী সুর ধরলে—

"হরি যে তুমি কিনা পার।
তুমি ডগায় ছিলে, মধ্যে এলে,
কোনও বেটার ধার না ধার।
এই যে, তলা ঘেঁষেও উঁকি মার।"

'ক্যাবাৎ।'—শশী হেসেই খুন।

তার পরের ওলটপালট অবস্থাটা শশী নিজেই উপভোগ করতে পাবে নি, করেছিলেন অন্য অনেকে। দাদা, বউঠাকরুণ, নরেশ—সকলেই; পাড়ার প্রবীণ উমেশবাবু পর্য্যন্ত। জগতের সেইটাই হয়েছিল সবার বড় লজ্জার কারণ।

শশীর মাথায় ঘড়া-ঘড়া জল ঢালা দেখে, বউঠাকরুণ ভয়ে ভাবনায় আড়ষ্ট। ডাক্তার ডাকবার জন্যে ব্যাকুলভাবে স্বামীকে কেবলই কাতর অনুরোধ করছিলেন।

জগতের মাথা তখন বিরক্তিতে, লজ্জায়, রোষে ভর্তি।—কর্কশ রকমের একটা ধমক খেয়ে স্ত্রী চমকে কেঁপে উঠলেন, যে হেতু এটা তাঁর অভ্যস্ত পাওনা ছিল না।

"ও-বয়সে বেকার ব'সে থাকলে অবান্তর পাঁচটা নিয়ে দিন কাটাতে হয়, নেশাটা তারই একটা। ভয় নেই, ওদের ওসব অভ্যস্ত বিদ্যে।" বলতে বলতে উমেশবাবু চ'লে গেলেন। জগতের যেন মাথা কাটা গেল।

০ ৬ ০

উপভোগ্য সংবাদগুলি প্রচার হতে বিলম্ব হয় না। সকালে অনেকেই এসে সংবাদ নিয়ে গেলেন। প্রবাসের সুখই এই। কয়েক ঘর মাত্র থাকায়, প্রীতির বন্ধনে একটু আঁট থাকাটা স্বাভাবিক। শশী কিন্তু থিয়েটার-পার্টির কমরেডদের চিন্তাকুল দৃষ্টির ও প্রশ্নের ভাষা ও ভাবের মধ্যে বিদ্রূপের লুকো-চুরিই পাচ্ছিল।

বাড়ির সকলেই বেশ চুপচাপ—যেন কিছু হয় নি। কথাবার্তাও বেশ সংযত। সেইটাই কিন্তু শশীর কাছে কদর্যপূর্ণ ঠেকছিল। নরেশ ইস্কুল থেকে

ফিরে, বার-বাড়িটা গম্ভীর মুখে পার হয়ে, ভিতর-বাড়িতে নাকি হাসিমুখে ঢুকেছিল; সেটা শশীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তার রগ দুটো দপ-দপ ক'রে উঠল। "হুঁ—এই কালে এই বিষ। আচ্ছা, আজ আর নিদ্রা নয়, হিসেব শেষ ক'রে তারপর যা মনে আছে—। না খাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, অপরের তো খাচ্ছি না, নিজের শেয়ার রয়েছে।"—শশী নীরবে মাথা গুঁজে আহার শেষ করলে। বড় বৌ একটি কথাও উচ্চারণ করতে সাহস পেলেন না। নিয়ম মত দুধের বাটি পাতের কাছে ধ'রে দিতেই—"ও আর কেন" ব'লে শশী উঠে পড়ল। তিন কদমেই বার-বাড়ি।

বড় বউ ভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন, শশীর মেজাজ জানতেন। যা বলবেন, শশী আজ সেটা কি ভাবে নেবে—এই তাঁর ভয়। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুরপো দুধ খেলে না, এইটাই তাঁকে কেবল আঘাত করতে লাগল। ভাবলেন, দুধের বাটি নিয়ে নিজে বার-বাড়িতে যান। এই সময় জগৎ এসে পড়ল। সব শুনে জগৎ মানা করলে, "বোধ হয় তার পেট ভাল নয়, কাল খাইও।"

তাঁর মন কিছু বুঝল না, নিজেও কিছু খেলেন না।

এই সময় নরেশ এসে বাপকে বললে, "আমার খাতা কাগজ পেন্সিল—সব গিয়েছে বাবা, আর কিচ্ছু নেই।"

"বেশ হয়েছে। যা, শুগে যা বলছি।" ব'লে তার মা এমন এক ধমক দিলেন, সে কেঁপে উঠল।

·

ছক্কন বাইরে এক ডিবে পান আর তামাক দিয়ে গেল।

শশী আজ অঙ্কের একোদ্দিষ্ট করবেই, উপকরণ সংগ্রহ ক'রে বসেছে। মাসাধিকের পরিশ্রম গরুর গর্ভে গিয়েছে, মায় দক্ষিণা—সিল্কের চাদর। "যাক, ফ্রেশ ফাঁদলে আর কতক্ষণ? একটা সাংঘাতিক ভুল ধরা পড়ে নি, তাই পাওনাটা কখনও এগারো টাকা, কখনও চৌদ্দ, কখনও সতেরো দাঁড়াচ্ছিল। ওঃ, সাত আনা জলপানিটে যে তিরিশ দিনে পায়, অথচ ফেব্রুয়ারি যে উনত্রিশ দিনে! তাই তো বলি, এত হয় কি ক'রে। উঃ, ভারি ধরা পড়েছে।"

শশী নতুন ক'রে ফাঁদলে বটে, কিন্তু সামনে সেই স্বখাত সলিল, প্রতি পদক্ষেপে সেই 'সওয়া' 'পৌনে' 'সাড়ে'র খোঁচা আর সূর্যোদয়ের দণ্ড পল পাশ ফিরতে দেয় না। হাত বাড়ালেই যেন রুষ্ট সজারুর গায়ে হাত পড়ে। তাকে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ করতেই হবে—'শেয়ার বাঁচাতে হবে'। এ যে ঝাঁশকালির

চেয়ে গেঁটে। বেণী মাস্টার কি একটা সাফাই-সঙ্কেত ব'লে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে না। শশী চক্ষু বুজে সেটা স্মরণ করতে বসল। একাগ্রতায় কি না হয়। ভাঙের মিঠে প্রভাব সাহায্য করলে, শশীকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

সে স্বপ্ন দেখলে, বেণী মাস্টার বলছেন, 'আ মূর্খ, শুভঙ্করের ছেলে হয়ে বাপের নাম ডুবুচ্ছিস! এত বুদ্ধি ধরিস, আর এটা ধরতে পারলি নি, ওটা অঙ্ক নয়? ওটা তোকে তাড়াবার ভদ্র ফন্দি। আর থাকতে আছে, চ'লে আয়। পশুপতি রয়েছে, আমরা রয়েছি, তোর ভাবনাটা কি?'

শশীর প্রাণে যা খেলছিল, এটা ছিল তারই ছায়াচিত্র।

সে যেন অকূলে কূল পেলে। মুখে হাসি দেখা দিলে। "উঃ কি দুরভিসন্ধি! ওটা অঙ্কই নয়, তা না তো সাঁইত্রিশ পাতা ক'ষেও শশী শর্মা কূল পায় না। যা ভেবেছিলুম আর স্বপ্নে যা শুনলুম, একদম ঘাটে ঘাটে মিল! ওটা অঙ্কই নয়! মা ব'লে থাকেন, মন নারায়ণ, very true, কিন্তু কি দুরভিসন্ধি! আসল মতলবটা ছিল শুধু তাড়ানো নয়, আমার মাথাটা বিগড়ে দিয়ে বিষয়-সম্পত্তির একেশ্বর হওয়া। এই হওয়াচ্ছি। তাই তো, কাগজ নেই যে!" নরেশের ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে ছিল, "ও আর কেন, ওই বাপ-মার ছেলে, জুচ্চুরি শিখবে তো!" শশী ভারতসমুদ্র মন্থন আরম্ভ করে দিলে। বেশ পরিষ্কার তিন ভাগ জল পেয়ে, তাকে তোলপাড় ক'রে খসখস কলম চালালে।

লেখাটা টেবিলের উপর দোয়াত-চাপা—চিত হয়ে রইল।

শশী প্রত্যহ মর্নিং-ওয়াকে যায়। বড় বউ চায়ের জল চড়িয়ে বাসি-পাট সারেন। শশী তার নিজের বাঁধা ফেভারিট সং—

> "আমার বুকে আঁকা রামের নাম,
> Uncle, nephew, father, mother,
> Sister, brother,—সবই রাম।—"

গাইতে গাইতে ফেরে, এবং তা কানে এলেই বড় বউ চা ছাড়েন। শুনতে না পাবার কোনও কারণই নেই। একে তো তাঁর কান সেই প্রতীক্ষায় থাকে, তার ওপর শশী 'সিস্টার' কথাটির উপর এমন একটি টনক-নড়া ও চমক-ভাঙা দমক দেয়, যা বধিরেরও শ্রবণ-সুলভ।

আজ রোদ উঠল, এখনও ঠাকুরপোর সাড়া নেই। বড় বউ একটু চঞ্চল হলেন। "কাল দুধ খায় নি, শরীর ভাল আছে তো? ছক্কন, দেখ্ তো, ছোটবাবু বেড়িয়ে ফিরেছেন কি না।"

ঠাকুরপো দুধ না খাওয়ায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। উঠান থেকেই একটু

চড়া গলায় বললেন, "তিনপোর বেলা হ'ল, এখনও কারুর ওঠবার নাম নেই। দেখাদেখি ছেলেটাও গোল্লায় গেল। লেখাপড়া হবে, না, ছাই হবে।"

নরেশ চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাড়াতাড়ি উঠে এসেই ধমক খেলে—"এর ওপর আর এক চোখ দেখাতে হবে না, দু চোখ বোজ্।—দুগ্‌গা দুগ্‌গা।" বালক হকচকিয়ে দালানের ক্লকটার দিকে চেয়ে সভয়ে বললে, "তুমি দেখ না মা, এখনও ছটা বাজতে তিন মিনিট—"

"ও-ঘড়ি আর দেখতে হবে না। এসে পর্যন্ত এক ফোঁটা তেল পেয়েছে কিনা। মাথার ওপর দিনরাত কেবল টিকটিক করতে আছে। যা, তোর কাকা বেড়িয়ে ফিরেছেন কি না দেখে আয়।"

কথাগুলো রুষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ায় জগৎবাবুও আধ ঘণ্টা আগেই উঠে পড়লেন।—"কি, আজ ব্যাপার কি? শেষরাত্রে উঠে হৈ-চৈ লাগিয়ে মানুষের ঘুম-ভাঙ্গাবার এত ধুম প'ড়ে গেছে কেন? ঘড়িটার দিকে দেখলেই তো হয়, কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা—"

"ছেলে একবার দেখিয়ে গেল, তুমিও দেখাচ্ছ। ওটা আর ঘড়ি আছে নাকি?"

"তবে ওটা কি?"

"এ দেশে টিকটিকি ডাকে না ব'লে বোধ হয় রাখা হয়েছে। পরের মেয়ের মত দিন রাত খেটে চলেছে, খেলে কি না খোঁজ নেবার দরকার আছে ব'লেও কেউ ভাবে না। সাত বছর হ'ল এসেছে, কোনও দিন 'অয়েল' করাতে তো দেখলুম না। নিজেদের তো পায়ে পেটে মাথায়, তিন রকম তেল লাগে—"

জগৎ একটু হাসি টেনে বললে, "তাই বুঝি নিজের জন্যে আর এক রকম বাড়াবার চেষ্টায় আছ, মধ্যম-নারায়ণটা বাকি থাকে কেন?"

নরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, "সব চুরি হয়ে গেছে মা, কাকার স্যুটকেস, বাঁশী, করতালি, সব—"

"তোর কাকা কোথায় বল্ না রে পাজি?"

বালক থতমত খেয়ে বললে, "বোধ হয় চোর ধরতে—"

মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, "দেখবি?"

সে বাপের পেছনে পেছনে বাইরে পালাল।

বড় বউয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। তিনি দালানেই ব'সে পড়লেন। চড়ানো চায়ের জল ফুটে ফুটে শেষ হয়ে গেল।

"ঘুম ভেঙেই গাধার ডাক শুনলুম। সাত সকালে—মাগী কাপড় এনে ম'লো। হতভাগা ছেলে উঠেই এক চোখ দেখালে। রাতে ঠাকুরপো দুধ

খেলে না, বললে—'ও আর কেন?' আবার চুরির কথা শুনছি। ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, একটুতে অভিমান করে। এখানে আমি ছাড়া তার অভিমান সইবার আর কে আছে? ওঁরা ছেলেদের মন কতটুকু বোঝেন! ওঁর কথা শুনেই তো কাল রাতে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা পেতে পারলুম না। ভালয় ভালয় দিন কাটিয়ে দাও ঠাকুর, আমার বড় ভয় হচ্ছে—"

হঠাৎ উঠে কয়েকটি পয়সা তুলসীতলায় রেখে, হাত জোড় ক'রে কত কি জানিয়ে প্রণাম ক'রে এলেন।

"তাই তো, বাইরে এতক্ষণ এরা করছে কি? সাড়ে সাতটা যে হ'ল! সুটকেস নিয়ে কে আবার মর্নিং-ওয়াকে যায়! তার জিনিসই কি চুরি যাবে?" বুকটা তাঁর শিউরে উঠল—"শ্বাশুড়ীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব? ঠাকুর, লজ্জা রাখ। কেন মরতে ভাঙা দিনে ভাণ্টাকে ছাড়ানো হয়েছিল, মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছিল, কোন গোল ছিল না—"

এই ভাবের এলোমেলো দুর্ভাবনা তাঁকে অত্যন্ত কাতর আর ভীত ক'রে তুলতে লাগল।

ক্ষণপূর্বে জগৎ স্ত্রীর সঙ্গে রহস্যই করছিল। সে ভাবছিল, শশী তো কারুর চাকরি করে না, সময় সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনা কিসের? দেশে কেরানী না থাকলে কটা ঘড়িই বা বিক্রি হ'ত! বেড়িয়ে ফিরতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে, বড় বউয়ের এতটা চাঞ্চল্য যে কেন—সেটা তার মাথায় আসছিল না। সে চাকরি করে, মাইনে এনে দেয়। সংসার চ'লে গেলেই হ'ল, কেউ না কিছু বললেই হ'ল।

সুটকেস নেই শুনে জগৎ ভাণ্টার খোঁজ করবার তরেই বাইরে যায়। ভেবেছিল, ভাণ্টা বোধ হয় আজও মাইনে পায় নি, এ সেই বেটারই কাজ।

কি কি গিয়েছে দেখতে গিয়ে যখন দেখ্‌লে, গড়গড়ার শৌখিন নলটি নেই, তখন ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। স্বগতোক্তি বেরুল,—"তাই তো গিয়েছেই তো—গিয়েছেই তো বটে! বলা নেই কওয়া নেই,—কারণ কি?" তাঁর ক্ষুদ্ধ প্রাণের পরিচয় মুখময় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।—"সে গেল কেন, কোথায় গেল? বড় বউ? উঁহু, সে তো কিছু বলবার মানুষ নয়।"

সহসা নরেশ নাকী সুরে ব'লে উঠল, "এই দেখ বাবা, কাকা আমার গ্রামারের খাতা ছিঁড়ে কি করেছেন দেখ। ও-পিঠে অর্থডক্স-ফক্স ছিল—সব গিয়েছে। আর এই ভারতবর্ষের মানচিত্রে—ভারতসমুদ্র একেবারে মাটি হয়ে গেছে বাবা।" বলতে বলতে বালক কেঁদে ফেললে।

মহাসমুদ্রের মাঝখানে বড় বড় হরপে নিজের নাম দেখতে পেয়ে, জগৎ

ম্যাপখানি হাতে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন।—"এ সব কি ? সেদিন নেশার ঝোঁকে লিখেছিল বোধ হয়। না, কালকের তারিখ যে! মাথা খারাপ হ'ল নাকি ? তাই তো—"

বিষম দুর্ভাবনাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ছুটলেন।

আজ ছুটির দিন। ইকনমিক ফার্মেসির লোক ওষুধের বিল নিয়ে তাগাদায় এসেছিল। বাবুর বাড়ি চুরি হয়ে গেছে শুনে, ধীরে ধীরে ফিরে গেল।

বড় বউ একভাবেই সেই দালানে ব'সে অপরাধীর মত ঠাকুর-দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিলেন।

জগৎ এসে ম্যাপখানি এগিয়ে ধরে—"এই দেখ, তোমার ঠাকুরপো নেশার ঝোঁকে কি কাণ্ড ক'রে বসেছে! এখন কি করা উচিত ?"

শুনেই বড় বউয়ের চেহারা মুহূর্তে ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য। তিনি ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন—মুখে কথা সরলো না। কষ্টে ক্ষীণস্বরে কেবল বললেন, "লেখা নাকি? কি লিখেছে ?"

"লিখেছে আমার মাথা। শশী আমাকে লিখছে—"

"জগৎবাবু,—পুরুষ বাচ্চায় স্পষ্ট কথা কয়। তাড়াবার মতলবে শাস্ত্রছাড়া হিসেব মেটাতে দেয় না। দুরভিসন্ধিটা আগে বুঝতে পারি নি। বেশ, চললুম। বোঝাবুঝি হবে কাটগড়ায়। নিজের হিসেব ঠিক রেখো।

শ্রীশশীভূষণ ঘোষাল"

বড় বউ ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু তো বুঝতে পারলুম না!"

"সিদ্ধি খেলেই বুঝতে পারবে।"

"না না, ছেলেমানুষে একটুতে অভিমান ক'রে অমন কত ভুল করে। তুমি শিগ্‌গির খোঁজ নাও, কাল থেকে তার খাওয়া হয় নি।"

বাইরে একটা গোলমাল হওয়ায়—"দেখ দেখ, সে এসে থাকবে। হরি, লজ্জা রাখ।"

জগৎ বাইরে গিয়ে দেখে, থিয়েটার-পার্টির কম্‌রেডরা শশীর খবর নিতে এসেছে।

বিক্ষিপ্তচিত্ত জগৎ তাদের বললেন, "শশী বোধ হয় কোথায় চলে গিয়েছে, তোমরা একটু দেখ তো ভাই—কোথায় সে গেল। আমি স্টেশনে খোঁজটা নিই।"

একটু মজা উপভোগ করা ছাড়া শশীর জন্য তাদের বড় চিন্তা ছিল না।

সকলেই সতৃষ্ণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে শেষে বললে, "তাই তো, কোথায় গেল, কই, কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না তো।"

তারা জটায়ুকেই খুঁজছিল।

*   *   *   *   *

বেপরোয়া বাঙ্গালীরা বাড়ির তাগাদা মত আফিস যেতে-আসতে দু'বেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে শো-কেসে শানিত 'মদনবাণ' শাড়ি ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।

সপ্তমীর মধ্যে বাঙ্গালীদের খরিদ এক প্রকার শেষ, কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তা-পেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। এক জোড়া নিলেই ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।
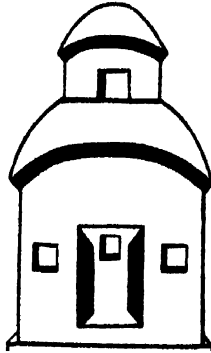
হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(১৮৬৩–১৯১৩)

(১)

হরিনাথ দত্ত চ'ড়ে সকাল বেলার ট্রেন,
দুর্গাপূজার ছুটি—শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।
এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দত্ত
পাটনায় চাক্‌রী করেন ;—কিন্তু সে চাকরির অর্থ
বলা কিছু শক্ত ; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাসে মাসে শ্বশুরকে তাঁর, ত্যক্ত
কর্ত্তেন টাকার জন্যে ; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে ক'রে অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

(২)

হরিনাথ ত উপন্যাস ক'রে মেলা জড়
পড়্‌তেন দিবারাত্র ; কোন কার্য্য কর্ম বড়
শিখেন নি ক, ব'সে পড়তেন তিনি ক'সে
কপালকুণ্ডলা এবং দুর্গেশনন্দিনী,
এবং তাহাই দিবানিশি ভাব্‌তেন ব'সে তিনি।

(৩)

হরিনাথের বাপের বাড়ী ছিল পাবনায় ;
বাঙ্গালদিগের আদিস্থানে সিরাজগঞ্জ গাঁয় ;
শ্বশুরবাড়ী হুগলির কাছে—গরিফায়।
তাঁহার স্ত্রীটি সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আরো সে (তা বলতে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারিক বালিকা ইস্কুলে।

(৪)

—এখন বালিকারা শিখ্‌লে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট ;—

তারা বাঁধে না ক খোঁপা, চুল ফেরায় তোফা,
শাড়ী এত বড় হয় যে বিরক্ত হয় ধোপা ;
শান্তিপুরে, বারানসী, ঢাকাই যায় সব চুলোয়,
পরে এখন 'বোম্বাই' পঁচিশ হস্ত লম্বায় ;
তাও এত কুঁচোয় যে তার ঘোমটাতে না কুলোয় ;
তার নীচেতে পরে কামিজ, জ্যাকেট পরে গায়ে ;
পায়ে দেয় না আল্‌তা বরং মোজা পরে পায়ে ;
তার উপরে জুতো ; ইত্যাদি ;—বস্তুতঃ
শীঘ্রই তাদের জ্বালায় চোটে উঠে জ্যেঠা, মামী,
পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত—ক্ষেপে যায় স্বামী।

(৫)

সৌদামিনীর অবশ্যই ছিল সে সব দোষ ;
কিন্তু তাতে বড় কেহ কর্ত্ত না ক রোষ ;
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
টাকার ছিল না ক খাঁক্‌তি ; তাই তাঁর এসব কসুর
"ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" যেত সবই ঢেকে ;
খরচ হ'ত না ত দিতে কারু পকেট থেকে ;
(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গু ণ টাকার
তিনিই এ কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার)
আরো এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী দশবর্ষীয়া যুবতী।

(৬)

মোটে গত হ'ল প্রায় মাসেক ষোল,
দিয়েছেন বিবাহ সদুর তদীয় মা বাপ,—
একবারটি হরির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ।
আশৈশব হরির পত্নী থাকেন বাপের বাড়ী,
দেখতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আস্‌চেন মহোল্লাসে অদ্য চ'ড়ে রেলের গাড়ী।

(৭)

হরিনাথ দত্ত ত একটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে,
এক ধারে গাড়ীর বেঞ্চের ব'সে একটি পাশে,
বাহিরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবচ্ছিলেন পান,
এবং সদুর রূপরাশি কর্ত্তেছিলেন ধ্যান ;
(সেই রূপরাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে না ক খুঁজে এলেও বৃন্দাবন ও কাশী।)

(৮)

দেখ্‌বেন সেই বঁধুর, বদনখানি মধুর,
ডাক্‌বেন কত ভালবেসে নামটি ধ'রে সদুর ;
বল্‌বেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
কর্ব্বেন সদুর সঙ্গে তিনি অনেক দিনের পরে,—
ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধরে।

(৯)

তিনি বাড়ী গিয়ে ঘরের দুয়োর দিয়ে
প্রথমতঃ ডাক্‌বেন স্ত্রীকে সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে।"
সদু বল্‌বে "নাথ!" তদুত্তরে বলবেন তিনি
"প্রাণেশ্বরি। প্রিয়তমে। সদু। সৌদামিনী!"
দিবে উত্তর সদু, "প্রাণেশ্বর বঁধু!
হৃদয়বল্লভ! প্রভো! প্রাণনাথ! পতি!
সর্ব্বস্ব! জীবিতেশ্বর!" ব'লে সে যুবতী
তৎক্ষণাৎ তাঁর আলিঙ্গণে বদ্ধ নিঃসন্দেহ
মূর্চ্ছা যাবেই—সামলাতে তা পার্ব্বে না ক কেহ ;
এই ভেবে হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু দুটি হ'ল সিক্ত, মুখটি হ'ল ম্লান।

(১০)

ভাঙ্গলে সেই মূর্চ্ছা উঠে আবেগে অচিরে
বল্‌বেই সে নিম্নমত ভাসি অশ্রুনীরে।

"নাথ তব লাগি, নিশি নিশি জাগি,
কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে প্রভো ! তোমারি বিরহে ?
পাষাণ হৃদয়, নিষ্ঠুর নিদয়" !!
"নিষ্ঠুরে প্রেয়সী" তিনি বলবেন তাঁরে চুমি,
"কিরূপে গিয়াছে দিন জান তা কি তুমি ?"
দুই জনে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহ পরে
কাঁদ্‌বেন দু'চার খানিক ঘণ্টা চোঁচা উচ্চৈঃস্বরে।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে উক্তরূপে বিরহী সে হরি
কাঁদ্‌তে লাগল সত্যই শেষে ভেউ ভেউ করি।

(১১)

পার্শে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে—
অতি ফরসা রং, একহারা তার ঢং,
টস্‌টসে বৃদ্ধ, যেন আম্র সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন ঐ উক্ত সকল ব্যাপার ;
ভাব্‌ছিলেন কি লোকটার এ সব লক্ষণগুলো ক্ষ্যাপার ?
পরে যখন দেখ্‌লেন তিনি, আসি বাহির ক'রে
হরি সম্মুখেতে তারে অৰ্দ্ধঘণ্টা ধ'রে
চেয়ে তারই পানে অতৃপ্তনয়ানে
মুখটি টিপে হাসেন, এবং আঁচড়ান নবীন দাড়ি,
বার্ণিশ করা জুতি, কালাপেড়ে ধুতি ;—
বুঝ্‌লেন ব্যাপার কতক ; তখন দূরের বেঞ্চি ছাড়ি,
বস্‌লেন গিয়ে অবিলম্বে হরির কাছে এসে ;
কল্লেন অম্‌নি আলাপ সুরু, দু তিনটি বার কেসে,—
"মহাশয়ের নাম ? ও নিবাস ? কোথা হয় তাঁর থাকা ?
কোথা যাবেন ? কি করেন ? আর পান বা কত টাকা ?"
ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করি সুতদস্ত
জান্‌লেন সেই বুড়, ব্যাপারটি যা গূঢ় ;
তাঁহার নাম ও বাড়ী 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জানলেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পৰ্য্যন্ত।

(১২)

এখন বুড়োর হাতের উপর ব'সে র'য়ে র'য়ে
ঝুলছিল সময়টা যেন বেশী ভারী হ'য়ে।
কল্লেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা।
সময়টাকে নিম্নমত করিবারে হত্যা।

(১৩)

জিজ্ঞাসিলেন তিনি আবার "পঁহুছিবেন ক'টায়?"
উত্তরিলেন হরি "রাত্রি আটটা কিম্বা ন'টায়।"
—"চিঠি লিখেছেন?" "ইস্ বাঙাল পেয়েছেন কি আমায়?
চিঠি লিখে শ্বশুরবাড়ী যায় কি কভু জামাই?"
—"সে কি বলেন?—আপনার জানেন যেতে হবে রাত?
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়বে, পাবেন না যে ভাত।"
—"হয় কভু কি এ?—একটি বছর বিয়ে,
পায় না খেতে জামাই নতুন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে?
যাব এমনি হঠাৎ যে সেই হর্ষের মহাঝড়ে,
বিরহিনী সদু আমার মূর্চ্ছায় যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরি আবার আয়না ক'রে বে'র
দেখে নিলেন গর্ব্বে নিজের চেহারাটি ফের।

(১৪)

এখন ভদ্রলোকটির স্বভাব একটু রসিক ধাঁজের;
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ওসব কথা বাজের,
বল্লেন একটু কেসে; মৃদুমন্দ হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সুচারু,
মনে তো পড়ে না এমন দেখেছি যে 'কারু';
তবে,—একটি কথা খাঁটি, এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করেছে যে মাটি।"
হরিনাথের সে বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ',
বল্লেন "ক্যান? এ দাড়িটারে কিসে দেখেন মন্দ?"
—"জানেন নাকি কিসে?—এহেন মিস্‌মিসে—
কালো দাড়ি রাখে শুধু বাবুর্চ্চি সহিসে;

এহেন কোঁকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মুদ্দফরাস মুচি, দর্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ি ফ্যাসন—করেন নি ক পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা এবং খাটো ;
আঃ—রাম! হেন, দেশী এবং ধেনো
দাড়ি বুদ্ধিমান্‌টি হয়ে রেখেছেন তা জেনেও ?
এখনই কামিয়ে হরিবাবু ফেলে দেন ও।"

(১৫)

শুনে এই সব ; হরি ত নীরব ;
ভাবলেন তিনি 'তাই ত—কিরূপে মায়া ছাড়ি'—
ফেলে দিই বা এতদিনের যত্নের হেন দাড়ি ?
ভদ্রলোকটি বুঝলেন তখন হরিনাথের সন্দ,'
বল্লেন তিনি শেষে, আবার একটু কেসে,
"এহাঁ বিশেষতঃ শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়ি ফাড়ি একেবারেই করেনা পছন্দ ;
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।"
তখন সাগ্রহে হরি বল্লেন "বটে ? বটে ?
সত্যি ?"—"নয় কি মিথ্যে—মিথ্যে কইবার আমার মানে ?
এ কথা কলকাতায় মশয় সকলেই ত জানে।"
কিন্তু এ যে বহু দিনের ?" বুলাইয়া হাত
আসি সাম্‌নে ধরি, বল্লেন আবার হরি ;—
"এত যত্নের দাড়ি—ফেলে দিব অকস্মাৎ ?"
"দেবেন না ত দেবেন না ক ; হ'লে একটু সাফ—
আপনার সুন্দর বদনখানি আমার তাতে লাভ ?"
এইটি বলে বৃদ্ধ একটু চটে যেন গিয়ে ;
হেলান দিলেন, মুখটি ঢেকে হাতের বহি দিয়ে।

(১৬)

"তাই ত তাই ত" বসে আবার ভাবতে লাগলেন হরি
"কামাব—কি কামাব না?—এখন যে কি করি ?"
হঠাৎ ভদ্রলোকটি বল্লেন, কেতাব ক'রে বন্ধ

"আর—ও—ছি ছি এ কি, আসুন দেখি দেখি;
দু এক গাছা যে পাকা; হোন্ তো দেখি বাঁকা;
অহো রাম! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ!
ওয়াক্-ওঃ ওয়াক্!"—"সত্যি নাকি?" ওয়াক্!
কি গন্ধ! ও-মা গো আপনি বাঙালই নিঃসন্দ।"
"বলেন কি?" "হ্যা দেখতে পান্ না? আপনি নাকি অন্ধ?
এ দাড়িও রাখে? অ্যাঃ ছ্যাঃ! নিয়ে উক্ত দাড়ি—
সত্যি কথা বল্‌তে কি তা—গেলে শ্বশুরবাড়ী,
ভাববে আপনাকে ডোম, কি মুর্দ্দফরাস হাড়ি।
ওয়াক্-ও অথুঃ—আপনার সেই সদু—
দেখ্‌বে আপনার দাড়ি মশয়, এবং শুঁকবে যবে
চুমো খাওয়া দূরে থাক্ সে, কথাও না কবে।"

(১৭)

এবার হলেন হরিনাথ ত সম্পূর্ণ পরাস্ত—
বল্লেন তখন মর্হোৎসুক্যে হয়ে ভারি ব্যস্ত—
"মহাশয় তবে দেখুন উপায় কি যে এখন,
এ দাড়িটা কামাই কোথা"?—"কেন, বর্দ্ধমান।"
"সেখানেতে নাপিত আছে"?—"কত গণ্ডা চান?"
তখন ত ঠিক হ'ল, থামলে বর্দ্ধমানে গাড়ী
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

(১৮)

ঘট্ ঘট্ ঘট্—শোঁ, ঘটক ঘটক—পোঁ
বর্দ্ধমানে ক্রমে গাড়ী এল ক'রে চোঁ।
এবং সেই বর্দ্ধমানে যেই থামা গাড়ী
নামলেন অমনি হরি দত্ত কামাতে তাঁর দাড়ি;
সবিশেষ অন্বেষণে বর্দ্ধমান ইষ্টেশনে,
পেলেন একটা নাপিত—কিন্তু কার কথাটি কে শোনে,
কারণ সেটি ১২৮২ শাল, যে সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে;
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে টি টি কার;—
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথঞ্চিৎ ত স্বীকার।

(১৯)

এখন দাড়ি অত প্রবীণ, নাপিত অতি নবীণ,
বাকি সময় অষ্ট মিনিট;—"এত তাড়াতাড়ি
হবে"—ভাব্‌ল পরামাণিক—"কামান এ দাড়ি ?"
যা হ'ক সে বিষয়ে চিন্তা কল্লেই নিজের ক্ষতি ;
(নাপিতেরও পয়সার সে দিন টানাটানি অতি)
বল্ল "একটি টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি," হরি স্বীকার ; করি তায় টাঁকস্থ,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটি করে বাহির,
শীঘ্র বসা হ'ল কর্ত্তে নৈপুন্য তাঁর জাহির।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকে দাড়ি হল ত নিপাত ;
তাতে পড়ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়ল শান
ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্, ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
হল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুন্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রাহায়ণের ধান,
পড়লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেই মত, আর
বাঁদিকের মুখটা ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।
এখন নাপিত হাঁচি', লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অর্দ্ধ, এমন সময় বর্দ্ধ—
মানে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনটি বার ;
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠক মশয় এ সময়টা কর্ব্বেন আমায় মাফ
যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই, —চোঁচা দিলেন একটা লাফ ;
চাদর মাদর ফেলে, লোকজন ঠেলে,
উঠ্‌লেন গিয়ে বহুৎ কষ্টে পুনরায় রেলে।

(২০)

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি ;

সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা ; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বর্দ্ধমানে।
পাঁচটি মিনিট হরিনাথ ত ব'সে রইলেন খাড়া;
তবে পড়ল ঘণ্টা আবার তিনবার ; ও তা ছাড়া,
এঞ্জিন কল্লো শোঁ, পরে কল্লো পোঁ,
ভক্ ভক্ ভক্, ঘট্‌ক ঘট্‌ক,
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্ ঘট্ ঘট্।
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট্।
গেল সে রেলগাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়ি ;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।

(২১)

তখন ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি —"এ কি মহাশয় ? ক'রে ফেল্লেন এ কি ?"
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—"মশয় দেখুন দেখি,
আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—"
"তাই তো একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি!
এমনও কি করে ?—তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটাও ত হ'য়ে গেছে সাফ"
ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ হোঃ ক'রে,
ভদ্রলোকটি হাসলেন চোঁচা দশটি মিনিট ধরে।

(২২)

হরিনাথ ত রইলেন ব'সে চুপটি করে, রেগে ;
হুগলীতে থামলে সে গাড়ী অতি তীব্র বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে সাহেব এবং মেমে)
দিয়ে ছুট, ভাড়া ক'রে একখান্ ছ্যাকড়া গাড়ী,
হরিনাথ—আর কথাটি নেই, চোঁচা দিলেন পাড়ি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

রাত্রি হবে দুপুর, বাড়ীর মধ্যের উপর,
সৌদামিনী এবং তার কনিষ্ঠ বোন, এই দু'য়ে
জুড়ে, তাঁদের দিদি মায়ের দুইটি দিকে শুয়ে
অকাতরে মাটির মতন ঘুমুচ্ছেন ত প'ড়ে।
বাড়ী অতি স্তব্ধ, নাহি সাড়া শব্দ—
হেনকালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চড়ে;
হল দেরি বেকুফিতে হরির নৌকার মাঝির—
তাইতে হরি শ্বশুরবাড়ী দুপুর রাতে হাজির।

(২)

মহা হুড়োহুড়ি এবং মহা ডাকাডাকি,—
জেগে উঠলো সবাই, ভেবে 'ডাকাত পড়্‌ল নাকি?'
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি করে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে করল রেগে তাড়া;
কর্ত্তা বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াক্কড় এক হুকুম দিলেন নীচেতে না নামি,'—
"মারো বেদম বজ্জাত চোরকো"—"আমি আমি আমি"
চীৎকারিলেন হরিনাথ ত,—"দেখুন নেমে এসে—
আমি'—আর—সে আমি—চোঁচা তস্য পশ্চাদ্দেশে,
পড়লো দু তিন লাঠি, যুদ্ধে নাহি আঁটি,
হরিনাথ ত উপুড় হ'য়ে কামড়াইলেন মাটি।

(৩)

সবাই তারে বাঁধে; পরে নিয়ে কাঁধে,
নিয়ে এল বাবুর কাছে; সেথা তারে নামাই'
দিল মনঃপূত জোরে দুদশ জুতো;
কর্ত্তা বল্লেন "বেটা, রাখে তোরে কেটা?
শীঘ্র নামটা তোর বল্‌ত শালা চোর;
দুপুর রেতে ডাকাতি?—কে বল্‌ না শালা আমায়,"

"ডাকাত নহি, চোরও নহি, শালাও নহি,—জামাই।"
বল্লেন শেষে হরি দত্ত, ক্রমে হাঁফ ছাড়ি'।
"জামাই—তবে কোথা গেল একটা দিকের দাড়ি?
বেটা ষণ্ডামার্ক বজ্জাৎ। আবার বলে জামাই, এঃ—
অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথায়?"—"ফেলেছি তা কামাইয়ে।

(৪)

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্তুতঃ;
তখন শ্বশুরমশয় হলেন দারুন অপ্রস্তুত, ও
লজ্জায় যেন কাঁথা—চুলকাইয়া মাথা,
বলেন "বটে. বটে, কিন্তু এমনও কি করে?
চিঠি নাহি লিখে হাজির রাত্রি দ্বিপ্রহরে।
ছিঃ ছিঃ রাম রাম। বলতেও হয় নামও;
এক লাঠি, 'আমি' ভিন্ন কথা নাহি সরে।
তাতে অর্দ্ধ দাড়ি শূন্য! এমনও কি করে?
এখনি অগত্যা হ'ত যে গো হত্যা—
অর্থাৎ—যা হ'ক্ শোওগে বাছা বাড়ীর ভিতর গিয়ে।"
(স্বগত) "এ গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে!"

(৫)

হরিনাথ ত শুনলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—;
"অভ্যর্থনার সুরু হ'ল কিছু গুরু;
হবে এটা হুগলি জেলার অভ্যর্থনার প্রথা,
খেতে দিলেও বুঝতাম, সেটা হ'ত কড়ামিঠে,
তা দিলে না মোটে, মরি ক্ষুধার চোটে,
পেটে পড়ল দ', আর লাঠি জুতো পড়ল পিঠে।
যা হোক দেখি, প্রিয়ার মুখপঙ্কজ নেহারি,
পেটের পিঠের জ্বালাও যদি ভুলিতেও পারি।"
ভাব্‌ছেন হরি হেন শুয়ে বিছানার উপরে;—
এদিকে সদুর মা গিয়ে সদুকে তাঁর জাগিয়ে,
অনেক্ষণটি যুঝিয়ে, ভোগা দিয়ে বুঝিয়ে,
পাঠালেন সদুকে শেষে হরিনাথের ঘরে।

(৬)

প্রবেশিল ঘরে সদু, সহ হৃৎকম্প ;
হরি অমনি, দিয়ে একটি ছোট খাট লম্ফ,
তারে বুকে নিয়ে, বল্লেন "অয়ি প্রিয়ে—"
হ'ল না কর্ণ্ঠে তাঁর বেশী সম্ভাষণ সুমধুর—
"ওগো মেরে ফেল্লে মা গো"—মুর্চ্ছা হল সদুর।
তখন সদুর মাতা উঠে,—এলেন ঘরে ছুটে,—
দেখ্‌লেন যে তাঁর সৌদামিনী ধরায় পড়ে লু'ঠে ;
এবং তাঁহার জামাতা—থেকে তস্য পা, মাথা
পর্য্যন্ত আড়ষ্ট, খাড়া, মুখটি করে ফাঁক,
(একটি দিকে দাড়িশূন্য)—নিস্পন্দ নির্ব্বাক্।
দেখে গিন্নী আগুন, তেলে যেন 'বাগুন,'
বল্লেন তিনি চীৎকারিয়া,— "হনুমানটা, কে রে,
সোনার বাছা সদুকে তুই ফেলেছিস যে মেরে ;
সোনার মেয়েটিরে বিয়ে দিল কি রে
কায়েতের এক ঢেঁকি, বুড়ো বাঁদর হতচ্ছিরে ?
বাবুই ত ঘটাল এ, এ ত ছিল জানাই ;
আমি ত এ বরাবরই করিছিলাম মানাই ;—
বেরো বুড়ো, বাড়ী থেকে বেরো, শিঘ্‌ঘির বেরো ;
দেখ্‌ছিস ও কি চেয়ে ;—আহা সোনার মেয়ে !—
কপালেরই গেরো গো সব কপালেরই গেরো।"
তখন সদুর মা, তার মুখে জলের ছিটে দিয়ে,
সদুকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চলে যান ত নিয়ে।

(৭)

দেখে ব্যাপার এই, হরি ত আর নেই ;-
খেয়ে উক্ত তাড়া, দিলেন না ক সাড়া ;
ভাব্‌তে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া ;
হ'ল ভঙ্গ আহা তাঁহার সারা পথের আশা,
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালবাসা ?
কই ত এরূপ চোঁচা মুর্চ্ছা স্বামী দরশনে,
দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মৃণালিনী,

গিয়েছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে।
চাহিলে নাও ভাল ক'রে কহিলে নাও কথা—
আর জামাইয়ের একি রকম অভ্যর্থনার প্রথা।
আহারের সঙ্গে ত মোটে নাইক নামগন্ধ—
আদর সুরু লাঠি জুতায়—শেষে অর্দ্ধচন্দ্র।
যা'হক এসব ভেবে কি জানি যান ক্ষেপে
পাছে তিনি ; ছাড়ি' সাধের শ্বশুরবাড়ী,
জেগে' সারারাত্রি প্রাতে কামাইয়া দাড়ি,
চড়ে পুন নৌকা, ছ্যাকড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই, হরিনাথ, ফের পাটনায় দিলেন 'পাড়ি'।

ফরমায়েসি গল্প

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)

(১৮৬৮—১৯৪৬)

মুকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক ক'রে, সিকি ভরি অহিফেন সেবন ক'রে, যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমুতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বললেন—"ঘোষাল। গল্প বল।"

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়তে না পড়তে তাঁর ডানধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে—

—যে আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বলবি বলত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়?

একটি অস্থি চর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করিলেন—

—তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটান যায়?

রায় মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন "কেন ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

—আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—

—এক লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটা ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাঁপুনীতে মিলে গেলে, গল্পের আর রস ভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা খুসি হয়ে বল্লেন—তা ত বটেই। আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্ত্তমান, তাতেই না অলঙ্কার শাস্ত্রে ওর নাম-আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরুচ্ছিল, এইবার আবার কথা বেরল ; কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলঙ্কার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চল্লুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগবে ? ও সব গল্প যাও ছেলেছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে, রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বললে—

হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে, হুজুরের তো আর সে ভয় নেই।

—দেখেছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক। যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বলতে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বলতে! শাস্ত্রে বলে যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সে যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সে যথার্থই রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে-সুঝে কথা কয় ? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়েসেও যে রস আছে, একালের যুবাদের মধ্যে হাজারে একজনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটাই গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন ; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.,-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে। বললে অশ্লীল।

—কোন গানটা ঘোষাল ?

—"গৌরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুভারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইষ্টুপিট্ কানে হাত দিলে ? অমন কান মলে দিতে পারলিনে ? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজী পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল।

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ অতি তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বল নীলমনি?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে এই প্রশ্ন করলেন, তার নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়—ঘোরশ্যাম, আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল-নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তার সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন—আজ্ঞে, ইংরাজি-নবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনে শুনেই বলছি। আমারই জন-কতক পাশকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত—

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটী নেহারি

তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায়?

—তফাৎটা কোথায়?—বললেন ভাল পণ্ডিত মশায়। একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন।

অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে।

—অবাক করলেন। তাহলে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই তো বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক্ আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান তো আর টোলে জন্মায় না।

—বটে। অমরু শতক থেকে সুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তাহলে মনু থেকে সুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ করবেন না পণ্ডিতমশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃতকাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি একবস্তু নয়—একটায়

নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখন ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বল-নীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

পণ্ডিতমহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না"—এই ছিল তাঁর motto তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন—

—কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বল-নীলমণি! তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশী বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি যুতসই উপমা লাগাও তো দেখি।

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো তো অমনি একটা রসিকতা!

—আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই।

যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা! ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?

—অবশ্য না! ও দুইত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্য-ন্যায় বটে!

—শুনুন পণ্ডিতমশায়। যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান; আর যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁসাইজি! তাহলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারি নাম ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মশায়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ-পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহাখুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টীপ্পনির অনুমোদন করলেন! উজ্জ্বল-

নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র, তার মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য "হেঁচ্চ" ধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল-নীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে দিল। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে সরে বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে বললেন—

—তোমরা ক'টায় মিলে ভারি গণ্ডোগোল বাধালে ত হে। আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা স্থরু করে দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনও মাথা-মুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে।

—শীগ্‌গির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?

উজ্জ্বল-নীলমণি বললেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

—"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলঃ জলদাগমে।"

পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তাত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বল-নীলমণির গায়ে এইকথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলেন—

—তবে বলি শ্রবণ করুন।

—দেখ্ মধুর রসের ব'লে গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস নে। একটু নুন-ঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন তাকি আর জানিনে।

—আর দেখ্, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস, একেবারে যেন সাদা না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জানতে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধার-করা কিম্বা চুরি-করা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তা হলে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে নিজের জিনিষ ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

অন্যে যে যা বলে তা বলুক ; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারিদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে ; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়, —একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল।

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়বে বলত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল জল চুঁইয়ে পড়ছে।

—হুজুর বলতে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফার-ফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না। এই শুনে দেওয়ানজি বললেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।

—সে আর বলতে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তাহলে তার বাড়িতে আর পাকা চণ্ডিমণ্ডপ হয়, আগে যাঁর চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?

—যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে নল ঢুকবে? যাক্ ওসব কথা। এখন গল্প শুনুন।

এই দুর্য্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বট গাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বললি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

—হুজুর অধীর হবেন না ; উদ্ধার তো করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ তো আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।

—তা ত জানি। কিন্তু তুই হয়ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি। গল্প সুরু করে দিলে তোর তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ Pneumonia হবে। এ যে বাঙলাদেশ, তায় আবার কলিকাল।

এ কথা শুনে উজ্জ্বল-নীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না ম'শায়। পদাবলী পড়ে, দেখবেন,—কি ঝড় জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন, এবং তাতে করে তাঁদের কারও যে কখনও অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলেছে, বাইরের জলে তার কি করবে?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ সন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বলতে পারে? অভিসারক বলে ত আর কোনও জানোয়ার নেই। দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুটজুতো। তারপর শুনুন—

শুধু ঝড়জল নয়। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার। লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি!

—কি বল্‌লি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি?—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!

—আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে ত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—তা ত ঠিকই। আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি, তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।

—শুধু করতে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত তাহলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি ত নয়ই—

—উনি ত ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন।

—হুজুর আমি কোথাও যেতে চাইনে, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।

—যেখানে আছেন সেইখানেই থাকতে চান। যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেলেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি।

—হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।

—দেখছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক, লোকটা অনুগত বটে। যাক ও সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। তুই এখন বল্, তারপর কি হল?

তারপর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুক চিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশহাত দূরে একটা পর্ব্বত-প্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোম ভোলানাথ" বলে' হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়ারে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড়-জল হো হো করে মন্দিরে গিয়ে পড়ল আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত!

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই, রবারের।

—এই যে বললি বুট?

—বুট বটে কিন্তু রবারের বুট। হুজুর আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?

তারপর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ-দিকে একটা হারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জেলে দেখতে পেলে ডান দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত একটা মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি! একেবারে মারবেল পাথরের খোদা। ব্রাহ্মণ সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিষও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুইটি পদ্মফুলের মত, গাল দুইটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত, কান দুটি—

—রাখ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম করলে না?

—আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন্ দেবতার তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোন জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি।—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম করবে না?

—আজ্ঞে লোকটি সন্ন্যাসী। ওদের ত কোনও ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নেই, ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

দেখ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।

—আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওল্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্ সন্ন্যাসী। দেখ্ যে কখনো সাধু-সন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা উর্দ্ধবাহু, দাদুপন্থী, অঘোরপন্থী,—দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, আর ঔষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর এ ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশী হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার্ করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

—হুজুর আমি বার করি নি, এরা নিজেরাই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টো টো কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়, শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতা-মোজাও পরে, স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে?

—আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে। এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা করলে কে?

—হুজুর, জার্ম্মাণরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা

বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এদেশে চালান দেয়, তেমনি ওরা শঙ্করের সঙ্গে শঙ্করী মিলিয়ে এ দেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে সস্তা বলে।

—অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বল-নীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন:—

ঘোষাল যাদের কথা বলছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাশ করা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে, এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এরা খুসি মত 'সা'র জায়গায় 'নি' এবং 'নি'র জায়গায় 'সা' বসিয়ে দেন।

—রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন:—

তোমার টীকা টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইষ্টুপিটরা দু'পাতা ইংরেজি পড়ে সব সোহহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃষ্টান। ঐ অকাল-কুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক, আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তাহ'লে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।

—হুজুর, তাহ'লেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছাচারের কথা শুনতে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তাহলে এইখানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তাহলে এইখানেই বন্ধ হল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল:—

হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ!

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে, তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এরকম ওলটপালট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জনপ্রাণী না থাকত তাহলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত নয় তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না!

—খুব কথা উলটে নিতে শিখেছিস বটে।

—ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পূজা করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর একদিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বললি, ভক্তি আর প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই ত এক সঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু এক সঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরাভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায় ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে। কিন্তু সে বোন-সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়। অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রাখো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি।

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষ পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে এক রকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যম নারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায় ?

প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বললেন ? এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালবাসায় ফেলি ?

—তাহলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হল ?

আজ্ঞে তাও কি হয়। যা হল তা শুনুন :—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত-ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত ? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায় পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরি! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চারচক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বা মাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে সুরু হল। তার মনে হল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া-জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বল-নীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন :—

আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব তার উপমা হল কিনা ম্যালেরিয়া জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের

কথা পেড়েছিল, তখনই জানি ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলেন। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বললেন :—

ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্বিক-ভাব বলছ, সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনো-ভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি কুইনিন গিলেছি কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন :—

চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠেছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ ও তো তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে নাকে কাঁদতে বসে না। পিলে যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদরোগ। ও-যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই ; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যাঁ দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস। উজ্জ্বলনীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ তো আর জাত বিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি—বদনায় করে। তারপরে এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন—

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিলরে?

—হুজুর লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!—

"—চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

বললে ও কবিতার আর থাকে কি! আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কি না জাত মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা করছেন কেন? আমি যে রঙ—চড়িয়েছি তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরোবে তার রঙ ত লাল। তবে বলতে পারিনে, হতে পারে যে কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়! কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তাহলে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তাহলে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না— আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব?

—হুজুর তর্ক আমি করি! আমি একজন গুণী লোক—নভেলিষ্ট। কথায় বলে যাদের আর গুণ নেই তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বলছেন!

—বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি, তারপর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন—

ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়স কত?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা কি বিধবা?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্। ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী? বাঙালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়েছে অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই, বলে দিলি হিন্দুস্থানী।

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হোক না হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানীও ত হিন্দু। আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। জানিস দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোন হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড়ো দেখেছিস বলত গাধা!

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বললি? মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস। মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে দে!

—হুজুর, এই দুর্য্যোগের মধ্যে—

—দুর্য্যোগ ফুর্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ও দেবতা অপ্রসন্ন আর ভেতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন তো বেচারা যায় কোথায়? হোক না মুসলমান, মানুষ ত বটে, আমাদের মত ওর-ও রক্ত ও মাংসের শরীর।

—খোপ্সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কিনা বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস্-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি

দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালী কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা। কুলীনের মেয়ের গায়ে ওড়না ওড়ে আর সে কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে!

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল, তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।

—এই যে বললি সলমা চুমকির কাজ করা ?

—হুজুর ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

—তাই বল্। আঃ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

—হুজুর, আপনার না হোক আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ-প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা....।

—অমন ভুল করিস কেন ?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক্! ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে হয়নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস্ তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্ বল্ ত? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব, তারপরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতী গল্প। এখন যা হল শুনুন :—

ভালবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা একজনের মনের সিগারেট থেকে আর একজনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন কুমারীর মনে, স্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধরতে সুরু করল।

—কি বললি ? স্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের স্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস্! পোর্ট বল্—আমার

ত আর কিছু জানতে বাকি নেই। স্যাম্পেনের নেশা হয় ধরেনা, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রক্তের গাঁথুনি গেঁথে যায়।

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও-বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোন বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তা হলেই বুঝতে হবে সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার জো নেই?

আমি ত তা বলিনি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ। তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন:—

তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুৎ, স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, তারপর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাস।"

—উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ "নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসের" বেশী আর আমি যেতে দেবো না।

—আজ্ঞে এর একটা তো আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে উঠে চুম্বক।

—বটে। হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বলনীলমণির, এখন ত দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই।

—হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখিনি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ও সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন "যব গোধুলি সময় ভোলি ধনী মন্দির বাহির ভোলি"।

—ঘোষাল নিজে করবি কুকীর্ত্তি আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলিনি, বাঙলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে আমি আগে ভাগেই তা করে বসব, আমি ত একজন ছোট গল্পকার। "মহাজনো যেন গত স পন্থা" হিসেবেই আমি চলি।

—বাঙলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চ্চা আর বেশী করতে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।

—তাহলে বলি হুজুর, ওটা আসল মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলছিস মন্দির আর এখন বলছিস ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভেতর ঠাকুর থাকত না? আগেই ত বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে। খুব ডিগবাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি।—আচ্ছা যাক্, এখন তুই গল্প বলে যা, এতক্ষণে জমছে।

—হুজুর, তারপর ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়ল আর তার অধর পান খাওয়া ঠোঁটের মত লালটুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্ সিঁদুরের কথা কি বললি?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি।

—উঃ তুই কি ঘোর মিথ্যেবাদী। সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস।

—তাহলে হুজুর, ও মুখফস্কে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে সধবাই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?

—কি বললে উজ্জ্বলনীলমণি, ক্ষতি কি?

—আজ্ঞে আমি বলছিলাম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন :—

হয় কি না হয় তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের করচা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন কি কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত...

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল, সকলে এক সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলে—কেউ কারও কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বলনীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলোর" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে তিনি বলছেন :—

আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন তারপর যত খুসি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মীনারী"—সে না হলে সংসার চলে না; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান ত পদাবলীতে....

—রক্ষা করুন গোঁসাইজি থামুন, আপনার ওসব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হলে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিতমশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস, যা মুখে আসছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"—এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। একালে ওসব কথা মুখে আনতে নেই, কেন না তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হতে

পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে চালাও, দুদিন পরে তা সমাজে চলবে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে, তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠোনো ভার। আজ যে রকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে পণ্ডিতমশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে তাঁর গতিরোধ হল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে :—

আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলেই যে সধবা হতেই হবে এমন ত কোনও কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী তাই না তার মাথায় ছিল সিঁদুর।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বললেন :—

ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদিঅন্ত নেই। আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি গেরস্তর ঝি বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কিরে—

—হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন। শুনুন :—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। দেশের লোক বললে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বাস করলে না। "আমার সিঁথের সিঁদূরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পূণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল, কারণ এই

দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল, কিন্তু স্বামী তাকে চিনতে পারেনি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়েছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণ সন্তান বুঝতে পারল "এই সেই", অমনি সেই বৈদান্তিক-শক্তি "তত্ত্বমসি" বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছু পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখা গেল মন্দির একেবারে শূন্য।

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি।

—হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন তাই শোনালুম।

বলা বাহুল্য ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বলনীলমণি। তিনি দাঁত-খিচিয়ে বললেন :—

ভূতের গল্প না তোমার মাথা। পেত্নীর গল্প।

এই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে খবর এলো যে মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও সেদিনকার মত ভঙ্গ হল।

সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৭১—১৯৫১)

সিংহরাজ বললেন,—"কোনদিন বা শেয়াল পণ্ডিত ভোম্বলদাস মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।"

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন,—"হতে পারে।"

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে—"এখনি এর একটা বিহিত করা চাই।"

গজপতি বল্লেন—"এমন কেউ নেই ঐ পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।"

মোষ চোখ রাঙিয়ে বল্লেন—"ওটা বিষম ঠক।"

ছোট ছোট জানোয়ার, তারা বলে উঠলো—"দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।"

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বল্লেন,—"ভয় নেই। ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেব। আসছে মাসে মামীর শ্রাদ্ধ, সেই দিনই এখানে আনাচ্ছি; তারপর বিচার কোরে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ কোরে বলতে পার; সজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়াল পণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ ছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছুতো করা চাই। মামা তো কৈলাসে গেলেই শীতে মরবেন জানা কথা, কেবল শেয়াল পণ্ডিতই তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাস যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা কোরে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাকে রোজ একটা কোরে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটা-সোটা কোরে আবার যে দিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সেদিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না। তাঁর নামে তোমরা যে সব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছবে। অতএব তোমাদের উচিত যে আজই আমাকে মামার রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না—মামার বাবা এলেও নয়।"

এই বোলে সিংহ হুঙ্কার ছেড়ে চারিদিক চাইলেন; সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচু-মাচু হয়ে এক সঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে

—"তাই হোক। এখনি আপনাকে অভিষেক করা হোক।

বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা—সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে

চায় চলুক ; আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করবো—জোর যার মুল্লুক তার।"

সিংহরাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, শ্বেত-ছত্র, শ্বেতচামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন।

ছুঁচোর কাছে মালখানার চাবি থাকতো, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিত মশাই যাবার একহপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুমনামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন ; সে চাবি তার কাছে এ পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয় পাঠান আর কি, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার কোরে ছুঁচো-মেরে হাতে গন্ধ করে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজ-কর্ম্ম চলে না। সিংহ হুকুম দিলেন,—"ভাঙ্গো দরজা"।

দরজা গেঁথেছিল রতা—শেয়াল, হাতী হয়েছিল ফোগলা—তিনি সেকাজে আর এগুলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল—সবাই সিং বেঁকিয়ে ফিরে এলো। বুনো শুয়োর তার ছিল সোজা ছুঁচলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল। গণ্ডারের ঐ দশা। এদের মধ্যে কেউ দাঁতে কোরে কেউ শিঙে কোরে না তুলেছেন, না ভেঙ্গেছেন এমন নেই। কিন্তু কি গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা—দরজা খুললো না।

এ দিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলাপ করছেন সেখানে এসে কেউ জানিয়ে গেল। মামা তো হেসেই অস্থির ; শেয়ালকে বল্লেন—"ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও আরো কিছু মজা হোক।"

শেয়াল বল্লেন,—"চাবিটা মহারাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুশী হবেন—কি বলেন?"

ভোম্বলদাস চোখ-মটকে বল্লেন—"যাও, কিন্তু ভাগ্নে যখন উত্তম, মধ্যম পুরস্কার হুকুম দেবেন, সে সময় ল্যাজ তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোরে চটপট ফিরে আসতে ভুলো না।"

শেয়াল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এলো ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভন্ ভন্ করতে। মশা মিহি সুরে কানের কাছে বল্লে,—"মহারাজ"!

ছুঁচের মতো কথা বিঁধলো—ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"আর মহারাজ বোলে কেন সম্বোধন কর? আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে পরের হাতে।"

বানপ্রস্থ

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১৮৬৩-১৯৩১)

বিবাহের পর সরলা তিন বৎসর বাপের বাড়ী ছিল। শ্বাশুড়ি দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "বউমা রাঁধিতে বাড়িতে, খাজা গজা তৈরি করিতে, শেলাই প্রভৃতিতে কিছু অপটু। আজকালকার ছেলেরা হোটেলে খাইতে ভালবাসে। বিশেষতঃ আমার খুদীরাম বামুনের হাতে খাইতে ঘেন্না করে।"

সরলা তিন বৎসর ধরিয়া রান্না শিখিতেছিল। সপ্তাহ পরে একখানি করিয়া স্বামীর পত্র পাইত। তাহা সাত দিন ধরিয়া পড়িত। চিঠিতে কিছুই থাকিত না। "আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ, এবং মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি খুদীরাম।"

তাহার পর একদিন পত্র আসিল,—"মার অনুমতিক্রমে তোমাকে আনিতে মামা যাইতেছেন। বাবার 'মার্চ্যাণ্ট হাউসে'র চাকুরী আমার হইয়াছে। অধিক লিখিবার ফুরসৎ নাই।"

খুদীরামের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। প্রায় সাত বৎসর আগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা রমণী দিগম্বরীই বিষয় আশয় দেখিতেন।

এক সপ্তাহ হইল, সরলা আসিয়াছে। সরলার রন্ধনপটুতা দেখিয়া শ্বাশুড়ি মনে মনে পুলকিত হইলেন। সকাল বেলার রান্নার ভার ও বৈকালের জল-খাবারের ভার সরলার ঘাড়ে পড়িল।

খুদীরাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাগানের দিকে ঘুরিত। ফুল গাছে জল দিত, এবং কখনও কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ভয়ে সরলা যাইত না।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিলেন, "বাবা, বউমার একটু ইংরাজী পড়া উচিত, এবং একটু হারমোনিয়মের সঙ্গে গান শেখাও উচিত। সন্ধ্যাকালে মিস্ মিত্রকে আসিতে বলিয়াছি। সে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত পড়াইবে।"

খুদীরাম নিতান্ত মাতৃভক্ত। সে ধীরভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "মিস্ মিত্র সকাল বেলা আসিতে পারে না?"

মাতা। না ; সকালে বউমা রাঁধে।

খুদীরাম কেবলমাত্র 'বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ রবিবার। বসুজাদিগের বৃহৎ ভবনে খুদীরামের মাধ্যাহ্নিক নাসিকা-ধ্বনি চলিতেছিল। শ্বাশুড়িকে অন্য ঘরে নিদ্রিতা দেখিয়া সরলা লুকাইয়া স্বামীর নিকট আসিল। কিন্তু সেই কথা। খুদীরাম রাত্রিকালে যত ঘুমায়

দিনেও ততোধিক। দুঃখিনী সরলার সাধ হইয়াছিল, দুটো লুকানো ও পুরাণো কথা স্বামীকে বলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সরলা কৃত্তিবাসের রামায়ণ খুলিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ভাগটা পড়িয়া দেখিল ডাক্তার সরকারের গৃহ-চিকিৎসা পাঠ করিয়া দেখিল। নিদ্রাভঙ্গের ব্যবস্থা কোথাও পাইল না। নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টার সহিত নাসিকার ডাক বাড়িতে লাগিল।

সরলার মনে হইল, এ সব চালাকী। নলিনীর স্বামী নীলকণ্ঠ ত এমন করে না। বোধ হয়, স্বামীর ভালবাসা সে পায় নাই। কিংবা হয় ত অন্য—। সরলা সে কথা ভাবিতে পারিল না। হারমোনিয়ম লইয়া সুর দিতে গেল।— এমন সময় দিগম্বরী ঠাকুরাণী ডাকিলেন—"বউমা, জলখাবার তৈরি করবে এস।"

০ ২ ০

নীলকণ্ঠ ডাক্তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি জানিতেন যে, স্ত্রীলোক মাত্রই সংসাররূপ যাত্রার দলের অধিকারী, এবং তন্মধ্যে স্বামী হনুমান-পদস্থ।

বিশেষতঃ, রাঙ্গা টুকটুকে বউ হইলে দর্শন শাস্ত্র অনেকটা স্তম্ভিত হইয়া যায়।

নলিনীবালা একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া আর্সিতে মুখ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ চেয়ারখানি দুলিয়া উঠিল।

"ওগো! আমি পড়ে যাব যে।"

নীলু। এই যে আমি আছি।

নীলকণ্ঠ ধীরে ধীরে চেয়ারখানি ধরিলেন, এবং ধরিতে গিয়া আরও দোলাইয়া দিলেন।

নলিনী মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমার চালাকী।"

নীলু। ওগো, তা নয়, মনে করিয়াছিলাম তোমার মুখ পর্য্যন্ত পৌঁছুঁছিব। কিন্তু সেটা অসম্ভব দেখিয়া তোমাকেই নামাইতে বাধ্য হইতেছি। ক্রমে চেয়ার আরও দুলিতে লাগিল।

সুন্দরী নলিনী বলিলেন, "ন্যাকামি রেখে দাও।"—কিন্তু ক্রমে বেগতিক দেখিয়া চেয়ার হইতে লাফ দিলেন—"যদি আমার পা ভেঙ্গে যেত?"

নীলু। একটু আর্ণিকা লোশন দিতাম, কিন্তু আপাততঃ তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব।

"ওগো, আমাকে লাঞ্ছনা ক'রো না—তোমরা কি নিষ্ঠুর। আমার সেফ্‌টী-পিন-কই?"

নীলু। সেফ্‌টী-পিন্ কেন?

নলিনী। আজ সরলাদের বাড়ী যাব। তার কি হয়েছে, ক'দিন ধরে কাঁদ্‌ছে।

প্রতিবাসীদিগের সংবাদ শুনিতে উৎসুক হইয়া নীলকণ্ঠ নলিনীর গলা ছাড়িয়া দিলেন।

নীলকণ্ঠ। কথাটা কি?

নলিনী। কানে কানে বলিব।

তাহার পর নীলকণ্ঠের কান্ টানিয়া লইয়া নলিনী দেবী চুপি চুপি কি বলিলেন।

নীলকণ্ঠ ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এটা ত একটা 'হার্ট' ফেলিওরে'র কেস্—হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।"

নলিনী। ভাঙ্গিলেও শরীরের মধ্যেই থাকিবে ত? তুমি যদি ডাক্তার হও, এবং আমি যদি সতী হই, তবে সরলার স্বামীকে নিশ্চয় সারাইয়া দিতে হইবে। হৃদয় জোড়া দিতে হইবে।

নীলু। আমিও ডাক্তার, তুমিও সতী; ইহার ফলাফল ভালোর দিকে যাইবে, সন্দেহ নাই। তোমার গুণে আমি শীঘ্রই সুখ্যাতি লাভ করিব। তুমি আগে যাও, আমি সন্ধ্যাবেলা যাইব।

নলিনী ঈষৎ রুষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথার মানে বুঝিতে পারিলাম না।"

নীলু। অর্থাৎ—ওঁরা বড়লোক। বড়লোকের হৃদয় জোড়া দিতে গেলে পয়সা চাই। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর অনেক টাকা আছে, ছেলের অসুখে হাত দরাজ ক'রবেন, তা নিশ্চয়। কেবল তোমার হাতযশের অপেক্ষা।

নলিনা দেবী ঈষৎ কটাক্ষের সহিত বুঝাইয়া দিলেন, "আচ্ছা।"

০ ৩ ০

বলা বাহুল্য, খুদীরামের নিদ্রাভঙ্গের পরই জ্বর আসিয়াছিল। বিলক্ষণ কাতরোক্তি ও ঘন ঘন প্রলাপ। গা তত গরম নয়।

মাতা দিগম্বরী বলিলেন, "বাবার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে।" সরলা কাঁদিয়া সই নলিনীকে চিঠি লিখিয়াছিল,—"ওকেঁ পাঠাইয়া দাও।"

নীলু ডাক্তার সন্ধ্যাকালে আসিয়াই বলিলেন, "ঘরের দোর জানলা সব খুলিয়া দাও।" ক্রমে হৃদয়, নাড়ী, তাপমান প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমেই দিগম্বরী ঠাকুরাণীর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। "এটা কি কোনও সাংঘাতিক ব্যামো? হয় ত আরও ডাক্তার ডাকাই।"

নীলু। কোনও দরকার নাই। আপনি প্রথমে লক্ষণগুলি বলুন।

দিগম্বরী। কেবল ঘুমটা বড় বেশী।

নীলু। এবং জিহ্বা রক্তবর্ণ। বোধ হয়—কেন—নিশ্চিত—'সেপটিক্ পয়জনিং' হইয়াছে। অর্থাৎ খাবার সঙ্গে বিষ ঢুকিয়াছে।

দিগম্বরী। তা তো সম্ভব নয়। বউমা যে নিজে রাঁধেন।

নীলু। কিন্তু হয়ত রাঁধিতে রাঁধিতে কাঁদেন। স্ত্রীলোকের চক্ষে ভয়ঙ্কর 'ব্যাসিলি' থাকে। চক্ষের জলের সহিত খাবারে গিয়া পড়ে। তাহা খাইয়া পুরুষগুলো হীনবল, নিস্তেজ ও বিষাক্ত হয়।

দিগম্বরী। আমি পূর্ব্বে ত এরূপ শুনি নাই।

নীলু। পূর্ব্বে ইহার তদন্তই হয় নাই। বাঙ্গালী যে বীর্যহীন, তাহার কারণ বউমাদের অবিরত ক্রন্দন, বৃথা ক্রন্দন, অকারণ সন্দেহ ও ক্রন্দন, অনিবার্য্য দুঃখ ও ক্রন্দন। কান্নার সহিত 'ইউরিক অ্যাসিড্' থাকে। উহাও বিষ। তদুপরি 'ব্যাসিলি'।

দিগম্বরী সত্রাসে বলিলেন, "বাবা, আমিও ত অনেক সময় কাঁদি।"

নীলু। সেটাও খারাপ। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ এই জন্য বিধবাদিগকে হরিনামের মালা জপিতে দিতেন, এবং সধবাগণ কজ্জল পরিতেন। উদাহরণ, মহাভারতে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহার উপর আর কাঁদিতে সাহস করিলেন না।

"তবে কি ইহার ঔষধ নাই?"

নীলু। এখন কেবল ব্র্যাণ্ডি এবং ষ্ট্রীক্নিয়া। বুঝিলেন? নচেৎ হয় তো নিউমোনিয়া কিংবা 'হার্টফেলিওর' হইতে পারে। অর্থাৎ হৃদয় বন্ধ হইয়া যাইবে। ভালবাসিবার উপায় থাকিবে না।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী সভয়ে জগদীশ্বরকে ডাকিলেন। নীলু ডাক্তার বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, আপনি একটু বাড়ীর মধ্যে গিয়া বউকে সান্ত্বনা দান করুন, সেখানে আমার বাড়ীর লোকও আছে।"

০ ৪ ০

নীলকণ্ঠ রোগীর নিকট গিয়া বসিলেন। খুদীরাম সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিল, "মা—এখানে নাই ত?"

নীলু। না ; থাকিলেও হানি কি ? ‘বিপদে ধৈর্য্য, এবং অভ্যুদয়ে ক্ষমা।’ এখন তোমার মতলব কি বলত ?

খুদী। আমার সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছে।

নীলু। সেটা ও সকলেরই হয়।

খুদী। ঘুম বাড়িয়াছে।

নীলু। সে কেবল আকণ্ঠ খাইয়া। পূর্ব্বে যখন হোটেলে খাইতে, তখন স্ফুর্ত্তি ছিল।

খুদী। নীলু! সংসারে সব দিন সমান যায় না। ক্রমে জীবের প্রসারণ হয়। যে পথে যাইতেছে, সে পথে আলোক আসিয়া পড়ে।

নীলু কাজেই মায়া মমতা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু বোধ হয় জান যে, সাড়ে তিন হাতের অধিক প্রসারণ এ যুগে অসম্ভব। তাল গাছের মত উঁচু হইতে গেলে মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিতে হয়। তোমার এখন ইচ্ছা কি ?

খুদী। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, আমার সংসারধর্ম্মে ইচ্ছা নাই।

নীলু। এ ত গেল মানসিক। শারীরিক লক্ষণটা কিরূপ ?

খুদীরামের মতে তাহার বুকের বামভাগে ধড়ফড় করে, সংসারের কথা ভাবিলেই ঘুম আসে, ঘুম না আসিলে পাগলের মত হইয়া যায়। যদি ঘুমও না আসে ও পাগলের মত না হয়, তবে তীব্র যাতনা বোধ হয়।

নীলু। প্রলাপটা কি স্বাভাবিক ?

খুদীরাম। দুই চারি দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ছুটি না লইলে চলিবে না।

নীলু। আমি তোমার বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। তুমি এখন একটু ঔষধ খাও। রাত্রিকালে আজ বাগানবাটীর ঘরে শুইয়া থাকিও।

ঔষধ দুই একবার খাইয়া, এবং বাগানবাটীর আবাসে শুইবার প্রস্তাবনা ভাল মনে করিয়া, খুদীরাম অনেক সুস্থ বোধ করিল। ক্রমে মন খুলিয়া গেল, এবং ঘুমাইয়া পড়িল। নীলু ডাক্তার দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে বানপ্রস্থের কথাটা বুঝাইয়া বলিলেন।

দিগম্বরী। বাবা, বানপ্রস্থ কোথায় ?

নীলু। ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে। কিন্তু আপাততঃ আপনি বাগানবাটীতে একবার বউমাকে পাঠাইয়া দিন—কেন না, রোগের সময় একলা ফেলিয়া রাখা ভাল নয়।

০ ৫ ০

রাত্রি গভীর। বাগানটা নীরব, কিন্তু লতাপাতার মধ্যে ঝিল্লীরব প্রতিধ্বনিত

হইতেছিল। খুদীরামের স্বহস্ত-সিক্ত জলের গুণে বৈশাখ মাসেই বেলা, চামেলী প্রভৃতি ফুটিয়া উদ্যানবাটী আমোদিত করিতেছিল।

চাঁদ উঠে নাই, কিন্তু উঠিবার সময় হইয়াছিল। না উঠিলেও ক্ষতি ছিল না ; কেন না, আঁধারই হতাশের আশ্রয়।

মলয় বহে নাই, বোধ হয় বহিবে ; কারণ, দক্ষিণ দিকের কামিনী বৃক্ষের শীর্ষ ঈষৎ দুলিতেছিল।

খুদীরামের লক্ষণ একটু ভাল। ছয় আউন্স ব্রাণ্ডি ও এক গ্রেণ ষ্ট্রীক্‌নিয়ার পর হৃদয় ক্রমে সংসারের দিকে প্রসারিত হইতেছিল।

খুদীরামের একাকী শুইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। একাকী থাকা নীতিবিরুদ্ধ। আশ্চর্য্য! জগতে ইহা কেহ বুঝে না। অথচ অদ্বৈতবাদ চাহে! স্বয়ং ঈশ্বরই জগৎ লইয়া আছেন, তখন মানুষের বাবার সাধ্য কি যে, জগৎ ছাড়িয়া যায়?

অতএব, একাকী থাকা অন্যায় ভাবিয়া খুদীরাম পুকুরের পাড়ে গেল। চাঁদ তখন উঠিতেছিল। সেই চন্দ্রালোকে খুদীরাম দেখিল, সোপানের উপর একটি রমণী নিদ্রিতা।

খুদীরাম বুঝিতে পারিল। নিকটে গিয়া দেখিল, একগাছি দড়ি ও একটা কলসী।

খুদীরাম বুঝিল, বাড়াবাড়ি হইয়াছে। পদাঘাতে কলসী জলে ফেলিয়া দিল, এবং ঘুমন্ত সরলাকে উঠাইয়া লইয়া উদ্যান-আবাসে আসিল।

খুদীরাম ডাকিল, "সরলা।"

সরলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া আবার মুদ্রিত কবিল।

খুদীরাম বলিল, "সরলা, আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু তুমি এ পর্য্যন্ত কথাটা বুঝ নাই। আমার ভালবাসিবার অবকাশ ছিল না।"

"কিন্তু ঘুমাইবার ছিল"—ইহা বলিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল।

খুদীরাম বলিল, "সরলা! এখনও বুঝিতে পার নাই। আমি চালাকী করিয়াছিলাম। নচেৎ তোমাকে পাইতাম না। বানপ্রস্থের ব্যবস্থা না হইলে তোমায় চিরকাল রাঁধিতে ও কাঁদিতে হইত। এখন আর হইবে না।"

সরলা বোকা মেয়ে। প্রথমে বুঝে নাই। যখন নলিনী দেবী তাহাকে দড়ি ও কলসী লইয়া যাইতে শিখাইয়া দিয়াছিল, তখনও বুঝে নাই। এখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইল।

"ছি! মাকে এমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই।"

খুদীরাম বুঝাইয়া দিল যে, ফাঁকি দেওয়া বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য, এবং যখন সরলার ছেলে পুলে হইবে তখন তাহারাও ফাঁকি দিবে।

খুদীরামের অভাবনীয় রোগমুক্তির পরিচয় পাইয়া দিগম্বরী ঠাকুরাণী নীলু ডাক্তারকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "অদ্যাবধি হরিনামের মালাই জপ করিব।"

প্রেরণা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৮১)

প্রমীলা সেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পরিবার অর্থে তিনটি প্রাণী: বিধবা জননী বিজনবাসিনী, এগার বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই সমর ওরফে ভোলা, এবং বাইশ বৎসর বয়সের অনূঢ়া কন্যা সে নিজে।

বাইশ বৎসর বয়সে প্রমীলার বিবাহের বয়স হয় নি, তা বলা চলে না। আর, এ কথা একেবারেই বলা চলে না যে, তার বিবাহের এ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা-চরিত্র হয় নি। উপস্থিত সপ্তম পাত্রের পালা চলছে; তৎপূর্বে যে ছয়টি পাত্র পর্যায়ক্রমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা-চরিত্রের সীমান্তরেখা পর্যন্ত লড়ালড়ি ক'রে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে তাদের প্রত্যেকেরই ওজন দেখে বিজনবাসিনী সন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু প্রমীলা কাউকেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় নি। প্রত্যেককেই সে একই কথা ব'লে ভাগিয়েছে,—'বিয়ে করতে প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

এই পাষণ্ড প্রেরণা বস্তুটি প্রমীলার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে জমাট বেঁধে ঘুমিয়ে আছে, এবং কি উপায়ে তাকে জাগ্রত করা যায়, তা আবিষ্কার করবার জন্য পাত্রগণের উৎসাহ এবং তৎপরতার অন্ত ছিল না। ব্যারিস্টার বেসুরা কণ্ঠে গান গেয়েছে, এঞ্জিনিয়ার খণ্ডিত ছন্দে কবিতা লিখেছে, ব্যবসাদার গ্যালন-গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে একই উত্তর লাভ করেছে, 'প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

০ ২ ০

ছুটির দিন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। স্নানের জন্য উঠি-উঠি মন সত্ত্বেও একটা বই ছেড়ে প্রমীলা উঠতে পারছে না, এমন সময়ে বিজনবাসিনী কক্ষে প্রবেশ করল। প্রমীলার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বন্ধ ক'রে টেবিলের উপর রেখে বললে, "হ্যাঁ রে মীলা, আট-দশ দিন ধ'রে প্রদোষ আর আসছে না কেন শুনি?"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে তুমি কম দিতে পারবে না মা। কেন তিনি আসছেন না, সে কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা যা বলব, তা হবে অনুমান।"

"তাকেও তুই জবাব দিয়েছিস তা হ'লে?"

দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু বিজনবাসিনীর প্রতি স্থাপিত ক'রে প্রমীলা বললে, "জবাব বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও তা আগে বল ?"

মনটা পূর্ব হতেই তিক্ত হয়ে ছিল, তদুপরি কন্যার এই ন্যাকামি-মিশ্রিত বাক্য শুনে একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে বিজনবাসিনী বললে, "বোঝাতে চাই তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। কি হতভাগা মেয়েই না গর্ভে ধরেছিলাম।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "গর্ভে ধ'রে ভাল করেছিলে তা বলছি নে, কিন্তু হতভাগা ব'লে গাল যদি দাও, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। তোমার মতো যার মা আছে সে হতভাগা, এ কথা ভগবান এসে বললেও বিশ্বাস করব না।"

একটা-কোনো উচিতমতো উত্তর সহসা খুঁজে না পেয়ে বিজনবাসিনী বললে, "না, তা কেন করবে।" তারপর হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, তোকে নিয়ে আমি কি করি, বল্ দেখি মীলা ?"

মৃদু হেসে প্রমীলা বললে, "পালিয়ে যাও মা। আমাকে নিয়ে এমন কোনো দেশে পালিয়ে যাও, যেখানে তোমাকে দুঃখ দিতে আর আমাকে জ্বালাতন করতে বিয়ে-পাগলার দল নেই।"

বিরক্তি-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "তুই ওদের বিয়ে-পাগলার দল বলছিস ?"

বিজনবাসিনীর কথার ভঙ্গী দেখে প্রমীলার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য দেখা দিল; বললে, "বলব না কেন মা ? তুমি তো স্বচক্ষে পড়েছ অজয় দত্তের কবিতা, আর স্বকর্ণে শুনেছ তারক মিত্তিরের গান। আচ্ছা, তুমিই বল, ওদের পাগল বললে খুব অন্যায় করা হয় কি ?"

কবিতা এবং গানের উল্লেখে বিজনবাসিনীরও মুখে হাসি দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু পাছে হাসি দেখে অবাধ্য কন্যা আস্কারা পায় সেই ভয়ে হাসি দমন ক'রে গম্ভীর মুখে বললে, "প্রদোষও গান গায় ?—কবিতা লেখে ?"

মাথা নেড়ে প্রমীলা বললে, "না, ও দুটি গুণ ওঁর আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ও। ঐ দুটি গুণই ওর আছে, আর কোনো গুণ নেই। তোর মতলব কি বল্ দেখি মীলা ?"

হাসিমুখে প্রমীলা বললে, "আমার মতলব অসাধু নয় মা। আমার মতলব তোমার সেবায় আর ভোলাকে মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করা।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ওঃ। ঢং দেখে বাঁচি নে। আমার

সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন। প্রদোষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলে তোর জীবন ধন্য হ'ত তা ভাল ক'রে জেনে রাখিস। তুই তার ক'ড়ে আঙুলেরও যোগ্য নোস্।"

"হাতের, না, পায়ের?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঔৎসুক্যের সহিত বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কি হাতের, না পায়ের?"

"ক'ড়ে আঙুল?"

"পায়ের, পায়ের, পায়ের।" বিজনবাসিনী তর্জন ক'রে উঠল।

ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আমি তো তোমারও পায়ের ক'ড়ে আঙুলের যোগ্য নই, তাই ব'লে কি মা, তোমাকে বিয়ে করতে হবে?"

"আমি কি, তোমাকে বিয়ে করবার জন্য গান গাচ্ছি, না, কবিতা লিখছি?" ব'লে রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজনবাসিনী দুদ্দাড় ক'রে প্রস্থান করলে।

কৌতুকমিশ্রিত সুমিষ্ট হাসির দ্বারা মুখমণ্ডলকে অপূর্ব ক'রে প্রমীলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে ব'সে রইল, তারপর ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে পূর্বোক্ত বইখানাকে শেল্‌ফের মধ্যে তুলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

প্রদোষের বিষয়ে এত কথার পর এ কথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সে প্রমীলার পাণিপ্রার্থী সপ্তম পাত্র। বিজনবাসিনীর যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় পূর্বতন ছয়টি পাত্রের মধ্যে কারো অপেক্ষা সে লঘু নয়।

০ ৩ ০

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পর প্রদোষ এসে উপস্থিত।

পরীক্ষা নিকটবর্তী ব'লে সন্ধ্যা থেকে ভোলা পাঠে মনোনিবেশ করেছিল; এবং প্রদোষ ও প্রমীলা একান্ত আলাপের সুযোগ পেলে তা থেকে সুবিধাজনক কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে মনে করে বিজনবাসিনী প্রদোষকে চা-খাবার খাইয়ে নিজ শয়নকক্ষে 'অমিয়-নিমাইচরিত' খুলে আত্মগোপন করেছিল।

দু-চারটে সাধারণ কথার পর আসল কথা উঠল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "এত দিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু?"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "বোধ হয় আসবার প্রেরণা পাই নি ব'লে।"

প্রমীলার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, তারই কড়িতে প্রদোষ তার দেনা পরিশোধ করলে। পাল্টা আঘাতটুকু বিনা প্রতিবাদে পরিপাক ক'রে সে বললে, "আজ তবে কিসের প্রেরণায় এলেন?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়।"

প্রদোষের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়? কেন, ধন্যবাদের কি করেছি আমি?"

স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "আমার প্রতি সদয় হয়েছ।"

ততোধিক বিস্ময়ে প্রমীলা বললে, "সদয় হয়েছি? কিন্তু কোনো দিন তো আপনার প্রতি অসদয় ছিলাম না।"

"সর্বনাশ। যা ছিলে তাকে যদি সদয় থাকা ব'লে তা হ'লে তোমার সদয় থাকা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষে করুন।" ব'লে হো-হো ক'রে প্রদোষ হেসে উঠল। তারপর অভয়-দানের মিষ্টি সুরে বললে, "কিন্তু ঘাবড়াবার কারণ নেই। সদয় হয়েছ জাগ্রত জীবনে নয়, স্বপ্নে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমীলা বললে, "ও হরি! স্বপ্নে?" তারপরই মুখ ঈষৎ গম্ভীর ক'রে নিয়ে বললে, "ও কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নে প্রদোষবাবু।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "কি বিশ্বাস কর না? স্বপ্ন? না, স্বপ্ন দেখা?"

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে প্রমীলা টেবিলের উপরকার একটা কাগজ-চাপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রদোষ বললে, "বুঝেছি। তোমার পেপার-ওয়েটের নাড়াচাড়া দেখে বুঝতে বাকি নেই যে, তুমি বোঝাতে চাও, আমি স্বপ্ন দেখেছি সে কথাও তুমি বিশ্বাস কর না। তর্কের খাতিরে যদি ধ'রে নেওয়াই যায় যে, বস্তুত আমি স্বপ্ন দেখি নি, কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে মিথ্যা স্বপ্নের ওজুহাত তুলেছি, তা হ'লেও এ মিথ্যার মূল্য আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "থাকলেও, সে মিথ্যার মূল্য এত অল্প যে, তার দ্বারা বিশেষ কিছু মূল্যবান বস্তু কেনা যায় না।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "তুমি যে শুধু মূল্যবান নও, অক্রেয়ও,—তা আমি জানি প্রমীলা। It is better to have tried and failed, than never to have tried at all—তোমার সঙ্গে আমি সেই খেলা খেলছি। অপরকে চেষ্টা ক'রে পাওয়ার চেয়ে তোমাকে চেষ্টা ক'রে না পাওয়া আমি শ্রেয় মনে করি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "ভুল মনে করেন প্রদোষবাবু। অপাত্রে এত মূল্য আরোপ করবেন না।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাসিমুখে প্রদোষ বললে, "ভুল মনে করি, কি ঠিক মনে করি, সে কথা না হয় বাড়ি গিয়ে একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখা যাবে,—আপাতত চললাম।"

"কোথায় ?"

"বন্ধুবান্ধবের সন্ধানে। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কোনো লাভ নেই।"

"তা হ'লে এখানেই তো আর কিছুক্ষণ থাকতে পারতেন ?"

"যে গাছের ফুল অধিকারে আসবার সম্ভাবনা নেই, সে গাছের তলায় বিলম্ব ক'রে কোনো লাভ আছে কি ?" ব'লে প্রদোষ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল ; তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, "মনস্তত্ত্বের একটা ছোট্ট কথা বলব ?"

স্মিতমুখে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা ?"

"তোমার মনে প্রেরণা জাগবার যদিই বা ছায়ার মতো কোনো ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে তো এ তোমাকে নিশ্চয় বলছি, নিজেকে অযথা সস্তা করলে একেবারেই তা লুপ্ত হবে।" ব'লে প্রদোষ আর-এক দফা উচ্চহাসি হাসলে।

প্রমীলা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না ; শুধু তার ওষ্ঠাধরে কৌতুকের অতি ক্ষীণ নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কবে আসবেন ?" কিন্তু প্রদোষ কোনও উত্তর দেবার পূর্বেই ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, উত্তর দিতে হবে না আপনাকে,—আমি আমার প্রশ্ন তুলে নিচ্ছি। 'যে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই, সে গাছতলায় আবার একদিন এসে কি লাভ ?'—এই ধরনের একটা উত্তর দেবেন তো ?"

প্রমীলার কথা শুনে প্রদোষ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "আমার মন তোমার কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে প্রমীলা। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।"

প্রদোষ প্রস্থান করবার পর বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "প্রদোষ অত হাসছিল কেন রে মীলা ?"

প্রমীলা বললে, "জোরে জোরে ?"

"জোরে জোরে না তো কি মুচকি হাসির কথা জিজ্ঞাসা করছি ? কথা শুনে গা জ্বলে।"

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "অল্প কারণে প্রদোষবাবু জোরে জোরে হাসেন।"

"তাই তো। প্রদোষবাবুর আর কাজ নেই, অল্প কারণে জোরে জোরে হাসেন। এত শীগ্‌গির চ'লে গেল যে ?"

"ভোলা রইল পড়ায় ব্যস্ত, তুমি দিলে ঘরে ঢুকে গা-ঢাকা,—একা আর আমার সঙ্গে কত গল্প করবেন ?"

"অত ঢঙের কথা শোনবার আমার সময় নেই।" ব'লে বিজনবাসিনী বিরক্তিবিরূপ মুখে প্রস্থান করলে।

০ ৪ ০

মাস দুই পরে আবার একদিন প্রদোষ এসে দেখা দিলে। ভদ্রতা রক্ষার্থে প্রমীলাকে বলতেই হ'ল, "এতদিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু?"

স্মিতমুখে প্রদোষ উত্তর দিলে, "স্বপ্ন দেখি নি ব'লে।"

"কি আশ্চর্য! স্বপ্ন দেখলে তবে আপনি আসবেন?"

"সব স্বপ্ন দেখলেই নয়,—যে স্বপ্নে আমার প্রতি তুমি সদয় হবে, সেই স্বপ্ন দেখলে আসব।"

"দেখেছেন না-কি স্বপ্ন?"

"দেখেছি,—কাল ভোর রাত্রে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "আপনার ঘুম হয় প্রদোষবাবু?"

উৎসাহভরে প্রদোষ বললে, "গভীর ঘুম হয়। পড়ি আর ঘুমুই।"

"তবে বোধ হয় আপনার ঠিক হজম হয় না।"

"ক্ষেপেছেন! সকালে উঠে ক্ষিদের চোটে কি খাই কি খাই, টেবিল খাই, না চেয়ার খাই, করি।"

"তবে এত স্বপ্ন দেখেন কেন?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে প্রদোষ বললে, "কিন্তু দেখি ব'লে তো তুমি বিশ্বাস কর না প্রমীলা?"

প্রদোষের কথা শুনে প্রমীলার মুখে অপ্রতিভতার ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে। কতকটা যেন নিজেকে সংশোধিত করার ছলেই বললে, "তাও বটে।" তারপর প্রদোষের প্রতি মুখ তুলে সহজভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরাই যদি যায় যে, দেখেন,—তা হ'লে সে কথাটুকু কোন্ লাভের জন্যে আমাকে জানাতে আসেন?"

শান্তকণ্ঠে স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "লাভের জন্যে আসি নে প্রমীলা, লোভে প'ড়ে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "লোভে প'ড়ে?—কিসের লোভ?"

"এইটুকু সুসংবাদ তোমাকে জানাবার লোভ যে, 'আমারও ভাগ্যে পড়ে দি, পড়ে নি কেবলই ফাঁকি।' স্বপ্নে-পাওয়া অবশ্য ষোল-আনা পাওয়া নয়; কিন্তু ষোল-আনা না-পাওয়া, তাও আমি মনে করি নে।" ব'লে প্রদোষ উঠে দাঁড়াল।

প্রমীলাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চললেন?"

প্রদোষ বললে, "নিঃসন্দেহ।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এত শীগ্‌গির কেন চললেন, সে কথাও তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই।"

"কেন বল দেখি?"

"বলাবেন, বেশিক্ষণ থেকে নিজেকে সস্তা করতে নেই।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে প্রদোষ বললে, "সে কথা মনে আছে তোমার?— আর সে কথা মনে নেই?"

"কোন্ কথা?"

"সুদূর সম্ভাবনার কথা?"

প্রমীলার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, তা-ও আছে।"

০ ৫ ০

মাত্র দিন-ছয়েক পরে প্রদোষকে পুনরায় আসতে দেখে প্রমীলা ঈষৎ বিস্মিত হ'ল। কিন্তু এমন কোন কথা সে বললে না, যাতে তার বিস্ময় প্রকাশ পায়।

কথাটা তুললে প্রদোষ নিজেই; বললে, "এবার এত শীগ্‌গির এলাম ব'লে মনে ক'রো না বিনা-স্বপ্নে এসেছি।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসবার তো কথা নেই আপনার।"

"না, তা নেই। একটা কথা তুমি কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবে প্রমীলা।"

"কি কথা?"

"গত দুবারের স্বপ্ন দেখার আমি শুধু জানান্-ই দিয়ে গেছি; স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে তোমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করি নি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আপনার সে রুচিবোধের জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রদোষবাবু।"

প্রদোষ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু এবারকার স্বপ্ন এমন যে, এবারকার স্বপ্নের বিরবণ দিলেই তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। তবে স্বপ্নের কাহিনী শুনে তোমার মুখে কৌতুকরসের যে সুমিষ্ট হাসিটুকু ফুটে উঠবে, তা-ই হবে আমার-দেখা তোমার মুখের শেষ হাসি।"

পরম কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কারণ, এর পর স্বপ্ন দেখে তোমাকে জানাতে এলে তা হবে ভূতের স্বপ্ন দিয়ে তোমাকে ভয় দেখানো।"

"তার মানে?"

"স্বপ্নের কাহিনী শুনলে তার মানে আপনিই বোঝা যাবে। বলব?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে প্রমীলা বললে, "বলুন।"

মনে মনে একটু-কি ভেবে নিয়ে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন রোগশয্যায় শুয়ে আছি; একজন ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টেথোস্কোপ নাড়তে নাড়তে বললে, আর আশা নেই।....আত্মীয়রা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। এমন সময়ে তুমি এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনছেন? আপনি ম'রে যাচ্ছেন'।....আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনছি'। তার উত্তরে তুমি বললে, 'আপনি মরছেন, কিন্তু আমি বাঁচলাম'।....ঘুম ভেঙে দেখি, কাক-কোকিল ডাকছে। ভারি মজার স্বপ্ন, নয় প্রমীলা? ....এ কাহিনীতে কিন্তু তোমার বিব্রত হবার মতো কোনো ঘটনা নেই।"

প্রমীলা কোনো উত্তর দিলে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন অবশ্য স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়,—কিন্তু তাই ব'লে স্বপ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একজনের নিশ্চেতন মনের গভীর চিন্তা অথবা বাসনা অপর একজনের নিশ্চেতন মনে প্রতিফলিত হয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখায়।"

এ কথারও প্রমীলা উত্তর দিলে না।

০ ৬ ০

পরদিন সকালে প্রদোষ চা-পানান্তে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, এমন সময়ে প্রমীলার ভাই ভোলা এসে পাশে দাঁড়াল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভোলাকে দেখে সহাস্যমুখে প্রদোষ বললে, "কি ভোলা, কি খবর?"

ভোলা বললে, "আজ সন্ধ্যার সময়ে দিদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।"

"আমাকে যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকে।"

"ঠিক শুনেছ?"

"ঠিক শুনেছি।"

"কি নাম বল দেখি আমার?"

নিঃশব্দে হাসির দ্বারা এই পরিহাসমূলক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গমনোদ্যত হয়ে ভোলা ফিরে তাকিয়ে বললে, "নিশ্চয় যাবেন, নইলে দিদি রাগ করবেন।"

যথাকালে প্রমীলার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রদোষ বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কারণ তোমার তলব পেয়ে এসেছি।"

প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আপনি আসেন নি।"

গভীর বিস্ময়ে প্রদোষ বললে, "আসি নি? কেন বল দেখি?"

"বসুন, বলছি।"

একটা চেয়ার টেনে ব'সে সকৌতূহলে প্রমীলার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রদোষ বললে, "বল।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে প্রমীলা বললে, "কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ? কি স্বপ্ন দেখেছ?"

প্রমীলার মুখমণ্ডল টকটকে হয়ে উঠল। একবার প্রদোষের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে সে বলতে লাগল, "স্বপ্ন দেখেছি, যেন বিয়ে-বাড়ি, হৈ-চৈ হচ্ছে, বাজনা-বাদ্যি বাজছে....আমি কনে সেজে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে ব'সে আছি। এমন সময় শাঁক বাজল,....বর এলেন আপনি। আর....আর.... আমি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার গলায়...."

"মালা দিলে?"

"দিলাম।"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "কিন্তু স্বপ্নের প্রসঙ্গকে আমরা তো মিথ্যা ব'লে সন্দেহ করি প্রমীলা?"

আরক্তমুখে প্রমীলা বললে, "মিথ্যা হ'লেও সে মিথ্যার মূল্য আছে।"

উত্তেজনার বশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদোষ বললে, "আছে? ....আছে প্রমীলা?—তা হ'লে কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে প্রেরণা জাগল?"

প্রদোষের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে মৃদুস্বরে প্রমীলা বললে, "বোধ হয়।"

তিলোত্তমা

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

(১৮৮০)

সিদ্ধিনাথের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। বিদ্যার খ্যাতি আছে, সরকারী কলেজে পড়াতেন, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি ছেড়ে তিন বৎসর প্রায় নিষ্কর্মা হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির উৎপত্তি সম্বন্ধে থিসিস লিখে পি, এচ, ডি, ডিগ্রী পেয়েছেন।

সিদ্ধিনাথের বাল্যবন্ধু উকিল গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে যথারীতি সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। উপস্থিত আছেন—গোপালবাবু, তাঁর পত্নী নমিতা, নমিতার ছোট বোন (সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী) অসিতা, অসিতার স্বামী রমেশ ডাক্তার, আর সিদ্ধিনাথ। সিদ্ধিনাথের বাড়ি খুব কাছে। তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে পুরুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।

আড্ডারম্ভে গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, তুমি ডক্টরেট পেয়েছ তাতে আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি। এই সম্মান অবশ্য তোমার বিদ্যার তুলনায় কিছুই নয়, তবে শোনায় ভাল—ডক্টর সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্জি। নমিতা তোমাকে আর অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

নমিতা বললেন, ডক্টর একটা নিতান্ত বাজে উপাধি, গণ্ডা গণ্ডা ডক্টর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি ওঁকে একটা ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

অসিতা বলল, মানে কি দিদি?

মানে খুব সোজা। যে বকে সে বক্তা, আর যে বক বক করে সে বকবক্তা।

সিদ্ধিনাথ বললেন, থ্যাংক ইউ নমিতা দেবী, আপনার প্রদত্ত উপাধিটির মর্যাদা রাখতে আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।

নমিতা বললেন, তবে আর সময় নষ্ট করেন কেন, আপনার বকবক্তৃতা এখনই শুরু করুন না।

—কোন্ বিষয় শুনতে চান? শংকরের অদ্বৈতবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, শারীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, না পরলোকতত্ত্ব?

গোপালবাবু বললেন, ওসব নীরস তত্ত্ব শুনতে চাই না। প্রেমের কথা যদি তোমার কিছু জানা থাকে তাই বল।

—হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আমি নিজেই একবার বিশ্রী রকম প্রেমে পড়েছিলুম।

নমিতা বললেন, আস্পর্ধা কম নয়! বাড়িতে পাহারাদার গিন্নী থাকতে প্রেমে পড়লেন কোন্ আক্কেলে? বলতে লজ্জা হয় না?

—মানুষের যা স্বাভাবিক ধর্ম তা স্বীকার করতে লজ্জা হবে কেন? আপনার মুখেই তো শুনেছি যে অসিতার বউভাতের ভোজে আপনি গব গব করে চার গণ্ডা ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই খেয়েছিলেন। তার জন্যে তো আপনাকে রাক্ষুসী কি মেছো পেতনী বলছি না।

গোপালবাবু বললেন, আঃ ঝগড়া কর কেন। নমিতা, সিধুকে বলতে দাও, তোমার মন্তব্য শেষে ক'রো।

সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলেন।—ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার বিবাহের আগে। গিন্নী থাকতে প্রেম হবার জো কি! তখন বয়স বাইশ-তেইশ, পোস্ট-গ্রাজুয়েটে পড়ি, বাবা মা দুজনেই বর্তমান। ওহে রমেশ ডাক্তার, তোমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে তো—কোনও দেশে একটা নতুন ব্যাধি যদি আসে তবে প্রথম প্রথম তা মারাত্মক হয়, কিন্তু দু-এক শ বছর পরে তার প্রকোপ অনেক কমে যায়?

রমেশ বলল, আজ্ঞে হাঁ, কোনও কোনও রোগের বেলা তাই হয় বটে।

—প্রেমও সেই রকম ব্যাধি। এর তিন দশা আছে। প্রাইমারি স্টেজে প্রেম হল নাইন্টি পারসেণ্ট লালসা, টেন পারসেণ্ট ভালবাসা। সেকেণ্ডারি স্টেজে হাফ অ্যাণ্ড হাফ। টারশারিতে প্রায় সবটাই ভালবাসা, নামমাত্র লালসা। পুরাকালে পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম আক্রমণ অতি সাংঘাতিক হত। কাদম্বরীতে বাণভট্ট লিখেছেন—মহাশ্বেতার প্রেমে পড়ে পুণ্ডরীক হার্ট ফেল করে মারা যান। আরব্য উপন্যাসের অনেক নায়ক নায়িকা প্রেমে শয্যাশায়ী হত। অমন যে জবরদস্ত রাজর্ষি আরংজেব বাদশা, তিনিও প্রথম যৌবনে গোলকুণ্ডার এক নবাবনন্দিনীকে দেখে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। আজকাল এরকম বড় একটা দেখা যায় না, কারণ মেয়ে পুরুষ সবাই খুব হিসেবী হয়েছে। কিন্তু দৈবক্রমে আমি যে প্রেমের কবলে পড়েছিলুম তা সেই সেকেলে ভিরুলেণ্ট টাইপের। তবে বেশী ভুগতে হয় নি, চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে উঠি।

নমিতা বললেন, কিসে সারল? পেনিসিলিন, না খ্যাপা কুকুরের ইঞ্জেকশন?

—ওষুধের কাজ নয়। গুরুর কৃপায় সেরেছিল।

—আপনি তো পাষণ্ড লোক, আপনার আবার গুরু কে?

—যিনি জ্ঞানদাতা বা শিক্ষাদাতা তিনিই গুরু। সম্প্রতি আমার দুটি গুরু জুটেছে—আমার ছাত্র পরাশর হোড়, আর এ পাড়ার বকাট ছোকরা গুলচাঁদ। পরাশরের কাছে কবিতা রচনা শিখছি, আর গুলচাঁদের কাছে বাইসিক্‌ল চড়া।

অসিতা বলল, সার, আপনি তো বলতেন যে, কাব্যচর্চা আর গাঁজা খাওয়া দুই সমান, তবে শিখছেন কেন? কিছু লিখছেন নাকি?

—রাম বল। লেখবার জন্যে শিখছি না, শুধু কবিতা লেখার প্যাঁচটা জানতে চাই। আর বাইসিক্‌ল শিখছি ট্রাম বাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্যে। দেখ অসিতা, কবিতা লেখা অতি সোজা কাজ, মাসখানিক প্র্যাকটিস করলে তুমিও পারবে, হয়তো তোমার দিদিও বছরখানিক চেষ্টা করলে পারবেন। কেন যে লোকে কবিদের খাতির করে—

নমিতা বললেন, বাজে কথা রাখুন। কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? অত চট করে সারলই বা কি করে? প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে ঠেঙিয়েছিল নাকি?

—ধৈর্য ধরুন, যথাক্রমে সবই শুনবেন। প্রেমে পড়ার চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কাবু হয়েছিলুম। আহারে রুচি নেই, মাথা টিপটিপ করে, বুক টিপ টিপ করে, ঘুম মোটেই হয় না, লেখাপড়া চুলোয় গেল, চব্বিশ ঘণ্টা শয্যাশায়ী। মা বললেন, হ্যাঁরে সিধু, তোর হয়েছে কি? কপালটা যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। বাবা ডাক্তার ডাকলেন। নাড়ী জিব বুক পেট সব দেখে ডাক্তার বললেন, ডেংগু মনে হচ্ছে, ভয়ের কারণ নেই, নড়াচড়া বন্ধ রাখবে, লিকুইড ডায়েট চলবে। এক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল এখনই খাইয়ে দিন, আর দশ গ্রেন কুইনীন নেবুর রস দিয়ে জলে গুলে এবেলা একবার ওবেলা একবার। মুখটা তেতো রাখা দরকার।

রামদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্তচুঞ্চু তখন ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি নাগপুরে আছেন। বয়স বেশী নয়, আমার চাইতে ছ সাত বছরের বড়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা একটু রসিক হয়ে থাকেন। রামদাসও রসিক লোক, ছাত্রদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আমাকে তিনি বিশেষ রকম স্নেহ করতেন, কারণ বিদ্যায় আর রূপে আমিই ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলুম।

নমিতা বললেন, জন্ম ইস্তক বিদ্যের জাহাজ ছিলেন তা না হয় মানলুম, কিন্তু রূপ আবার কোথায় পেলেন? ওই তো গুলিখোরের মতন চেহারা, গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখ, শুওর কুঁচির মতন চুল—

—সকলেই আপনার মত অন্ধ নয়, সমঝদার রূপদর্শী লোক জগতে ঢের আছে। দুদিন আমাকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে চুঞ্চুমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধিনাথ কামাই করছে কেন? ছাত্ররা বলল, তার ভারী অসুখ। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বাবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে চুঞ্চুমশায় মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। অসুখ শুনে আমাকে দেখতে এলেন।

নমিতা বললেন, বকবক করে শুধু বাজে কথা বলছেন। প্রেমে পড়লেন অথচ প্রেমপাত্রীটির কোনও খবর নেই। তার নাম কি, পরিচয় কি, দেখতে কেমন, সব বৃত্তান্ত খুলে বলুন, আপনার রামদাস চুঞ্চুর কথা শুনতে চাই না।

—ব্যস্ত হবেন না, কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে সবই শুনতে পাবেন। মেয়েটি দেখতে কেমন তা জানবার জন্যে ছটফট করছেন, নয়? আচ্ছা এখনই বলে দিচ্ছি—অতি সুশ্রী গৌরী তন্বী, আপনার মতন গোবদা নয়, কালো নয়, হিংসুটেও নয়। গোপাল কি দেখে যে আপনার প্রেমে মজেছে তা বুঝতেই পারি না।

—বোঝবার কোনও দরকার নেই, পরচর্চা না করে নিজের কথাই বলুন।

—শুনুন। চুঞ্চুমশায় যখন দেখতে এলেন তখন আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি চিতপাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, কপালে ওডিকোলনের পটি, চোখে উদাস করুণ দৃষ্টি, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আঃ ইঃ উঃ এঃ ওঃ প্রভৃতি কাতর ধ্বনি বেরুচ্ছে।

রামদাস প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে সিদ্ধিনাথ?

বললুম, কি জানি সার। শরীর অত্যন্ত খারাপ, বড় যন্ত্রণা, আমি আর বাঁচব না।

চুঞ্চুমশায় আমার নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, বুকে আর পিঠে হাত বুললেন। তার পর ঠোঁট কুঁচকে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

—কিসের লক্ষণ পণ্ডিত মশায়?

—সাত্ত্বিক বিকারের অষ্ট লক্ষণ প্রকট হয়েছে—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা।

—সাত্ত্বিক বিকার মানে কি সার?

—মানে, তুমি ঘোরতর প্রেমে পড়েছ, সুদুস্তর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। ঠিক বলেছি কিনা?

আমি ঢাকবার চেষ্টা করলুম না, বললুম, আজ্ঞে ঠিক।

—পাত্রীটি কে? নামধাম বলে ফেল, যদি অলঙ্ঘনীয় বাধা না থাকে তবে সম্বন্ধের চেষ্টা করব।

—কোনও আশা নেই সার, বৈবাহিক অবৈবাহিক কোনও সম্পর্কই হবার জো নেই। আমার নাগালের একদম বাইরে।

চুঞ্চুমশায় বললেন, যদি নাগালের বাইরেই হয় এবং কোনও আশা না থাকে বৃথা তার চিন্তা করছ কেন? মন থেকে একেবারে মুছে ফেল।

—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি না যে।

—আচ্ছা তার ব্যবস্থা আমি করছি। আগে তার পরিচয় দাও।

আমি সবিস্তারে পরিচয় দিলুম। তাকে সিনেমায় দেখেছি, তিলোত্তমা ছবিতে নায়িকার পার্টে—

নমিতা বললেন, আরে রাম রাম, ছি ছি, এত ভনিতার পর সিনেমার অ্যাকট্রেস! ইস্কুলের চ্যাংড়া ছেলেরাই তো সে রকম প্রেমে পড়ে। ডক্টর সিদ্ধিনাথ বকবক্তার নজর অত ছোট তা মনে করি নি, একটা উঁচু দরের কিছু আশা করেছিলুম। অন্তত একটি পিস্তলওয়ালী অগ্নি-দিদি, কিংবা নাটোরের বনলতা সেন।

অসিতা বলল, অমন আশা করাই তোমার অন্যায় দিদি। এঁর তো তখন কম বয়স, ডক্টর বা বকবক্তা কোনও খেতাবই পাননি।

সিদ্ধিনাথ বললেন, ছি ছি করবার কোনও কারণ নেই, আমার মনোরথে আকাশের নক্ষত্র জোতা ছিল। তিলোত্তমা ছবিতে সে নায়িকা সাজত। তার নিজের নামও তিলোত্তমা। তার বাপ আর ঠাকুরদ্দা বাঙালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পাঞ্জাবী। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়ে মোটেই সুশ্রী নয়। জারুল কাঠের মত গায়ের রং, ছোট ছোট চোখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত মুখের হাঁ—যেন ইঁদুর ধরা জাঁতিকল, থুতনি এতটুকু। বিশ্বাস না হয় তো আরশিতে মুখ দেখবেন।

নমিতা বললেন, বাঙালী পুরুষদের চেহারা কেমন শুনবেন? আবলুস কাঠের মতন রং, চোয়াড়ে গড়ন—

সিদ্ধিনাথ হাত নেড়ে বললেন, থামুন থামুন, যা বলবার আড়ালে বলবেন, সামনাসামনি পতিনিন্দা মহাপাপ। যা বলছিলুম শুনুন। তিলোত্তমার দেহে চার জাতের রক্ত মিশেছিল, সেজন্যই সে অসাধারণ সুন্দরী। গোড়ালি পর্যন্ত চুল, চাঁপাফুলের মতন রং—

অসিতা বলল, রং কি করে টের পেলেন সার? তখন তো টেকনিকলার হয়নি।

—রংটা অনুমান করেছিলুম। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, পীনস্তনী, নিবিড়নিতম্বা। কালিদাস যাকে বলেছেন—যুবতিবিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি।

নমিতা বললেন, বিধাতার সৃষ্টি থোড়াই, আপনি আদেখলে হাঁদা ছিলেন তাই আসল রূপ টের পান নি। রং সুর্মা পরচুল তুলো আর খড় দিয়ে কি গড়া যায় তার কোনও আইডিয়াই আপনার নেই।

—হুঁ, রামদাস চুঞ্চুও তাই বলছিলেন বটে। তার পর শুনুন, তিলোত্তমার গলার আওয়াজ এত মিষ্টি যে তা বলবার নয়।

—উপমা খুঁজে পাচ্ছেন না? রুপুলী কণ্ঠস্বর বলা চলবে?

—ও হল ইংরিজীর অন্ধ নকল, কণ্ঠস্বর সোনালী রুপুলী হয় না। সোনা রুপোর আওয়াজও ভাল নয়। বরং ষ্টীলের তারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বীণার ঝংকার কিংবা দামী ঘড়ির গংএর ডিং ডং। তার পর শুনুন। রামদাস চুঞ্চু তিলোত্তমার বিবরণ শুনে প্রশ্ন করলেন, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

বললুম, আলাপ কোত্থেকে হবে সার, সে থাকে বোম্বাইএ। তাকে কোনও দিন সশরীরে দেখি নি, শুধু ছবিতেই তার মূর্তি দেখেছি, ছবিতেই তার কথা আর গান শুনেছি।

চুঞ্চুমশায় সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ। কায়া দেখ নি শুধু ছায়া দেখেছ। এখন শুয়ে শুয়ে ছায়াও দেখছ না শুধু মায়া দেখছ। ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। সাংখ্যদর্শনে বলে, প্রকৃতি এক আর পুরুষ অনেক। পুরুষ আসলে শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার, কিন্তু তার সামনে যখন প্রকৃতি সেজেগুজে নৃত্য করে তখন পুরুষের বিকার হয়, সে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রজ্ঞা লাভ করলেই পুরুষের নেশা ছুটে যায়, প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। তুমি একজন পুরুষ, তিলোত্তমা-রূপা প্রকৃতি তোমার সামনে নেচেছিল, এখনও তোমার মনের মধ্যে নাচছে, তাই তোমার এই দুর্দশা। বৎস সিদ্ধিনাথ প্রবুদ্ধ হও, তোমার পৌরুষ দেখাও, প্রকৃতিকে ধমক দিয়ে বল—দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মোহমুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ কর।

আমি বললুম, ও সব তত্ত্বকথায় কিছুই হবে না পণ্ডিত মশায়।

—বেশ, সাংখ্যে যদি কাজ না হয় তবে অদ্বৈতবাদ শোন। এই জগতে হরেক রকম যা দেখছ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধুই মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন, ক্লীবলিঙ্গ এবং তুমিই সেই ব্রহ্ম।

—বলেন কি সার! আপনি ব্রহ্ম নন?

—আমিও ব্রহ্ম। তিলোত্তমা, তোমার সহপাঠীরা, তোমাদের ভাইস চ্যান্সেলার, প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। সবাই এক, শুধু মায়ার জন্য আলাদা আলাদা বোধ হয়।

—আপনি বলতে চান তিলোত্তমা আর আমাদের বাড়ির কুঁজী বুড়ী ঝি দুই-ই এক?

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুন্দর বা কুৎসিত, সাধু বা অসাধু, সব

তুল্যমূল্য, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। বোকা লোক মনে করে এক সের তুলোর চাইতে এক সের লোহা বেশী ভারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইএরই ওজন সমান।

—মানি না সার। আপনি নীচের ওই উঠনে দাঁড়ান, আমি দোতলা থেকে আপনার মাথায় এক সের তুলো ফেলব, তার পর এক সের লোহা ফেলব। তার পরেও যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনার কথা মানব।

অট্টহাস্য করে চুঞ্চু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, গুরুমারা বিদ্যে এখনও তোমার হয় নি, একটু সায়েন্স প'ড়ো। তুমি গুরুত্ব আর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভার আর সংঘাত গুলিয়ে ফেলেছ।

আমি বললুম, যাই বলুন সার, আপনার অদ্বৈতবাদে কোনও ফল হবে না। তিলোত্তমা অলোকসামান্যা নারী, তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনাই হতে পারে না। তার চেহারা অভিনয় আর গান আমাকে জাদু করেছে।

চুঞ্চু মশায় বললেন, তবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ কর, যাকে বলে কমনসেন্স। পক্ষিরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, শিংওয়ালা খরগোশ—এসবে বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না, ওসব তো কল্পনা, কিন্তু তিলোত্তমা বাস্তব।

—একেবারেই ভুল। কবি খুব হাতে রেখেই বলেছেন—অর্ধেক কল্পনা তুমি অর্ধেক মানবী। তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনরো আনা কল্পনা। তুমি তার কতটুকু জান হে ছোকরা? তার মূর্তিটা জোড়াতালি দিয়ে তৈরী; তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্রিম মানবীর চিত্রার্পিত ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না, হয়তো খেঁকী কুঁদুলী, হয়তো নেশা করে, হয়তো দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কালচারও বিশেষ কিছু নেই।

একটু ভেবে আমি বললুম, পণ্ডিত মশায়, আপনার কথা শুনে এখন মনে পড়ছে—তিলোত্তমা সরোবরকে সড়োবড়, জিহ্বাকে জেহোভা, আর প্রেমকে ফ্রেম বলেছিল।

—তবেই বোঝ। তুমি আবার ভীষণ খুঁত-খুঁতে। যদি তোমাদের মিলন হয়, তার সঙ্গে তুমি যদি ঘর কর, তবে দুদিনেই তার গ্ল্যামার লোপ পাবে। সেকালে কলকাতায় একজন অতি শৌখিন বনেদী বড়লোক ছিলেন। তিনি রোজ সন্ধ্যায় তাঁর রূপসী রক্ষিতার বাড়িতে যেতেন, দুপুর রাতে বাড়ি ফিরতেন। কোনও কারণে দুদিন তিনি যেতে পারেন নি। বিরহযন্ত্রণা সইতে না পেরে তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় তিনি হাজির হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী গামছা

পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন। তাই দেখে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ে বললেন, এঃ তুমি—তুমি—

নমিতা বললেন, আপনি অতি অসভ্য, মুখে কিছুই বাধে না।

—ও তো আমি বলিনি, গুরুমুখে যা শুনেছি তাই আবৃত্তি করছি। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্রলোকের মোহ কেটে গেল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবনবাসী হলেন।

নমিতা বললেন, আপনার নিজের কি হল তাই বলুন।

—তার পর চুঞ্চু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, এখন তোমাকে আসল তিলোত্তমার ইতিহাস বলছি শোন। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই ছিল হরিহরাত্মা। তাদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ভয় নেই, আমি দু দিনেই ওদের সাবাড় করে দিচ্ছি। তিনি ব্রাহ্মী মায়ায় এক সিন্থেটিক ললনা সৃষ্টি করলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর তিল তিল উপাদানের সংযোগে তৈরী, সেজন্য তার নাম হল তিলোত্তমা। তার ট্রায়াল দেখবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মসভায় সমবেত হলেন। ব্রহ্মার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তিলোত্তমা নাচতে লাগল। পিতামহ প্রবীণ লোক, চক্ষুলজ্জা আছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারেন না, অথচ দেখবার লোভ ষোল আনা, অগত্যা তাঁর ঘাড়ের চারিদিকে চারটে মুণ্ডু বার হল। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন ফুটে উঠল, তাই দিয়ে তিনি চোঁ চোঁ করে তিলোত্তমার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ নাচ দেখে ব্রহ্মা বললেন বাঃ খাসা হয়েছে, এখন তুমি সুন্দ উপসুন্দর কাছে গিয়ে তাদের সামনে নৃত্য কর। তিলোত্তমা তাই করল। তাকে দখল করবার জন্য দুই ভাই কাড়াকাড়ি মারামারি করে দুইজনেই মরল। দেবতারা নিরাপদ হলেন। ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমা বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে বিষ্ণু, তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে, তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কৈলাসে যাবে, পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়। তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল, অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশ্লিষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেইখানেই ফিরে গেল,—কান্তি বিদ্যুল্লতায়, কেশরাশি মেঘমালায়, মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রে, দৃষ্টি মৃগলোচনে, ওষ্ঠরাগ পক্কবিম্বে, দন্তরুচি কুন্দকলিকায়, কণ্ঠস্বর বেণুবীণায়, বাহু মৃণালদণ্ডে, পয়োধর বিল্বফলে, নিতম্ব করিকুম্ভে, উরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিওঅ্যাকটিভ ধোঁয়া।

অসিতা বলল, তিলোত্তমার মন কোথায় ফিরে গেল তা তো বললেন না সার।

তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই ছিল না, আত্মাও ছিল না। তিলোত্তমা একটা রোবট। পুরাণকথা শেষ করে চুঞ্চু মশায় প্রশ্ন করলেন, বৎস সিদ্ধিনাথ, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করছ কি? মোহ অপগত হয়েছে?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললুম, একদম সেরে গেছি সার। আমার মানসী তিলোত্তমাও এক্সপ্লোড করে বিলীন হয়েছে।

—এখনও বলা যায় না, কিছু ধোঁয়া থাকতে পারে। দেখ সিদ্ধিনাথ, তোমার চটপট বিবাহি হওয়া দরকার। তোমার বাপ-মায়েরও সেই ইচ্ছে। আমার ছোট শালী নবদুর্গা দেখতে নেহাত মন্দ নয়, কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাকে একবার দেখো।

আমি উত্তর দিলুম, দেখবার দরকার নেই সার। ছায়া দেখে একবার ভুলেছি, কায়া দেখে আর ভুলতে চাইনা। ওই নবদুর্গা না বনদুর্গা কি নাম বললেন, ওকেই বিয়ে করব। আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কি।

চুঞ্চু মশায় বললেন, ঠিক বলেছ সিদ্ধিনাথ। দশ মিনিট দেখে তুমি কি আর বুঝবে, আমি তো দশ বছরেও নবদুর্গার দিদি জয়দুর্গার ইয়ত্তা পাই নি। বিবাহ হয়ে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে যতদিন খুশী দেখো।

তার পর চুঞ্চু মশায় বাবাকে বললেন, বাবা-মা রাজী হলেন, দুমাসের মধ্যে নবদুর্গার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গোপালবাবু বললেন, সিদ্ধিনাথের ইতিহাস তো শেষ হল, এখন নমিতা তোমার মন্তব্য বলতে পার।

নমিতা বললেন, আপনার গিন্নীকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন, শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবনস্মৃতি তাঁকে বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই, আমার কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—জীবনস্মৃতি না ছাই, বক বক করে আবোল-তাবোল বানিয়ে বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি।

অন্নাভাবের দিনে

জগদীশ গুপ্ত

(১৮৮৬–১৯৫৭)

দাঁড়িয়ে গেলাম আমি ছড়া'য়ে দু'হাত—
দাঁড়ালাম এবে, কিন্তু নহে অকস্মাৎ,
তার মানে, দাঁড়া'বার ভঙ্গিটা আমার
সঞ্চিত ক্রোধের ভঙ্গি বহুদিনকার।
গরিবের কেন এই ক্রোধের উদয়?—
তা'ও বলি: অন্নকষ্ট কতদিন সয়;
না খেয়ে না খেয়ে নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল,
হাত পা পিত্তের কাজ হয়েছে অচল......
শ্বাসকষ্টে নির্জ্জীবের পাঁজরের হাড়
ওঠে নামে ঘন ঘন, ভেঙে' পড়ে ঘাড়।
ভাবিলাম, করিবই তীব্র প্রতিবাদ
এ-ব্যবস্থার, যার ফলে এত আর্ত্তনাদ—
হা অন্ন হা অন্ন রবে পূর্ণ দেশ আজ;
বিধাতার বিধি, না, এ মানুষের কাজ!

*　　　*　　　*

অন্নদার প্রিয় দেশ, সুজলা সুফলা—
নিঃস্ব শুষ্ক করে তারে মানুষের ছলা;
করিবই দাবি: "দাও, দাও শীঘ্র ভাত"......
দাঁড়া'য়ে গেলাম তাই ছড়া'য়ে দু'হাত;
কহিলাম দাঁড়াইয়া করিয়া চীৎকার:
"একি কাণ্ড! জঘন্যের একি পশ্বাচার!
নৃশংস তোমরা, আর, অতি অমানুষ—
শোষণ করিছ রক্ত; লোভেতে বেহুশ
কেন এত? চক্ষুলজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন
করিতেছ সর্ব্বনাশ জীবনহরণ......
যে জননী হারাইল ক্রোড়ের সন্তান,
যে শিশু করিল মৃতা মাতৃস্তন্য পান

রাজপথে পড়ে' —দেখ, তাদের মিছিল
চলেছে সম্মুখ দিয়া ভরিয়া নিখিল....
দেখিতেছি আরে, ঐ ত্যক্ত মৃতরাশ
ক্রমে হয় উচ্চতর ঢাকিয়া আকাশ....
আরে রে মজুতদার, আরে রে পাষাণ,
কেন এত তুচ্ছ ভাবো মানুষের প্রাণ!
মানুষের তুলনায় টাকা হ'ল বড়ো!
নিতে কি পারিবে সঙ্গে করিছ যা' জড়ো
স্বজনেরে পাণে মেরে'? কোন্ দিক্ ভার?
মানুষ না টাকা? বলো এই কি বিচার!
প্রতিষ্ঠা পাইবে লোপ—কি কহিব আর,
জীবনেই দেখ পা'বে মৃত্যু-যন্ত্রণার।
লুকাও চালের বস্তা কোথায় আঁধারে—
ঢেলে' দাও দুনো দামে চোরের বাজারে....
লাভ হয় ঢের, কিন্তু স্বদেশ তোমার
মৃতের শ্মশান হ'ল—হ'ল ছারখার।''

* * *

থামিলাম এইখানে, লইলাম দম—
কহিলাম পুনরায়: ''বেশী কিম্বা কম
ঘুষ নিয়ে লাভবান্ হইল যাহারা,
মুমূর্ষু প্রাণীর ক্ষিপ্ত নিঃশ্বাসের ধারা
ছুটিবে তাদের পিছু প্রখর অমর,
হ'তে হ'বে নিঃসম্বল আতঙ্কে জর্জ্জর।
ওদিকেও দেখি কাণ্ড কি রোমাঞ্চকর!
করিছে সমুদ্রযাত্রা বিপুল বহর
আমাদেরি খাদ্য ল'য়ে। ফেলে' দেয় জলে
অখাদ্য হ'ল যে-খাদ্য মজুতের ফলে।
করি এ-র প্রতিবাদ, চাই প্রতিকার;
অন্নাভাব সহ্য মোরা করিব না আর''......

বলিতে বলিতে তেজ হইল বিপুল—
মনে হ'ল করিয়াছি ব্যথায় আকুল
দুষ্ট প্রতিপক্ষে; আর কহিয়াছি ভাষা
ধ্বনিছে যা' দেশে; আর ঘুচায়ে নিরাশা
মুমূর্ষুর বুকে প্রাণ করেছি জাগ্রত—
প্রলেপে করেছি স্নিগ্ধ জ্বালাময় ক্ষত।
কহিলাম পুনঃ "শুন,শুন বিশ্ববাসী,
শুন দূরবর্ত্তী, শুন ক্রূর অবিশ্বাসী,
ফেল্‌না খেল্‌না (নই); কেশরী বাহিনী,
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামের পূজনীয়া যিনি....
তিনি আমাদের মাতা; দেবী দশভূজা,
সমাপন করিয়াছি সদ্য যাঁর পূজা—
দশয়ুধা জগদ্ধাত্রী তিনি মহেশ্বরী,
তাঁর আশীর্ব্বাদে মোরা কম (ই) ভয় করি
উদ্ধত শক্তিরে; ঐ হের, সুদর্শন
ঘুরাইছে শিরোপরি কংসনিসূদন....
সহিব না অন্নাভাব; মরণেরে রোধ
করিব নিশ্চয়; শুন, অসাধু নির্ব্বোধ"—
বলিতে বলিতে আমি থামিয়া হঠাৎ
গুটাইয়া লইলাম ছড়ানো দু'হাত,
বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে রহিলাম চেয়ে
শূন্যপানে; অন্ধকার চোখে এল ছেয়ে......
কি হেতু যে হতবাক্ হইলাম এত
তা'ও বলি; হো'ক লজ্জা,
হো'ক কথা তেতো:
কে যেন সহসা গালে মারিয়া চাপড়
খুলে' নিল পরিধানে ছিল যে কাপড়।

নরকের কীট

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৬)

নরক ?—নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876. একটা idea দিই। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,—হাঁ হাঁ তাই। I mean your—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয়, এবং জাভা থেকে চিনি আমদানী কর্‌তে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার; এবং যেখানকার মহামান্য চিকিৎসকগণ propaganda work কর্‌চেন খোলা বাতাসের বিরুদ্ধে।—নাঃ তোমাদের দোষ কি? দোষ সব অশ্লেষা মঘার।—১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব করে আস্‌চে,—অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়।—আজও বংশবৃদ্ধি কর্‌চে, আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভর্‌বে শুধু পীলে আর লিভারে। A colony of maggots in a dungheap!

ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবার জো নেই, Consent Bill এর নামে হাহাকার একেবারে!

—Morality?—হাঁ, ও জিনিসটা তোমাদের আছে। সুবোধকে চিন্‌তে? ও রকম moral লোক প্রায় দেখা যায় না। চুরি কর্‌তে পার্‌লে না ব'লে M. A. তে fail কর্‌লো, ঘুষ দিতে পার্‌লো না ব'লে চাক্‌রী খোয়ালো। হাতে টাকাকড়ি কোন কালেই বিশেষ কিছু ছিল না। বেকার অবস্থায় একেবারে কিছু না থাকবার কথা! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তার স্ত্রী একটু লেখাপড়া জান্‌তেন। Higher mental sphereএ মিশবে ব'লে হয়ত শিক্ষিত মেয়ে বে' করেছিল। তার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল—চারটে না ক'টা ছেলে। এই গুলোকে নিয়ে স্ত্রী এক স্কুলে কর্ম্ম নিলেন। সেও আবার বরিশালে না কোথায়? সুবোধ কল্‌কাতায় মেসে থেকে অর্থচেষ্টা কর্‌তে লাগল। কিছু উপার্জ্জনও হয়ত করেছিল। কিন্তু সবটাই বোধ হয় খরচ হয়েছিল Scott's Emulsionএ। ভদ্রলোকের একটু বুকের রোগ ছিল,—a most moral disease! পাপের ফলে যে সব 'দুষ্টরোগ' হয়, এ রোগ সে দলে নয়। অতএব sympathy কর্‌তে পার।

ছেলে-পুলের সমস্ত ভারটা স্ত্রীকেই বহন কর্‌তে হ'ল। তিনি বেতন পেতেন অল্প। তাই স্কুলের কাজের পর সমস্ত দিনটাই প্রায় tuitionই ক'রে কাটাতে হ'ত। প্রবাসে, নিরানন্দে, গুরুশ্রমে তিনি বেশ রুগ্ন হয়ে পড়লেন।

কিন্তু কাজ পূরাদমেই চালাতে হ'ল। সুবোধ স্ত্রীর জন্য হা-হুতাশ কর্‌তো অনেক। কিন্তু কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌তো না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তো, এবং একটি ক'রে সন্তান দিয়ে আস্‌তো। ঐ অবস্থাতেই তাঁর গর্ভে আরও ৪।৫টা সন্তান উৎপাদন করেছিল।

—Human weakness ? It is inhuman weakness !

আমি তাকে বলেছিলুম ঐ শ্মশানের মড়াটাকে ছেড়ে দাও। তুমি না হয় একটু কুপথে যাও। But he had not the pluck to be immoral. He had a homicidal morality.

স্ত্রীকে তুষ্ট কর্‌বার জন্য সে এই কাজ করেছিল ? It is a lie. It is worse than that. It is হিতোপদেশ! ঐ হিতোপদেশের 'অষ্টগুণ কামাগ্নি'র তুষানলে তোমরা পুড়ে খাক হয়ে গেলে। আজও আগুন নিবলো না। আজও পথে ঘাটে তোমাদের তরুণ-সাহিত্যের Freudism and Psychologyর মধ্যে আমি দেখতে পাই ঐ আদ্দিকেলে তুষানলের হল্কা—সুবোধকে কামনা করা দূরে থাক্, তার স্ত্রী পায়ে ধ'রে তাকে বলেছিল, 'ওগো, আমার ওপর দয়া কর। আমার কাছে আর এসো না।' প্রথমটা অনুরোধ, উপরোধ, তারপর রাগারাগি, শেষটা she refused to meet him.

কিন্তু সবল পুরুষ এত সহজে তার property ছাড়বে কেন ? খুব খানিকটা লাঠালাঠি, পুলিশ পেয়াদা, মামলা মকোদ্দমার গুজব শুনেছিলুম। তবে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। স্ত্রীটা managed to die in a hospital during childbirth.

সুবোধও মারা গেছে, আজ কয়েক বৎসর হ'ল জ্ঞান বোধ হয়।

—ছেলেগুলো ? হা হা হা হাঃ। সেগুলো ডিম ভাঙা মাকড়সার বাচ্ছার মত ছর্ ছর্ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমি করিছি ? হ্যাঁ, তা করিছি ত। করিছি, in atonement of the sins of my parents.—করিছি তাতে কি ? তাতে সুবোধের morality কিছু কম্‌লো ?

—ওঃ। আমার মহানুভবতা ? তা বটে। But don't you know I use to love that girl ?

—না, না, না, না। সে রকম কিছু না। ভয় পাবার মত কিছু নেই। তাঁর মধ্যে প্রেমের লেশমাত্রও ছিল না।—স্বামীর প্রতিও না, পরপুরুষের প্রতিও না। She was nothing but a mother এবং মাতৃত্ব ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ।

আঃ বাঁচা গেল ? কি বলো ? সুবোধের স্ত্রী আমাকে ভাল-বাস্তো এমন হলে গল্পটা একেবারে মাটী হয়ে যেত। কেমন, না ? আশ্চর্য্য মন তোমাদের। মাছির ঝাঁকের ভেতর থেকে ভাত খুঁটে খুঁটে খেতে তোমাদের গা ঘিন্ ঘিন্ করে না। তোমরা আঁৎকে ওঠ, যদি শূদ্রে ছুঁয়ে দেয়। তোমাদের শরৎ চাটুজ্জের সতীশ-সাবিত্রী, আর রবিবাবুর রমেশ-কমলাও এই ছোঁয়া বাঁচিয়ে ত'রে গেল। কর্‌বে কি। নইলে যে তোমাদের sympathy থাকে না। পাপকে যে তোমরা সহ্য কর্‌তে পার না একেবারে। তোমাদের দেশে সীতা পরিত্যাজ্য হন্, কারণ রাবণ লোক ভাল নয়। যদি ছুঁয়ে ফেলে থাকে।—দেখ সমাজের মধ্যে একটা শাখিনী সাপ ঢুকেছে। তার দুটো মুখ,—'ধর্ম্ম' আর 'সতীত্ব'। এই দুটো মুখে সে যে হত্যাকাণ্ডটা ক'রে চলেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। The wanton, most atrocious, the most devastating crime যত কিছু আছে, তার মূলে আছে হয় ধর্ম্ম, না হয় সতীত্ব। আমরা ক'টি অপোগণ্ড একটু মিলেমিশে থাক্‌তে পারতুম্ যদি এই ধর্ম্ম আর সতীত্বের ফোকর দিয়ে লোককে স্বর্গে পাঠাবার প্রবৃত্তি একটু কম হত।—কি বল্‌লে ? স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাল না বাসে ত সমাজের স্থিতি রক্ষা হয় না ? I agree with you there. সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীর একনিষ্ঠা খুব convenient. কিন্তু সকলকে সব সময়ে convenience মেনে চল্‌তে হবে, এ হুকুম জারী করবার কে তুমি ? চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রীতি বা অরবিন্দের দেশপ্রেম was most inconvenient. তা ব'লে আমি ত তাঁদের জাতিচ্যুত কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি করো।—হাঁ, একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি 'একনিষ্ঠ' শব্দটা ব্যবহার করিছি পতিভক্তির প্রতিশব্দরূপে। ওটা অন্যায় হয়েছে। একনিষ্ঠার সঙ্গে পতিভক্তি বা প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। যারা যারা স্বামীর পা কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছে তারা সবাই স্বামীকে ভালবাসে না। যারা যারা পরপুরুষকে ভালবাসে তারা সবাই স্বামীর ঘর ভেঙে চলে যায় না।

—ভুল ?—কার ? আমার না তোমার ?—

একটা গল্প বলি :—আমি তখন মৈমনসিংহে practice করি। নামটা মনে রেখো,—মৈমনসিংহ। সিংহের বাচ্ছারা কখনো দুর্ব্বল হ'তে পারে ? এরা সবাই বীর পুরুষ। এরা জন্মগ্রহণ করে লাঠি সড়কি হাতে। এদের vocal cord থাকে বল্লমের ডগায়। সেখানে থাক্‌তে criminal case এ হাত পাকিয়ে ছিলুম। অনেক case করিছি। তার মধ্যে একটার কথা কিছুতে ভুল্‌তে পারি না। একটা cut-throat case. একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ের গলায় কে ছুরি বসিয়েছিল। বেশ ভাল ক'রেই বসিয়েছিল।

কিন্তু কে যে সেই বীরপুরুষ তার কোন পাত্তা পাওয়া গেলনা। মেয়েটা যখন হাঁসপাতাল থেকে ফির্লো, তখন তার ক্ষত সম্পূর্ণ সারে নি। গলার একটা ছেঁদা দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যায়—মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। যা হোক্, ইসারা ক'রেও ত সে কিছু সন্ধান দিতে পার্তো। তা দেয়নি। তাকে অনেক জেরা করা হ'ল,—'তুমি নিজে করেছ?' 'তোমার স্বামী করেছে'? 'আর কেউ করেছে?' সে 'হাঁ' ও বলে না 'না' ও বলে না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রৈল।

পুলিশ স্বামীটাকে ধরেছিল আসামী ব'লে। আর আমি ছিলুম, আসামী পক্ষের উকীল।

উকিল হ'লে সাক্ষীসাবুদ সামলে নিতে হয়। আমিও সে চেষ্টা করিছিলুম। কিন্তু মেয়েটাকে তৈরী ক'রে নিতে পারলুম না। আমার সমস্ত সাধ্যসাধনা পণ্ড করে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রৈল। এবং শেষে একদিন আকুল হয়ে কেঁদে আমার বুকের ওপর লতিয়ে পড়লো। হিতোপদেশ পড়া থাক্লে বুঝতে পারতুম, মেয়েটার মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু তুমি জান, I hate all শাস্ত্রs, all অনুষ্টুভ, তাই অনুমান কর্লুম সে হয় ত আমার আশ্রয় ভিক্ষা করচে। কিন্তু এই রকম ক'রে আশ্রয় ভিক্ষা করা। বিশেষতঃ স্বামীর সাক্ষাতে! বল কি? ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল যে! কাজেই আমি জোর ক'রে তাকে সরিয়ে দিলুম। এবং খুব আল্তো আল্তো পিঠ চাপড়ে বললুম, 'ভয় নেই, তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দোবো।'

স্বামী তখন পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। করবেন কি? ও দৃশ্য দেখে সংযত হয়ে থাকা ত পুরুষের কাজ নয়। এদিকে অসংযত হ'লেও স্বার্থ হানির সম্ভাবনা।

তোমাকে বল্‌বো কি? বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। আমি ত সান্ত্বনা দিলুম, স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবো।' কিন্তু সে কি এই আকুল আবেদন জানালে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য, না স্বামীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য? কেমন সন্দেহ হ'ল স্বামীটাই খুনী। গলায় ক্ষতটা দেখলে ত suicidal বলে মনে হয় না।—দুটো তিনটে আঁচড়, আর একটা deep cut, একটা সতেরো বছরের মেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য এতটা চেষ্টা করেছে? অসম্ভব। এ নিশ্চয় ঐ স্বামীটার কাজ। স্বামী ব'লেই তাকে ধরিয়ে দিতে পারেনি। কেন না, সেই স্বামীর কাছেই আবার ফির্তে হতে পারে। Out of love!—কি বল?

যাক্। এ সব চিন্তা করা আমার কাজ নয়। I was paid to save the husband, and save him I did.

—অবাক্ হ'লে? অবাক্ হবার কি আছে? বাঁচাতে পারি, তাই

বাঁচালাম। মেয়েটা এখনও হয়ত নিঃশব্দে তার পতি-দেবতার বন্দনা মেজে চলেছে।

—অনুতাপ ?—Man, this was the one sacred act of my life! স্বামীটাকে মেরে ফেল্‌লে কি সুবিধা হত শুনি ?—পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা ?—A cut-throat husband is safer. খেয়ে পরে বাঁচতে হ'লে a woman must sale her body,—to one man, or to many. Tracheotomy tube-পরা মেয়ের কোন খদ্দের নেই। Let her go to the only available market,—the husband—হ্যাঁ, দাদা-খুড়োর ঘাড়ে চেপে অনেকে থাকে জানি,—আব আঁচিলের মত। তাকে থাকা বলে না। তার দুঃখ—ও! তুমি বল্‌চ দুঃখ কিছু কিছু থাক্‌বেই সংসারে। তোমরা মহাপুরুষ এ কথা বল্‌তে পার। তোমাদের বড় বড় মনের engineএর তলায় মানুষ গরু মাড়িয়ে চলে যেতে পার,—with colossal unconcern. আমি তা পারি না! আমি ক্ষুদ্র জীব,—bicycle নিয়ে কারবার,—একটা কুকুরছানার গায়ে আঘাত লাগলে একেবারে কাৎ হয়ে পড়ি।—ঐ নির্ব্বাক্ মেয়েটার দু ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে আমার সমস্ত সৌরজগৎ নীহারিকায় মিলিয়ে যায়। ঐ একটা মানুষের জন্য I would like to break and remake your God.

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে হে।

০ ২ ০

চার হাজার বৎসরের জীর্ণ কঙ্কাল তোমরা। শান্তি ছাড়া বাঁচতে পার না! Convenience is your fettish গালে চড় খেয়ে হজম কর, পাছে উত্তর দিলে শান্তি ভঙ্গ হয়। দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে আসন বাসনের মত ব্যবহার কর, এবং দিন রাত প্রার্থনা কর তারা যেন মুখ ফুটে কিছু না বলে। বল্‌লে শান্তিভঙ্গ হবে যে! I hate your শান্তি। I want a few সন্দীপs যারা ওদের শক্ত মুঠোয় তোমাদের শান্তির জগদ্দল গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে! —By the way, here is a culpable homicide. I mean, the slaughter of সন্দীপ by রবীন্দ্রনাথ। নিখিলেশ বলে, 'আমি সন্দীপকে শ্রদ্ধা করি।' নিখিলেশ was a fool, or a hypocrite, রবিবাবুর সন্দীপ মোটেই শ্রদ্ধেয় নয়। His সন্দীপ is cramped, crippled, curious. He is neither flesh nor fowl.

I want my সন্দীপs without the shackles of a showman.

আমি সেই সন্দীপের কামনা করি, যে প্রবলভাবে আকাঙক্ষা কর্‌তে জানে, প্রবলভাবে গ্রহণ কর্‌তে জানে। বিশ্বকে যে জয় কর্‌বে বাহুর বলে, বাক্যের বলে, মনের বলে ;—কোন ছলে নয়, কোন কৌশলে নয়, কোন ফিকির-ফন্দির আড়ালে আব্‌ডালে থেকে নয়। বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে যে সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে আস্‌বে ; এবং যার দীপ্ত কটাক্ষের তেজে।

Like a burning scroll.

Will heaven and earth together roll'.

শান্তি! your epics have been written by block heads, বেচারাদের যদি একটু imagination থাক্‌তো দেখতে পেতো যে নরকের একমাত্র উপাদান হচ্চে শান্তি। এই rolling rumbling universeএর প্রতি অনুপরমাণু যখন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপচে, তখন নরকের বাসিন্দারা আছে একেবারে নিস্পন্দ। বিশ্বের বুক ফেটে তপ্ত রক্ত উছলে পড়চে। তারা অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে দেখবে। হাতটি পর্যন্ত নাড়তে পাবে না এর কাছে তোমার hell fire is a mere ফুলঝুরি।

একটা ছোট্ট গল্প বলি :—একদিন বাইরের ঘরে ব'সে আছি একটা ১২।১৪ বছরের ছেলে এসে বল্‌লে, 'বাবু, চাকর রাখবেন?' বেশ ভদ্র চেহারা। দেখলে intelligent ব'লে মনে হয়। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'কোথায় চাকরী কর্‌তিস?' সে বললে 'এক জায়গায় কর্‌তুম। তারা তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কেন?'

'তাদের আর দরকার নেই।'

'তোর আছে কে?'

'বাড়ীতে মা আছে।'

কেমন দয়া হ'ল আমি আর খবরাখবরি না ক'রে তখনি তাকে engage করলুম। He was a very good servant. The best I ever had. কিন্তু টিঁক্‌লো না।

একদিন ঠাকুর এসে বল্‌লে, 'বাবু, ও লোকটা মুসলমান। ও রান্নাঘরে ঢুকতে চায় না।' আমি ছোক্‌রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম। "কিরে, তুই মুসলমান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে রান্না ঘরে ঢুকতে চাস না কেন? কি জাত তুই?'

প্রথমটা বলতে চায় না। কাতর ভাবে তাকিয়ে থাকে। শেষটা স্বীকার কর্‌লে, 'আমরা দাস।'

'নমঃশূদ্র ?'

'হাঁ'।

সে যে অতি নীচ জাত সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। যে পবিত্র পাকশালায়. আমার গেঁজেল ভোজপুরী মহারাজ তাঁর পবিত্র দাদ চুলকান, সেখানে যে তার প্রবেশাধিকার নেই, এটাও তার মুখস্থ হয়ে গেছে। শাস্তির আয়োজনে কোথাও কোন ক্রটি নেই। এত বড় আয়োজন আমিই বা পণ্ড করি কেন? তাকে আর এক দণ্ড ঘরে রাখলে ঘরে বাহিরে কোথাও শান্তি থাক্‌বে না। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় দিলুম।

—হ্যাঁ গো তাড়িয়ে দিলুম।

বেচারা কোন অপরাধ করেনি।—সত্যকথা বলা ছাড়া। সে না করুক, তার বাপ দাদা কেউ জল ঘোলা করেছে অতএব দণ্ড দিলুম।

—শোন, শোন! এখনও বাকী আছে;—the climax.

অকারণে, অকস্মাৎ এত বড় দণ্ডটা দিলুম। সে কিন্তু এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লো না। What do you think of that? আমি বললুম, 'যা'। সেও সুড় সুড় ক'রে চ'লে গেল। একবার ফিরে চাইল না। মাইনের টাকাটা পর্য্যন্ত চাইতে সাহস করলো না।

তারপর!—সে যাবে কোথায়? যেখানে যাবে সেখান থেকেই তাড়া খাবে। পরের বাড়ী সিঁধকাটা ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই!—Do you know,—your country is the largest manufacturing centre for crooks—

—Will you just keep quiet for a moment? আমি বল্‌চি বেশ্যা আর বদমাইস তৈরী কর্‌বার মত এমন কল আর কেউ কোন দেশে আবিষ্কার করে নি।

—রেখে দাও তোমার Statistics! We live surrounded by rouges unhanged তাদের সকলের পরিচয় তোমরা Census Reportএ দাও না।

একটা গল্প শোন। তখন আমি ছেলেমানুষ। ব্যাপারটা তখন ভাল বুঝি নি। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি। আমাদের পাশের বাড়ীতে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক থাক্‌তেন। তাঁর কাছ থেকে খানিকটা শুনেছি। বাকীটা নিজে দেখিছি। ব্যাপারটা এই!—ভদ্রলোক একদিন সমাজ থেকে বেরুচ্ছেন। ফটকের কাছে এসে দেখলেন একজন স্ত্রীলোক তাঁর দিকে এগিয়ে আস্‌চে। তিনি একটু দাঁড়ালেন। স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছেই এলো। এসে বল্লে, 'আমি

ভ্রষ্টা। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বড় বিপদে পড়েছি। আমার একটি মেয়ে আছে। তাকে হাসপাতালে রেখে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি বৃদ্ধ, আপনি ধার্ম্মিক। তাই সাহস ক'রে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। নিদেন দু' একদিনের জন্য।—'

—হ্যাঁ গো, ভ্রষ্টা, একেবারে ভ্রষ্টা। অবাক কাণ্ড! একটা মানুষ সৎপথ-ভ্রষ্ট হয়েছে! শুনেছ এমন কথা? Stone her to death, man, stone her to death!

দুঃখের বিষয় তোমরা তখন সেখানে ছিলে না। যে বৃদ্ধের কাছে সে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল তিনি নিজে হয়ত জীবনে অনেক পাপ ক'রে থাক্‌বেন। তাই রাগ না হয়ে তার মনে হঠাৎ sympathy এসে হাজির হ'ল। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই মেয়েটিকে বাসায় নিয়ে এসে তুল্‌লেন। বাসায় এসে কিন্তু দেখলেন কাজটা ভাল হয় নি। তাঁর বাড়ীতে একজনও স্ত্রীলোক ছিল না। এমন জায়গায় একজন যুবতীকে তিনি স্থান দেন কি করে? লোকে বলবে কি?

ভদ্রলোক বিপন্ন হ'য়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন, বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশের একটি প্রাণীও একরাত্রের জন্য ঐ পাপকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না।

বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখে মেয়েটিও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। কোন রকম ক'রে দুদিন সে সে বাড়ীতে কাটিয়েছিল। এ দুদিন সে ক্রমাগত চিঠি লিখেছে। এ চিঠিগুলো সে কোন্ শূন্যে পাঠিয়েছিল কে জানে? কেউ তাকে নিতে এলো না। সে নিজেই চ'লে গেল।

—না। হাতে পয়সা কড়ি ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। She went out with the only capital she had,—youth. এর কিছুদিন বাদে একদিন স্কুলে যাবার পথে একটা দোকানে খাতা কিন্‌তে গিয়ে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি show case এর সাম্‌নে উবু হয়ে ব'সে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছে। দোকানদারটি যুবা। তার রসাভাষকোমল মুখখানা দেখে পায়েস ভেজান পাটি সাপ্টা পিঠের কথা মনে প'ড়ে গেল।

এর পর আর একদিনের কথা। ঐ মেয়ে দামী পোষাক পরিচ্ছদ প'রে একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেল।

—কোথায় গেল? কোথায় গেল আবার? তোমরা সব সতীত্বের পাণ্ডারা যেখানে রাত কাটাও সেইখানে।

I beg your pardon! তোমাকে ও দলে ফেলতে পারিনা। কারণ,

আমি ডাক্তার নই। তুমিও আমার patient নও।—ওর স্বামী।—হাঁ, খবর পেয়েছি। He is an engineer in Imperial service.

—কি বললে? এমন স্বামীকে ত্যাগ ক'রে—আচ্ছা, এমন স্বামী তোমরা টের পাও কি ক'রে? তোমরা কথায় কথায় বল, 'আহা! এমন স্ত্রীকে ত্যাগ কর্‌লে!' 'এমন স্বামীকে ছেড়ে গেল।' তোমরা কি ক'রে বোঝ বল দিকি? কাউকে তো বলতে শুনিনি কখনো, 'আহা! এমন patent leather এর জুতো! তবু পায়ে দিলে না।' পায়ে দিচ্চে না দেখলেই বুঝতে পারি, জুতোটা বোধ হয় পায়ে হয় না।

—আমার patent leatherএর জুতো ছিল। কৈ, চামড়ার কথা ত একদিনের জন্যেও মনে পড়ে না। I was concerned with its grip, and it was sickening!—স্ত্রীর কথা ভাবছি।

—যে কোন একটা loop ধ'রে টান দিলে, the whole tangle is disturbed, আমার married lifeএর কথা বলতে গেলে আরও গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌তে হয়। আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।—কাজেই লেখাপড়া বিশেষ জান্‌তেন না।

এই হ'ল আমাদের দেশ। এখানে, যে সবচেয়ে মূর্খ, সেই হয় গুরুমহাশয়; যে সংস্কৃত অক্ষর চেনে না, সেই সকলকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনায়; যে কখনো একটা রুগী দেখে নি সে হয় ডাক্তার।

যাক,—বিদ্যা না থাকলেও বাবা শ্রদ্ধা কম পান নি। তবে শ্রদ্ধায় পেট ভরে না। শুধু খাটুনি বাড়ে। যথাসাধ্য কম খেয়ে প'রে আমরা ক'টি ভাইবোন মানুষ হয়েছিলুম। আমাদের জন্য বাবার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি বলতেন 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' এরকম একজন থাকলে বেশ হ'ত। Unfortunately, হঠাৎ যেদিন কয়েকখানা দেনো ছাতা, গামছা, আর কাপড়ের সম্বল রেখে তিনি মহাপ্রয়াণ কল্লেন, সেদিন দেখা গেল তাঁর এই পরম dependable মহাজনটি একেবারে ফেরার! আহার দেনেওলা কোই নেই হ্যায়!

এক হাতে শালগ্রাম, আর এক হাতে মায়ের হাত ধ'রে আমি আমাদের এক যজমানের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম।—জলন্ত জাহাজ থেকে পালিয়ে ঝাঁপ দিলুম অকূল সমুদ্রে।

আমার ভগিনীদের গতি বাবা ক'রে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাদের ফেলে দিয়েছিলেন, জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, যেখানে হোক্। Don't want to talk about them.

সে বছর আমি entrance পরীক্ষা দোবো। বড় হয়েছি। কাজেই আমি তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াবার ভার নিলুম। আর, মা ছিলেন সম্পর্কে মাসী। মাসী, please note,—দাসী নয়। দাসী হ'লে আর এক রকম চেহারা হ'ত।

একটা পোড়ো গোয়ালঘরে আমাদের থাকতে দিয়েছিল।

—Excuse me. Beggars are choosers. ভিখারীকে একটা পয়সা দিয়ে, তারপর গালে চড় মেরে, সেটা কেড়ে নিলে, he has every right to resent it—তাছাড়া আমরা ত ব'সে খাইনি। যথেষ্ট খাটিয়ে নিয়েছে।

সমস্তদিন ছেলে পড়িয়ে, রাত্রে একটু নিজের কাজ করবো, সে সময় দিত না। 'এটা কর্,' 'ওটা কর,' এই রকম হাজার ফরমাসের মধ্যে একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে আট্‌কে রাখতো। এক এক দিন সহ্য হ'ত না। বই টই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদতুম।

মা'র কি করে দিন কাট্‌ত, জানি না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাও হ'ত খুব কম। দেখা করবার চেষ্টাও করতুম না।

এক ঘরে থাকতুম বটে। কিন্তু আমি ঘুমোবার পর কখন যে তিনি এসে শুতেন, আমি ওঠবার আগে কখন যে বেরিয়ে যেতেন, জানিনা। তবে তিনি যে বেঁচে আছেন, তাঁর প্রমাণ পেতুম ঘরের কোণে থালা-চাপা পান্তাভাতের গাদা দেখে। Fool of a woman! সমস্ত দিনের drudgeryর পরিবর্ত্তে একবেলা একমুঠা কদন্ন খেতে পেত। তারির থেকে ভাগ রেখে দিত তার big bodied ছেলেটার জন্যে। ইচ্ছা করতো, সব টান মেরে ফেলে দিই। কিন্তু এমনি ক্ষুধার জ্বালা যে সাম্‌লাতে পারতুম না। গপ গপ ক'রে সেই গুলো গিলতুম।—আচ্ছা, এ কি রকম বেঁধে মারা বলত? ঘাড়ে কয়েকটা ছেলে চাপিয়ে দেবে, অথচ তাদের পোষণ করবার উপায় রাখবে না;—হাতে পায়ে শেকল বেঁধে রাখবে, পাছে খেটে খায়। এদিকে এক পয়সার সংস্থান রেখে যাবে না।

—হাঁ, মাতৃস্নেহ নিয়ে এবার কবিত্ব আরম্ভ হবে, আমি জানি। ওটা তোমাদের খুব মুখস্থ আছে। ছেলেবেলা থেকে অনেক Essay লিখেছ। মুখস্থ আছে ব'লেই বুঝতে পার না, যে সন্তানের জন্য আত্মহারা হওয়া একটা পশুবৃত্তি। সকল জানোয়ারই ঐ রকম ক'রে থাকে। ওটা instinctive, ওটা mechanical ওর মধ্যে বাহাদুরীর কিছু নেই। সন্তানের ভালর জন্য যে এই instinct দমন করতে পারে, সংযত হ'য়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, তার মধ্যে তবু মনুষ্যত্ব আছে। কলেরাগ্রস্ত সন্তানের সেবায় যে মা নিজের safety র

দিকে না তাকায়, হাত ধুতে ভুলে যায়, তাকে দেখে তোমরা গদ গদ হ'য়ে পড়। আমি বলি, ওটা স্নেহ নয়। ওর নাম বর্ব্বরতা।

Entranceএ Scholarship পেলুম। ভাবলুম এই degree establishment থেকে পালাই। কিন্তু রাক্ষুসী কিছুতেই আমাকে ছাড়ালো না। নিজেও গেল না। আমাকেও যেতে দিল না। কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে আরও দুবছর সেখানে কাটাতে হ'ল। তার পর স্কুলমাষ্টারী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মাকে বল্লুম, 'মা, তুমিও চল আমার সঙ্গে।' তিনি বললেন, 'না বাবা তুই যা। আমি গেলে এদের বড় কষ্ট হবে।'

আমি অনেক বোঝালুম। কিন্তু বুঝবে কে ? জুজুর ভয়ে যে লোক কোণ নিয়েছে তাকে কি যুক্তি দিয়ে বাইরে বার করা যায় ? তাঁর যে মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গে গেলেই কৃতজ্ঞতা জুজুর গায়ে আঁচড় লাগবে, ধর্ম্ম জুজুর গোসা হবে, পরলোক জুজু মুখ ভার করবে।

একাই চ'লে গেলুম, বিদেশে। তারপর একদিন wire পেলুম, আমার benefactorদের self-sold বাঁদিটি আর ইহলোকে নেই। Died, or was kicked out of existence, I don't know. And I don't care to know. She is rightly served ! Rightly served !

০ ৩ ০

—ওরে,—তামাক দিয়ে যা।

ধনীদরিদ্রে জাতিভেদ আছে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষে ত জাতিভেদ নেই। যে বাড়িতে অন্ত্যজের মত বাস করতুম, সেই বাড়ীরই একজনের হৃদয় জয় করিছিলুম,—যৌবনের আভিজাত্যে।—সে ছিল আমার ছাত্রী।

—হাঁ, novelএর মতই,—hackneyed, যাই হোক, আমি কোন active part নিইনি। আমার অত সাহসও ছিলনা। It was she who made love to me. আমার মন্দ লাগতো না।— Quinine mixtureএর সঙ্গে একটু syrup,—নাইবা তাতে ঢাকা পড়লো the outstanding bitterness, যা পেলুম তাই বা ছাড়ি কেন ? একটু বেশী বয়স হ'লে বুঝে সুঝে কাজ করতে পারতুম। কিন্তু তখন ? In the rashness of youth I swallowed the bait and got stuck. একটু যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে সেটা প্রথম সন্দেহ করলুম যখন মা জিদ ধ'রে বসলেন ওকে বে' করবার জন্য।

কি সর্ব্বনাশ! বে করবার কথা ত কখনো ভাবিনি। She was a perfect

animal, and I liked her. তাই বে' করা। বল কি? কাবুলিওয়ালার জুতো জোড়ার তারিফ করিছি ব'লে সে তার দুর্গন্ধ জোব্বা জাব্বা শুদ্ধ আমাকে জাপটে ধরবে।

কিন্তু মা'র সঙ্গে argue করাও ত আর এক মুস্কিল। যে বোঝে—তার সঙ্গে তর্ক করা যায়। মূর্খের সঙ্গে কথা কইবে কে?

—কান্নাকাটি? না। তাঁকে কান্নাকাটি করতে দেখিনি বড়। তবে, তাঁকে যখনি দেখতুম, মনে হত যেন তার জ্বর হয়েছে, যেন একটার জায়গায় দুটো sentence বল্‌তে গেলে তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে পড়বে।

আমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করলাম। পালালাম বটে। কিন্তু শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে মনে হ'ল মা'র অশৌচ পর্য্যন্তও বুঝি অপেক্ষা করা চলে না; তার পূর্ব্বেই ছুটে গিয়ে বে ক'রে আসতে হয়। কিন্তু সাংসারে টাকা আছে, ডাক্তার আছে, ধর্ম্ম আছে, ভগবান আছে। ফাঁড়া কেটে গেল।

—হাঁ গো, ছেলে হয়েছিল। এও আবার বাংলা ক'রে বলতে হবে নাকি? ছেলেটা আছে কোথায়? স্বর্গে।—Owner ম'রে গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে চাও, ছেলের owner খুঁজে না পেলে তখনি তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দাও,—তোমরা ত বেওয়ারীশ property কিছু পড়ে থাকতে দাও না। কোন্ মানুষের বাঁচা উচিত, না উচিত, সেটা ঠিক ক'রে দেবার একমাত্র কর্ত্তা হচ্ছ তুমি, তোমার খুড়ো, জাঠ-শ্বশুর, আর নাত-জামাই। তোমরাই হচ্ছ ভগবানের খাশতালুকের বরকন্দাজ।

পেটের ছেলেটাকে খুন করা হ'ল, অতি সঙ্গোপনে। কিন্তু সে যে এসেছিল তার চিহ্ন রেখে গেল প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গে।

Ultimately I had to marry her. ভিখারীর ছেলে একদিন বর সেজে এসে রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে গেল। তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকরণা করতে লাগল।—

—Miserable!

—Love? বল কি হে? Love না থাকলে এমন দুর্গতি হয়? She had a fatal love. কি খাই, কি করি, কোথায় থাকি সব খুঁটিনাটির হিসাব নেবে; রাত্রে ব'সে পড়ছি, ধাঁ করে এসে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেবে; পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইচি,—লোক পাঠিয়ে খেতে ডাকবে;—'যাচ্চি' বললে শুনবে না। কোথায় থিয়েটার দেখতে একটু রাত হয়েছে। এসে দেখি জেগে ব'সে আছে, জানালার ধারে। কোথায় এক drop whisky খেয়েছি, অমনি চুল ছেঁড়া, মাথা কোটা, রক্তারক্তি ব্যাপার।

অসহ্য!—আমি বলি, দেখ আমি তোমার পুতুল নই। আমি মানুষ। তুমি ছাড়া আরও অনেক interest আমার আছে। আমায় অমন করে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখবার চেষ্টা কোরো না। কিন্তু—কিছু ফল হ'ল না। শেষকালে আর পারলুম না। পুঁটলি বেঁধে চালান ক'রে দিলুম বাপের বাড়ীতে।

—না, আর দেখা শুনা করিনি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতুম,—বাস!

—হাঁ, মৃত্যুর আগে একবার দেখা হয়েছিল। And, I cut a most sorry figure.

আমাকে বলে, 'তোমার পা দুটি দাও।—আমি বুকে ক'রে মরবো।' See preposterous idea ! —কত বোঝালুম। ঈশ্বর, আত্মা, ইহকাল পরকাল, ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ড। But she was insistent. She caressed the feet with which I kicked her ! Just think of it ! The damnedest idolatry you can conceive of !

—চোখে জল এসে পড়েছে?—বাঃ! I wonder how you worship foolishness, how you worship weakness. আমি যখন ঐ ঘটনার কথা ভাবি I feel my blood boiling with a head-hunter spirit. মানুষের ক্ষুধিত আত্মাকে যারা এমন ক'রে bread এর বদলে brickbat দিয়ে গেছে, তাদের একজনকেও আমি ক্ষমা করতে চাই না।

—সাত্ত্বিকতা! But idolatry is never সাত্ত্বিক। ইহকালে বা পরকালে সস্তায় বাজীমাৎ করবার আশায় লোকে idolatry করে। It is the most selfish thing in the world.—

—And she was inordinately selfish. জীবনে আমাকে জ্বালিয়ে গেছে। মরবার পরেও রেহাই দেয়নি। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যেন আর বিবাহ না করি।

—প্রতিজ্ঞা পালন না করলেই পারতুম?

—তুমি মনে কর সেই প্রতিজ্ঞার বশেই এতদিন অবিবাহিত রয়েছি? You are mistaken. আর বিবাহ করিনি,—because I hate woman, —because I didn't want to go through another ordeal.

—প্রতিজ্ঞা করেছিলুম কেন? তাছাড়া করবো কি? তুমি হ'লে কি করতে? তর্ক করতে?—কোন্ একটা অশান্ত শিশুকে তুষ্ট করবার জন্য কবে বলেছিলুম চাঁদ ধরে এনে দেবো, তাই আজ চাঁদ ধরতে ছুটবো?—

দেখ, তোমরা কথা কও, gramophone এর মত। No volition, no variation. কবে মুখস্থ ক'রে রেখেছ, প্রতিজ্ঞা পালন করতে হয়। তা-ই

আজও আউড়ে চলেছ। প্রতিজ্ঞা পালন করাই যে অন্যায় হতে পারে একথা আর তোমাদের মনে আসে না। মায়ের কাছেও ত প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, 'যদি কখনও টাকা সঞ্চয় করি ত শ্মশানঘাট বাঁধিয়ে দোবো।'

—ঐ একটা ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আজ অনেক টাকা হয়েছে। একটার জায়গায় দশটা শ্মশানঘাট বাঁধাতে পারি। কিন্তু আজ যদি প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে ছুটি,—don't you think it would be criminal ?—To rob living people for the comforts of the dead ?

—মায়ের শেষ ইচ্ছা ? ও শেষ ইচ্ছায় বিশেষ কোন importance নেই। সব ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা হ'তে পারে। তা ব'লে সকলের সব ইচ্ছা পূর্ণ করা চলে না। বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। আমার শেষ ইচ্ছা ত তিনি পূর্ণ করেন নি। অনেক সাধাসাধি করেছিলুম, আমার সঙ্গে যাবার জন্য। But she was adamant.—Living people এরই বা কি করেছি ? কিচ্ছু করিনি। Living people খুঁজে পাচ্ছি না।—দিন কতক মাষ্টারী কর্‌তুম জান! সেই সময়কার এক ছাত্রের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হয়েছিল। সে তখন এক হাঁসপাতালের House-surgeon, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছ ?'

সে বললে, 'আমাদের আর থাকা! একটা responsible work দেয় না। কেবল dress কর, আর bandage কর!'

—আমি বল্‌লাম, 'Dressing'-টাই ভাল ক'রে ক'রে যাও। একেবারে ডগায় চড়বার জন্য ব্যস্ত হও কেন? 'Whatever thy hand findeth to do, do it with all thy might.'

সে বললে, 'Sir, ওটা ত copy-book maxim, সকলকে বলতে শুনি। কাউকে করতে দেখিনি'।

ভেবে দেখলাম, সে ঠিকই বলেছে। অমন কাজ ত কেউ করে না। And no wonder! এই সমস্ত বাংলাদেশে একজন নাপিত নেই, যে চুল ছাঁটতে জানে; একটা দরজী নেই যে গায়ের মাপে জামা তৈরী করে, একটা ধোপা নেই যে ইস্ত্রী করতে পারে, একটা Historyর professor নেই যে Jugo Slaviaর খবর রাখে, একটা business নেই যা liquidationএ যাবার জন্য মুখিয়ে নেই।

—শ্রদ্ধা? না, শ্রদ্ধা আমার কারুর ওপর নেই। যে দেশে কর্ম্মের উপাদান চীৎকার, আর ধর্ম্মের উপাদান গিরিমাটি, যে দেশে অনুপ্রাসের নাম কবিত্ব,

আর কবিত্বের নাম বিজ্ঞান, হেমচন্দ্র যে দেশের কবি আর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কাব্য, বিদ্যাসাগর যে দেশে দয়ার সাগর এবং রামমোহন রায় একখানা ছবি, যে দেশে রবীন্দ্র—জগদীশ are applauded simply because they are not appreciated,—সে দেশের কিছুর ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই। I hate everything ! Every thing ! Every thing !

আজকাল প্রায় শুনতে পাই, 'খদ্দরের loin clothপর, আর অতীতে ফিরে যাও'—আরে, যাবি কোথায়? অতীত কিছু আছে? জ্ঞানে, কর্ম্মে, বীর্য্যে, পৌরুষে, কোথায় তোমরা কৃতিত্ব দেখিয়েছ? তোমাদের অতীত ত উমিচাঁদ, ভারতচন্দ্র, আর লক্ষ্মণসেন। তোমাদের গর্ব্বের মধ্যে আছে এক ধর্ম্ম, যার জন্য কোন সাধনা করতে হয় না, কোন পুরুষকারের দরকার হয় না, যা depends on the length of the টিকি and কচুডাঁটার মত টিকি আপনি গজায়।—ওহে, আমার ঐ টাকাটা দেশের Sanitationএর জন্য দিলে হয় হে? Say for the prevention of Cholera,—Cholera বলতে আমার মনে প'ড়ে গেল, আমার বাবা Choleraয় মারা গিছলেন।—সবটা আমার বেশ মনে পড়েচে, সকাল থেকেই রোগ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু বলেননি, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাইরে ছিলুম। যখন বাড়ীতে ফিরলাম, তখন তাঁর অবস্থা বেশ খারাপ। তবু, আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে বসলেন। একবার বললেন, 'বাবা এসেছিস'—বল্‌তে বল্‌তে খুব এক ঝলক বমি ক'রে পড়ে গেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি ডান হাতের আঙুলে পৈতে জড়িয়ে, দুহাত এক ক'রে কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করলেন। হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে আধা পথে উঠে এলিয়ে পড়লো।

—ও পুণ্য-টুণ্য বুঝিনা। নিষ্ঠা বল্‌তে পার। হ্যাঁ, নিষ্ঠা বলতে পার। তা নিষ্ঠা তাঁর ছিল। Whatever foolish ideas he might have had, he was honest, he was steadfast—রোজ ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করতেন। তারপর খুব ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে বাড়ী ফিরতেন। প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা ধরে পূজা করতেন,—in the most ridiculous language, before a most ridiculous deity; কিন্তু সেই কাজ তিনি করে গেছেন মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। একবেলা আহার করতেন, কোন লোভ দেখিয়ে কেউ তাঁর এ ব্রত ভঙ্গ করতে পারেনি। রাস্তায় চলবার সময় লালা পর্য্যন্ত গিলতেন না, পাছে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বল কি?—একাহারে, অনাহারে, দিন কাটিয়েছেন। তবুত টাকার জন্য তাঁর জাত খোয়াননি। তাঁর পিতৃপিতামহরাও এই রকম দরিদ্র ছিলেন। অচথ রাণী ভবাণী যেদিন কাশীতে বড় বড় বাড়ী

ক'রে ব্রাহ্মণদের দান করতে চাইলেন, এই বাংলা দেশের একটি ব্রাহ্মণও হাত বাড়ায় নি—to accept her bounty. Look at the strength, man, look at the strength !

—I beg your pardon ! I am getting excited,—কেমন খেই হারিয়ে ফেলচি। কি বলতে যাচ্ছিলুম ? হ্যাঁ—Cholera.

—মনে হচ্ছিল, যদি proper precaution নিতে জানতেন, তাহ'লে আমার বাবা হয়ত আরও কিছুকাল বাঁচতে পারতেন।

—কিন্তু বাঁচবার কি দরকার ?

জীবনের যা কর্ত্তব্য ব'লে জানতেন তা নিখুঁত ভাবে পালন ক'রে, তাঁর ভগবানের কাছে শেষ আবেদন জানিয়ে, পুত্রের সঙ্গে শেষ দেখা করে, তিনি চলে গেছেন। Wasn't he supremely happy ? আমি আর তাঁর কি সুখ বাড়াতে পারতুম ? He would not have cared for my preventive measures তিনি বলতেন, 'জগৎটাকে ছেঁড়া চটির মত ফেলে দিয়ে চলে যাব।'

—ছেঁড়া চটির মতই ফেলে দিয়ে গেছেন। ছেঁড়া চটির আবার মেরামত কি হে ?—গুলিয়ে ফেলচি।—I am not consistent tonight.—It is that mother of mine ! That mother of mine ! She has killed me.

আমাকে একেবারে চুষে খেয়েছে। আমার মেরুমজ্জায় আর কিছু রেখে যায়নি। Innate দুর্ব্বলতায় মাঝে মাঝে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। সেদিন দেখলুম ক'টা জোয়ান ছেলে একটা বুড়ীকে তীরস্থ করতে নিয়ে যাচ্ছে। Shrivelled up old lady ! মাথায় সিঁদুরের ছাপ, চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরান।—আমার কিন্তু দেখেই মনে হল কি সুন্দর এই মুখখানি!—And, I felt so childish ! রাস্তার মাঝখানে,—বললে বিশ্বাস করবে না হে—কেঁদেই ফেললুম!—না, ভাই, আজ আর কোন কথা নেই।—হ্যাঁ, ঐ শ্মশানঘাট বাঁধাবার একটা estimate দিও—Good Night !

আশ্চর্য্য-কবিতা

সুকুমার রায়

(১৮৮৭-১৯২৩)

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, 'আমি পোইটরি লিখতে পারি!' একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, 'আমরাও ছেলেবেলায় ঢের-ঢের কবিতা লিখেছি'। নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটি কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা।

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, 'দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফলের গল্প শোননি বুঝি?' একজন ছেলে অত্যন্ত ভালমানুষের মত মুখ করিয়া বলিল, 'শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?' অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষন করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে?
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভর্তি হইয়াছে আর আট দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পুরা হয়; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে 'বিদায় বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'ফের যদি আমার নামে পোইটরি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।' হরেরাম বলিল, 'আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।' গোপাল বলিল, 'ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কিরে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেবো।' দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল। ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া, নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভাল কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

> পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
> অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি।
> উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল
> তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে—'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর'—এমন সময় গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল—'ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে'? ফিরিয়া দেখে হেডমাষ্টার মহাশয়। শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আগে

ওরা লিখেছিল।' 'ওরা কারা?' শ্যামলাল বোকার মত একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না। মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন, 'ওরা যদি পরের বাড়িতে সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে?' যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিতমহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা এককাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্‌স্পেক্‌টার স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেক্‌টার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেড মাষ্টার মহাশয় ইন্‌স্পেক্‌টারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথা! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোটবড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চীৎকার করিয়া, যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়ীটা কর্তালের মত ঝন্‌ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেক্‌টার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দারোয়ান হইতে অফিসের কেশিয়ার বাবু পর্য্যন্ত হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

সকলে সুস্থ হইলে পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'এত চেঁচালে কেন?' সকলে চুপ করিয়া রহিল। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল 'কে কে চেঁচিয়েছিলে?' পাঁচ সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল 'শ্যামলাল'। শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘণ্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বি তম্বার পর, একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?' বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিষস্য বিষমৌষধম্‌, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা

যে যে কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা একমাস প্রতিদিন পঞ্চাশবার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।' এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে গুণে দেখি চোদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য।
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কি আশ্চর্য্য গুণ—তার পর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

কেলো কামড়ায়

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবীর)

(১৮৯০)

কিছুক্ষণ থেকে রাস্তায় একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু তেমন কান দিইনি। পাড়ার অনেকের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সবার আওয়াজ ছাপিয়ে আশুদার গলা উঠছিল। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে দেরি হ'ল না। আশুদার সঙ্গে কোনোদিনই পাড়ার কারুর সদ্ভাব নেই, কারুর না কারুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে—আজকাল হাঙ্গামাটা যেন একটু ঘন ঘন হচ্ছে। কাজেই ওদিকে মন না দিয়ে নিজের চরকায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে চেঁচামেচি যেন বেড়েই চলল। পাড়ার অনুকূল, গজেন, সতু, জিতু, মিতু সবার গলা শুনতে পাওয়া যেতে লাগল, আর সবার ওপরে আশুদার ক্যানক্যানে গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপার কি! মুখ বাড়িয়ে দেখি, আশুদার বাড়ীর সামনে বেশ বড় রকমের একটি ভিড় জমা হয়েছে। কাজটাজ ফেলে ছুটলুম সেখানে। হাঙ্গামা মেটানোর চাইতে কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছাই যে প্রবলতর ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলম তাই, আশুদার পেয়ারের কুকুর কেলোকে নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে।

কেলোর একটু ইতিহাস আছে। বছর দুয়েক আগে আশুদা তাকে বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। তার বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে আশুদা বলতেন —আপিসের এক সায়েব দিয়েছে।

চাকরি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আজীবন বিশ্বস্ততার পুরস্কাররূপে বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতীকস্বরূপ এই সারমেয় শিশুটিকে কোলে নিয়ে আশুদা যেদিন বাড়ী ফিরলেন সেদিন সে বাড়ীর শিশুমহলে খুবই সোরগোল পড়েছিল।

ভাল জাতের বিলিতি কুকুর ব'লে দিন কয়েক তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি। কালো রঙ বলে তখুনি তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল কেলো। কিছুদিন কোলে কোলেই কেলোর দিন কাটতে লাগল বাড়ীর বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হ'ত না। তার পরে জিনিষ পুরনো হ'তে থাকলে যা হয় অর্থাৎ কেলো সম্বন্ধে সবাই উদাসীন হ'য়ে পড়ল। কেলোও সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

বড় ঘরের ছেলে, তার ওপরে আদরে মানুষ দেখতে দেখতে কেলোর দেহ হ'য়ে পড়ল বিরাট, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটিও সেই অনুপাতে হ'তে লাগল ক'ড়া। কেলো দিনরাত ঘেউ ঘেউ করে, পাড়ার ছেলেরা পেয়ে গেল মজা, তারা কেলোকে

দেখতে পেলেই দূর থেকে ইট মারা সুরু করলে। কেলো তার অদ্ভুত স্বপ্রতিভায় আততায়ীকে চিনে রেখে দেয় এবং সুবিধা পেলেই আঘাতের তারতম্য অনুসারে তাকে দংশন করে। ফলে, পাড়ার প্রায় সব ছেলেকেই কেলো দংশন করেছে। তাদের অঙ্গে যেমন কেলোর দংশন ক্ষতচিহ্ন বর্তমান, তেমনি কেলোও শতাধিক লোষ্ট্রনিক্ষেপ চিহ্ন সর্বদাই অঙ্গে ধারণ করে থাকে। তার অঙ্গের ঘা আর শুকোয় না। অবশ্য তাতে তার তেজোবৃদ্ধিই হয়ে চলেছে দিনে দিনে।

শুধু পাড়ার নয়, বে-পাড়ার ছেলে-মেয়েরাও কেলোকে চেনে। তারা স্কুলে যাবার-আসবার পথে সাবধান হ'য়ে চলে। আশুদার বাড়ীর কাছাকাছি এলেই তাদের গতি মন্থর হয়। মেয়েরা বলে—ও ভাই, কেলো আছে কিনা দেখ।

কেলোকে সকলেই চেনে। কেলোর অত্যাচারে পাড়ায় ফেরিওয়ালা, বাঁদর-নাচানে, ভালুক নাচানেওয়ালা, এমন কি বিয়ের শোভাযাত্রার পর্যন্ত যাবার জো নেই। কেলো দিনের বেলায় বাড়াতে থাকে না। বাড়ীর সামনেই রাস্তার ঠিক মাঝখানে সটান পড়ে থাকে। ঠেলাগাড়ীর চীৎকার, মোটরের ভোঁক-ভোঁক কিছুতেই তার গ্রাহ্য নেই, শেষকালে তারাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একবার এক রিক্সাওয়ালা কেলোর একটা পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিল, তাতে কেলো পাড়া ফাটিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে এমন আর্তনাদ করেছিল যে, তার অতি বড় দুষমনের মনও তার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

দিন দুই সে পেছনকার একটা পা লেংড়ে চলল বটে, কিন্তু তার পরেই তার বিক্রম হ'য়ে উঠল তিনগুণ, কারণ পা-টা একটু সারামাত্র সে পাড়ার মধ্যে রিক্সাওয়ালা দেখলেই তাকে কামড়াতে আরম্ভ করে দিল। শুধু পাড়ার মধ্যেই নয়, এমন কি বড় রাস্তায় রিক্সার ঠুংঠুাং আওয়াজ শুনতে পেলেও সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকত।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক কেলোর বিরুদ্ধে হ'লেও একা আশুদা ছিলেন তার স্বপক্ষে। সন্ধ্যেবেলা আশুদা যখন নিজের হাতে বাড়ীর রকটি ধুয়ে মুছে তাতে মাদুর পেতে বসতেন, কেলো সে সময়টা আর কোথাও থাকতে পারত না। সে-ও এসে আশুদার গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ত। আর আশুদা তার ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতেন ও আস্তে আস্তে ছেলে ঘুম পাড়ানো ছড়া গাইতেন আর কেলো চোখ বুজে শুয়ে এই আদর উপভোগ করত।

কেলোর সঙ্গে অন্যের যে রকম সম্পর্কই থাকনা কেন, আমাকে সে কখনো কিছু বলত না, বরং আমার একটু অনুগতই ছিল সে। এক সময় আমার নিজের অনেকগুলি কুকুর ছিল এবং কৃষ্ণের এই জীবটির প্রতি আমার মমতাও ছিল

অনন্যসাধারণ। একদিন কি একটা কাজে সন্ধ্যেবেলা আশুদার বাড়ী গিয়েছিলুম। কেলো যে সদর দরজার কাছে শুয়েছিল অতটা লক্ষ্য করিনি। আশুদা ব'লে ডাকতেই কেলো গর্জে উঠল—গ র্ র্ র্—কামড়ায় আর কি।

আমি ভড়কে না গিয়ে বললুম—এই যে কালো বাবু, আশুদা বাড়ী আছেন ?

বলা মাত্র কেলো চেনা লোকের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে একেবারে পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালো। সেই থেকে কেলো আমাকে দেখলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে। আমিও মাঝে মাঝে তাকে এক আধ পয়সার জিলিপি ঘুষ দিয়ে তার মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে, সময় বিশেষে অনেক কুকুরকেই আজকাল 'বাবু' বলতে হয় এবং বদমাইসকে ঘুষ না দিলে সংসারযাত্রা সুগম হয়না। যাক এখন কেলোর কাহিনীই হোক।

হঠাৎ দেখা গেল কেলো বাড়ীতে আহার ত্যাগ ক'রে রাস্তায় আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খেতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয়, পাড়ায় এমন কি বেপাড়ার পর্যন্ত উৎসব বাড়ীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে—মাঝে মাঝে দু-তিন দিন পর্যন্ত সে জায়গা ছাড়বার নাম করে না। নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট মৎস্য, মাংস ও দরবেশ মেরে মেরে দেহের পরিধি তার যে রকম বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে বেপাড়ার লেড়ী কুত্তাদের সঙ্গে যুদ্ধে দন্তাঘাত ও ছেলেদের লোষ্ট্রাঘাতের চিহ্নেও সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। কেলোকে এইভাবে আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে দেখে একদিন আশুদাকে বললুম—অমন ভালো কুকুরটা অযত্নে খারাপ হয়ে গেল।

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—আরে ভাই অযত্নে নয়, ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোক মেরে যাওয়াই তো order of the day।

বললুম—তা ব'লে রাস্তায় আস্তাকুড় ঘেঁটে খেয়ে বেড়াবে বাড়ী থাকতে!

আশুদা বললেন—কি করবে বল, ওতো আর মানুষ নয়। রেশানে যে চাল দেয় তার ভাত কুকুরেরও অখাদ্য। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ রসের কথা ছেড়েই দাও। আমরা পয়সা খরচ করে ও আস্তাকুঁড় খাই, ও বিনি পয়সায় তার চেয়ে ভাল আস্তাকুঁড় পেয়েছে বলেই বাড়ীতে খায় না। তাতে মনিবেরও দুপয়সা বাঁচে।

সেদিন সকালে আশুদার বাড়ীর সামনে চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলুম—হৈ হৈ ব্যাপার বেধেছে। অশোকস্তম্ভ গুহরায়, স্বাধীনতা সেনচৌধুরী, আজাদহিন্দ বক্সী, দামোদরভ্যালি সরখেল, জহরলাল মিত্রমজুমদার প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিরা খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন। দেখলুম ভারতী সেনগুপ্তা, অমৃতপাক চক্রবর্তী প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিনীরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

আমি যেতেই আশুদা চীৎকার ক'রে উঠলেন—এই যে নিরঙ্কুশ, দেখত' ভাই সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এরা কি হাঙ্গামা লাগিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি, হ'ল কি?

দুপক্ষই হৈ হৈ ক'রে উঠল। পাড়ার অধিকাংশ লোকই কেলোর অর্থাৎ আশুদার বিরুদ্ধে। তাদের নালিশ হচ্চে, কেলোর অত্যাচারে টেকা মুস্কিল হয়ে পড়েছে এবং আশুদার আস্কারা না পেলে সে কখনই এতটা বাড় বাড়তে পারত না। কিন্তু এতদিন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর তারা সহ্য করবে না। এবার যা হয় একটা এস্‌পার কি ওসপার হয়ে যাবে।

আশুদাও কম যান না। তিনি একাই একশ'। হাত পা ছুঁড়ে গলাবাজি ক'রে তিনি জাহির করতে লাগলেন, কেলো অত্যন্ত শান্ত নিরীহ জীব, সকলে উত্যক্ত করায় স্রেফ আত্মরক্ষার্থে তাকে মাঝে মাঝে একটু অসভ্য ব্যবহার করতে হয়। তার মত অবস্থায় পড়লে পাড়ার যে কোন লোক তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করত এবং বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে, হামেশা করে থাকে।

দুপক্ষের কথা শুনে সেদিনকার ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা হ'ল তা এই—বিঠলভাই গুপ্তভায়া, পাড়ার সবাই তাঁকে বিটকেল ভাই ব'লে ডাকে। তাঁর দুই খলিফা ছেলে প্যান্তা আর খ্যাঁচাকে চেনে না এ মহল্লায় ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই। কেলোকে তারা বড় ভালবাসে। যেতে আসতে ঢেলাটা খোঁচাটা দিয়ে প্রায়ই তাকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। মাস কয়েক আগে কেলোর দংশনে খ্যাঁচাকে প্রায় দিন পনেরোর জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল। এর পর কিছুদিন তারা কেলো সম্বন্ধে উদাসীনই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন থেকে আবার এদের ইঁটের জ্বালায় কেলোকে দিবা-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ করতে হয়েছে, বেচারির সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়েছে দগ্‌দগে।

আজ সকাল বেলা প্যান্তা বাজার করে বাড়ী ফিরছিল। দু'হাত জোড়া, একহাতে রেশনের ঝুলি অন্য হাতে বাজারের—মনের সাধে "লারে লাপ্পা" গাইতে গাইতে বাড়ীর দিকে চলেছে এমন সময় কেলো কোথা থেকে নিঃশব্দে এসে তার পায়ের ডিমের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। আশুদা অবিশ্যি বলছেন—ও কিছু না, একটু বড়ির মত মাংস কেটে নিয়েছে, তাতে আর হ'য়েছে কি!

বিঠলভাই চীৎকার করতে লাগলেন—নিরঙ্কুশ, তুমি ভাই একটু বিচার কর। নিত্যি এই কুকুরের অত্যাচার সহ্য ক'রে তো আর বাঁচা যায় না!

হঠাৎ কেলো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে "ঘেউ" শব্দে এক বিরাট হুঙ্কার

ছাড়ল। অর্থাৎ—খবরদার কুকুর কুকুর ক'রনা বলছি। 'সারমেয়' বলতে পারনা!

এই রকম দুপক্ষেই চেঁচামেচি চলছে, এমন সময় শ্রীমতী ভারতী দেবী এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন—দেখুন, এ রকম চেঁচামেচি করলে কিছু হবে না। এখন বেলা প্রায় দশটা বাজে, সকলেরই কাজকর্ম আছে। তার চেয়ে সন্ধ্যেবেলা নিরঙ্কুশ বাবুর বৈঠকখানায় সব আসুন, দু'পক্ষেরই সওয়াল জবাব শুনে নিরঙ্কুশ বাবু বিচার ক'রে যা বলবেন তাই হবে।

বিঠলভাই-এর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এতে রাজী আছেন?

বিঠলভাই বললেন—তা আছি। নিরঙ্কুশ ভাই ন্যায় বিচার করতে হবে।

ঠিক হ'ল সেদিন সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় পঞ্চায়েৎ বসবে। পাড়ার সব মুরুব্বিরাই আসবেন। আশুদাও ঠিক সময়ে কেলোকে নিয়ে সেখানে হাজিরা দেবেন। দশজনে পরামর্শ করে দেখা যাক কি করতে পারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে থাকতেই আমার বৈঠকখানায় পাড়ার মুরুব্বিরা এসে জমতে লাগলেন। এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনেও চোরাবাজার থেকে কিছু চিনি কিনে এনে রেখেছিলুম। অতগুলো লোক আসবে আমার বাড়ীতে, এক কাপ করে চা অন্তত না দিলে কি চলে। যথাসময়ে আশুদাও এলেন, সঙ্গে কেলো। আশুদা আসরে এসে বসতেই কেলোও তাঁর পাশে এসে বসে পড়ল। লোকজন আসবে বলে সেদিন গদির ময়লা চাদর তুলে পরিষ্কার চাদর পেতেছিলুম, কেলোর পদচিহ্নে বেশ খানিকটা জায়গা ময়লা হয়ে গেল। কেলোর আসাটা অনেকে পছন্দ না করে আপত্তি করলেন। কিন্তু আশুদা বললেন—এ বিষয়ে আমি বিচারকের অনুমতি চাইছি। বিচারালয়ে আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়।

আর কেউ কিছু বললেন না। আমি আশুদাকে বললুম—

তাহলে কেলোকে আপনি ধরে থাকবেন। এখানে যদি সে কাউকে কামড়ায় তাহলে তাকে আদালত-অবমাননার অপরাধে অপরাধী করা হবে।

সকলেই উপস্থিত, পাড়ার কয়েকজন মহিলাও এসেছেন। কয়েকটি কৌতূহলী ছেলেও জানালায় উঁকিঝুঁকি মারছে। পরিস্থিতি প্রায় আদালতের মতনই হয়ে উঠেছে, এমন সময় মহিলাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করলেই তো হয়, আর দেরী কিসের? কদিন থেকে আমার রাঁধবার লোকটাও আসছে না—

প্রথমে বিঠলভাই আরম্ভ করলেন—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন এবং আশুবাবুর কুকুর দ্বারা দংশিত হয়েছেন এমন অনেকে যাঁরা উপস্থিত নাই তাঁরা

সকলে আমাকে তাঁদের মুখপাত্র ক'রে এই সভায় পাঠিয়েছেন। অবিশ্যি মহিলাদের তরফ থেকে আমার কাছে এ সম্বন্ধে কোনো অনুরোধ আসেনি। তবুও—

শ্রীমতী চক্রবর্তী বললেন—যদি কিছু বলবার থাকে তো আমরা নিজেরাই বলব।

বিঠলভাই বললেন—বেশ। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, আশুবাবুর কুকুরের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত হয়েছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কোনো ব্যবস্থা তো করেনই না, বরং তাঁর হালচাল দেখে মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁর প্রশ্রয় পেয়েই যেন তাঁর কুকুর দিনে দিনে অত্যাচার বাড়িয়েই চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বিষয়ে আশুবাবুর কিছু বলবার আছে?

আশুদা বল্‌লেন—আমার কুকুর আপনাদের প্রতি কি রকম অত্যাচার ক'রে থাকে এবং আমি কি রকমে তাকে প্রশ্রয় দিই তা প্রকাশ না করলে আমি কিছুই বলতে পারি না।

স্বদেশজীবনবাবু উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—দেখুন, ন্যাকা সাজবেন না। কি রকম অত্যাচার করে আপনি জানেন না যেন। মশাই পাড়াশুদ্ধ ছেলেবুড়ো সবাইকে কামড়ে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়লে, আর উনি জিজ্ঞেস করছেন—কি রকম অত্যাচার করেছে!

স্বদেশজীবনকে সাবধান ক'রে দিতে হল—দেখুন ও রকম ভাষা ব্যবহার করলে প্রতিপক্ষও আপনার প্রতি অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। অতএব সকলের প্রতিই আমার অনুরোধ যে, ভাষা সম্বন্ধে একটু সংযত হবেন।

আশুবাবু বললেন—আমার কুকুর কখনো যাকে-তাকে কামড়ায় না। যে তাকে বিনা কারণে মারে তাকেই সে কামড়ায়। আঘাত না পেলে কখনো সে অন্যকে দংশন করে না। পাড়ার ছেলেবুড়ো যাকে যাকে সে কিমা করেছে, তাদের প্রত্যেকেই পূর্বে কখনো-না-কখনো আঘাত করেছে।

অধমতারণ ঘোষ দোস্তিদার বললেন—আপনি ইচ্ছে করলেই তাকে সামলাতে পারেন।

আশুদা জোর করে বললেন—না, সামলাতে পারি না। আজকালকার দিনে লোকে নিজের ছেলেকেই সামলাতে পারে না তো কুকুর! এই, আপনার ছেলে শ্রীমান পতিতপাবন আপনার খায়, আপনার পরে, থাকে আপনার আশ্রয়ে, কিন্তু সে কি আপনার বাধ্য? সেদিন যে সে বৌবাজারে বোমা মেরে ধরা পড়ল—আমি কি বলব সে কার্য সে আপনার প্রশ্রয় পেয়ে করেছে?

স্বদেশজীবনবাবু বললেন—দেখুন নিরঙ্কুশবাবু আমি একটা উপায় বাতলে

দিতে পারি। আশুবাবু যদি তা পারেন ত'হলে দু'পক্ষই রক্ষা পায়। আমি বলি কি, কেলোর মুখে একটা Muzzle অর্থাৎ মুখবন্ধ পরিয়ে দিলে ও আর কারুকে কামড়াতে পারবে না। Muzzle টার দাম না হয় পাড়ার সবাই চাঁদা করে তুলে দেওয়া যাবে। টাকা চার পাঁচের মধ্যেই একটা লোহার তারের Muzzle পাওয়া যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম—আশুবাবু কি বলেন?

আশুদা ঘোরতর আপত্তি করে বললেন—না তা হতে পারে না। প্রথমত কালুর (আশুদা আবার আদর ক'রে কেলোকে কালু বলেন) প্রতি অত্যাচার না করলে ও কখনো কামড়ায় না, দ্বিতীয়ত—মুখে Muzzle লাগিয়ে রাখা মানে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—এ কুকুর যাকে তাকে বিনা কারণে কামড়ায়। কালু মোটেই সে রকম নয়। যদিই বা তর্কের খাতিরে তাকে সেই জাতের কুকুর ব'লেই ধরা যায় তবুও Muzzle লাগানোটা ভদ্র উপায় নয়। কালু কুকুর ব'লেই স্বদেশজীবনবাবু তাকে Muzzle লাগাতে বলতে পারলেন। তাঁর ভাই যে গেল বছর বাসে পকেট মেরে ধরা প'ড়ে দু'মাস জেল খেটে এল—পাড়ার লোকেরা তো বলতে পারে রাস্তায় বেরুবার সময় এবার থেকে যেন তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার সেই অবস্থা দেখলেই সকলে পকেট সামলাবে কিংবা তাকে পকেটমার ব'লে চিনতে পারবে। Muzzle লাগাতে আপত্তির তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে, কালু রাস্তার খেয়ে উদরপূর্ত্তি ক'রে থাকে। সে পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাতে কালুর ও আমার দু'জনেরই অসুবিধা। রেশনের চাল ওর মুখে রোচেনা, রুচলেও সরকার কুকুরের জন্য রেশন দেয় না, দিলেও উনি দুটি লোকের আহার একাই ক'রে থাকেন!

শ্রীমতী অমৃতপাক্ বললেন—আশুবাবুর কথা সকলকেই মানতে হবে। আমাদের একটা নতুন চাকর এসেছে, সে তিনজনের ভাত একা খায়, তাতেও তার পেট ভরে না। তার জন্য আজ একমাস বাড়ীশুদ্ধ সকলে আধপেটা খেয়ে আছি। এর একটা কিছু ব্যবস্থা হয় না। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার—

শ্রীমতী অমৃতপাককে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে—কেলোর অত্যাচার। আপনারা ইচ্ছা করেন তো গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিষয়ও এখানে আলোচিত হ'তে পারে। কিন্তু এখন নয়।

আজাদহিন্দ্‌বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক কথা। আচ্ছা কেলোর আর একটি অত্যাচারের কথা আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে

আশুবাবু কি বলেন শুনতে চাই। কেলো রোজ সকালবেলা আমার বাড়ীর দরজার সামনেই ময়লা ত্যাগ ক'রে প্রার্তভ্রমনে যায়। এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করি আশুবাবুকে।

আশুবাবু বললেন—এর বিহিত করতে অনুরোধ করুন সহর পরিষ্কার করবার ভার যাঁদের ওপর আছে তাঁদের। কেলোকে শেখানো হ'য়েছে ঐ কর্মগুলি রাস্তাতেই সারবার জন্য।

স্বদেশজীবনবাবু শ্লেষ করে বললেন—কি শিক্ষাই দিয়েছেন!

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—দেখুন স্বদেশজীবনবাবু, কেলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—খবরদার বাড়ীতে ওসব কর্ম করবে না। সেই শিক্ষার জন্য কেলো ভুলেও কখনো বাড়ীতে ও কাজ করেনা। আর আপনাকে জন্মাবধি শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে বাড়ীতেই ওসব কাজগুলো সারতে কিন্তু তথাপি আপনি প্রতিদিন বাড়ীতে ঢোকবার সময় আমার বাড়ীর গায়ে সেটী সেরে তবে বাড়ী ঢোকেন। এ বিষয়ে কালু আপনার চাইতে অনেক উন্নত। তার ওপরে সহর-রক্ষক কোম্পানি এই জন্য বৎসরান্তে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা খাজনা আদায় ক'রে থাকে। আপনি কত খাজনা দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আশুদার কথা শুনে ঘরে একটা উচ্চ হাসির রোল উঠল।

অনেকক্ষণ থেকেই দূরে একটা ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হ'তেই কেলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হুমকি ছাড়লে—গ-র্-র্-র্।

হঠাৎ কেলোর এই ভাবান্তর দেখে সভাস্থ প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা ব'লেই ফেললেন--আশুবাবু, ওকে সামলান। আমাদের কামড়াবে নাতো?

আশুবাবু কেলোর যেয়ো গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—কালু, প ক'রে ব'সো।

ওদিকে ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হ'তে হ'তে ঘুঙুরের আওয়াজে পরিণত হ'ল। কেলো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেলোর বিরোধী পক্ষ তার এই ভাব দেখে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করছে এমন সময় রাস্তায় সুরের প্রস্রবণ ছুটল—"হরিদাসের বুল্‌বুল্ ভাজা,

খেতে বাবু বড়ই মজা—।
টাট্‌কা ভাজা গরম তাজা"—

ব্যস, আর কথা নয়। কেলো একটি হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে সভাস্থল পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ।

মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই বাইরে বিকট আর্তনাদ উঠল—ওরে বাবা, গেছি রে। মেরে ফেললে রে। ওরে হরিদাসের বুল্‌বুল্‌ ভাজা রে।

সবাই মিলে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে তিনকড়িদের বাড়ীর সামনে ভিড় জমেছে। তিনকড়ির গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড—কেলো এক ঘুগ্‌নি-দানাওয়ালাকে কামড়ে পালিয়েছে। লোকটার মাথায় স্ট্র-হ্যাট, চোখে কালো চশমা, একটা লাল কম্ফর্টরকে স্কার্ফ ক'রে পরা হ'য়েছে। হাত-কাটা খাঁকি সার্ট, ধুতি পরা, দু-পায়ে মোটা করে ঘুঙুর বাঁধা। কেলো তাকে কামড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিয়েছে।

তিনকড়ি সন্ধ্যেবেলায় তার বৈঠকখানার চারদিক বন্ধ ক'রে নিরিবিলি ব'সে খাঁটি খাচ্ছিল এমন সময় তার শান্তিভঙ্গ ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালার বিরাট আর্তনাদ!!!

সেখানে পেঁৗছে দেখি ঘুগ্‌নিওয়ালা ও তিনকড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে। তিনকড়ি ঘুগ্‌নিওয়ালাকে ধ'রে বলছে—ঘুগ্‌নি বিক্রি করিস্‌ তো এমন অদ্ভুত সেজেছিস কেন?

ঘুগ্‌নিওয়ালা বললে—তা'বলে কুকুরে কামড়াবে?

—আলবৎ কামড়াবে। তোর এই সাজ দেখে আমারই তোকে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ঘুগ্‌নিওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনকড়ি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে বললে—যাও বলছি, নইলে—

এই ব'লে সে বিরাট মুখব্যাদন ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালাকে তাড়া করতেই—ওরে, বাপরে ব'লে তল্পি তুলে সে মারলে টেনে দৌড়।

সেদিনকার বিচার সভা এইখানেই শেষ হ'ল।

উড়ুম্বর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৪—১৯৫০)

স্বর্গে সবে সকাল হইয়াছে।

কালিদাস স্বগৃহের বহির্দেশে চম্পক বৃক্ষের তলায় বসিয়া ঝিরঝিরে বাতাসে খুব মনোযোগ দিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, এমন সময় অঙ্গনের ও-প্রান্ত হইতে কে বলিল—বলি কালিদাস বাড়ি আছ কি?

কালিদাস মুখ তুলিয়া দেখিলেন ভাস এদিকে আসিতেছেন। 'মেঘদূত'খানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া কালিদাস আগাইয়া গিয়া ভাসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন।

ভাস বৃদ্ধ ব্যক্তি, শিখা-সূত্রধারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মত তেজোব্যঞ্জক মখশ্রী, বড় বড় চোখ, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের উপর পড়িয়াছে। বেশ দীর্ঘচ্ছন্দে পদবিক্ষেপ করিয়া হাঁটিবার অভ্যাস আছে। আসিতে আসিতে বলিলেন—সকালে কি করছিলে? গাছের তলায় বসেছিলে দেখলাম।

কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে বসে বসে 'মেঘদূত' খানা একবার দেখছিলাম। 'কাল রাত্রে যে রকম গুমোট গিয়েছে—তাতে গাছতলায় বসলে তবুও একটু—

—নাঃ, দু' চোখের পাতা কাল বুজতে পারি নি। স্বর্গ আর সে স্বর্গ নেই। ক্রমেই খারাপ হয়ে আসচে। দেবরাজ উদাসীন, একবিন্দু বৃষ্টি পড়েনি আজ দশ পনেরো দিন। তারপর তোমার কাছে একটু এলাম বাবাজী—

কালিদাস বয়োজ্যেষ্ঠ পূজ্যপাদ কবিকে সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—বিশ্রাম করুন। ব্যজনী কি আনাবো?

—থাক, দরকার হবে না। এটি চম্পক বৃক্ষ দেখচি যে।

—আজ্ঞে নন্দনকানন থেকে দেবরাজের কর্মচারীকে বলে কয়ে একটি চারা আনিয়েছিলাম। তবে এখনো পুষ্প-প্রসবের সময় হয় নি।

—সে কি রকম? বর্ষাকাল, সে সময় তো উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে নাকি? এখন তো—

তা নয়। এ একটু অন্যরকম। আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে একটি চারা দিতে পারি।

—চম্পকের চারা আপাতত আবশ্যক নেই। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে অন্য একটু কারণে। আমাকে সুবন্ধু বলছিল তোমার 'মেঘদূত'-এর

নাকি বাঙময়-আলেখ্য হয়েচে, মর্ত্যে নাকি কোন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্চে? এই হল আমার নান্দী। এখন উত্তর দাও।

—আজ্ঞে আপনার কথা যথার্থ। সুবন্ধু আপনাকে ঠিকই বলেছে। আজ ভাবছিলাম মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসব। দেব, আপনি সঙ্গে চলুন না।

—নিশ্চয় যাবো। সেই শুনেই তো আমি সকালেই এখানে এলাম। আজকাল মর্ত্যে আমাদের আর আদর নেই। সংস্কৃত ভাষাটাই ভারতবর্ষে সবাই ভুলে যাচ্চে। এখন সেখানে অন্য ভাষার চর্চ্চা।

—আজ্ঞে বহু অর্বাচীন বালক কবির আজকাল সেখানে প্রাদুর্ভাব।

—তবুও তো তোমার কাব্য সেখানে আদৃত হয়, পঠিত হয়। আমার 'অবিমারক'-এর কথা, 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'র কথা ত সবাই ভুলে গিয়েচে। তোমার কাব্যের বাঙময়-আলেখ্যও তো হোলো। আমার নাটক কে পড়ে?

—আজকাল বাঙময়-আলেখ্যের যুগ চলেচে ভারতবর্ষে। আমার উজ্জয়িনীতে পর্যন্ত দুটি বাঙময়-আলেখ্যের প্রেক্ষাগৃহ। এবার যদি—

এমন সময় কবি সুবন্ধু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে দেবদারু কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় এদিকে আসিতেছেন দেখা গেল। সুবন্ধু অনেক ছোট ইঁহাদের চেয়ে—দ্বাদশ শতাব্দীর লোক কালিদাস ও ভাস তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুবন্ধু দীর্ঘাকৃতি লোক, তাঁরও শ্বেতশ্মশ্রু, তবে ভাসের মত বক্ষদেশাবলম্বী নয়, হাতে একটা সরু যষ্টি।

ভাস বলিলেন, ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সুবন্ধু ভাসের সঙ্গে অত্যন্ত সমীহ করিয়া কথাবার্তা বলেন, ভাস কালিদাসেরও পূর্বাচার্য্য, সুবন্ধুর মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবির পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। তবে সুবন্ধু মনে মনে এই বৃদ্ধ কবির প্রতি একটু অনুকম্পার ভাবও পোষণ করেন। হয়তো সেটা তারুণ্যের স্পর্দ্ধা।

সুবন্ধু বলিলেন—আজ্ঞে যাবো।

—এখন মর্ত্যে কোনো গোলযোগ নেই তো?

দুজনই সুবন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন। সুবন্ধু যে ঘুর ঘুর করিয়া প্রায়ই মর্তধামে যাতায়াত করেন, এ সংবাদ দুজনেই রাখেন। ভাবেন তরুণ বয়স, বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে এখনো অনেক বিলম্ব, মর্ত্যধামের সৌখীন লীলাবিলাসের বাসনা এখনও তাহার যায় নাই। সুবন্ধু লজ্জিতসুরে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, মর্ত্যধামের গোলযোগ মিটবার নয়। ও লেগেই আছে। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

ভাস বলিলেন—সুবন্ধু, এখন কি রচনা করচো?

—আজ্ঞে কিছু না। আপনাদের নাম তো মর্ত্যে এখনো যথেষ্ট। আমার নামই তো লোকে ভুলে গিয়েচে। আমার 'বাসবদত্তা' এখন আর কে পড়ে?

—আমার নাটক কে পড়ে?

—ও কথা যদি আপনি বলেন তো আমাদের আশাই নেই। আপনারা ঋষি হয়ে গিয়েচেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভাস উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—পূজ্য-পাদ ভবভূতি এদিকে আসচেন দেখছি—

ভবভূতি অঙ্গনে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—আমার কি সৌভাগ্য! এখানেই যে আজ দেখচি কবি সম্মেলন।

সুবন্ধু বলিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত কবি আজ এখানে মিলিত হয়েচেন। দেখে ধন্য হোলাম।

কালিদাস বলিলেন—আমিও সে কথা বলতে পারি।

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আপনি বলতে পারেন না।

—কেন?

—আপনি দেখচেন দুজনকে। আমি দেখচি তিন দিক্‌পালকে। আমি বিখ্যাত কবি নই। আমাকে বাদ দিয়ে বিচার করবেন।

ভবভূতি বলিলেন—ওহে ছোকরা তুমি থাম তো। তোমাদের বিনয়ের কলহ এখন রাখ। আমি যে জন্যে এসেছি—কালিদাসকে বলি। আমার সময় কম। পিতৃব্য ভাস, আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

ভাস ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—স্বচ্ছন্দে বল বাবাজী। আমার কি অসুবিধে?

ভবভূতি কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পৃথিবীতে আমি দাম্ভিক বলে গণ্য হয়েছিলাম একটি শ্লোক লিখে, এখন দেখচি আমার সেই শ্লোক আমার কাব্যের চেয়েও খ্যাতি লাভ করচে। এখন আমার একটা কথা। শুনলাম, দাদা, আপনার মেঘদূতের নাকি বাঙময়-আলেখ্য হয়েচে পৃথিবীতে?

—হ্যাঁ ভাই।

—আমার 'উত্তররামচরিত' খানার ওইরকম করা যায় না? কিংবা 'মালতী মাধবে'র? সেই জন্যেই আপনার কাছে এলাম আজ।

কালিদাস কিছু উত্তর দিবার পূর্বেই সুবন্ধু বলিলেন—ও ক'রে দেবো দাদা। সুধাংশু রায় নিপুণ বাঙময়-আলেখ্য নির্মাণকারক। সে স্বর্গে এসেচে

কিছুদিন হোল, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বাসবদত্তা কাব্যখানার জন্যে তাকে বলেছিলাম—

ভবভূতি অধীরকণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছা, তার দেহ হাওয়া হয়ে রয়েচে—মর্ত্যধামে তার কিছু করবার ক্ষমতা আছে আজকাল? বড় অসার কথা বলো ছোকরা।

—আজ্ঞে, আমার কথা প্রণিধান করুন। আমার সঙ্গে ছিল সোঢ়ল—

—সে আবার কে?

—আজ্ঞে আপনারা সফরী মৎস্যের খবর কি রাখবেন? আমরা হোলাম কাব্য-সমুদ্রের সফরী—আপনারা অগাধ জলসঞ্চারী রুই কাৎলা—সোঢ়ল কবি ধরেচে তার কাব্যের বাঙময়-আলেখ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে—

—কি কাব্য?

—আজ্ঞে উদয়সুন্দরী-কথা নামে চম্পূ কাব্য—খুব নামকরা কাব্য—তবে কি আপনার কিংবা পিতৃব্য ভাসের—কিংবা কালিদাস দাদার—

—থাক্ আমার কথা বাদ দাও—ওঁদের কথা বলতে পারো। সারা পৃথিবীতে মেঘদূতের নাম ব্যাপ্ত হয়েচে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পড়ে একজন ম্লেচ্ছ কবি—

ভাস বলিলেন—বাদ ওই সঙ্গে আমার নামটাও দাও। একমাত্র স্নেহভাজন কালিদাসের নাম এখনো পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁ, তুমি যে ম্লেচ্ছ কবির উল্লেখ করলে, আমিও রাখি সে সংবাদ—তার নাম—ম্লেচ্ছ নাম বড় দুরুচ্চার্য-তার নাম—

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—গয়থী। ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করে মাঝে মাঝে। আমার নাটক তার নাকি ভাল লেগেছে। যাক সে সব কথা। আজ মর্ত্যধামে আমরা যাচ্ছি মেঘদূতের আলেখ্য-দর্শনে। ভবভূতি তুমিও চলো, আমরা বড় আনন্দ পাবো। তোমার শিক্ষা মর্ত্যে অমর হয়ে আছে, অযথা বিনয় কেন? আলেখ্য-দর্শনের বীজ তুমিই বপন করেছিলে তোমার অমর নাটকে। তোমার সমানধর্মা লোকেরা তোমাকে এখন চিনেচে। ঠিকই বলেছিলে, কাল নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুল। ধন্য তুমি।

কথা শেষ করিয়া কালিদাস ভবভূতিকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন।

মর্ত্যধামে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই এই দলটি যাত্রা করিলেন কবিকুঞ্জ হইতে। পথে বাণভট্টের সঙ্গে দেখা। এতগুলি কবিকে এক সঙ্গে দেখিয়া বাণভট্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—উপাধ্যায়গণ, আপনারা কোথায় চলেচেন? একসঙ্গে এতগুলি জ্যোতিষ্ক? এই যে সুবন্ধুও—ব্যাপার কি?

ভাস প্রবীণতম এবং এই দলের অধিনায়ক। তিনি বলিলেন—আমরা যাচ্চি কালিদাসের মেঘদূতের বাঙময়-আলেখ্য দর্শনে, মর্তে—তোমারও তো—

বাণভট্টের পরিধানে মহার্ঘ পীতবর্ণের পট্টবাস, মাথার চুল শাদা হইলেও কুঞ্চিত, পরিপাট্যযুক্ত ও দীর্ঘ। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ, দুই কর্ণে কর্ণিকা পুষ্পের গুঞ্জিকা, বেশ সৌখীন ধরণের লোকটি। ভাসের কথায় তাঁহার বিস্ময় যেন আরও বাড়িয়া গেল। শুধু বলিলেন—ও।

কালিদাস সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন বানভট্টকে।

এতক্ষণে বাণভট্ট যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—না না, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাতঃপাদ ভাসও চলেচেন দেখচি। এসব সুবন্ধুর ক্রিয়াকলাপ আমি জানি। যখন তখন মর্ত্যধামে ঘুর ঘুর ক'রে যাওয়ার ফল আর কি। আজকাল কি অতিরিক্ত আসব পান ক'রে থাকো সুবন্ধু?

সুবন্ধু অপ্রতিভের স্বরে উত্তর দিলেন—না দাদা।

—সেদিনও তো দেখলাম বাঙময় আলেখ্য প্রেক্ষাগৃহে—?

—আজ্ঞে না আপনার ভ্রম হয়েচে। ও আসব নয়, একপ্রকার বৃক্ষপত্রের ক্কাথ, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে পান করা হয়। একটু আস্বাদ ক'রে দেখছিলাম —মর্ত্যে সবাই খায়—

—মর্ত্যবাসীদের অলীক ব্যসন তোমাকে পেয়ে বসচে ক্রমে ক্রমে। আর একটি হচ্চে এই বাঙময়-আলেখ্য। মর্ত্যে এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সেদিন এই সুবন্ধুর পরামর্শে ওর সঙ্গে আমার 'কাদম্বরী'র বাঙময়-আলেখ্য দেখতে গিয়ে হতাশ হয়ে এসেছি—

ভাস সাগ্রহে বলিলেন—কেন? কেন?

—আচার্য ভাস, আপনি প্রবীণ ও প্রাচীন, আপনাকে সেই রকম ভক্তি করি, আপনার সামনে আর সে সব কথা বলতে চাই নে। আর কথায় কথায় গীত। নাঃ, আমি তো দুঃখে আক্ষেপে চলে এলাম—সুবন্ধু সব জানে, আবার আপনাদের আজ নিয়ে যাচ্চে—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি নিয়ে যাই নি দাদা। কালিদাস দাদাই আমাকে বল্লেন উনিই আমাকে নিয়ে যাচ্চেন। বরং আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন—

কালিদাস বলিলেন—সে ঠিক। সুবন্ধু জানতো না। আমিই ওকে যেতে বলেচি। দেখেই আসি কেমন হোলো মেঘদূত। চল্লাম ভায়া বাণভট্ট—

রাত্রিকাল। কলিকাতা 'প্রদীপ' সিনেমাতে 'মেঘদূত' হইতেছে। ভীড় খুব। ডিম ভাজা ও ঘুঘনি, চানাচুর, বাদাম ভাজা, আলু-কাবলীওয়ালাদের

পাশ কাটাইয়া কবিদল সিনেমা হলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছবি আরম্ভ হইল। ছবি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কালিদাস বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—একি? এ কার মেঘদূত? আমার তো নয়—

ভাস বলিলেন—তাইতো। আমিও তাই ভাবচি।

ভবভূতি বলিলেন—শুধু নামটাই নিয়েচে।

কালিদাস ক্ষোভের সঙ্গে বলিলেন—এখানে বসে দেখে কি করবো। বাণভট্ট ঠিক বলেছিল। চলুন আর সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

বাহিরে আসিয়া কালিদাস বলিলেন—ওহে সুবন্ধু, তুমি সেই বৃক্ষপত্রের ক্বাথ সেবন করবে নাকি?

—আজ্ঞে না চলুন। ও অভ্যেস নেই আমার, দৈবাৎ সেদিন একটু আস্বাদ করেছিলাম মাত্র।

এমন সময় দুটি ছোকরা যাইতে যাইতে একজন আর একজনকে বলিতেছে শোনা গেল—'মেঘদূত' কার লেখা বই হে?

অপর ছোকরা জবাব দিল—অতীন ঘোষের।

—'ভাবীকাল'?

—তা জানি নে। বই উঠেচে জানিস?

—কাল একখানা 'মেঘদূত' আর একখানা 'ভাবীকাল' খুঁজে দেখতে হবে পাওয়া যায় কি-না।

কালিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঠিক পিছনে ছোকরা দুটি। রাগে ও ক্ষোভে কালিদাস কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। ছবি দেখিয়াও এত রাগ তাঁহার হয় নাই। ভাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—শুনেচেন এ অর্বাচীন বালক দুটি কি বলচে? অতীন ঘোষ নামক কোনো ব্যক্তির লেখা নাকি এই বই। বাঙময়-আলেখ্যই প্রধান জিনিস, লেখকের নামটা জানবার আবশ্যক কি?

সুবন্ধু বলিলেন, এই বাঙময় আলেখ্যের নির্মাণকার হোলো অতীন ঘোষ নামক কোন লোক। ওরা অত কৌতূহলী নয় গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধে। আলেখ্য নিয়ে আসল কথা। অতীন ঘোষকেই ভেবেচে গ্রন্থকর্তা। মহাস্থবির অশ্ব-ঘোষের নাম করলেও কালিদাস দাদার মানটা থাকতো। তা নয়, অতীন ঘোষ।

সুবন্ধু হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস রাগের সুরে বলিলেন—অত হাস্য কিসের? বৃক্ষপত্রের ক্বাথ পান না করেই এই। চলো এখান থেকে যাই।

—বৃক্ষপত্রের ক্বাথে বিহ্বলতা আসে না দাদা, এ আসব নয়। আপনি আস্বাদ ক'রে দেখতে পারেন।

ফিরিবার পথে ভবভূতি বলিলেন—না হে সুবন্ধু, তোমার সেই সুধাংশু রায়কে আর কোন কথা বোলো না, আমার উত্তররামচরিতের বাঙময়-আলেখ্যে কোন প্রয়োজন নেই—

ভাস বলিলেন—আমারও 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' সম্বন্ধে ওই কথা—বাণভট্ট ছোকরা যথার্থ কথাই বলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে—

কালিদাস বলিলেন—সুবন্ধু কিন্তু ওর বাসবদত্তার ঠিক আলেখ্য করাবে আপনি দেখে নেবেন—ও এখনো আসক্তি পরিত্যাগ করেননি—সেই সুধাংশু রায়কে ও ধরবে ঠিক—

সুবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—যা বলেন দাদা। আপনারা হোলেন প্রথিতযশা কবি, আপনাদের কথা আলাদা—নাম যা হবার আপনাদের হয়েই গিয়েচে। —আপনাদের কি ?

ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন কালিদাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কালিদাস ভাসকে সঙ্গে লইয়া নিজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চম্পক বৃক্ষের বেদীমূলে বসিয়া আছেন। ব্যাসদেব প্রবীণতম ও প্রাচীনতম কবি, তিনি কখনো আসেন না। শুধু কবি নহেন, দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়াও তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যাসদেবের আকৃতি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায়, পরিধানে কষায় বস্ত্র, মস্তকে শুভ্র কেশভার, গম্ভীর ও সৌম্য মুখভাব। উভয়ে সসম্ভ্রমে ব্যাসদেবের পাদ-বন্দনা করিলেন। কালিদাস বিনীতভাবে বলিলেন—আমার গৃহ পবিত্র হোল আপনার চরণ-স্পর্শে। আমার প্রতি কি আদেশ, তাতঃপাদ ?

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমার মঙ্গল হোক। কালিদাস, তোমার কুশল ? ভাস, তুমি ভাল আছ ? বোস, বোস। কোথায় গিয়েছিলে ? মর্ত্যধামে ? ভবভূতিও সঙ্গে ছিল ? ছোকরা ভাল লেখে। সেখানে কেন ?

কালিদাস কারণ বলিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—আমিও ঐ কারণেই এসেছিলাম, গীতার একটি বাঙময়-আলেখ্য নির্মাণ করিয়ে দিতে পারো ? অবশ্য আমি প্রচারের দিক দিয়েই বলচি। তত্ত্ব-প্রচারের সুবিধে হবে। তোমরা তো আজকালকার ছেলে, মর্ত্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, আমার তা নেই। ভাস কি বলো ?

ভাস বলিলেন—অনুমতি যদি করেন তো বলি, ও সব কলঙ্ককারী ব্যাপারের মধ্যে আপনি যাবেন না। বলো না হে কালিদাস সব খুলে ঘটনাটা ?

পরে ব্যাসদেব সব শুনিয়া নীরব রহিলেন।

ভাস বলিলেন—এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন। আপনাকে আমি কি বলবো ?

ব্যাসদেব বলিলেন—তোমার যে কাব্যের বাঙময়-আলেখ্য হয়েচে, তার নামটি কি বল্লে ? মেঘদূত ? কি অবলম্বনে লেখা ? কাব্যের ঘটনাটি কি ?

কালিদাস লজ্জিত স্বরে বলিলেন—সে আর আপনার শোনার প্রয়োজন নেই, তাতঃপাদ। সে কিছু না। ওই একটা দেশবিদেশের বর্ণনার মত। আমাদের কথা বাদ দিন। আপনি এবেলা আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে যান।

ব্যাসদেব থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ব্রহ্মার কাছে যাইতে হইবে। বেদ সম্বন্ধে কি আলোচনা আছে। অন্য সময়ে চেষ্টা করিবেন। এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ব্যাসদেব বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ভাস কালিদাসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বোঝো ব্যাপার!

ত্রিলোচন কবিরাজ

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (দিবাকর শর্ম্মা)

(১৮৯৬-১৯৩২)

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল। সকালে 'জেণ্টস্ রেস্তোরাঁ ডি ল্যুক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসি রুটির একখানা পোড়া টোষ্ট খাইয়াছিলাম, ক্রমাগত তাহারই ঢেকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ী ফিরিব না সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ী কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোন আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক, কেহ সরবে কাঁদিতেছে কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে খাটিয়া দেখিলাম না; উপরে চাহিলাম—দেখিলাম বাড়ীখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইন বোর্ড, তাহাতে সোনালি অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্ত্তিহরণ ঔষধালয়', তাহার নীচে লেখা—শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইন বোর্ডের সোনালি অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড় হল ঘর, তাহার আসবাব পত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ'- একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ; ক্যাশবাক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিলেন তিনি অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিস্‌পেনসারী। ক্যাশবাক্স রক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে-ছিলেন, সহসা ডাকিলেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েল পেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জানেন তো বাড়ীতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা?" কহিলাম, "কিসের দর্শনী?"

"কবরেজ মশায়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিনদিনেই নির্ম্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এই কথা বল্‌বার জন্যে ডেকেছেন বুঝি? ব্যাধি আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—"

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না, বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, "আপনি অন্তর্যামী দেখছি।"

বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে কহিলেন, "প্রায়। এই তেষট্টি বচ্ছর বয়স হ'ল মশাই, আঠার বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউণ্ডারী কচ্ছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন শ' রুগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রুগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না। নিজে দেখছি তো কবরেজ মশায়ের ওষুধ নৈলে কারো চলে না। আর আপনি কি না—"

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, "কি ব্যাধির কথা বল্‌ছেন জান্‌লে—" বৃদ্ধ কহিলেন "সাইনবোর্ড দেখেন নি? যাবতীয় প্রণয়-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা, ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন কোথাও?" শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প প্রভৃতি প্রণয়-ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড় বড় মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ—বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনও ব্যাধি নেই আপনার? কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখো-চোখি হ'লেই বুঝতে পার্‌বেন ব্যাধি আছে কিনা? আপনার আর বয়েস কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার ক'রেছি, এই তেষট্টি বছর বয়েস, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।" প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয় তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয় তো এটাও প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন,

"ওই কব্‌রেজ মশাই আসছেন।" পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্‌গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই, পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরা ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরণে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্ত-চন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুঁজিলাম। কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "ভয় নাই, আরোগ্য হবে।" পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, "রোগিগণকে উপস্থিত কর মাধাই।" কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিস্‌পেনসারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে সুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলই আমার পরিচিত! রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক পত্র সম্পাদক পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, "হাঁ মেয়েরাও আছেন, তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।"

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত কর।" এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ মহাশয় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রাতে মোহমুদ্‌গর গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।" ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগীরা আসিতে সুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন

তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশা কি?" ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদক।"

"হুঁ। কবিতা ছাপা হয়?

"আজ্ঞে তা'তেই তো—"

"হুঁ। লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য্য করা হইয়াছে?"

"আজ্ঞে। তাঁর জবাব পেয়েই তো—" বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, "ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বল্পপ্রণয়ান্তক।" তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ কর।"

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্ত্তনাদ শুনিলাম, পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্চ্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, যদি কিছু মনে না করেন—"

"রসনিধি কহিলেন, আদৌ মনে কর্ব্বনা, প্রশ্ন করুন।"

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল, কহিলাম "কবিরাজ মশায়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—"

রসনিধি কহিলেন, "ত্রিলোচন কব্‌রেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা সংক্ষেপে শুনুন তবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কব্‌রেজ মশায় পড়তেন সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্যময়ী ত্রিলোচন কব্‌রেজের নামে অভিযোগ কর্‌ল যে তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মশায় চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেমব্যাধিই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেমব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধ পত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিস্‌পেনসারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ কর্ত্তে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলে আমার সম্বন্ধে তাঁর

অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক্ পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।" বলিয়া রসনিধি হাতযোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, "চুপ!" ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙ্গীন পাঞ্জাবী, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ্ম। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানী হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।"

কেমন করিয়া পাশের বাড়ীর ছাতে শাড়ী শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ীর অধিকারিণী তাঁহার মাথায় ছাত হইতে একঝুড়ি তরকারীর খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার অন্যতম। এই পর্য্যন্ত বণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, "তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।" কবিরাজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ! জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?" রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ষোল—ষোল! sweet—"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরী-কালানল প্রাতে; সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত কর গে।"

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন; একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্ত্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি

বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থ পক্ষের সহধর্ম্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার অরুচি শিরঃশূল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মত একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। 'বাস্তবিকার' অন্যতম সদস্য রাতুল রাহা! সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব সহরে আসিলেন কি করিয়া? ঘর শুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্ব্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর উঠিয়া আলমারী হইতে বেল কাঠের ষ্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন, রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই।"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "হুঁ। রোগ জটিল।"

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, "সারবে কি? না ফাঁদে বদ্ধ হ'য়ে—"

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই। অবস্থা বল।"

রোগী কহিলেন, "অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।"

ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "হুঁ। বল।"

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল —সেই ছোট বেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখী ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয়-খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।" বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, স্পষ্ট করে বল।"

রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে নিবেদিতাগণের অভিভাবক

এবং অভিভাবকরা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তিবিকা' হইতে কুমারী-গণের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে, রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন। ত্রিলোচন কবিরাজ খানিক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "রোগ জটিল। রীতিমত চিকিৎসা আবশ্যক।" তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, "প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত-নিসূদন রস অর্দ্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ-বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মত।" ব্যবস্থা মত ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্ত্তমান সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, "অপেক্ষা কর।" ফিরিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।" বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান্ বুদ্ধিমান খ্যাতিমান্ ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই। আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় খুলিয়া না বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরুদীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরূপ বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্ব্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি যথেষ্ট—আবার স্কুল কলেজ এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ীর আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্য্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্চ্ছা যাইবে।"

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম। পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণীর আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই সুখের কথা, কিন্তু এ ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়েস্কুলের গাড়ী হইতে বায়স্কোপের ছবি পর্য্যন্ত এই দারুণ রোগের বীজাণু বহন করিতেছে সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশী সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দ্দন বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ী শীতল জল সহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চক্ষে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।" আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমে দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী —আমার কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই।

সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

* এই রচনা প্রেসে দিবার পরই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের বুড়া কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্য্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র-তাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে সেলটিক সভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র-সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, পাঁচালী-গায়ক সুবর্ণবণিককুলতিলক ভবভূতি লাহা পর্য্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে —অবস্থা বুঝিয়া আমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্ম্মার নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

"গৃহিণী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাড়ীতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই। তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে—যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন

দেখিয়াছি। এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে ভরসা দিবেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক তাড়নার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।”

মডার্ন ফুলশয্যা

ভাস্কর

ভূমিকা

(১৮৯৬)

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বাংলার এক পল্লীগ্রামে এক বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাত্রের বয়স ছিল দুই বৎসর এবং পাত্রীর এক। দুইখানি রূপার থালায় দুইজনকে বসাইয়া কন্যা-সম্প্রদান হইয়াছিল এবং তাহাদের ফুলশয্যা হইয়াছিল একখানি সুসজ্জিত বেতের দোলনায়। ইহাদের সন্তান-সন্ততিরা ধনে এবং মানে সাধারণ বাঙালীর মতই হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই দুইটি নরনারীর নরত্ব ও নারীত্বের যে অবমাননা হইয়াছিল, বাংলার সমাজ তাহা ভোলে নাই। কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে যে দুইটি কুসুমকলির বলিদান হইয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বাঙালীকে করিতেই হইবে। প্রেম কি, তারুণ্য কাহাকে বলে, পূর্বরাগ কিরূপ, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার, বুঝিবার এবং নিজ জীবনে পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ যাহারা পাইল না, তাহাদের বিবাহের সার্থকতা কি? বিবাহ কি, মন্ত্রের কোন মূল্য আছে কি না, ইহা কি একটি চুক্তিমাত্র, না ইহার আর কোন গভীরতর অর্থ আছে, বিবাহটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, না সামাজিক ব্যাপার, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিবার বা এতৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবার অবকাশ তাহারা পায় নাই। একই সময়ে দুইটি নারীকে বা দুইটি পুরুষকে ভালবাসা সম্ভব কি না, সম্ভব হইলে তাহা কর্তব্য কি না, কর্তব্য হইলে তাহা বাঞ্ছনীয় কি না এবং বাঞ্ছনীয় হইলে তাহা নিরাপদ কি না, প্রভৃতি ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। বিবাহ-ব্যাপারটা দৈহিক, বা মানসিক, বা আধ্যাত্মিক, বা কাল্পনিক, বা সবই, বা কোনটিই নয়, তাহা জানিবার বা বুঝিবার জন্য যেটুকু জ্ঞানলাভ আবশ্যক তাহার অবসর তাহারা পায় নাই। পাত্রের পক্ষে গ্রাজুয়েশন এবং পাত্রীর পক্ষে সঙ্গীতচর্চা, বিবাহের এই দুইটি ন্যূনতম যোগ্যতাও তাহারা অর্জন করে নাই। পাত্র এবং পাত্রীর রুচি কিরূপ, তাহারা কি খাইতে, কি পরিতে, কি শুনিতে, কি বলিতে, কোথায় যাইতে, কোথায় না যাইতে ভালবাসে, তদ্বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহাদের হয় নাই। স্পষ্ট, নির্ভীক ও লজ্জাহীন কলাচর্চা এবং অবাধ-মিশ্রণ যে মানসিক পবিত্রতার লক্ষণ এবং দ্বিধা, সঙ্কোচ এবং লজ্জাই যে মানসিক মলিনতার নিদর্শন, এই সামান্য সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। সর্বোপরি, যে সকল মূল্যবান গ্রন্থে উপরোক্ত সমস্যা-গুলির, সহজ, রসাল, সুমধুর এবং মনোমুগ্ধকর সমাধান শাস্ত্ররূপে, দর্শনরূপে,

বিজ্ঞানরূপে বা সাহিত্যরূপে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিবার সুযোগটুকু হইতেও তাহারা একান্ত বঞ্চিত ছিল। এমত অবস্থায় উহাদের বিবাহ ধনীর বিড়ালের মত বা শিশুর পুতুলের বিবাহের মতই একটা খেলা, একটা খেয়াল, একটা প্রহসন বা একটা কৌতুক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মানুষের মনের প্রতি এই অবিচার, এই নিষ্ঠুরতা সমাজ সহিতে পারে নাই। ইহার প্রতীকার সে করিয়াছে এবং করিতেছে। বক্ষ্যমান প্রসঙ্গ তাহারই নিদর্শন।

পাত্র

পাত্রটি মডার্ণ। শ্রীমান্ সলিলকুমার বি-এ পাশ করিয়া, কিছু একটা পড়িবার জন্য বিলাত যান। সেখানে তের বৎসরে পর পর সাতটি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। পরীক্ষার ফী-টাকে বৃথা অপব্যয় মনে করিয়া কোন বিষয়েই পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রতি দুই বৎসর অন্তর তাঁহার পারদর্শিতার বিবরণসহ ফটো বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ প্রবাসকালে তিনি ভূমিকায় উল্লিখিত সর্ববিধ গার্হস্থ্য, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সযত্নে আলোচনা এবং সমাধান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা, সঙ্কোচ, সন্দেহ বা অজ্ঞতা ছিল না।

বিলাতের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি একটি খাদ্য-সংরক্ষণ ব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হইয়া অস্ট্রেলিয়ায় যান। সেখানে তিন বৎসর বাস করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং জনৈকা অস্ট্রেলীয়ানীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পত্নী অল্পদিন পরেই তাঁহার যথাসর্বস্ব স্বামীকে উইল করিয়া দিয়া পরলোকগমন করিলেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনা অসহ্য হওয়ায় সলিলকুমার অস্ট্রেলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং জাপানে একটি দেশলাইয়ের কারখানায় নিযুক্ত হইলেন। চার বৎসর জাপানে অবস্থানের পর তিনি পারস্যে চলিয়া আসেন এবং সেখানে একটি বড় তৈলের খনিতে কর্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁহার দিনগুলি বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু উপরিতন একজন কর্মচারীর সহিত হঠাৎ একদিন এমন একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া গেল যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্মত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তবু সলিলকুমারের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে, কারণ কয়েকদিনের মধ্যে আমেরিকার একটি পেট্রল কোম্পানীতে চাকুরি পাইয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন। আমেরিকায় কয়েক বৎসর কাটিল। তথায় একটি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

ওখানকার নানাপ্রকার আইনগত গণ্ডগোলের জন্য মহিলাটি বেশি দিন তাঁহার সহধর্মিণীত্ব করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে সলিলকুমার মনে কষ্ট পাইলেন, আমেরিকার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং বহুদিন চাকুরি করিবার পর স্বাধীন ব্যবসায় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। সুযোগও আসিল। এক বন্ধুর সহিত তিনি পূর্ব-আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। সেখানে লবঙ্গ-ব্যবসায়ে বেশ দু পয়সা উপার্জন হইতেছিল, কিন্তু জাঞ্জিবারের ব্যবসায়-সংক্রান্ত গোলযোগে, সলিলকুমার ভারত-মাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া এডেন যাত্রা করিলেন। সেখানেও লবণের ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সম্প্রতি বড়বাজারে অড়হর ডালের একটি আড়ৎ খুলিয়াছেন এবং একটি সাবানের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

সলিলকুমার বাস করেন একটি ইঙ্গবঙ্গ হোটেলে। ডাল-ভাত সহ্য হয় না। বাংলা ভাল বলিতে পারেন না, তবে কাজ চলিয়া যায়। বয়স পঞ্চাশ, ওজন তিন মণ বার সের, লম্বা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, গায়ের রং মিশমিশে কালো; টাক আছে, গোঁফ নাই; গাড়ী আছে, বাড়ি নাই।

পাত্রী

পাত্রী শ্রীমতী রেবা। এন্‌ট্রান্স্ পাশ করিবার পর একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে নিযুক্ত হন। একবার গুরুতর অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় নার্সের কার্যেব প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। রোগমুক্তির পর জনৈকা প্রৌঢ়া ধাত্রীর পরামর্শে রেবা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং একটি বড় হাসপাতালে কর্মগ্রহণ করেন।

এখানে একজন তরুণ ডাক্তারের সহিত পরিচয় হয় এবং পরে ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রোগীর শুশ্রূষার পরিবর্তে এখন তিনি স্বামীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ডাক্তার-ধাত্রীর বিবাহ—অনেকেই কটাক্ষ করিল; কিন্তু তাঁহাদের অকপট দাম্পত্য প্রেম অল্পদিন মধ্যেই সকল সমালোচনার পথ বন্ধ করিয়া দিল।

দীর্ঘ বার বৎসরের মধ্যেও তাঁহাদের সন্তানাদি হইল না। বিমর্ষ রেবার সমগ্র মন তাঁহার স্বামীই জুড়িয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বিধাতার ইহাও বুঝি সহিল না। একটি বসন্তের রোগীর চিকিৎসার পর ডাক্তার নিজেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং রেবার সকল সেবা, সকল অনুনয়, সকল ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। নিঃসন্তান শোকাতুর বিধবা, স্বামীর

সম্বল যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া এল্‌গিন রোডের একটি ফ্ল্যাটে উঠিয়া আসিলেন।

নিঃসঙ্গ জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমশ শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, মহিলামঙ্গল, বিধবামঙ্গল, সধবামঙ্গল্‌, তরুণীমঙ্গল প্রভৃতি বিবিধ সমাজহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। নিজের শূন্য হৃদয় এবং শূন্য গৃহ পরের অসংখ্য কার্যের চঞ্চলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সভা-সমিতি, কথা-বক্তৃতা, নৃত্য-গীত, আবৃত্তি-অভিনয়, শুশ্রূষা-চিকিৎসা, হাসি-কান্না, মিলন-কলহ, এমন কি মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত শ্রীমতী রেবার কর্মতালিকা হইতে বাদ পড়িল না। দিনগুলি যেন উড়িয়া পলাইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে তরুণীমঙ্গল সমিতি হইতে স্থির হইল শ্রীমতী রেবাকে ইউরোপে পাঠাইতে হইবে। সেখানকার সমাজের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া আসিলে বাংলার সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। মোট কথা, একজন ইউরোপ-ট্রেণ্ড এক্সপার্ট চাই। তহবিলে টাকার অভাব ছিল না—শ্রীমতী রেবা একদিন সত্তরটি ফুলের মালা পরিয়া এবং আশিটি ফুলের তোড়ায় ট্রেনের এয়ার-কন্‌ডিশণ্ড কামরা বোঝাই করিয়া হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পরিত্যাগ করিলেন। স্টেশনের ভিড় দেখিবার জন্য ত্রিশ হাজার যাত্রী সেদিন ট্রেন ফেল করিল।

পূর্ণ পাঁচ বৎসর বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং তদ্বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া শ্রীমতী রেবা দেশে ফিরিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশ; সরু ছিপছিপে গড়ন; গলায় লকেট আছে, হাতে চুড়ী নাই; বেঁটে ছাতা আছে, ব্যাগ নাই।

পরিচয়

লবণসংক্রান্ত অনুসন্ধান শেষ করিয়া সলিলকুমার এডেন হইতে জাহাজ ধরিলেন। জাহাজে উঠিয়া নিজ কেবিনে ঢুকিবার সময়ে দেখিলেন, বামদিকে একটি কেবিনের শিরোদেশে লেখা 'লেডিজ'। সেই কেবিনের পাশেই দেখা গেল একখানি শাড়ি শুকাইতেছে। অতি সাধারণ আকাশরঙের প্লেন শাড়ি, অতি সাধারণ জরির পাড়। কিন্তু বহুদিন পরে বাঙালিনীর প্রতীকস্বরূপ এই শাড়িখানি সলিলকুমারের চোখে স্বর্গের সুষমা ছড়াইয়া দিল। তাঁহার মনে হইল, যেন জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু স্নিগ্ধ, সব

একত্র হইয়া ঐ শাড়িখানির গায়ে লেপিয়া আছে। মুগ্ধচিত্তে সলিলকুমার কেবিনে ঢুকিলেন।

বৈকালে ডেকে গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া সলিলকুমার অনন্ত জলরাশির নৃত্য দেখিতেছেন, নীল আকাশ ততোধিক নীল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করিয়াছে, তাহারই দিকে নির্নিমেষ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের সংঘাত, ঢেউয়ের শিরোদেশ উচ্ছলিত বারি-কণার শুভ্র রমণীয়তা, মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং অস্তগমনোন্মুখ সৌরকিরণের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত কমনীয়তা, তাঁহার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল।

সহসা এক দিকে একটা খস্ খস্ শব্দ কানে যাইতেই সলিলকুমার চাহিয়া দেখিলেন, সেই শাড়ির অধিকারিণী সেই শাড়িখানি পরিয়াই একখানি ডেক চেয়ারে উপবিষ্টা হইলেন। একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল মাত্র, আর কিছু হইল না। আর কিছু হইবার কথাও নয়, উভয়েরই যে বয়স এবং যে অভিজ্ঞতা তাহাতে অন্য কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। শাড়ি দেখিয়া সলিলকুমারের মন যেটকু চঞ্চল হইয়াছিল, শাড়ির অধিকারিণীকে দেখিয়া সে চঞ্চলতা আপনিই কাটিয়া গেল।

সূর্য্যাস্তের পরক্ষণ হইতেই বাতাস একটু জোরে বহিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢেউগুলির আকারও দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। জাহাজ বেশ একটু দুলিয়া উঠিল এবং শ্রীমতী রেবা যেন একটু বমনোদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সলিলকুমার একান্ত নির্লিপ্তভাবেই বলিলেন—দেখুন, ওটা একটা মানসিক অবস্থা। একটু মনে জোর করুন, তাহলেই ও ভাবটা কেটে যাবে।

আমি বড্ড সহজেই সী-সিক্ হই।

উঠে একটু হেঁটে বেড়ান, বলিয়া সলিলকুমার নিজেই সহসা ডেকের পার্শ্বের রেলিংএর দিকে ছুটিলেন এবং ওয়াক্ করিয়া একবার বমি করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দোষের বা লজ্জার কিছুই নাই। কারণ জাহাজ বেশি দুলিলে যাত্রীদের অর্ধেকের বেশিরই এই অবস্থা হয়। যতক্ষণ এই দোলন বন্ধ না হয়, ততক্ষণ টিনের মগ পার্শ্বে লইয়া চোখ বুজিয়া নিজের বিছানায় পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

এদিকে রেবারও বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনিও সলিলকুমারের পাশেই রেলিংএর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুখ মুছিবার জন্য ব্লাউজের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিতেই বাতাসের বেগে তাহা আরব্যোপসাগরের বক্ষে বিলীন

হইল। সলিলকুমার তাড়াতাড়ি নিজের রুমালখানি বাহির করিয়া রেবার হাতে দিলেন। রেবাদেবী বলিলেন, থ্যাঙ্কস্।

উভয়েই ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলেন। এবার একটু নিকটে।

সামুদ্রিক বিবমিষার পশ্চাতে কুসুমধন্বার গোপন ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত?

করাচী হইতে ইঁহারা এরোপ্লেনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বিভিন্ন মঙ্গল-সমিতির পক্ষ হইতে বিপুল সংবর্ধনা হইল। এরোপ্লেনের পার্শ্বে যাঁহারা রেবা দেবীর সন্নিকটে যাইবার সৌভাগ্যলাভ করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট একান্ত নির্লিপ্তভাবে সলিলকুমারকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, ইনি একজন মহানুভব বদান্য ব্যক্তি, আমাদের আদর্শের প্রতি এঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা। এঁর সাহায্য পেলে আমরা ধন্য হব। নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই অমৃতবাজারের ফটো-গ্রাফার এরোপ্লেন-সহ রেবা-সলিলের ফটো তুলিয়া লইল।

কিছুদিন ধরিয়া বিবিধ মঙ্গল-সমিতিতে রেবা এবং সলিলকুমার সম্বন্ধে কানাঘুষা চলিতে লাগিল। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি যত বেশি নির্লিপ্ত ও পবিত্রভাবে আর্টচর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তত বেশি উচ্চৈঃস্বরে ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ফুলশয্যা

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। ইঙ্গ-বঙ্গ হোটেলে ফুলশয্যার ব্যবস্থা রেবা দেবীর মনঃপূত না হওয়ায় ক'নের বাড়িতেই ইহার আয়োজন হইয়াছে। নিমন্ত্রিতেরা সব চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে আছেন শুধু বর, ক'নে আর রেবা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী মীরা এবং তাঁহার ষোড়শী নাতনী রমা।

নূতন রং করা ঘর। খাট, বিছানা, সোফা, ড্রেসিং টেব্‌ল, আল্‌না, সমুদয় আসবাবপত্র সব নূতন, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। ফুলের মালা দিয়া খাটের ছত্রী-গুলি মোড়া। তিন চারটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া এবং এক গাদা ঝরা ফুলে বিছানা প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে। শুধু পাত্র এবং পাত্রী, এই দুইটি বস্তু ব্যতীত অন্য সমস্ত জিনিসেই নূতনত্বের মনোরম গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

সলিলকুমার বিছানায় শুইয়া আছেন, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রমা রেবা দেবীকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। ইঁহাদের পদশব্দে তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়ায় সলিলকুমার চাহিয়া দেখিলেন এবং রেবা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কে?

ও মীরার নাত্নী রমা।

ও।

বামস্কন্ধ হইতে ব্রুচটি খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া, রেবা দেবী একখানা সোফা খাটের কাছে টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুই মিনিট কেহই কোন কথা বলিলেন না। পরে রেবা দেবী বলিলেন, বিয়েটা তাহলে হয়েই গেল।

হুঁ।

না হলেও ক্ষতি ছিল না।

না।

তাহলে এ বিয়েতে তুমি সুখী হওনি?

সুখদুঃখের হিসেব তো অনেকদিন আগেই চুকে বুকে গেছে।

তা তো বটেই। আমি তো অস্ট্রেলিয়ানী নই!

আমিও তো আর হাসপাতালের ডাক্তার নই।

দেখ, মেয়েমানুষের মন তোমরা কখনই বুঝবে না।

ওসব দার্শনিক তত্ত্ব এখন রাখ। দেখ তো পাশের বাড়ির বারান্দায় ও মেয়েটি কে?

পাশের বাড়িতে তো স্ত্রীলোক নেই।

দেখই না একবার। আলোটা নিভিয়ে দাও—জান্‌লার পর্দাটা একটু ফাঁক করে দাও তো।

কে একজন ঘরে ঢুকলো বটে। পাশের বাড়ির জন্য তোমার অত কৌতুহল কেন?

নিজের বাড়িতে যার দ্রষ্টব্য কিছু নেই, তার পাশেব বাড়িই সম্বল। তা ছাড়া কালকের মজলিসে একটা গল্প করবার মত বিষয় পাওয়া যাবে। একবারটি টুক্ করে ছাদে চলে যাও তো, সেখান থেকে ভাল দেখতে পাবে।

তুমি যখন বলছ, একবার দেখেই আসি......এই তো এলুম দেখে। পাশের বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকের বোধ হয় খুব অসুখ, ওঁর বুড়ো চাকরটা ফীডিং কাপে করে কি যেন খাওয়াচ্ছে—ওই চাকরটাকেই তুমি দেখেছ। তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে।

যাও, সব মাটি করে দিলে। আমি মনে মনে একটা রসাল গল্প তৈরি করছিলুম—

চুলোয় যাক্ তোমার গল্প। তুমি যে বলেছিলে, তোমার লাইফ্-ইন্‌সিওরটা বাড়াবে, তার কি হল?

এত রাত্রে এজেণ্টের বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে? সকাল হোক।

আমি যেন এখনই যেতে বলছি। কালকেই একটা প্রপোজাল দিয়ে দিও। রোসো দেখি, একটা অ্যাটোফ্যানের বড়ি খেয়ে আসি। বাঁ হাতটা ভয়ানক কন্ কন্ করছে।

দেখ, ঐ তোয়ালেখানা দাও তো আমার বালিশের উপরে, নইলে চুলের কলপ লেগে ওয়াড়টায় দাগ হয়ে যাবে।

এই নাও। তোমার ডালের ব্যবসাটা কি করবে, চালাবে না বিক্রি করে ফেলবে?

সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। সাবানের কারখানাটা গড়ে তুলতে পারলেই ডালের ব্যবসাটা তুলে দেবো। তোমার যে সব মহিলামঙ্গল, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি আছে, তারই ভিতর দিয়ে আমি কলিকাতার পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

বিয়ের পর ওসব ব্যাপারে আমার তেমন আধিপত্য থাকবে কি না, কে জানে?

নিশ্চয়ই থাকবে। যে কারণে বিয়ের পর মেয়েদের পাব্লিক লাইফ নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণ তো তোমার নেই। তুমি এতদিন যেমন ছিলে, এখনও ঠিক তেমনি থাকবে। বরং আমার তো মনে হয়, এখন তোমার সুযোগ সুবিধা আরো বেড়ে যাবে।

হয়তো যাবে। কিন্তু এই বেতো শরীরে আর অত হৈ চৈ ভাল লাগে না। মিটিং আর ফুলের মালার সখ আমার মিটে গেছে। এখন যে কটা দিন আছি একটু নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে পারলেই বাঁচি। এ বিয়েটাও শুধু সেই জন্যই। তুমি এখন আমার স্বামী। স্বামীর কাছে মনের কোন কথা গোপন করা পাপ। সত্য বলতে কি, তোমার আয়ের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে দিন কাটানো ছাড়া আর কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

তুমি এখন আমার স্ত্রী। তোমার কাছেও আমার কোন কথা গোপন করা কর্তব্য নয়। তোমাকে আমি সাবানের কারখানার মূলধন ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নে। মোট কথা, আমি তোমাকে বিয়ে করি নি, বিয়ে করেছি তোমার মঙ্গল-গ্রুপকে, আর তোমার পিসেমশাইকে। ওদের আমাকে চাই, যেমন করে হোক। বাতে নড়তে না পারো, গাড়ীতে যেও। বক্তৃতা করতে না পারো, অন্যকে দিয়ে তোমার লেখা বক্তৃতা পড়িও। তোমাকে মঙ্গল-গ্রুপ হাতে রাখতেই হবে—অন্তত আমার শেয়ারগুলো বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত।

তোমার পিসেমশাইকে স্পষ্ট বলে দিও—তিনি আমার ভাগ্যবৃক্ষের মই। আমি তাঁকে চাই।

বেশ তো, কালই চল ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আসবে। আমিও যতটা পারি তোমার জন্য বলে কয়ে দেখব।

দেখ, একটা কথা ভাবছিলুম। একটা বাসা টাসা করবে, না যেমন চলছে এমনি চলবে।

আমি তো বলি, যেমন আছে এমনি চলুক। গেরস্থালীর ঝঞ্ঝাট আর পোষায় না।

লোকে কিন্তু এটা ভাল দেখবে না।

তাও তো বটে! এসব তো আগে ভাবিই নি। ঘরকন্নার চিন্তা মনে এলেই একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

কিন্তু বিয়েটা যখন হলই, তখন—

আচ্ছা, ভেবে দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে। এমন তাড়াতাড়িই বা কি।

নাঃ, তাড়াতাড়ি আর কি!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। উভয়কেই যেন একটু ক্লান্ত, একটু অবসন্ন মনে হইতেছিল। রেবা দেবী একবার উঠিয়া ঘরে একটু পায়চারি করিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন। একবার গিয়া আলোটা একটু কমাইয়া দিলেন। কুঁজা হইতে ঢালিয়া এক গ্লাস জল নিজে খাইলেন, আর এক গ্লাস বরকে দিলেন। তারপর আবার সোফাটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একটা কথা বলব?

বল।

কিছু মনে করবে না তো?

বিজনেস্ ইজ্ বিজনেস্—এর মধ্যে মনে করাকরি কিছু নেই।

তুমি বলেছিলে, তোমার কিছু শেয়ার টেয়ার আছে। ওর কিছু—ধর অর্ধেক—আমার নামে ট্রান্সফার করে দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?

সবই তো তোমারই থাকবে—আমি আর কদিন?

আমিই বা কদিন? বলছিলুম কি, যখন তখন হাত পেতে তোমার কাছে টাকা পয়সা চাওয়াটা একটু কেমন লাগে না? তার চেয়ে বরং—

বুঝলুম, আচ্ছা একটা ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

দেখ, আমায় ভুল বুঝো না কিন্তু; তাহলে আমি কিছুই চাই না।

না না, ভুল কেন বুঝব, ঠিকই বুঝেছি।

যাক্ গে, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

না, এ বয়সে কি এত শীঘ্র ঘুম পায়?

আজকের কাগজ পড়েছ? চেকোশ্লোভাকিয়ায় তো গোলমাল পেকে উঠেছে।

তাই নাকি? মোহনবাগানের খবর জান? শুধু নামটাই আছে, কাজের বেলায় কিছু না।

না, কিছুই না।

এবারও বোধ হয় মহমেডান স্পোর্টিংই লীগ পাবে।

বোধ হয়।

আচ্ছা তুমি না স্টীলের শেয়ার কিনেছিলে? কাগজে তো দেখলুম, দাম ক্রমাগত নামছে।

ওতে আমার লোকসান হয় নি, সময় মতই বেচতে পেরেছিলাম।

আচ্ছা, এত থাকতে তুমি অড়হর ডালের ব্যবসা করতে গেলে কেন?

আমি কি আর নিজে সাধ করে করছি। একদিন রেসের মাঠে হঠাৎ এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ। তারই পরামর্শে এ কাজ করছি—নিজের বেশি কিছু রিস্ক্ নেই। তাছাড়া ব্যবসা—ব্যবসা, তা অড়হর ডালই হোক, আর সোনা রূপোই হোক—একই কথা, লাভ হলেই হল।

তা ঠিক।

জলের গ্লাসটা একটু এগিয়ে দাও তো।

দিই। দেখ আমার এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা পিসি আছেন, তিনি বলছিলেন, বাড়ির অর্ধেকটা বিক্রী করবেন। তুমি অর্থাৎ আমি কিনব?

একটু ভাল করে খোঁজ খবর নাও, তারপর দেখা যাবে।

আমার এই বাতের ব্যাথাটা ক্রমেই-যেন বাড়ছে—একবার চেঞ্জে গেলে হয় না—দেওঘর বা গিরিডি।

অবসরমত গেলেই হবে।

তোমার আবার অবসর। তুমি তো সাবান সাবান করেই গেলে। বরঞ্চ আমি একাই দিনকতক ঘুরে আসি।

বর ঈষৎ নিদ্রালু হইয়াছেন এবং একটু পরেই নাসিকা গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক'নে নীরবে উঠিয়া গিয়া রমার বিছানার পাশে গিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন, রমা! ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া রমা জিজ্ঞাসা করিল, কে, দিদিমা?

হ্যাঁ।

একটু সরে শো, আমি এখানে শোব।

সে কি! বরের সঙ্গে এরই মধ্যে ঝগড়া করেছ।

না, ঝগড়া কেন হবে?

তবে, ভয় করছে বুঝি?

যাঃ।

তবে?

ঐ শোন, কি ভীষণ নাক-ডাকা। ওর কাছে মানুষে শুতে পারে? নে, সর, একটু শুয়ে পড়ি।

পাশের ঘরে বরের বিকট নাসিকা গর্জন শুনিতে শুনিতে ক'নে নাতনীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন।
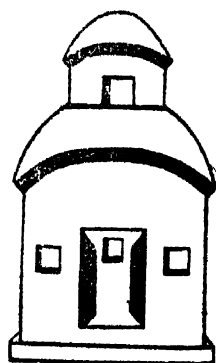
গ্রাম সংস্কার

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৬)

বেশ কাটিতেছিল।

ইউ, পি, স্কুলের হেড-মাষ্টার। ক্রোশ দুয়েক দূরে জগদীশপুরের এল, পি, স্কুল ছাড়া পাঁচ মাইলের মধ্যে মা-সরস্বতীর আর বৈঠক নাই। কখানা গ্রামের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় একমেবাদ্বিতীয়ম্—শৈল ঠাকুর—এই অধীন। ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ-কল্পিত ভিলেজ-স্কুল-মাষ্টারের জীয়ন্ত সংস্করণ।

একমেবাদ্বিতীয়মের আপনারা বাংলা অনুবাদ নিশ্চয় করিবেন—বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা। করুন, আপত্তি নাই। আচ্ছা, সুখ জিনিসটা কি নিতান্ত বস্তুনিরপেক্ষ নয়? মনের দিক দিয়া ধরুন, আগরার দেওয়ান-ই-আমে নতশীর্ষ রাজন্যবর্গের সভায় মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরসিংহাসনে উপবিষ্ট শাজাহানের বুকে যে অনুভূতি স্পন্দিত হইত, আকাশের মুক্ত চন্দ্রাতপতলে, কৃষ্ণশিলার দৃপ্ত সিংহাসনে অর্ধউলঙ্গ বন্য সামন্তদের মধ্যে উপবিষ্ট ভিলরাজার বুকেও কি ঠিক সেই অনুভূতি জাগে না?

আপনারা এর উত্তর করিতে পারিবেন না; কেন না, আপনারা কেহই শাজাহান নন। আমি পারিব; কেন না, আমি যে এক বন্য রাজ্যের অধীশ্বর সেই কথা বলিয়াই সুরু করিয়াছি। তর্কে কিছু ভুল থাকিয়া গেল বলিতেছেন? তা থাক, এই রকম তর্কতেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে।

'চলিয়া যাইতেছিল' বলা উচিত; কেন না সম্প্রতি আমি রাজ্যচ্যুত। এটা সেই দুঃখেরই কাহিনী বলিতে বসিয়াছি।—

আমার স্কুলের সামনে দিয়া শিবডাঙা আর রত্নপটির হাটের রাস্তা এবং পিছনে আশু মোক্তারের পুকুর। যে স্কুলের সামনে দিয়া হাটের রাস্তা আর পিছনে স্নানের পুষ্করিণী, সে স্কুলের একটা মস্ত বড় সুবিধা, তাহাতে পড়া হয় না।

আপনাদের মধ্যে কি কেহ মাষ্টার আছেন? থাকিলে, গুরুমহাশয়, স্কুল-মাষ্টার, প্রফেসর, গবেষক—যে কোন স্তরেরই হোন না কেন, নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, পড়ার ঝঞ্ঝাট না হইলে আমরা কেহই ক্ষুব্ধ হই না; ছেলেরা তো নয়ই, অনেক গার্জেনও নয়, অন্তত সেই সব গার্জেন যাহাদের কাছে ছেলেরা পড়া বলিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হয়। আমি তো ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, মামা পড়া না করিবার জন্য যতটা প্রহার দিতেন, পড়া করিবার জন্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে অপর কোন না কোন ছুতা করিয়া তাহার চেয়ে ঢের বেশী ঠেঙাইতেন।

পড়া বাদ দিয়া আমার স্কুলে আর সব কিছুই হইত।

পাঠশালার আটচালার মাঝের ঘরটি আমার ; একটি হল গোছের। আমি রাস্তার দিকে মুখ করিয়া বসিতাম।

দুর্লভ আসিয়া উপস্থিত হইল।—

"প্রণাম ঠাকুর।"

"আরে দুর্লভ যে! খবর কি? এস, ব'স।"

"খবরের কথা আর জিগুবেন না। এদিনে শিবডাঙার হাটে যাওয়া হ'ল না ; রাঙী-গাইটা পর্শ হ'ল কিনা। দেখ, আসল কথা জিগুতে ভুলেই গেছলাম আর কি! রাঙী বিওল মঙ্গলবারের ঠিক সন্দের মুখে, দেবতা ঠিক পাটে বসলে আর কি ; নই বাছুর, এখন শাস্ত্রে লক্ষণ কি বলেছে বলেন তো ঠাকুর।"

উৎকর্ণ ছেলেগুলার জন্য টেবিলে একটা বেত-আছড়ানি দিয়া বলিলাম—

"মঙ্গলের সাঁঝে হ'ল নই
কোথায় থুবি মাখন দই?"

খনার বচন নয়, আমার নিজের। এই ক্ষমতাটা ছিল আমার প্রতিপত্তির মূলে। দুর্লভ গদগদ হইয়া উঠিল,—"এই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম।

কাঁধের গামছাটা নামাইয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া, কলাপাতায় জড়ানো খানিকটা দা-কাটা তামাক হাসিতে হাসিতে সামনে রাখিয়া বলিল, "সুখীর মা বললে, 'শৌল ঠাকুরের ওখানে দিয়ে যাবে, একটু লতুন তামাক গামছায় বেঁধে দিনু।'....বনু, তা দে।....ভুলেই গেছলাম আর কি! তা ভুলের দোষ দেওয়া যায় কি ঠাকুর? তুমিই সালিসী কর না, মাথার কি আর ঠিক আছে? রাঙী পর্শ হ'ল, শিবডাঙার হাটে যেতে নারলাম, ভাবলাম রত্নপটির হাটটা একবার দেখে আসি, গরুটা লতুন বিওল, এই হাটে গুড়টা কিনে থুই। আজকাল গুড় দিচ্ছে কি দর ঠাকুর?"

বাজার-রেট কণ্ঠস্থ থাকিত। বলিলাম, "সাড়ে তের সের পর্যন্ত দেয় তো কিনে নিও, ঐ দর চলেছে ক' হাটে।"

"স'পাঁচ আনায় তা হ'লে কতটা হ'ল? সুখীর মা ওর বেশী বের করলে না পয়সা, বললে, 'এ হাটে স'পাঁচ আনারই আন।' গরু আবার ভগবতী কিনা। সুখীর মা পাঁচ আনাটাকে স'পাঁচ আনা ক'রে দিলে।"

শিরপোড়ো পুঁটে তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিল। নূতন তামাক আসিলেই সে নিজে হইতে উঠিয়াই এ কাজটুকু সারিয়া ফেলে এবং হুঁকাটা বাড়াইয়া মুখ ঘুরাইয়া কোন ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে থাকে, না হইলে

তাহার নিশ্বাসের গন্ধে তামাক সাজিবার এত আগ্রহের কারণটা জাহির হইয়া পড়িবে। এই মুখ ঘোরানোটুকু আমাদের গুরুশিষ্যের মধ্যে পর্দা। এই পর্দার এধারে আমিও জানি, ও আমায় প্রসাদ না করিয়া দেয় না ; ওধারে ও-ও জানে, প্রসাদের কথাটা মাষ্টার মশাইয়ের কাছে গুপ্ত নাই।

তামাক টানিতে টানিতে দুর্লভকে সাড়ে তের সেরের দরে সওয়া পাঁচ আনার হিসাব করিয়া দিলাম।

"কে, দুর্লভ নাকি ? তা বেশ, আমি বলি মাষ্টার মশার সাথে ব'সে গল্প করে কে ? ছেলেরা তোমার পড়ছে কেমন মাষ্টার মশাই ? নে, একটু স'রে ব'স দিকিন। তামাক নিশ্চয় দুর্লভের বাড়ির ? ঠিক তো ? হ'তেই হবে, আমি যা আন্দাজ করব, তার আর নড়চড় হবার জো আছে ?"

দুর্লভ কৃতকৃতার্থ হইয়া এক গাল হাসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল,—"দেবতা আপনারা আজ্ঞে, আপনাদের কাছে কি চাপা থাকে কোন কথা ?"

"খানিকটা দিয়ে আসিস বাড়িতে, দেখব।"

অবিনাশ ঠাকুর গ্রামের পুরুত। কৃষকপল্লীর পুরোহিত,—বিশুদ্ধ, প্রচুর ভক্তি, দুগ্ধ এবং ঘৃতের মধ্যে বেশ সুখেই থাকে ; চারটি ছেলের জায়গা লইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "দাও, ধরেছে নাকি ?"

কয়েকটা টান দিয়া হুঁকাটা দুর্লভের দিকে বাড়াইয়া দিল। দুর্লভ বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইল। অবিনাশ ঠাকুর বলিল, "মহাদেব মাষ্টারকে দেখি না, ঐ ঘরে পড়াচ্ছে বুঝি ? আজকালকার আবার পড়া। তোমাদের নিস্‌পেক্টরের নিয়ম-কানুনে আর পড়ার কি রেখেছে বল ? ছেলেবেলার কথা মনে আছে,—পাঠশালায় পা দিতেই রঘু গুরুমশায় জিগ্যেস করলে, 'তামাকের পয়সা এনেছিস ?'....'আজ্ঞে, আজ সুবিধে হ'ল না।'....'সুবিধে হ'ল না ?' বটে। আচ্ছা ব'স্।"....মাদুর বিছিয়ে ব'সে ধারাপাত খুলতেই,—আঠার-উনিশং ?'....ঘাগী লোক, ঠিক যেটি বলতে পারব না, সেইটি এমন তাক ক'রে ধরত। কখনও ভুল হ'তে দেখিনি।.... তারপর উঠে মার।....তার এক ঘা খেলে এদের কেউ উঠে জল খেতে পারবে ? তারপর দুহাতে ইঁট নিয়ে চেয়ার হয়ে বসা। গায়ের টাটানিতে সমস্ত দিনে একবার ভুলতে পারতাম যে সকালে পাঠশালায় গেছলাম ?....এরা কি পড়বে ?.... কই, হ'ল তোর দুর্লভ ? হাটে যাচ্ছিলি বুঝি ? তা যা, হাট উঠে গেলে গিয়ে আর কি হবে ? তামাক যদি পেয়েছিস তো আর কিছুতেই উঠবি নি।"

দুর্লভ চলিয়া গেলে অবিনাশ ঠাকুর নামাবলীর খুঁটে বাঁধা একটা ষ্ট্যাম্প-

মারা কাগজ খুলিয়া আমার টেবিলে বিছাইয়া দিল, বলিল, "দেখ তো মাষ্টার, সুদটা দাঁড়াল কত? চক্রবৃদ্ধি হারে, সেটা মনে রেখ।....তোরা সব পড় না রে বাপু, মাষ্টারকে সর্ব্বদা ছড়ি হাতে ব'সে থাকতে হবে নাকি? তার আর সামাজিক কাজ নেই? আরে গেল।"

ভুবন কামার উপস্থিত হইল। হাতে একখানি নূতন দা, আমার ডাক্তারির ফী।

টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া পাশে উবু হইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আছে কেমন ছেলেটি ভুবন?"

ভুবন মটকার দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা হ্যাঁ, বারো আনা আন্দাজ কমেছে বইকি।" অবিনাশ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল "ধন্বন্তরি আর কারে কয় ঠাকুর? আমাশায় ক'দিন থেকে ভুগছিল, হাতের জল শুকোয় না, তিনটি খোরাকে বারো আনা—"

অবিনাশ ঠাকুর দা হাতে তুলিয়া লইয়া ধার পরখ করিতে করিতে বলিল, "ও বাকিটুকুও সেরে যাবে'খন; সন্দেবেলা আসিস আমার বাড়িতে, একটু রাধারমণের চন্নামৃত নিয়ে যাস।....একখানা এই রকম দার কথা কদ্দিন থেকে ভাবছিলাম; অনেকেই গড়ছে, কিন্তু তোর মত হাত তো হ'ল না গাঁয়ে কারও —একথা আমি জোর গলায় বলব, আসুক না হারাণে কামার, আসুক না যতে, তোর খুড়ো নিবারণই আসুক না, লেহ্য কথা বলব, তাতে ভয়টা কি? আচ্ছা, মাষ্টারের মত লোহা চিনতে তো গ্রামে কেউ নেই?....কি হে মাষ্টার, এ লোহা, এ গড়ন আর কারুর হাত থেকে বেরুবে? তুমিই বল না।"

আমি কাটারিটা বাঁ হাতে ধরিয়া খুব আলগাভাবে ডান হাতের বুড়া আঙুলটা তার ধারের উপর দুইবার বুলাইয়া লইলাম, তাহার পর নখ দিয়া ধারটা খুঁটিয়া একটা আওয়াজ বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম এবং সেই আওয়াজটা ধরিবার জন্য ডান কানটা আগাইয়া লইয়া গেলাম। বলিলাম "নাঃ, সরেস জিনিস হয়েছে, এর কাছে অন্য লোহা যে শীগ্‌গির এগুতে পারবে, মনে তো হয় না।"

হারাণকেও ঐ কথা বলি, নিবারণকেও বলি। কাহাকেও নিরাশ করিয়া বিশেষজ্ঞ হওয়ার যশ অক্ষুণ্ণ রাখা চলে না।

নিবারণ কাছে থাকিলে বলিতে হয়, "নিবারণেরই ভাইপো তো।"

দুর্লভের নিকট তামাকের আর ভুবনের নিকট কাটারির বন্দোবস্ত করিয়া অবিনাশ উঠিয়া গেল। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা বাহির করিয়া ভুবনকে ঔষধ দিলাম। সে চলিয়া গেলে টেবিলে বেতটা আছড়াইয়া একটা হুংকার করিলাম,

"তোরা কি ভেবেছিস বল দিকিন? অন্য দিকে এক মুহূর্ত চোখ ফেরাবার জো নেই দেখছি যে। অন্তা, তোর কড়াকে লেখা শেষ হ'ল? নিয়ে আয় শ্লেট, আয় নিয়ে।"

অন্তার শ্লেটের মাঝখানে একটা লম্বা দাঁড়ি, তাহার নীচের প্রান্তে দুইটা ছোট ছোট দাঁড়ি দুই দিকে একটু তেরছা হইয়া নামিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রান্তদেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র বৃত্ত; তাহার মুখে পাঁচটি করিয়া ক্ষুদ্র রেখা। বড় দাঁড়ির উপরের প্রান্তে একটি মাঝারি গোছের বৃত্ত, তাহার ভিতর আবার তিনটি ছোট ছোট বৃত্ত। দাঁড়ির মাঝখান থেকে আবার দুইটি ছোট ছোট দাঁড়ি, উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। একটির প্রান্তে সংলগ্ন আবার আর একটি দাঁড়ি, এরও দুই প্রান্তে দুইটি ছোট বড় বৃত্ত।

অর্থাৎ একটি লোক তামাক খাইতেছে। লোকটা অবিনাশ পুরুতও হইতে পারে, আমিও হইতে পারি, দুর্লভও হইতে পারে, শিরপোড়ো পুঁটেরও হইতে বাধা নাই। কাহারও চেহারার সঙ্গে যেমন পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তেমনই পূর্ণ বৈসাদৃশ্যও লক্ষিত হয় না।

বেতটা তুলিয়া তাহার চিত্রবিদ্যার যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে যাইতেছিলাম, শঙ্কর পানের বুড়ী মা কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে হুড়মুড় করিয়া সামনে পড়িল।

"বাবা, রক্ষে কর, আর বুঝি বাঁচতে দিলে না বউটাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আবার কি হ'ল?"

"মেরে ফেললে বাবা, কি গোঙানি। কি মাথা-চালা। একবার চল বাবা শীগ্‌গির, তুমি না গেলে হবে না, রামধন ওঝার মন্তরে এ যাবার নয়।"

শঙ্করের বউকে ভূতে পাইয়াছে। গুরুমশাই শৈল ঠাকুর না হইলে ছাড়িবে না। বলিলাম, "নাঃ, তোরা দেখছি—আচ্ছা, যা, আসছি; খানিকটা সরষে, একটা পিঁড়ে, একটা ভরা কলসী ঠিক ক'রে রাখগে। হ্যাঁ, আর একটা বেলপাতায় খানিকটা মঙ্গলচণ্ডীর সিঁদুর যোগাড় ক'রে রাখিস,—বিধবা ভূত হ'লে আবার সিঁদুর ছোঁয়াবার ভয় না দেখালে ছাড়বে না।"

এই সুদ-কষা থেকে ভূত-ছাড়ানো পর্যন্ত তাবৎ বিদ্যার জোরে দীর্ঘ ছয়টি বৎসর প্রবল প্রতিপত্তিতে কাটাইয়া দিলাম। ছয়টি বৎসর, ঝাড়া অর্ধ যুগ পাঠশালার নমুনা দিয়াছি, সকালে আশু মোক্তারের পুকুরঘাটের দৃশ্যও অনুরূপ, সন্ধ্যায় ষষ্ঠিতলায় বটগাছের বাঁধা চত্বরে দৈনন্দিন গ্রাম্য সম্মেলনে শৈল ঠাকুর তো একেবারে সার্বভৌম।

চমৎকার কাটিতেছিল। শাহনাশা শাজাহান যদি যুগ ডিঙাইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিতেন, 'হে সার্বভৌম, তখ্‌ত্‌-তাউস—সে তোমারই যোগ্য আসন,

আমি খালি ক'রে এসেছি; চল, অলংকৃত কর'....শৈল ঠাকুরকে নড়াইতে পারিতেন না।

কিন্তু এ আসন আমায় নিজেই ছাড়িতে হইল, স্ব-ইচ্ছায় এবং স-ভয়ে।

দুঃখের কাহিনীটা সংক্ষেপেই সারিব।

সেদিন সকাল থেকেই প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। পুকুরঘাট মোটেই জমে নাই। স্কুলেও দুইজন মাষ্টারই ছুটি লইয়াছেন। দুই একটা ক্লাসে দুই একজন ছেলে আসিয়াছে, শিরপোড়ো পুঁটেকে ধরিয়া; সে মহাদেব মাষ্টারের ঘরে গিয়া তামাক সাজিতেছে, প্রায় পনর মিনিট হইল।

আমি প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দুইটি যুবক সামনে উপস্থিত হইল এবং একবার আমার স্কুলের সাইন-বোর্ডটার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ছাতা মুড়িয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল।

এ প্রান্তে এ ধরণের ছেলে দেখি নাই বড় একটা। একজনের মাথায় বাবরী চুল, শীর্ণ গালে নরুণের মত গালপাট্টা, গায়ে খাটো পাঞ্জাবি, মোগলাই পায়জামা ধরণের কাপড় পরা। অপরটির প্রজাপতি-কাটের নবোদ্ভিন্ন গোঁফ, মাথায় ছাঁটা চুল, গায়ে ওল্টানো-গলা কামিজের উপর কোট, কাপড় সঙ্গীরই মত।

জামা-কাপড় প্রায় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে। নিংড়াইতে নিংড়াইতে বাবরীওয়ালা ছোকরাটি প্রশ্ন করিল, "আপনারই নাম নিশ্চয় শৈল পণ্ডিত?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, আপনারা যে ভিজে নেয়ে গেছেন! কোথা থেকে?"

"অনেক দূর থেকে আসছি, জগদীশপুর এখান থেকে—তা কোশ দুয়েক হবে, কিন্তু কাজের সামনে দূরের কথা কি বৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে তো চলে না মশাই। দুদিন থেকে যা কাটছে আমাদের, তার সামনে একটু ঝড় কি বৃষ্টি, সে তো—"

দ্বিতীয় যুবকটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে তো অতি তুচ্ছ। তাই আমি বললাম, গলাবাজি ক'রে মরছিস কেন? এ তল্লাটে এ কথার মীমাংসা যদি কেউ করতে পারে তো মণ্ডলহাটীর শৈল পণ্ডিত; চল, তিনি যা বলবেন তাই মাথা পেতে—"

প্রথম ছোকরা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল, "মশাই তো ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই।"

দ্বিতীয় ছোকরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া একেবারে আমার পদস্পর্শ করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইল, বলিল, "ভুলটা দেখুন একবার। মনেই ছিল না।—মাথার কি আর ঠিক আছে?"

আমি তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কি এমন

সমস্যা, যাহার জন্য এই নিদারুণ অভিযান? কিসের সালিসী, যাহার জন্য এই ভক্তির কাড়াকাড়ি? বলিলাম, "আচ্ছা, আগে আপনারা কাপড় ছাড়ুন।....পুঁটে, তামাক সাজা রেখে দু'খানা শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তো।"

স্কুলের প্রায় সংলগ্নই আমার বাসা, পুঁটে আগন্তুকদের একবার দেখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ছোকরা কোটের বোতাম খুলিল, কামিজের বোতাম খুলিল, তাহার পর গেঞ্জির ভিতর হাত দিয়া বুকের কাছ্ থেকে কাগজে জড়ানো একটি বেশ মাঝারি গোছের পুলিন্দা বাহির করিয়া খুব সন্তর্পণে খুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বেশ একটু পিঁয়াজ-ছাড়ানো করার পর একখানি মোটা ভাঁজ করা কাগজে মোড়া দুইটি ফোটো-বুক ছবি বাহির হইল।

কাপড় আসিল। ছোকরা ছবি দুইটি আমার টেবিলে পাশাপাশি সযত্নে রাখিয়া দিয়া বলিল, "দেখুন ততক্ষণ, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ভিজে কাপড়চোপড়গুলো নিংড়ে নিই।"

আলেখ্য দুইটি দুইজন সিনেমা-জোতিষ্কের। পূর্বে যেন দেখিয়া থাকিব, এখন একাদিক্রমে পাঁচ ছয় বৎসর কলিকাতার বাহিরে থাকায় এবং সিনেমা-জগৎ হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকায় নামধাম মনে নাই। অবশ্য স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি। যুবতী তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু এখানে এভাবে এ দুর্যোগের মধ্যে ইঁহাদের সমাবেশ কেন? আমি নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারি, কিন্তু সে সব ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীর অনাড়ম্বর নিত্যজীবনের সরল সমস্যা, দুইটি আধুনিক যুবক আর অতি-আধুনিক যুবতীর সমস্যার মধ্যে আমার দৃষ্টির প্রবেশ কোথায়? ভূত ঝাড়াইতেও জানি, কিন্তু এর ওঝাগিরি কি করিব আমি?

গলদ্ঘর্ম হইতেছি,—দুইজনে বাহির হইয়া আসিল, প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করিল, "দেখলেন? কি রকম দেখলেন?

একেবারে স্কুলঘর, আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "ইয়ে মানে—মন্দ কি?"

জড়াজড়ি করিয়া দুইজনেই বলিয়া উঠিল, "মন্দ কি, কি বলছেন মশাই? ওঁরা আজকাল কলকাতার সিনেমায় যাকে বলে—মানে হচ্ছে, ওঁদের সামনে দাঁড়ায় কে? চেহারায় বলুন, হাবভাবে বলুন, অ্যাকটিঙে বলুন। এঁর নাম সরযু, এঁর নাম বনলতা; আজ এঁরা মডার্ন থিয়েটার্স ছেড়ে চ'লে আসুন, কাল কোম্পানি ব'সে যাবে।....আপনি কি বলছেন মশাই।"

আমি চক্ষে অকৃত্রিম বিস্ময় এবং যতটা সম্ভব শ্রদ্ধা মিশাইয়া আলেখ্য দুইটির পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রথম যুবক কোমরে দুইটা হাত দিয়া বলিল, "এখন কথা হচ্ছে, এ দুজনের মধ্যে আবার কে সবচেয়ে ভাল?"

দুইজনেই আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে দ্বিতীয় যুবক টেবিলে একটা মুঠি চাপিয়া বলিল, "ও বলছে—বনলতা, আমি বলছি—সরযূ দেবী। আজ তিন দিন থেকে আমাদের তর্ক চলছে; ওর দিকেও অনেকে হয়েছে, আমার দিকেও কম ভোট নয়। কিন্তু বেশির ভাগই তো চাষাভূষো, গায়েরই নয় জোর আছে, কিন্তু সরযূ-বনলতার তারা কতই বা বোঝে বলুন, তাই আপনার কাছে আসা।"

সর্বনাস! আমি চোখ তুলিয়া একবার চকিতে দেখিয়া লইলাম, দ্বিতীয় যুবক বেশ মোটাসোঁটা এবং প্রথমটি হাড়-বাহির করা হইলেও বেশ কসরৎ-করা শরীর। আমি পুঁটের সাড়া লইবার জন্য বলিলাম, "হ'ল তোর পুঁটে?"

পুঁটে চেঁচাইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এখনও ধরাতে পারি নি টিকে, স্যাঁৎসেঁতিয়ে গেছে; যা বিষ্টি!"—বলিয়া গলায় ধোঁয়া আটকাইয়া যাওয়ায় প্রবল বেগে কাসিতে লাগিল।

সাহস পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের বলিলাম, "তা নয় হ'ল. কিন্তু এঁদের অ্যাক্টিং সম্বন্ধে আমার তো জানা নেই কিছু।"

আশা ছিল ঐতেই রেহাই পাইব, কিন্তু দূরাশা। প্রথম যুবক বলিল, "চেহারা সম্বন্ধেই বলুন।"

দ্বিতীয় যুবক একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "আর ফোটোর পোজ দেখে হাবভাব সম্বন্ধে যতটা আন্দাজ করতে পারেন। ওপিনিয়ন কিন্তু আপনাকে একটা দিতেই হবে। পাড়াগাঁয়ে এসে প'ড়ে গেছি একটা সমস্যায়। আমরা তো কলকাতাতেই বেশির ভাগ থাকি কিনা, ভেবেছিলাম গরমের ছুটিটা ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌ট (গ্রাম-সংস্কার) নিয়ে থাকব। এখন দুটো দল খাড়া হয়ে গেছে,—হারজিতের, মানসম্ভ্রমের ব্যাপার।"

আমার যে জীবনমরণের ব্যাপার। পাপ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য ছবি দুইটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আপনার সরযূ দেবী খুবই সুন্দর, তবে বড্ড রোগা নয় কি?"

একটু যেন রুক্ষ স্বরেই উত্তর হইল, "আপনি নিশ্চয় বলতে চান—তন্বী?"

তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, বড্ড তন্বী একটু।....আর বনলতার মত সুন্দরী বড় একটা দেখি নি, খালি নাকটা যেন একটু বেশি—"

লম্বা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস হইতেছিল না। প্রথম যুবক বলিল, "গ্রীসিয়ান ছাঁচের....এই তো ?"

হাঁপ ছাড়িয়া বলিলাম, "ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

অল্প একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর প্রশ্ন হইল, "তা হলে ?"

এত অল্পে ছাড়িবে না ; তবুও একবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম, "একজন হ'ল উর্বশী,—তন্বী, গৌরী, সঞ্চরিতা লতার মত ; একজন ভেনাস—শিল্পীর পাষাণের মধ্যেও সে হয়ে ওঠে কুসুমের চেয়েও পেলব, প্রভাতের চেয়েও—"

প্রথম যুবক অধৈর্যভাবে একরকম ধমক দিয়াই বলিয়া উঠিল, "থাক থাক, আপনার ভাষার চটক শুনতে বৃষ্টি মাথায় ক'রে দু'কোশ পথ আসি নি মশায়, ফাঁকিতে চলবে না। বেশ, মিস্ বনলতা ভেনাসই হল ; এখন ভেনাস উর্বশীর চেয়ে বড় কিনা বলুন, চুকে যাক ল্যাঠা।"

দ্বিতীয় যুবক একটু চতুর। সঙ্গী সালিসকে চটাইয়াছে, এ সুবিধাটা ছাড়িল না, বেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল, না না, আপনার যেমন ক'রে সুবিধে হয় বলুন। ওই নিন, আগে তামাক খান মশাই। যত রকম ভাবে দেখা যায় দুজনকে দেখুন। ধরুন, বনলতা থেকে খানিকটা মাংস সরযূর শরীরে চারিয়ে দেওয়া হ'ল, আর সরযূর নাকটা—মানে, সরযূর মত নাক বনলতার ক'রে দেওয়া হ'ল। দুইজনেই নির্দোষ হয়ে গেল তো ? এখন বলুন, কে সুন্দর ? তারপর আবার খুঁত দুটো আলাদা আলাদা বিচার ক'রে, যার খুঁত তার শরীরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে—"

কি মারাত্মক রকম মেথডিক্যাল !

প্রথম যুবক একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, "মাংস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ বনলতার নাকটাও তোর ওই তন্বী খেঁদীর মুখে বসিয়ে দে না !"

দ্বিতীয় যুবক হুংকার করিয়া উঠিল, "মুখ সামলে !"

"আলবৎ বলব।—খ্যাঁদেশ্বরী, !"

"তোরও তা হ'লে নাকেশ্বরী, বকেশ্বরী, ঢাকেশ্—"

"এই তা হ'লে তোর নিজের নাক সামলা !"

আমি তাড়াতাড়ি নাক এবং উদ্যত ঘুষির মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুইজনকে থামাইয়া দিলাম।

লক্ষ্য করি নাই, বৃষ্টি কমিয়াছে, মেঘেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরিয়াছে। বাচনিক তর্কের এই হাত বাহিয়া ঘুষিতে অবতরণ একটা সুবিধাও। বলিলাম, "সমস্যাটা খুবই শক্ত—বুঝতেই পারছেন, রামী-বামীর ব্যাপার তো নয়, এক কথায় সেরে দিলাম। উনি যে রকম বলছেন, ঐ রকম একটা লজিক্যাল মেথড ধ'রেই এগুতে হবে। আমায় পাঁচ দিন সময় দিন, ঠিক ক'রে

আপনাদের ওখানে নিজেই ব'লে আসবখ'ন। সমাধান ক'রে উঠতে পারি, আগেই ব'লে আসব। এমন গুরুতর সমস্যা মাথায় ক'রে আপনাদের কি ভাবে কাটবে দিনগুলো বুঝছি তো।......বৃষ্টিটা এবার বেশ ধরে এসেছে।"

ঠিক ঠাণ্ডা না হইলেও দুজনে কতটা সংযত হইয়াছে; নিজের নিজের ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে।

আমার কথা শেষ হইলে প্রথম যুবক মুখ তুলিয়া বলিল, "নাঃ, আপনি যাবেন কেন, আমরাই পরশু থেকে রোজ একবার ক'রে এসে জেনে যাব'খন।"

দ্বিতীয় ছোকরা বলিল, "আমাদের নিজের নিজের সমর্থকদের নিয়ে আসব'খন সঙ্গে করে; গোপাল মণ্ডলের ছেলে রসিকের দেখবেন, কি শরীর আর কি উৎসাহ।"

প্রথম ছোকরা বলিল, "মানে, যতদিন না একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে, আমাদের আসল কাজে—মানে, ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌টের কাজে মন দিতে পারছি না কিনা....তা হ'লে মনে রাখবেন—পরশু।"

* * * * *

পরশুর আগের দিনই চলিয়া আসিয়াছি, আপাতত ছুটি লইয়া; কিন্তু আবার যাইব কি না স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অস্বীকার করিব না, প্রতিপত্তির নেশা এখনও লাগিয়া আছে একটু। নেশাই তো! তবুও খুব সতর্কভাবে খোঁজ লইতেছি, ভিলেজ-আপ্‌লিফ্‌টের জন্য ওপ্রান্তে আরও সব চারিদিকে কি রকম সেবক-সমাগম হইতেছে।

মানুষের মন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

(১৮৯৬)

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক-বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট, গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত, মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া, চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব, গোঁফদাড়ি কামানো, গলায় কণ্ঠি, কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কম্‌বাইন্‌ড্‌ হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য ফাউল কাট্‌লেট বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ্‌ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়ীতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত!

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই তা নয়। ইঁহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম. এ. পাশ—নরেশ কেমিস্ট্রীতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে ইঁহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে, ইহাতে দুই-তিনটে পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন, 'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য।

'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন, নির্মলা সত্যই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই মাত্র।

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির, এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়ীতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—"আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।" পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—"বাকী অর্ধেকটা তা হ'লে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক।" তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কি?

পল্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিংবা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত, তখন সে হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে, বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স, ষোল বৎসর। এইবার মাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ, আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালবাসিতেন। এ বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ, তিনি স্বভাবতঃই একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায়

কিছু আপত্তি করেন নাই ; কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত ?"

"বেশ, দেখাও।"

কবিরাজ আসিলেন, সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল। পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্ঠিটা দেখালে কেমন হয় ? কি বল ?"

"বেশ তো। তবে যাই কর, এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড।"

"তাই নাকি ?"

পল্টুর কোষ্ঠি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—"কবিরাজী ওষুধেতে বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি ?"

"তাই ডাক না হয়।

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা, আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায় ?"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক।

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু-একদিন দেরি হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন ?"

"বাবার কাছে ধর্না দেব।"

নরেশ কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।"

ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত

হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার ক'রে খাইয়ে দিতে, তা হ'লেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড-রোগীকে ফুল-বেলপাতা-পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েক দিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন।

"ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হাঁ, হাঁ, আমার আর ইন্‌জেক্‌শন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইন্‌-জেক্‌শন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু, খাও, খাও তো বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

ভূতপূর্ব

পরিমল গোস্বামী

(১৮৯৭)

বাড়িখানা পৈতৃক, ব্যাঙ্কের সঞ্চয়টাও পৈতৃক, হঠাৎ আমার মনটা কেন যে আমার স্বোপার্জিত হল জানি না। মনের শান্তি নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে হয় কেন, এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

একা থাকি বলেই কি এই অশান্তি? কিন্তু তাই বা কেন? একা ছিলাম না বলেই তো এই অশান্তি। কিন্তু থাক এ সব প্রশ্ন।—আমার গোপন কথা আমারই থাক আপাতত।

ঘরে আড্ডা জমেছিল যথারীতি।

আমরা তিন বন্ধু, অমল, ধীরেন ও আমি। অমল কিঞ্চিৎ খোঁড়া, সে বেশি হাঁটাহাঁটি পছন্দ করে না, ধীরেন ভীষণ আড্ডাবাজ, সমস্ত দিন খেটেখুটে দিনান্তে তার একটি আড্ডা চাই। আমাকে খেটে খেতে হয় না, সে জন্য আমারও আড্ডা চাই। শুধুই কি সে জন্য?

বোশেখ মাস, অস্বাভাবিক গরমে অস্থির হয়ে উঠছি। আবহাওয়ায় ঝড়ের পূর্বাভাস। আবহাওয়া নিয়েই আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল, এমন সময় হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠে এলো পলায়মান একটি শীতল প্রবাহকে অনুসরণ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। দেহ মন মুহূর্তে শীতল এবং তৃপ্ত। এত ভাল লাগল যে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলাম..চলুক এ ঝড় সমস্ত রাত। বন্ধুরা কি বলবে জানা ছিল, কোন আপত্তিরই সুযোগ না দিয়ে বললাম খিচুড়ির অডার দিচ্ছি, খাবে এখানে, থাকবে এখানে।

জানতাম এ অনুরোধ বৃথা হবে না। আগেই বলেছি বন্ধুরা আমারই সমধর্মী, যথারণ্যং তথাগৃহম্। যাদৃশী ভাবনা—কাজ হল। তার কারণ এ রকম ঘটনা এই নতুন নয়, এবং এই তো গতবারে যখন আমরা তিনবন্ধু একত্র রাত কাটাচ্ছিলাম, সেবারে চারইয়ারি কথা বইখানা তিনজনে একত্র পড়ে শেষ করেছি। এমনি এক বর্ষার রাত্রিতে বইখানা অদ্ভুত ভাল লেগেছিল।

সেই বইয়ের প্রভাবেই হোক, বা ঝড়বৃষ্টির প্রভাবেই হোক, বা বন্ধুত্বের 'ঘনত্ব' বৃদ্ধির জন্যই হোক অমল চিৎকার ক'রে গেয়ে উঠল 'এমন দিনে তারে বলা যায়'—।

গলাটা ওর ছিল বেশ মিষ্টি আর গাম্ভীর্যপূর্ণ। ভারি ভাল লাগছিল। কিন্তু ধীরেন ওর চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—থাম, থাম, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এর মানে কি?

কথাটা ভাববার মতো।

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল একমাত্র এমন বর্ষার দিনেই তাকে বলা যায় সেই কথা, যে কথা এমন দিন ভিন্ন বলা যায় না। আর এমন দিন তো আমাদের এসে গেছে—বাইরে ঘনঘোর বর্ষণ গর্জন, ভিতরে তিন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কিন্তু সে কথাটি কোন কথা ?

"তোমাকে ভালবাসি"—এই একটি মাত্র কথা।

অমল বলল, তা নয়। এমন দিনে বলা যায় মনের যাবতীয় গোপন কথা। কনফেশনের এই হল উপযুক্ত সময়।

ধীরেন তর্ক তুলছিল, আমি বললাম আজ আর তর্ক নয়, অমলের অর্থটা আপাতত কাজে লাগানো যাক। এসো, আজ আমরা যার যার গোপন কথা প্রকাশ করি। আমরা যে নারী বিদ্বেষী এর পিছনে একটি ক'রে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী আছে একথা গোপন ক'রে লাভ নেই। যদি সত্যিই কোন দিন কাউকে ভালবেসে থাক আর যদি তা এমন দিনেও প্রকাশ করতে না পার তা হলে জানব হয় ভালবাসনি, আর না হয় তোমরা এক একটি ক্রিমিন্যাল।

এ কথা বলবার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই উপলক্ষে আমার জীবনের গোপনতম কথাটি আজ প্রকাশ করতে চাই। চাই, সমাজের হিতের জন্য। কি হিত তা সুযোগ পেলে পরে বলব। ক'দিন ধ'রেই মনে হচ্ছে আর নয়, সময় এসে গেছে। 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানটি শোনামাত্র স্থির ক'রে ফেললাম আজই সেই সময়। বললাম—অমল আগে তুমি আরম্ভ কর।

অমল বুঝতে পারল, না বলে উপায় নেই। বলল বেশ, শোন তা হলে। বলব খুব অল্প কথায়। পিছনের না বলা অংশটি তোমরা ভাবে বুঝে নিও। আইসবার্গের মতন আর কি। উপরের দেখা অংশ সামান্য, কিন্তু নিচে বারো আনাই থেকে যায় অদৃশ্য।

ধীরেন বলল, এ আবার কেমন প্রেমের কথা ? প্রেম মানে তো বুঝি উত্তাপ। উত্তাপের বদলে বরফ।

তা না হলে আমার প্রেমের টাইটানিক জাহাজখানা ধাক্কা খাবে কিসে ? কিন্তু শোন। শোন, কিন্তু নতুনত্ব না পেলে আমাকে দোষ দিও না, বলছি তোমাদেরই অনুরোধে।

এক সঙ্গে পড়তাম, বি-এ অনার্স ক্লাসে। ইংরেজী অনার্স। নাম ছিল তার..কিন্তু না, যাক, ধর তার নাম ছিল তনিমা। ভালছেলে ছিলাম পড়া-

শোনায়—এ কথা বন্ধু মহলে প্রচার ছিল। তনিমা ছিল খুব শার্প। বুদ্ধিতে চোখমুখ উজ্জ্বল। নিজে সে যথেষ্ট ভাল ছিল পড়াশোনায়, তবু সে কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আমারই কাছে আসতে আরম্ভ করল সমাধান বাসনায়। কেন, তখন বুঝিনি।

এই যে অমলবাবু, আজ আপনার একটু সময় নষ্ট করব—রোম্যান্টিক রিভাইভ্যালের স্পিরিটটি কি তা আপনার ভাষায় আমাকে একটু বলুন।

আর একদিন এলো প্রশ্ন নিয়ে এনশেণ্ট মেরিনারের কাহিনীতে একই সঙ্গে জীবনের আর প্রকৃতির বিস্ময়, রহস্য আর অলৌকিকত্ব এসে মিলেছে। এখন যদি এটিকে নবরোম্যান্টিক কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলি তা হলে তা কতখানি সমর্থনযোগ্য ?—এ বিষয়ে আপনি একটু আলোচনা করুন, শুনি।

এইভাবে অত্যন্ত সহজ সমস্যার পথে এলো জটিলতা। মাসখানেক এইভাবে চলবার পর আমাদের অনেকটা উন্নতি হল। এখন আমরা মাঝে মাঝে কফি হাউসে গিয়ে বসি। আমাদের কাব্য আলোচনা মডার্ণ যুগ পর্যন্ত এসেছে।

আরও কয়েক দিন পরে তনিমা আমাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছে। দেখা হলে কথা হয় কম। খাতা বা বই বিনিময় হয় নির্ঘাৎ, তার মধ্যে চিঠি গোঁজা থাকে। উন্মাদ করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। নিও-রোম্যান্টিসিজম না নিও-রোম্যান্স, এটি বুঝতে আর কারো বাকী নেই।

তনিমার প্রেমের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। বাইরে তার উচ্ছলতা কম। সংক্ষিপ্ত দুচার লাইনের চিঠি। এখানেও আইসবার্গের সঙ্গে তুলনা চলে। অবশ্য শুধু বলা আর না বলা অংশের অনুপাতের দিক দিয়ে।

কিন্তু আমার উন্নতি স্পষ্ট। আধুনিক কবির পদে উঠেছি—আমি নিজে কবিতা লিখতে শুরু করেছি। এবং দিনে তিন চারটে ক'রে। অনার্সের এবং অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় পেপারকে আচ্ছন্ন ক'রে জ্বলছে প্রেমের শিখা। চন্দন-গন্ধে বক্ষোমন্দির বিহ্বল। তারই ধূপে তারই পূজো করছি। শেষ হয়ে গেল পরীক্ষা।

তনিমা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হল ইংরেজী অনার্সে। আমি পেলাম নিম্ন সেকেণ্ড ক্লাস। দেবী পূজার ফল। প্রেমের জন্য ত্যাগ। আত্মগর্বে নিজেই অভিভূত। এখন তার কাছে গিয়ে শুধু বলা—'তুমি মোরে করেছ সম্রাট !'—সম্রাট। মাথায় সেকেণ্ড ক্লাস কাঁটার মুকুট।

ইদানিং তনিমাদের বাড়িতে যাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমি

পরিচিত ছিলাম সবার। বিনা সঙ্কোচে সেদিন রাত্রে উঠে গেলাম ওদের বাড়ির দোতলায়। তনিমার ঘর সেখানে।

কথা কানে এলো সেই ঘর থেকে। তনিমা বলছে—বোকা, অমলটা একেবারে বোকা।

তোমার কাছে তো বটেই।—পুরুষ কণ্ঠ। দূর থেকে দেখলাম পুরুষটিকে উত্তম পুরুষ। গোবেচারা হরিশ।

তনিমার স্বর—এ ছাড়া পথ ছিল না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অমলকে হারিয়ে আমি ফার্স্ট হব। সামান্য দু আনার চন্দনের গুঁড়ো আর আট আনার খাম কাগজ। খুব বেশি হলেও মোট এক টাকা। এই এক টাকা মূলধনে এত বড় মুনাফা..।

মাথাটা ঘুরে উঠল। যা জানবার জানলাম, যা দেখবার দেখলাম। দেখলাম আমারই প্রেমের চিতার পাশে কোথাকার এক হরিশচন্দ্রকে। আর দেখলাম বিজয়িনী তনিমাকে।

গোপনেই নেমে আসছিলাম, কিন্তু পদস্খলন হল।

অবশ্য বহু আগেই হয়েছিল, এবারে আনুষ্ঠানিকভাবে হল। হরিশচন্দ্র সাহায্য করেছিল হাসপাতালে যেতে। সিম্পল্ ফ্র্যাক্চার প্ল্যাস্টার ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু আসল ফ্র্যাকচার হৃৎপিণ্ডে, সেটি অবশ্য অদৃশ্য বলেই যা বাঁচোয়া। —কেমন; শুনলে তো?

দেখলাম অমলের চোখদুটো ছলছল্ করছে। হাসি পেল দেখে। ধীরেন বলে উঠল, বেশ নাটকীয়। তবে নামটা আর বদলালে কেন? তোমাদের সঙ্গে একটি মেয়েই ফার্স্ট হয়েছিল ইংরাজীতে, সে নাম সবার মুখস্থ। যাই হোক, তোমার গল্পের পাশে কি আর আমারটা জমবে?

আমি বললাম এ তো আর গল্প না যে ভালমন্দ বিচার। অতএব তোমারটি নির্ভয়ে বল, ধীরেন।

ধীরেন বলল, তবে শোন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল—

আমার কাহিনী একটি নিশ্বাস মাত্র। তবু বলতে হবেই। একটি মুহূর্ত—আচ্ছা এক মুহূর্তকে এক যুগে পরিবর্তিত করা যায় না কি? গেলে বুঝতে পারতে আমার অবস্থাটা।

আমি বললাম সিনেমা যন্ত্রের সাহায্য নিলেই হতে পারে। স্লো মোশন পিক্চার। এক সেকেণ্ডের ঘটনার দশবিশ লাখ ছবি তুলে সাধারণ ছবির-গতিতে প্রোজেক্ট করলেই হল।

অমল বলল ওতে হবে না। মুহূর্ত্তকে যুগে পরিণত করা একমাত্র ভাবের জগতেই সম্ভব। কবিরা এ কার্য করেছেন। করেছেন মানে চেয়েছেন, হোক। চাওয়াটাই হওয়া, যদি ঠিকমতো চাওয়া যায়। কিংবা চেতনার মধ্যে মুহূর্তকে যুগযুগান্তরূপেই পেয়েছেন। লাখলাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেল—এ কথার অর্থ কি ভাবলেই বুঝতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ এই জিনিসই চাইয়েছেন প্রেমিকার মুখ দিয়ে—'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল' —আর ইচ্ছে করেছিলেন ব্রাউনিং তাঁর দি লাস্ট রাইড টুগেদারে—

ধীরেন কথার মাঝখানেই প্রায় চিৎকার ক'রে বলে উঠল কি বললে? লাস্ট রাইড টুগেদার? মানে দুজনে শেষ ঘোড়ায় চড়া? চমৎকার। ভাই, আমি সাহিত্য পড়িনি, জানতাম না এ সব। বড্ড মিলে যাচ্ছে যে।

অমল বলল, মিলে যাচ্ছে মানে? ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপার না কি? খুব রোম্যান্টিক তো?—প্রেয়সীর সঙ্গে ঘোড়ায় চাপা। কোথায় ভাই? বিলেতে না দার্জিলিঙে?

কলকাতায়। এবং ঘোড়ায় নয়, লাস্স রাইড টুগেদার ট্যাক্সিতে। শেষ চড়া এবং প্রথম চড়াও বটে। জীবনে এই প্রথম প্রেম, এবং হঠাৎ প্রেম। মানে হঠাৎ দর্শনে প্রথম প্রেম, কিংবা প্রথম দর্শনে হঠাৎ প্রেম, যেটা হয় বুঝে নিও। এতে সময় বাঁচে বলেছেন এক ইংরেজ রসিক। বিলেতে থাকতে শুনেছিলাম।

শুধুই শোনা?

সেখানে এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি তার বাইরে কোনো দিকে মন দিইনি। লাজুক আমি বরাবর। একা একা দিন কাটত। একেবারে একা। তার জন্য লাঞ্ছনা সয়েছি অনেক, বন্ধুরা টানাটানি করেছে এবং শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ঘটনাটা বিলেতে নয় কলকাতায়। বড়দিনের মধ্যে। মনে আছে সন্ধ্যায় ময়দানে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। ট্রাম থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কিছু ঘুরতে। মাঝে মাঝে যেতাম। ওজন বেড়েই যাচ্ছিল, সেজন্য দেহটাকে ফিট রাখা, কর্মক্ষম রাখা, চলত ঐ ভাবে। বেড়ানোর কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। বেড়াতে গিয়ে কোথায়ও বসা আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু সেদিন একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম বেশি হেঁটে। মনটাও কেন যেন একটু কল্পনাপ্রবণ হয়েছিল—সে কল্পনা অবশ্য এঞ্জিনিয়ারিং কল্পনা। সামনে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, তারই কিছু দূরে বসেছিলাম। এতবড় একটি বিরাট সৌধের যে দিন ব্লু প্রিণ্ট রচিত হয়েছিল সেই দিনের কথা কল্পনা করছিলাম। এমন

সময় মধুর অথচ আর্ত কণ্ঠে আমার পাশে কে বলে উঠল—মাপ করবেন, আমি একটু বিপদে পড়েছি, আমাকে বাঁচান।

আমি ভীষণভাবে চমকে চাইলাম সুধাকণ্ঠির দিকে। পথের আলো পড়েছে তার মুখে, অদ্ভুত ভাল লেগে গেল সে মুখ। আমি মুহূর্তে সকল লুপ্ত পৌরুষকে জাগিয়ে তুলে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নিশ্চয় বাঁচাব আপনাকে, বলুন কার হাতে বিপদ।

বিলেতে থাকতে শিভ্যালরির হাওয়া খানিকটা নিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো রক্তে মিশে থাকবে। আমি বললাম, কাকে খুন করতে হবে বলুন। হঠাৎ ভাল লেগে গেল তরুণীটিকে।

এই হঠাৎ ভাল লাগা সম্ভবত হঠাৎ ভাল লাগা নয়। ভেসুভিয়াস থেকে যেদিন আগুন বেরিয়েছিল, গলিত লাভা স্রোতে পম্পেই সহর ডুবিয়ে দিয়েছিল সেও কি এমনি হঠাৎ, না তার আড়ালে অনেক দিনের প্রস্তুতি ছিল?

অমল অধীরভাবে বলল, সোজাপথে চল, ভাই। বড্ড অধৈর্য জাগিয়ে তুলছ মনের মধ্যে। শর্ট কাট্ কর।

তুলনাটাই তো শর্ট কাট্। নইলে মনের লাভাপ্রবাহ বর্ণনা করব কোন্ ভাষায়? —বিপন্না তরুণী আমার হাত ধরে আমাকে বসিয়ে দিল এবং সেও আমার পাশে বসে পড়ে বলল—সমস্ত গা কাঁপছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমি তখন লাফিয়ে উঠে মানুষ খুন করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে পড়তে হল সব উত্তেজনা সংহত ক'রে। মনের বয়লার যেখানে ফাটানো দরকার সেখানে সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্ ঠেলে কিছু বাষ্প বার ক'রে দিলাম বাধ্য হয়ে।

অমল পুনরায় প্রতিবাদ করল: দেখ, শর্ট কাট্ কর, ভাল হবে না।

তাই তো করছি। কি মন্ত্রবলে ওর বিপদ আমার বিপদ হয়ে উঠল। দুজনে দুজনের খুবই কাছে এসে পড়লাম। গোটাদশেক বছর পার হয়ে গেল আমাদের জীবনে ঐ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

বিপন্না বলতে লাগল, কি কুক্ষণে যে একা এসে পড়েছি। এখন আর ভয় নেই। কয়েকটা গুণ্ডার হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। ওরা এখন ভাববে আমি একা নই, আর আসবে না। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। ব'লে তরুণী আমার পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, এবং ওর হাতখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, দেখুন হাত এখনও কাঁপছে।

এরপর আমার অবস্থাটা ভাব। আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি কাঁপছে তখন। আমার সব শক্তি তখন লুপ্ত। বাঁচিয়ে দিল একখানা

ট্যাক্সি। আমাদের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে। ইসারা করলাম।

তারপর কি হল মনে নেই। জন্মান্তর পার হয়ে এলাম। মনে হল কতযুগ কেটে গেছে আমাদের। অথচ মোট তিন মিনিটও না। গুণ্ডারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর, বাহুবন্ধন ছিঁড়ে গেল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, একজন জানাল তার স্ত্রীকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমি তখন স্বপ্নমুক্ত আত্মস্থ। জিজ্ঞাসা করলাম পার্শ্ববর্তিনীকে, একথা কি ঠিক? তরুণী মুখ নিচু ক'রে কেঁদে বলল ঠিক, ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচান।

অভিনয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। গুণ্ডা বলল পুলিস কেস হবে। তরুণী বলল, আপনাকে বিপদে ফেললাম। পুলিশ এলে কি বলতে পারবেন আপনি আমার স্বামী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম তুমি পারবে? তরুণী বলল, স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারব না, আপনি ভীরু, আপনি ছেড়েই দিন আমাকে। আমার যা হয় হবে।

গুণ্ডারা বলল বাঁচতে চান তো দুশো টাকা বের করুন। ব'লে হাত এগিয়ে দিল। আমি পার্সটি বের ক'রে তার হাতে তুলে দিলাম। কত ছিল মনে নেই। তবে ওরা আর গোলমাল করল না, ট্যাক্সিসুদ্ধ সরে গেল, আমি পড়ে রইলাম একা।

তারপর থেকে তোমাদের আড্ডায় ভর্তি হয়েছি, নারী বিদ্বেষী হয়েছি জন্মের মতো। কাগজে তারপর কতবার পড়লাম ঐ একই প্রতারণার কথা। শুনলাম অনেক আগে থেকেই আছে। অতএব আমার এ ঠকার মধ্যে মৌলিকতা কিছু নেই, নকলের নকল।

খুব বেঁচে গিয়েছ যা হোক—বলল অমল।

ঠাকুর এসে বলল রান্না হয়ে গেছে, জায়গা করা হচ্ছে।

ঝড়বৃষ্টি চলছে বাইরে। খাওয়ার পালা মিটিয়েই এলাম তিনজন। আজ এ ব্যাপারটি বড়ই স্থূল মনে হল কেন জানি না, যদিও রান্না উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

এবারে শোবার ঘরে এসে বসা গেল। তিনটি পৃথক বিছানা তৈরী ছিল। এবারে আমার কাহিনী। ধীরেন বলেছে তার কাহিনী মৌলিক নয়। সত্যি বলেছে সে। প্রেমের কাহিনী সব যুগে এক, সবার বেলায় এক। প্রেমে প্রতারণাও সব এক চেহারার। সেজন্য ভরসা আছে আমার এ কাহিনীতে কিছু নতুনত্ব থাকবে। কারণ এটি সম্পূর্ণ আত্মপ্রতারণার ব্যাপার। আত্মহত্যাও বটে। আর সেও আমি জাতিস্মর বলেই বলতে পারছি। এতদিন বলিনি নিজেরই প্রয়োজনে—যদি কেউ বিশ্বাস না করে। আত্মাভিমান আছে প্রখর।

কিন্তু আজ ঐ 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গান আমার মনকে ওলটপালট ক'রে দিয়েছে। আমি আমার কাহিনীটির একটি নতুন দিক আবিষ্কার করেছি। এতে সমাজের উপকার হবে। যে প্রণয়ীযুগল সমাজচ্যুতির ভয়ে বা মার খাওয়ার ভয়ে, ইহলোকে ব্যথ হয়ে বিষ খায়, এবং আশা করে পরলোকে গিয়ে মিলবে, তারা যেন বিশেষ ক'রে আমার কাহিনীটিকে পড়ে। মিলিত হওয়ায় কয়েকটি গুরুতর অসুবিধে আছে।

ভূমিকা না ক'রেই বললাম—এবারে আমারটি শোন।

অমল ধীরেন একসঙ্গে বলে উঠল, অপেক্ষা ক'রে মিনিট গুনছি, দেরি করছ কেন?

বলতে লাগলাম: আমি জাতিস্মর। তিন জন্মের কথা বলব আজ বিশ্বাস কর আর না কর, শোন। তার নাম ছিল মল্লিকা দাস। ১৯১৬-১৭ সালের কথা। ১৯১৬ মার্চ থেকে ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত--একটি বছরের ইতিহাস। ইউরোপে তখন যুদ্ধ চলছে। ১৯১৬ সালে আমার বয়স ২২ এবং মল্লিকার ২০।

ধীরেন বাধা দিয়ে বলল,—তবে যে বলেছ তোমার এখন বয়স ৩৮? ১৯১৬ সালে ২২ বছর হলে আজ ১৯৫৭ তে তুমি তো ৬২ পার হয়েছ।

বললাম, ঠিক বলছি, শোন। কিন্তু তার আগে—ব'লে পাশের একটি স্টীলের আলমারি খুলে একটা দেরাজ থেকে একখণ্ড খবরের কাগজের কাটা অংশ বের ক'রে ওদের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম এইটে দেখে নাও। অমল চেঁচিয়ে পড়তে লাগল—

শোচনীয় দুর্ঘটনা

৭ই ফেব্রুয়ারি। গতকাল পুলিশ পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের একটি ঘরে সুধাকান্ত চক্রবর্তী নামক এক যুবক ও মল্লিকা দাস নাম্নী এক যুবতীকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করিয়াছে। আত্মহত্যা বলিয়াই সন্দেহ করা হইতেছে। উহাদের পাশে একটি খালি শিশি পড়িয়া ছিল। একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উহাদের সম্মিলিত স্বাক্ষরে লেখা আছে আমাদের আত্মহত্যার জন্য কেহ দায়ী নহে বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। দায়ী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। তাই এ সমাজ ব্যবস্থার বাহিরে চলিলাম। আশা করিতেছি সেখানে জাতিভেদ, ধর্মভেদ এবং শ্রেণীভেদ নাই।

মল্লিকা দাস,
সুধাকান্ত চক্রবর্তী।

পড়া শেষ হলে ওরা আমার দিকে চাইল। আমি বললাম আমারই নাম ছিল সুধাকান্ত চক্রবর্তী। শোন সব আগে। এক বাড়ির দুই তলে ছিলাম আমরা। সামান্য ব্যাপারে আমাদের আলাপের সূত্রপাত। আমার একখানা চিঠি ভুল ক'রে ওদের চিঠির বাক্সে বিলি হয়েছিল। মল্লিকা সিঁড়ি পথে উপরে উঠে যাবার সময় দরজায় চিঠিখানা আমাকে পেঁৗছে দিয়ে গেল। বলল এখানা আমাদের বাক্সে ছিল।

মল্লিকারা থাকত চারতলায়, আমরা দোতলায়। যে যার মতো একান্তে বাস, কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই, হবার সুযোগও নেই। মল্লিকারা খুব শান্ত পরিবার এই টুকু জানা ছিল। ওরা বাপ মা ভাই বোনেরা মিলে কম নয়, কিন্তু কখনো ঝগড়া বিবাদ বা অসভ্য চিৎকার শুনিনি। আভিজাত অঞ্চলের বিরাট বাড়িতে কত পরিবার কেউ কাউকে চেনে না।

আমি চিঠি পেয়ে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। আমি সদ্য এম-এ, পাস করেছি ডিগ্রীটি চিঠির উপর আমার নামের সঙ্গে লেখা ছিল। সুধাকান্ত চক্রবর্তী, এম-এ। পূর্বজন্মে এম-এ, কিন্তু আজ আমি ভূতনাথ মল্লিক বি-এ। কিন্তু যাক, শোন।

সেদিন আমার ধন্যবাদ দেওয়ার ভঙ্গিটা সম্ভবতঃ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় নম্র এবং বিনীত হয়েছিল। হয়তো কিঞ্চিৎ চপলতাও প্রকাশ হয়ে থাকবে। বাইরের মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ সে যুগে ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ক্লাসে একটিও মেয়ে ছিল না। তাই অনভ্যস্ত ব্যবহার। কিন্তু মল্লিকাকে তা মুগ্ধ করেছিল, তা পরে জানতে পারি। পরস্পর অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত ঐ চিঠি বিলিতে। হঠাৎ সে একদিন এলো এক পাঠ সমস্যার সমাধান আশায়। বলল, আপনি তো এম-এ, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। মল্লিকা বি-এ পড়ত বাড়িতে বসে।

খুব বিনয়ের সঙ্গে আমার মূল্যবান সময় এবং সহৃদয়তার উপর অত্যাচারের জন্য বারবার ক্ষমা চেয়ে নিল এবং বই বের ক'রে বলল—আমি নেহাৎ বাধ্য হয়েই—।

না না সে কি কথা, কি তোমার সমস্যা বল, আমি যতদূর সম্ভব—।

সাহায্য চলতে লাগলো মাঝে মাঝে। আমার অভিভাবকেরা আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। বুঝতে পেরে টিউশন কমিয়ে দিলাম। একেবারে বন্ধ করে দিলে ক্ষতি হত না, কেননা ইতিমধ্যে আমার কাছে সে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। শিখেছে প্রেমের সংজ্ঞা, প্রেমের রোমাঞ্চ, প্রেমের মাধুর্য। সপ্তাহে একবার তাকে তবু আসতে হত চিঠি দেবার জন্য।

চিঠি বিলি নিয়েই প্রথম পরিচয়, সেই বৃত্তি সে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করল। অন্যের লেখা চিঠি সে একবারই মাত্র বিলি করেছিল।

স্বলিখিত চিঠির পৃষ্ঠা সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে গেল। সমস্ত রাত জেগে সে চিঠি পড়তাম এবং তার উত্তর লিখে রাখতাম।

অভিভাবকেরা জিজ্ঞাসা করলেন এত রাত জাগা কেন? বললাম পি-এইচ্-ডি'র চেষ্টা করছি।

খুশি হলেন কি না বোঝা গেল না।

আমি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ ছিলাম। মল্লিকাকে দর্শন পড়াতাম। কিন্তু সে আর ক দিন। যে দর্শন আমরা নিজেরা রচনা করছিলাম তা না মিলবে ন্যায়—বৈশেষিক—সাংখ্য—যোগ—মীমাংসা—বেদান্তে, না মিলবে কোঁতদেকার্ত—স্পিনোজা—লাইবনিৎস—কাণ্ট—হেগেল—মার্ক্‌স—বের্গসঁতে। এ মিলবে দুজন বাঙালী দার্শনিকের ডায়ারির পাতায়। তাদের নাম মল্লিকা দাস আর সুধাকান্ত চক্রবর্তী।

সম্পর্কের উর্ধবিন্দুতে পৌঁছতে দেরি হল না, এবং পৌঁছবার পরে তবে জানতে পারা গেল আমরা ক্রস্—রোডে পৌঁছেছি, অবস্থা ভয়াবহ। অর্থাৎ মল্লিকার গলায় ক্রস্। ওরা খৃীষ্টান।

বজ্রপাত হল দুজনের মাথায়। মল্লিকা ভেবেছিল আমি জানি, আর আমি ওসব জানা প্রয়োজনই মনে করিনি। এতদিন যে আমরা এই দিকটির বিষয়ে ঘোর উদাসীন ছিলাম তাতে প্রমাণ হয় আমরা দার্শনিক, এবং অন্তত সেই আদি যুগের দার্শনিক যখন দার্শনিকদের স্বপ্নবিলাসী বলে গাল দেওয়া হত।

জনকজননীকে জানতাম, অতএব আমাদের পরিণামও জানতাম। তাঁরা সম্প্রতি তীর্থভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরেছেন। বাড়িতে গুরু পূজোর মধ্যে তাঁরা জীবনের সার্থকতা, আর মন্ত্র-মাদুলি মানতের আশ্রয়ে জীবনের নিরাপত্তা খোঁজেন। একে মন্দ বলার অধিকার আমার নেই, আমি শুধু অবস্থা বিশ্লেষণ করছি। এই বংশের একমাত্র সন্তান ত্রিশূল আর ক্রস্‌কে একত্র মেলাবে এতো ভাবাই যায় না। সেটি যে ১৯১৭ সাল। আজ ১৯৫৭য় সে অবস্থা কল্পনা করা শক্ত।

অতত্রব মল্লিকার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করলাম চিঠির মারফৎ। সে স্বীকার করল এ ছাড়া পথ নেই। ইহজগতে মিলন-সম্ভাবনা নেই, পরজগতে গিয়ে মিলতে হবে। তারপর ইহজগতে কি ঘটল তা তোমরা খবরের কাগজের ঐ কাটা অংশে পড়েছ। বছর কয়েক হল ওটি সংগ্রহ ক'রে রেখেছি।

তারপর কি হলো ?—অমল ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল।—ধীরেন বলল, তুমিই যে সুধাকান্ত ছিলে তা জানলে কি ক'রে ?

কিভাবে জেনেছি তা তো বলতে পারব না, তবে সব মনে আছে এইটিই প্রমাণ, অন্তত আমার কাছে। আমার ধারণা আমি জাতিস্মর।

অমল ধীরেনকে ভর্ৎসনা ক'রে বলল, এখন আর বাধা দিও না, ভাই। বাধা দেবার আর সময় নেই।

আমি বলতে লাগলাম—এবারে আমার কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায় এবং এইটিই সব চেয়ে রহস্যজনক। অনেক নতুন তথ্য তোমরা জানতে পারবে এ থেকে। কারণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি পরলোকের ব্যাপার। যেখানে গিয়েছিলাম সেটিকে ভূতের কলোনি বলতে পার তোমরা। বছরখানেক ভূত হয়ে বাস করেছি সেখানে।

নরক বোধ হয় সেটি ? ধীরেন জিজ্ঞাসা করল।

তার চেয়ে খারাপ। শোন। বিষ খাওয়ার পর কোনো জ্ঞান ছিল না। তারপর কখন কতদিন পরে জ্ঞান হল জানি না, দেখি এক নতুন রাজ্যে এসে পেঁছেছি। বিস্তর লোক সেখানে স্ত্রী-পুরুষ কত যে সংখ্যা নেই। যেন সব উদ্বাস্তুর দল। তখনই মনে হল, এই কি সেই পরলোক যেখানে আমরা মিলব বলে বিষ খেয়েছিলাম ? তা যদি হয় তা হলে মল্লিকাকেও নিশ্চয় এখানে পাওয়া যাবে। আমাদের তো একই সঙ্গে আসবার কথা।

যাকে প্রশ্ন করি সেই বলে কি জানি হয়তো পাবে, দেখ না খুঁজে। শুনলাম এখানে পথঘাটের কোনো নাম নেই, ঘর বাড়িও নেই। সবাই এখানে বাস্তুহারা। একটু ধাঁধায় পড়লাম। প্রথমেই মনে কেমন একটা সন্দেহ হল। তবু খুঁজতে লাগলাম মল্লিকাকে। কিন্তু কি ভাবে খুঁজলে পাব তাকে ?

হঠাৎ দেখি সে আমারই সামনে দিয়ে কোথায় চলেছে। আমি আনন্দে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম, মল্লিকা, আর আমাদের কোনো বাধা নাই, আমাদের আত্মহত্যা সার্থক।

অমল একটু যেন চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল তাকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরলে ?

প্রকাশ্যে বৈ কি। দেখলাম সেখানে কোনো সেন্সর নেই, এ কার্য সবাই করছে প্রকাশ্যে। ওখানকার সম্ভাষণ জানাবার এটাই রীতি বলে বোধ হল। কিন্তু শোন। আমরা দুজনে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমার হৃদয় তখন উদ্বেলিত, তারও সম্ভবত। দুজনে চুপচাপ বসে আছি। মল্লিকাই প্রথম কথা বলল—প্রাণেশ্বর—

ধীরেন উত্তেজিত স্বরে বলল, ইম্পসিবল। ও ভাষা অচল, তুমি বানিয়ে বলছ।

আদৌ না। ভুলে যাচ্ছ কেন ১৯১৭ সালে যখন আমরা বিষ খাই তখন মল্লিকার বয়স ২১। তার মানে মল্লিকার জন্ম ১৮৯৬ সালে, উনবিংশ শতাব্দীতে, ভিক্টোরিয়া যুগে। যুগের ছাপ মল্লিকার উপরে বেশ পড়েছে, কেননা সে ছিল খৃীষ্টান সমাজের মেয়ে। সে যুগের বাঙালী হিন্দুদের মতো বাঙালী খৃষ্টানরা বাংলা ভাষায় খুব এগিয়ে আসেনি, যদিও আজকের তুলনায় সাধারণ হিন্দুরাও বাংলা বিশেষ কিছু জানত বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাণেশ্বর হিন্দু খ্রীষ্টান সকল বাঙ্গালী বধূরই সম্বোধন ছিল। তখন খামের উপর ছাপা থাকত এক উড়ন্ত পাখী, তার মুখে চিঠি, চিঠিতে লেখা "যাও পাখী বল তারে সে যেন ভোলে না মোরে।" কিন্তু এসব কথা তুলে গল্পের গতি কিন্তু তোমরাই নষ্ট ক'রে দিচ্ছ।

শোন, আমিও ওর ভাষাতেই বললাম, প্রাণেশ্বরী, এসো আমরা আজকে একটি উৎসব করি, আজকের পুর্ণমিলন দিনটি স্মরনীয় হয়ে থাক। এখানে চেনা শোনা আর কাউকে তো দেখছি না, তবু দুচার জনকে নেমন্তন্ন ক'রে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি। আজ যে আমাদের বিয়ে। সাক্ষী থাক নিমন্ত্রিতেরা। দেরী করা ঠিক নয়, কেননা কোন অভিভাবক ভূত যদি দেখে ফেলে তা হলে এখানেও বাগড়া দেবার চেষ্টা করবে। অতএব কাজটি আজই হয়ে থাক। আমাদের পুর্ণমিলন একেবারে আশাতীত। এমন আত্মিক মিলন পৃথিবীতে কখনো ঘটে না, এবং শুধু আত্মিক নয়, প্রেতাত্মিক মিলন। এইটেই তো আমরা চেয়েছিলাম, মল্লিকা, এসো, আরও কাছে এসে বস।

আমি আত্মগত ভাবে বলছিলাম, হঠাৎ চেয়ে দেখি কাকে বলছি এসব? এ তো মল্লিকা নয়, অন্য একটি মেয়ে। একে আমি চিনি না। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মল্লিকা কোথায়? তুমি কে? মেয়েটি পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? আমি আমার নাম বললাম, আরও বললাম মল্লিকার আজ বিয়ে আমার সঙ্গে, তুমি যদি উপস্থিত থাক খুশি হব।

বুঝতে পারছি না তো কি বলছ।—

চেয়ে দেখি অন্য আর একটি মেয়ে বলছে এ কথা।

এ কি রসিকতা। আমি আমার প্রেমের প্রথম অর্ঘ্য নিয়ে ভূত হয়েছি, এখন সে অর্ঘ্য কাকে নিবেদন করি? কোথায় মল্লিকা? সেই লক্ষ কোটি ভূতের রাজ্যে কে বলবে কোথায় মল্লিকা। কেউ কারো কথা বেশিক্ষণ শুনতে চায় না। এক জনকে একটি কথা বলছি, দেখি সে কথার প্রথম দিকটা সে

শুনেছে, শেষের দিকটা শুনছে আর একজন। প্রথমজন দ্বিতীয়জনও নেই। সবাই উদাসীন, কারো কোনো আকর্ষণ নেই কারো প্রতি। শুধু আমি যে কেন ওদের মতো হতে পারছি না, জানি না। কিন্তু এ অবস্থা ক্রমে আমার কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। মল্লিকাকে পেলাম কতবার, কিন্তু দেখি সে প্রতিদিন নতুন নতুন ভূতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে ডেকে যখনই বলতে গিয়েছি— আমি আর কতদিন অপেক্ষা করব, বল, বল, মল্লিকা, তখনই দেখি মল্লিকা নেই, সে কথা শুনছে ক্ষেমঙ্করী, এবং বলছে আমি কি জানি। শুনছে নিস্তারিণী, বলছে কি কও, বুঝিনা। শুনছে কাদম্বিনী বলছে কাকে কি বলছ? শুনছে চন্দ্রমুখী, বলছে মিন্‌ষে বলে কি?

প্রায় এক বছর এই অসহ্য অবস্থায় কাটালাম। শুনছ তো?

ওরা সমস্বরে বলে উঠলো, সে প্রশ্ন তোলবার আর সময় নেই, থেমো না।

মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে কাঁদতাম, কিন্তু কেউ ফিরেও চাইত না। কেবলই মনে হত, এই ভূতের রাজ্যে সবাই যদি এত উদাসীন তবে আমার এত বাসনা কামনা কেন? একি ফিলসফিতে এম-এ পাশের শাস্তি! তাই তো মনে হয়। কারণ এখানে ইংরাজীতে এম-এ ভূত দেখলাম, ইতিহাসের এম-এ ভূত দেখলাম, অঙ্কের এম-এ ভূত দেখলাম, তারা সবাই তো বেশ উদাসীন ভাবেই ঘুরে বেড়ায়। শুধু ফিলসফির ভূত আমি একা, আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পার্থিব রয়ে গেছে।

ক্রমে আমার এই স্বাতন্ত্র্য, এই একাকিত্ব আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলল। শেষে মরীয়া হয়ে ভবতারিণী, ক্ষেমঙ্করী যে--হোক, তার কাছেই দুটো মনের কথা বলব বলে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু ফল হলো না। ভূত ডাকলে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের মনে প্রবেশ করে না কোনো কথা। কোনো ভূতই এক মিনিটের বেশি কোনো কথা শোনে না।

অবশেষে—

আমাকে চুপ ক'রে যেতে দেখে ধীরেন ক্ষেপে গেল। অমলের চোখে মুখে অধৈর্য ফুটে উঠল, বলল, থামলে খুনোখুনি হবে।

থামব কেন? সে কথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। শোন। অবশেষে সেই উদাসীন ভূতের রাজ্যে আমি ফিলসফিতে এম-এ ভূত নিতান্ত অসহায় ভাবে একটি গাছ খুঁজতে লাগলাম। তিন চার দিন খোঁজার পর—

অমল বাধা দিয়ে বলল, গাছ কেন?

ধীরেন বলল, দাঁড়াও, একটা কথা ভাবছি। ফিলসফির ভূত স্বতন্ত্র কেন, ভূতের রাজ্যেও তার অকাঙ্ক্ষার, নিবৃত্তি নেই কেন?

অমল ক্রুদ্ধভাবে বলল সে প্রশ্নের এই কি সময়? সংসারে সব কিছু

ফরমুলায় মেলে না। শেক্সপীয়ার বহুকাল পূর্বেই বলে গেছেন ফিলসফির কল্পনার ভিতরের চেয়ে বাইরে অনেক বেশি জিনিষ আছে। বার বার ফিলসফির এম-এ ভূতদের দিয়ে সেটি এই ভাবে প্রমাণ করা হয়। শেক্সপীয়ার বলেছেন There are more things in heaven and earth, Horatio than are dreamt of in your philosophy, এখানে হোরাশিও হচ্ছে আমাদের ভূতপূর্ব সুধাকান্ত চক্রবর্তী। অর্থাৎ হে সুধাকান্ত, দেখ, তোমার ফিলসফিতে এ দুনিয়ার কতটুকুই বা তুমি জানতে পার।—নাও এখন এ প্রসঙ্গ থাক।—তোমার গল্প বল। গাছ খুঁজলে কেন?

আমি অমলের এই ব্যাখায় মুগ্ধ হয়ে বললাম, ঠিক কথা বলেছ ভাই অমল। এবারে শোন। গাজ খুঁজলাম প্রাণের দায়ে। কারণ গাছই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ঐ গাছের একটি ডালে গলায় কাপড় জড়িয়ে ঝুলে পড়লাম।

অ্যাঁ! ভূত অবস্থায় ফের আত্মহত্যা?

সজ্ঞানে এই দুইবার। প্রথমবার আত্মহত্যার পাপে ভূত হয়েছিলাম, দ্বিতীয় বারের পাপে ১৯১৭ সালেই ফের মানুষ হয়ে জন্মেছি। জন্মেছি ভূতনাথ মল্লিক হয়ে। মল্লিকার সঙ্গে ধ্বনির দিক দিয়ে পদবীর মিলটা ছাড়া গেলনা, কেননা জন্ম বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কোনো মতামত নেই। এখন প্রেমের নাম শুনলে চমকে উঠি।

অমল আপন মনে বলে উঠল, আমরা কি পাপে মানুষ হয়ে জন্মেছি কে জানে।

ধীরেন বলল, জাতিস্মর নই, বলতে পারব না।

অমল বলল, হয় তো পূর্বজন্মে আত্মহত্যা ক'রে থাকব, কিংবা ভৌতিক জীবনে।

ধীরেন বলল, অত ঘোরা পথে যাইনি বলেই মনে হয়।

অমল বলল, হয় তো বা হাত পা ভেঙ্গে হাসপাতালে অপমৃত্যু ঘটেছে।

ধীরেন বলল, আচ্ছা ভূতনাথ, তোমার এত কথা মনে আছে, মল্লিকার কি হল মনে নেই?

আছে বৈ কি। সেও মানুষের ঘরে জন্মেছে। বর্ত্তমানে তার নাম শ্রীমতী সুধা চক্রবর্তী। তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে।

যা-তা বলছ—বলে উঠল অমল। সে তোমার পূর্ব জন্মের নাম নিয়ে বসল, তার উপর আবার তুমি মল্লিক, সে চক্রবর্ত্তী, অথচ বিয়ের কথা চলছে মানে কি? কথা চালাচ্ছে কে?

মল্লিক একটি বিশ্বজনীন পদবী। আমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেটি বড় কথা

নয়। বিয়ে হবে নতুন আইনে। রেজিষ্টারি ক'রে। কথা আমরাই চালাচ্ছি ব্রাহ্মণ না হলেও বাধা ছিল না।

তার মানে প্রেম ক'রে বিয়ে?—অথচ তুমি জীবনে প্রেম করবে না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সে প্রতিজ্ঞা রাখব যদি বিয়ে করি। প্রেম ক'রে বিয়ে করছি না ভাই, বিজ্ঞাপন দিয়ে করছি। আর বিয়ের পরেও যদি প্রেম করার সময় থাকে এ কথা বিশ্বাস কর, তা হলে আমার অনুরোধ, তোমরাও বিয়ে কর।

অমল বলল, তুমি যদি কর।

ধীরেন বলল, বিয়ে করব না প্রতিজ্ঞা করেছি, মেয়ের চরিত্র দেখে। ও জাতের উপর ক্ষেপে আছি। অথচ বয়সকে যেমন এড়ানো যায় না জরা মরণকে যেমন এড়ানো যায় না, বিয়েকেও তেমনি এড়ানো যায় না। তাই বিয়ে করলেও ওদের ঘৃণা করব চিরদিন।

অমল বলল, এখন আমার মনে হচ্ছে আমিও যেন অনেকটা ঐ রকমই ভেবেছি।

অমল বলল, ঝড়বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ থেমে গেছে, বাকী রাতটুকু তা হলে—ঘুমনো যাবে, কি বল?

ধীরেন বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

মিনিট তিনেক পরেই ধীরেন জড়িত স্বরে স্বপ্নে বলতে লাগল, ঘৃণাও ঠিক করা যায় না নারী জাতিকে।

অমল স্বপ্নের মধ্যে বলে উঠল ঘৃণা করা কি মুখের কথা?

তারপর দুজনেরই নাক ডাকতে লাগল।

তারপর আমারও, সম্ভবত।

পঞ্চরুদ্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৮)

পঞ্চরুদ্রের মৃত্যু। অপঘাতে অপমৃত্যু হইয়া গিয়াছে; আজ তাহারই প্রেতক্রিয়া উপলক্ষ্যে সমারোহের কাণ্ড, লাঠালাঠি ব্যাপার; রক্তগঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। এক নয়, দুই নয়, পঞ্চরুদ্র, পঞ্চমুখ পঞ্চাননের পঞ্চ মূর্ত্তির মৃত্যু—তাও অপমৃত্যু। রক্তগঙ্গা হইবে না? সমস্ত গ্রামটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বের কথাটা আগে বলা প্রয়োজন।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অন্নভিখারী পঞ্চানন মহুগ্রামের রামরতন পাঁজার বাড়ীতে পাঁচটি বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলেন, বোধ হয় পাঁচ-মুখে খাইয়া এক উদরে খাদ্য সম্ভার সঙ্কুলান করিতে কষ্ট হইতেছিল, তাই তিনি পাঁচমুখের জন্য পাঁচটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

রামরতন পাঁজার তখন জমজমাট সংসার, ধনে পুত্রে পাঁজা বাড়ি হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। উর্ব্বর ক্ষেত্র, খামার ভরা মরাই, পুকুর ভরা মাছ, গোয়ালভরা পয়স্বিনী গাভী, লোহার সিন্দুকে সোনারূপা,—মোটকথা পরিপূর্ণ সংসার। ঠিক এই সময়েই ভিখারী শিবঠাকুর অন্নলোভে আসিয়া বলিলেন, ওহে পাঁজা আমাদের চারটি করে খেতে দিতে হবে তোমাকে।

অর্থাৎ, একদা রাত্রে পাঁজা স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি শিব প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই তিনি বড় ছেলেকে ডাকিয়া আদ্যন্ত স্বপ্নের বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, শিব প্রতিষ্ঠার উদ্যুগ কর।

সংবাদটা শুনিয়া গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু আলাদা ক'রে করব। তোমার শিব থাকবেন ডান দিকে, আমার শিব থাকবেন বাঁয়ে।—বলিয়া তিনি ফিক করিয়া হাসিলেন।

'বেলা যে যায়' কথাটা শুনিয়া সাধু-মহাত্মার বৈরাগ্য উদয় হয়, অথচ কথাটা অত্যন্ত সাধারণ, বেলা রোজই যায় এবং প্রত্যহই বহু লোক বহুবারই বলিয়া থাকে। পাঁজা-গৃহিণীও দিনে এমন হাসি বহুবারই হাসেন, কিন্তু এই মুহূর্ত্তের হাসিটি পাঁজা মহাশয়ের বুকে সম্মোহন বানের মত গিয়া বিঁধিল, তাঁহার অঙ্গ যেন অবশ হইয়া গেল। তিনিও ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেড়ে বলেছ!

কিছুক্ষণ পর দুই বিধবা ভগ্নী আসিয়া বলিল, আমাদের সাধ দাদা, বহুদিনের।

পাঁজা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, হুঁ।

এক ভগ্নী বলিল, আমাদের বাপ বল, মা বল, ভাই বল, পুত্তুর বল—সবই

তুমি। তুমি যদি আমাদের মুখের দিকে না তাকাও, তবে আর আমাদের পরলোক কি করে হয়, বল?

পাঁজা মহাশয় ভগ্নীদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের মুখচ্ছবি ভিক্ষুকের মতই সকরুণ এবং ত্রস্ত। তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার মমতা হইল, শুধু মমতাই নয়, তিনি এ সংসারে তাহাদের স্বর্ব্বস্ব জানিয়া বেশ একটু খুশীও হইলেন, কিন্তু তবুও তিনি গৃহিনীর সম্মতি না লইয়া একেবারে সম্মতি দিতে পারিলেন না। বলিলেন তা হ্যাঁ, দেখি ভেবে চিন্তে। মাসে খরচ পত্র তো আছে।

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, তোমার খুশী! আমি কে? পাঁজা মহাশয় চিন্তিত হইয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন, তাই তো—!

দিন দশেক পরেই কিন্তু একটা সুমিমাংসা হইয়া গেল। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্ত্তী গ্রামে পাঁজা মহাশয়ের এক শ্যালিকার বাড়ী। তিনি হঠাৎ সেদিন আসিয়া হাজির হইলেন। গালে মোটা মোটা দুই-দুইটা ডবল খিলি পান দোক্তা সহযোগে, লবনাক্ত আনারসের মত অনবরত রসক্ষরণ করিতেছিল, তিনি কোঁত কোঁত করিয়া সেই রস গিলিতে গিলিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন, কই গা পাঁজামশয়, কই গা?—বলিয়া পচ করিয়া এক ঝলক পানের পিচ ফেলিয়া দিলেন।

গৃহিণী পুলকিত হইয়া বলিলেন, কে, বেমলা? আয় আয়।

—উঁ—হুঁ, আগে পাঁজা মশাই কই, বল?

পাঁজা মহাশয় ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি পুলকিত হইয়া আসিয়া বলিলেন, আরে, এস এস, ছোটগিন্নী এস। ওরে আসন দেরে, বসতে আসন দে।

ছোটগিন্নী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, নাঃ, তোমার আর আদরে কাজ নেই; ভালবাসার কথা জানা গেছে!

ত্রস্ত হইয়া পাঁজা বলিলেন, আরে আরে হ'ল কি ছোটগিন্নী? কথাটাই বল আগে।

কেন? শিবপ্রতিষ্টে করছ, দিদি থাকবে তোমার বাঁয়ে, বলি ডান দিক কি তোমার খালি থাকবে নাকি?

গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, তা, আমাদের বেমলা বলেছে বেশ। দুপাশে দুটি ছোট মন্দির, মাঝখানে তোমারটি একটু বড়, সে মানাবে খুব ভাল। বিমলা হাসিয়া বলিল, দুই পাশে দুই কলাগাছ মধ্যিখানে জগন্নাথ!

অতঃপর গৃহিনী ও শ্যালিকার দুইপাশে দুই ভগ্নীকে স্থান না দেওয়াটা

আর ভাল দেখাইল না। গৃহিনীও এবার বলিলেন, আহা, স্বামী নেই, পুত্তুর নেই, তুমি ছাড়া ওদের কে আছে? আর বাপু, মানাবেও খুব ভাল। দুপাশে দুটি ছোট, তার পাশের দুটি আর একটু বড়, একেবারে মাঝে তোমারটি স-ব চেয়ে বড়। সারি সারি পাঁচটি মন্দির, পঞ্চকন্যে স্মরেন্নিত্যং—বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া গৃহিণী প্রণাম করিলেন।

ছেলে সমস্ত শুনিয়া বলিল, তাইতো খরচ বেজায় বেড়ে গেল;—পাঁচ পাঁচটা মন্দির।

পাঁজা বলিলেন, ছোট ছোট মন্দির কর।

তাতেও তো নেহাৎ কম খরচ হবে না। মনে করেছিলাম সরকারদের সম্পত্তিটা কিনব।

তবে না হয় ধান বিক্রয় কর।

ধান? ধানের কি দর আছে? তাছাড়া ধান ধার দিলে একবছরেই দেড়া হয়ে ফিরে আসবে।

তবে?

আমি বলছিলাম পিসিমারা গয়নাগুলো দিন না। কিছুতো সাহায্য হবে। আর কাদার গাঁথনি ক'রে—তাতে খরচও কম হবে; বাকি যা লাগবে সে যা হোক করে দোব আমরা।

গহনাই বা কি? মরা-সোনার কয়েকখানা পদ—কাঁকনি, বাজু, গলার মুড়কি মালা—এই মাত্র; সমস্ত বিক্রয় করিয়াও শ-চারেক টাকা হইলনা। কুড়ি টাকা কম থাকিয়া গেল। তবুও তাহারই শোকে বিধবা দুইটি গোপনে ঘরের মেঝে ভিজাইয়া তুলিল।

থাক সে কথা। দেব পঞ্চানন পঞ্চমুত্তিতে তো প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাঁজা পাকা বন্দোবস্ত করিলেন, পাঁচ বিঘা নিষ্কর জমি দেবোত্তর করিয়া গ্রামের নবাগত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর ঘোষালকে অর্পণ করিয়া পূজক নিযুক্ত করিলেন। হরিহর ঘোষাল বংশানুক্রমে ফুল-বিল্বপত্র, আতপ ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে বাধ্য থাকিবে। ঘোষাল শুধু পাঁজাকেই দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলনা, সে পঞ্চরুদ্রের পদতলেও লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, জয় আশুতোষ। তুমিই আমার অন্নদাতা, তুমিই আমার ঈশ্বর।

সে পরম ভক্তি সহকারে পূজা আরম্ভ করিল।

বিধবা ভগ্নী দুইটি নিত্য প্রণাম করে। গাওয়া ঘি আনিয়া শিবের অঙ্গে মাখাইয়া দেয়, চন্দন লেপন করে। পাঁজাও নিত্য প্রণাম করিয়া যান, বাড়িতে কলা পাকিলে পাঁচটি শিবের জন্য আসে, জমিতে শসা ধরিলে শিবেরা পাইয়া

থাকেন, প্রতি সন্ধ্যায় ছটাক খানেক করিয়া পাঁচ ছটাক দুধও পঞ্চরুদ্র পাইয়া থাকেন।

খাইয়া মাখিয়া পঞ্চজনে বেশ চিকন হইয়া উঠিলেন।

রাত্রে মধ্যবর্ত্তী রামরতনের শিব রত্নেশ্বর রুদ্র বলিলেন, বলি কেমন লাগছে হে কমলেশ্বর?

গিন্নী কমলার শিব কমলেশ্বর বলেন, আঃ বুড়ো বয়সে রস দেখ! রাত-দুপুরে এমন আরামের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছ।

ডান পাশ হইতে বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলেন, মরণ তোমার! রসের আবার বয়েস আছে নাকি? আছি বেশ। আমার তো ভুঁড়িটা বাড়ছে দিন দিন।

একেবারে এপাশ হতে ত্রলোকেশীশ্বর বলেন, মাথার জটাগুলো কালো হয়ে উঠল হে, ঘি খেয়ে আর মেখে! গায়ের কাটগুলো একেবারে ম'রে গেছে। বেঁচেছি হে, শরীর আর চড় চড় করেনা।

একেবারে ও পাশ হতে মুক্তকেশীশ্বর বলেন, সন্ধ্যাবেলায় দুধটি খেয়ে মাথার গোলমালটা আমার একবারেই কেটে গেছে। আর গাঁজার মুখে দুধটি যা লাগে, আহা—হা!

এবার বিমলেশ্বর বলেন, কই, তোমার কথা তো কিছু বললে না রত্নেশ্বর?

রত্নেশ্বর বলেন, সুখ সবই। তবে একটি দুঃখ আমার আছে। চন্দন যখন মাখি তখন গৌরীকে মনে পড়ে যায়।

অকস্মাৎ কমলেশ্বর ফোঁস করিয়া উঠেন, আ মরণ তোমার!

পঞ্চান্ন বৎসর পর।

কালপ্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তণ হইয়াছে। পাঁজা মহাশয় নাই, কমলা বিমলা, এলোকেশী মুক্তকেশীও নাই। শুধু ইহারা কেন, সমগ্র পাঁজা পরিবারই আজ ছত্রভঙ্গ; পাঁজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা একটা প্রকাণ্ড মাটির ঢিপিতে পরিনত হইয়াছে। রামরতন হইতে তৃতীয় পুরুষের প্রথমেই পাঁজা বংশ মহাপ্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরী গিয়া মোক্ষ লাভ করিল। সম্পত্তি গিয়া আসিল পাঁজাদের দৌহিত্র বংশে। তাহাদের বাসও নিকটেই, পাশের গ্রামে। হরিহর ঘোষালও গত হইয়াছে, তাহার পর তাহার পুত্রেরাও বিগত, এখন আছে তিন পৌত্র। এক পৌত্র গিরীন ঘোষাল, সে করে জমিদারী সেরেস্তারা গমস্তাগিরি এক পৌত্র মহীন ঘোষাল, সে করে গুরুগিরি; অপর পৌত্র মনীন্দ্র ঘোষাল, সে খানিকটা জড়তা ব্যাধি-যুক্ত, বুদ্ধির জড়তাও আছে, জিহ্বার জড়তা হেতু কথাও বেশ পরিস্কার উচ্চারণ করিতে

পারে না। সে-ই এখন পঞ্চরুদ্রের পূজা করে। বলা বাহুল্য, তিন জনেই পৃথগন্ন, মনীন্দ্রের ভাগেই পঞ্চবিঘা জমির সহিত পঞ্চরুদ্র পড়িয়াছেন।

কাদার গাঁথুনির মন্দিরগুলিতে পঞ্চান্ন বৎসরেই ফাট ধরিয়াছে, চারিপাশের রোয়াকগুলি তো নিঃশেষে বিলুপ্ত, ইঁটগুলির পর্য্যন্ত চিহ্ন নাই। বহুদিন পর্য্যন্ত ইঁটগুলি আশেপাশে রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াই ছিল সে, হরিহর ঘোষালের পুত্র-দ্বয়ের জীবিত কালের ঘটনা। ঘোষালদের তখন উন্নতির মুখ, ঘোষালের দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া নবান্ন উপলক্ষ্যে অন্নপূর্ণা পূজা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিল। প্রথম বৎসর পূজার শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর দিবসই অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহ-নির্মাণের জন্য বনিয়াদ খোঁড়া হইল।

বড় ভাই বলিল, ভালই হল, বাহিরে বসবার দাঁড়াবার একটা জায়গা হ'ল। পূজো তো বছরে দুদিন।

ছোট ভাই সায় দিয়া বলিল, এ আমার বহুদিনের সাধ দাদা। দত্তদের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে যাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলে ছোটলোক বেটারা। ওদের ওখানকার আড্ডা এইবার ভাঙব, দাড়াও।

বড় ভাই বলিল, তবে এক কাজ কর, দু-কুঠুরির ঘর হোক। পূজোর ঘরটা বড়, ওইটাতে সব বসবি দাঁড়াবি, আর পাশে একখানা ছোটঘর, ও-খানাতে আমি আপনার সেরেস্তার কাগজপত্র রাখব, সাধন ভজন করব।

সাধন ভজন অর্থে অনেক কিছু, কিন্তু সে থাক। ঘর হইয়া গেল, ছোট বলিল দাদা, মেঝেটা কোন রকমে বাঁধিয়ে ফেল। খরচতো কিছু করতে হয়নি। তোমার গমস্তাগিরির কল্যাণে কাঠকুঠো বাঁশ মায় খড় পয্যন্ত বাবুদের মহাল থেকে এল। কিছু খরচ কর।

বড় ভাই বলিল আচ্ছা।

পরদিনই দেখা গেল, মজুর লাগিয়া ঝুড়িতে বহিয়া পঞ্চরুদ্রতলার রোয়াক-ভাঙা ইঁট ঘোষালদের বাড়ীর দিকে লইয়া চলিয়াছে।

রাত্রে কমলেশ্বর বলিলেন, দেখছ ঘোষাল বেটাদের কাণ্ড।

বিমলেশ্বর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু অন্নপূর্ণার মন্দিরের জন্য নিয়ে যাচ্ছে যে।

রত্নেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা এলে তো বাঁচি। খাওয়াদাওয়ার বড়ই অসুবিধে হচ্ছে হে।—আতপ বড্ড কমিয়ে দিয়েছে। জলতো কুশীতে ক'রে এতটুকু। ঘি চন্দন তো দেয়ই না। গা-হাত-পা এমন চড় চড় করছে।

এলোকেশীশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার পাশেই একটা সার ডোবা করেছে ঘোষালেরা। গন্ধে তো আর বাঁচি না।

মুক্তকেশীশ্বর চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ঘরের কোনের ফাটলে বিছুটির গাছ হয়েছে, লতাটা এসে গায়ে জড়িয়েছে, অহরহ জ্বালাতে আমি জ্বলে মলাম! ওঃ এর চেয়ে সাপের জ্বালা ভাল।

রত্নেশ্বর কটমট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, তবে একবার উঠব নাকি? বিমলেশ্বর বলিলেন, অন্নপূর্ণা সবে এল, ওরাই অন্নপূর্ণাকে আনলে, এখন কি অরসিকের মত কাজ করা ঠিক হবে?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা ক'রেই মল!

এখন মনীন্দ্র ঘোষাল পঞ্চরুদ্রের সেবক।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সে একটা ঘটিতে জল, একটা ঠোঙাতে একমুঠা আতপ ও কতকগুলা বেলপাতা লইয়া আসিয়া মন্দিরের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। কিন্তু কি যে সে বলে তা সেই জানে, ভাষাটা সংস্কৃত, কি চীনে, কি পুস্তু, কি হনোলুলুর ভাষ্য—বোঝা যায় না। কিন্তু চীৎকার সে করে খুব।

তবে একটা কাজ সে করিয়াছে, মুক্তকেশীশ্বরের অঙ্গের বিছুটি সে ঘুচাইয়াছে। একদিন বিছুটি তাহার গায়েই লাগিয়াছিল। মুক্তকেশীশ্বর তো মনীন্দ্রের উপর মহা সন্তুষ্ট, চায় না তাই, চাহিলে বোধ করি পৃথিবীর সাম্রাজ্যই তাহাকে দান করিতে পারেন।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, আচ্ছা কি মন্ত্র ও ব'লে বলতো? মুক্তকেশীশ্বর বলেন, যাই বলুক, ভক্তি ওর খুব। ওকে কিছু দিতে হবে।

কিন্তু তাঁহারা দিবার পূর্ব্বে একদিন মনীন্দ্র নিজেই তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া বসিল। একদিন গভীর রাত্রে সে পঞ্চরুদ্রের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ঠক করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কিছু মনে ক'র না বাবারা। ঘরের জানলা হচ্চে না আমার।

রত্নেশ্বর অবাক হইয়া বলিলেন, কি বলে হে?

ততক্ষণে মনীন্দ্র এলোকেশীশ্বরের মন্দিরের দরজার দুইপাট খুলিয়া লইয়া কাঁধে চাপাইয়াছে। ক্রমে বিমলেশ্বর, রত্নেশ্বর, কমলেশ্বর, মুক্তকেশীশ্বর সকলের দরজাই সে একে একে খুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

রত্নেশ্বর বলিলেন এ কি রকম হল?

বিমলেশ্বর বলিলেন, যা হোল তাই হোক গে। কিন্তু বসন্তের হাওয়াটি কেমন দিচ্ছে বল তো?

রত্নেশ্বর বলিলেন, যা বলেছ! শরীরটে যেন জুড়িয়ে গেল! অন্নপূর্ণাকে ডেকে একটু গল্প করলে হয় না?

কমলেশ্বর বলিয়া উঠিলেন আমি উঠে যাব কিন্তু।

দুঃখিত হইয়াছিলেন এলোকেশীশ্বর, সার-ডোবার গন্ধটা মুক্তদ্বার পথে অত্যুগ্র হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

মুক্তকেশীশ্বর খুশি হইয়া ভাবিতেছিলেন, যাক, কিছু পেলে বেচারা। কিন্তু সামান্য ঐ কয়জোড়া দরজা লইয়া মনীন্দ্র সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলনা। প্রত্যহ রাত্রে গ্রাম নিশুতি হইলে সে একটা ঝুড়ি ও একটা শাবল লইয়া আসিয়া মন্দিরের পিছন দিকের ভাঙা ভিতে শাবল চালাইয়া ইঁট বাহির করিয়া নিয়মিত দুই চার ঝুড়ি করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। তাহার ঘরের মেঝে বাঁধাইতে হইবে।

আর রুদ্রদেবতার সহ্য হইলনা। অকস্মাৎ একদিন মাথা নাড়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মনীন্দ্রের কোন ক্ষতি হইল না, রুদ্রদেবতাদের মস্তকান্দোলনে মন্দিরগুলিই শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মন্দির পতনের ফলে রুদ্রদেবতার রোষে মারা গেল গোটা দুই ছাগল, সার ডোবার মধ্যে একটা ঢোঁড়া সাপ আর বহু কীট পতঙ্গ একটা মুচিদের মেয়ে মন্দিরের পিছনে পতিত জায়গাটায় বুনো শাক তুলিতেছিল, একটা ইঁট ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ে লাগিল, সে খানিকটা জখম হইল।

মন্দির পতনের শব্দে বহুলোক আসিয়া জমা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মনীন্দ্রও ছিল, সে বিপুল পুলকে উচ্ছসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ডয় বিঠ্যনাট। অর্থাৎ জয় বিশ্বনাথ।

বহুক্ষণ পর রত্নেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, বলি ওহে, শুনছ সব? কমলেশ্বর ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, শুনছ সব? কেমন, বার বার বললাম, ক্ষ্যাপামি ক'র না, তুমিই তো ক্ষ্যাপালে সব।

বিমলেশ্বর বলিলেন, উঃ, ভাগ্যিস জটার বোঝাটা বেশ মোটা হয়ে আছে, তাই তো রক্ষে। নইলে মাথা আর কারু থাকত না।

এলোকেশীশ্বর বলিলেন, আমার হাতে বড্ড লেগেছে।

মুক্তকেশীশ্বর বলিলেন, এ যে ইঁট চাপা পড়ে দম বন্ধ হয়ে গেল।

রত্নেশ্বর বলিলেন কুম্ভক করে ব'স।

পঞ্চরুদ্র কুম্ভক করিয়া বসিলেন। ভাগ্য ভাল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই এ অবস্থার অবসান হইল। ইঁট সমান অংশে ভাগ করিয়া কিছু লইল মনীন্দ্র, কিছু লইল মহীন্দ্র, কিছু লইল গিরীন্দ্র। গ্রামের লোকে আসিয়া ধরিল, রাস্তার ওই সাঁকোটার জন্য আমরা কিছু নেব।

তাহারাও কিছু লইল। মহীন্দ্র ড্রেনটা পাকা করিয়া ফেলিল, গিরীন্দ্রের

ভাগের ইঁটগুলি লইয়া গেল চাষাদের মেয়ে সত্য-দাসী। সে তাহার ঘরের মেঝেটা বাঁধাইয়া ফেলিল। গিরীন্দ্র রোজ সন্ধ্যায় সেখানে যায়, গল্প করে, তামাক খায়, আসিবার সময় সত্য-দাসী এক বাটি ঘনাবর্ত্ত দুধ না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

*　　*　　*　　*　　*

আরও পনেরো বৎসর পর।

মনীন্দ্র কৈলাসে গিয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র জীবনকৃষ্ণ এখন রুদ্র-দেবতার সেবক। পঞ্চরুদ্র এখন উন্মুক্ত আকাশের তলে রৌদ্র বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম মাথায় করিয়া বোধ করি যোগমগ্ন। কষ্টি পাথরের নিকষ কাল রঙের উপর ধূলা পড়িয়া পড়িয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আশে পাশে ইঁট চূনের কোন চিহ্ন নাই এক-একটা মাটির টিপির উপর কেহ কাৎ হইয়াা, কেহ ঈষৎ হেলিয়া, কেহ বা কোন রূপে সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। বিমলেশ্বর তো একেবারে শুইয়া পড়িয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ স্নান করিয়া কতকগুলো বেলপাতা তুলিয়া লয়, সিক্ত বস্ত্রেই পথে দাঁড়াইয়া বেলপাতা ছুড়িয়া দেয়, নমঃ শিবায় নমঃ। গামছার খুঁটে অর্দ্ধমুষ্টি অপেক্ষাও কম আতপ চাউলের খুদ বাঁধা থাকে। তাহাই চারিটি করিয়া ছিটাইয়া দিয়া আসে। এক এক রুদ্রের ভাগে পড়ে গুটি বিশ পঁচিশেক আতপকনা।

জীবন একদিকে পূজা করিয়া যায়, আর একদিক হইতে কয়টা ছাগল সেগুলি খাইতে খাইতে আসে। জীবনের পূজার সময় তাহাদের যেন মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ছাগলের বাচ্চাগুলা আবার লাফাইয়া রুদ্রদেবতার মাথায় চড়িয়া নাচে।

আরও নাচে কয়েকটি ছেলে, গিরীনের ছেলে তাহাদের মুখপাত্র। তাহারা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এক এক জন এক এক রুদ্রের ঘাড়ে চাপিয়া ভাঙা ডাল দিয়া দেবতাকে পিটিতে পিটিতে বলে, চল চল, হেট হেট।

কাহারও চোখে পড়িলে সে ধমক দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয়। নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ কিন্তু দেখিলেও কিছু বলে না। সে মনে মনে রুদ্রদেবতাকে নিবেদন করে, নাও বাবা রুদ্রদেব, নাও বেটাদের! নিব্বংশ হোক সব!

দয়াময় আশুতোষ কিন্তু শিশুর অপরাধ গ্রহণ করেন না। জীবন মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলে, শিব না কচু! সেদিন সে বেলপাতার পরিবর্ত্তে আগাছার পাতা ছিটাইয়া দেয়।

ছেলেদের কাণ্ডটা একদিন চোখে পড়িল গিরীনের। সে শিহরিয়া উঠিয়া নিজের ছেলে লক্ষ্মণকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিল, ঠাকুর! দেবতা! ও করলে পাপ হয়। বাবারে! ঠাকুরকে পেন্নাম করতে হয়।

লক্ষ্মণ উৎসাহের সহিত বলিল, পূজো করব তবে, বেশ বাবা।

হ্যাঁ, পূজো করতে হয়।

শালুক ডাঁটা তুলে এনে বলিদান দোব, বেশ বাবা।

আচ্ছা, তাই দিও বরং।

আর বেসজ্জন?

গিরীন চমকিয়া উঠিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিল। তারপর একবার চাহিল নিজের বাড়ীর দিকে। সদর রাস্তা হইতে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত একটা গাড়ির রাস্তার বড় অভাব, ধান তুলিতে অসুবিধার অন্ত থাকে না। পথ জুড়িয়া বসিয়া আছেন পঞ্চরুদ্র। মোড়ের ওই দুইটা যদি—

অসহিষ্ণু লক্ষণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল বেসজ্জন করব না বাবা?

চুপি চুপি গিরীন বলিল, দিস্ করে। এই দেখ্, এই পাশের দুটো বুঝলি? ভত্তি দুপুর বেলা দিস্; নইলে লোকে বকবে।

দিন দুয়েক পরেই পঞ্চদশ নেত্র পঞ্চবক্র মাত্র নবনেত্র ত্রিবক্র হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুক্তকেশীশ্বর এবং কমলেশ্বর শীতল জলশয়ানে শুইয়া ভাবিলেন, 'প্রলয় পয়ধি জলে' তো মন্দ নয়, শরীরতো বেশ জুড়াইয়া গেল। জীবনকৃষ্ণও উচ্চবাচ্য করিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে পাঁচ বিঘা নিস্কর জমির দুই বিঘা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তাহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কাঁদিল শুধু বেনেবুড়ী। রোজ সকাল সন্ধ্যায় সে পঞ্চরুদ্রকে প্রণাম করিয়া যাইত। সেদিন সন্ধ্যায় সে পঞ্চদেবতার স্থলে তিনজনকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কি অপরাধ করলাম বাবা? রোজ পাঁচটি করে পেন্নাম করতাম, দুটি করে যে আমার বাকী থেকে যাবে বাবা!

জীবন একদিন রাত্রে এলোকেশীশ্বরকে নিজেই একটা পুকুরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তাহার আরও টাকার প্রয়োজন।

*   *   *   *   *

আরও বৎসর পঁচিশেক পর।

রত্নেশ্বর আর বিমলেশ্বর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার মতন অভিশাপ আর নাই।

জীবনকৃষ্ণ এখন বৃদ্ধ, সে-ই এখনও পূজো করে, বেলপাতা ছিটাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, গতি কর পরমেশ্বর।

দুই রুদ্র আশীর্ব্বাদ করেন, মৃত্যুঞ্জয় হও, অমর হও তুমি।

তবে রুদ্রদেবদ্বয়ের এই অবস্থার মধ্যেও হঠাৎ একটা সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে,

এক পরম ভক্ত জুটিয়াছে। গিরীনের ভাই মহীন, তাহারই এক পৌত্র। সে রুদ্রদেবতার মহাভক্ত। সে চুল রাখিয়াছে, দাঁড়িগোঁফ রাখিয়াছে, গাঁজা খায়, পারদ এবং লতাপাতা লইয়া সে তামা হইতে সোনা প্রস্তুত করে, সে-ই আসিয়া গভীর রাত্রে দুই রুদ্রের সম্মুখে চোখ বুঝিয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে গাঁজা সাজে, রুদ্র-দেবতাদের ভোগ দেয় ; তারপর নিজে প্রসাদ খায়।

মধ্যে মধ্যে রত্নেশ্বর বলেন, দেখ, কিসের পর কি হয়, সে কি বলা যায় ? গাঁজাটা কিন্তু ছোকরা বানায় ভাল হে।

বিমলেশ্বর বলেন, বম্ বম্ বম্ হরি হরি হরি হরি।

রত্নেশ্বর ও গাল বাজান, বম্ বম্ বম্।

অকস্মাৎ একদিন পঞ্চরুদ্র তলায় তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। গিরীনের পুত্র সেই লক্ষ্মণের সহিত তাহার ভ্রাতা রামদাসের বিবাদ বাধিল। নিতান্ত অকারনে ঝগড়া—দুই বউয়ের ঝগড়া ক্রমশঃ বিপুলতর হইয়া ভাগা-ভাগির ঝগড়ায় পরিনত হইয়াছে। এখন ঝগড়া সেই রাস্তাটা লইয়া ; মূল বাড়িটা এখন লক্ষ্মণের ভাগে পড়িয়াছে, রামদাসের বাড়ীটা লক্ষ্মণের বাড়ী পার হইয়া যাইতে হইবে। লক্ষ্মণ বলিতেছে এ রাস্তা তোমার নয় আমার।

রামদাস বলে, বাঃ, এ রাস্তা তো পৈতৃক।

পৈতৃক তো এই আমার বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত। তারপর এ জায়গাটা তো আমার। এ জায়গার ওপর দিয়ে তোমাকে রাস্তা কেন দোব হে ? তুমি কি আমার পীর নাকি ? ওঃ বলে যে সেই, গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে!

পাঁচজন গ্রামের লোকও আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারাও লক্ষ্মণকে সমর্থন করিয়া বলিল, সে একশো-বার। যতটুকু পৈতৃক রাস্তা ততটুকু সাজার বটে। কিন্তু তারপর ওর নিজের জায়গা যদি ও না দেয় ?

রামদাস বলিল, বেশ, ও জায়গাটা আমার সঙ্গে বদল করুক।

লক্ষ্মণ বলিল তা যদি আমি না করি ?

শেষ পর্য্যন্ত রামদাস বলিল, আচ্ছা, রাস্তা ভগবান আমাকে দেবেন।

গভীর রাত্রি।

রামদাস চুপি চুপি রুদ্রতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ওই শিব দুইটাকে সরাইতে হইবে। সে ওই দিক দিয়া রাস্তা বাহির করিবে। মালকোচা মারিয়া কাপড় আঁটিয়া আসিয়াই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একি, কে ? ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, নিথর মুর্ত্তি। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পরক্ষণেই আলোক জলিয়া উঠিল। পাগল দেশলাই জালিয়া গাঁজার

জন্য টিকা ধরাইতেছিল। মূহুর্ত্তে রামদাস ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়া গেল। হারামজাদা, গেঁজেল, শূয়ার, পাজী, ছুঁচো!

সে দুম্‌দাম্‌ করিয়া কিল্‌ চড় লাথি মারিয়া পাগলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পাগল কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মার খাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

রামদাস একটু হাসিল। তারপর প্রথমেই বিমলেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিয়া সে একটু চিন্তা করিয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া রত্নেশ্বরকে ঘাড়ে তুলিল।

পরদিন জীবনকৃষ্ণ দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে পাঁচ বিঘার বাকী দুই বিঘার খরিদ্দার খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

* * * * *

পরদিন রামদাস রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। জীবনকৃষ্ণ আসিয়া বাধা দিল। সে বলিল, আমি পুলিশে খবর দেব। তুমিই শিব কোথায় ফেলে দিয়েছ। নইলে আমাকে কিছু দাও।

রামদাস মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল, আর বাকী তিনটে? আর জমিগুলো যে বেচে খেলি, সে জমি আন।

জীবন ভড়কাইয়া গেল।

ইতিমধ্যে গোবিন্দ ঘোষ সটান পাশের গ্রামে গিয়া বাঁড়ুজ্জ্যে বাবুদের নিকট হাজির হইল, বলিল, জায়গা তো আপনাদের ধরুন পাঁচটা মন্দির, প্রত্যেক মন্দিরের মেঝে চার হাত, দেওয়াল দু'হাত, আর বারান্দা তাও এক একপাশে দু'হাত করে চার হাত, একুনে দশ হাত, এই পাঁচ-দশে পঞ্চাশ হাত লম্বা, আর হাত দশেক চওড়া, এ জায়গাটাতো আপনাদের বটেই, ওটা বন্দোবস্ত করলে মোটা টাকা হবে আপনাদের।

বাঁড়ুজ্জ্যে বাবুরাই এখন পাঁজাদের সম্পত্তির মালিক, তাহাদের দৌহিত্রদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহারা নিলামে খরিদ করিয়াছেন। বাবুরা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়।

ঘোষ বলিল আমিই একশো টাকা দোব। আজই লেখাপড়া করে দিন, দখল দিয়ে দিন, সঙ্গে সঙ্গে টাকা।

বাবুরা বলিলেন আন কাগজ।

লেখাপড়া হইয়া গেল। ঘোষ বলিল, দখল দিয়ে দিন।

আচ্ছা, কালই আমাদের লোক যাবে। আর নায়েববাবু জীবন ঘোষালকে একবার ডেকে পাঠান তো।

জীবন আসিতেই বাবুরা সেই পাঁচ বিঘা জমি দাবি করিয়া বলিলেন, জমি

বেচেছ, টাকা ফেল, নইলে নালিশ করে তোমাকে জেলে দোব। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এই কাণ্ড। রামদাসকেও ছাড়ব না। লক্ষ্মণের ওই পথ বন্ধ করব।

জীবন যেন অগাধ জলে পড়িল। সে আসিয়া রামদাসকে বলিল, বাবুরা বলেছে, 'জায়গা তো দখল করবই, তা ছাড়া রামদাসকে আর তোমাকে জেলে দোব। লক্ষ্মণের ও পথ বন্ধ করব।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে যাদুমন্ত্রে ঘোষাল বাড়ীর সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া গেল। তাহারা বলিল, আরে মামলা তো সাক্ষীর মুখে। সে দেখা যাবে। এখন লাঠি ঠিক করে রাখ, দেখব কেমন করে কাল জায়গা দখল করে।

* * * * *

সন্ধ্যায় বেনেবুড়ী কাঁদিয়া ফিরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে পাগল শূন্য রুদ্রতলায় হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠিল। তারপর বড় পুকুরটায় সে আসিয়া নামিল।

হ্যাঁ, এই খানেই তো! এই তো! আর একটি কোথায় গেল? আরে, আরে, অই, এ যে অনেক! গাজনের ভক্তরা তো বলে শিবের বাচ্চা হয়।

* * * * *

পরদিন প্রাতঃকালেই পঞ্চরুদ্রতলায় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে বাঁড়ুজ্জ্যে বাবুদের বরকন্দাজ দল, অপরদিকে ঘোষালেরা সবংশে, চারিদিকে বিস্মিত জনতা, মধ্যে পঞ্চরুদ্রতলায় সারি পঞ্চরুদ্র বিরাজমান। সমস্ত জনতা নির্ব্বাক। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বেনেবুড়ী জনতা ঠেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, আঃ বাবা! ছলনাময় যে তোমাকে বলে তা মিথ্যা নয়। ফিরে আসতে পারলে বাবা! সম্মুখে আসিয়া সে ঠক্ ঠক্ করিয়া পাঁচটা প্রণাম করিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পঞ্চরুদ্রতলা বাবা, পেন্নাম কর, সব পেন্নাম কর।

পাগল দূরে একটা গাছতলায় বসিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছিল।

যুগ পরিবর্ত্তন

অশোক চট্টোপাধ্যায়

(১৮৯৮)

প্রথম দৃশ্য

আবেগ জিনিষটা বড় গোলমেলে। সকল কাজের সিদ্ধির মূলেও আবেগ, আবার সকল কাজে ব্যাঘাত দিতেও ঐ আবেগই রহিয়াছে। কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাঠক বা শ্রোতা মহলে খ্যাতি লাভের একমাত্র উপায় তাহার মূলগত আবেগটাকে টানিয়া প্রকাশ্যে বাহির করিয়া দেখান, আবার কোন বিষয় গোপন করিবার অথবা অপরকে ভুল বুঝাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সেই আবেগটাকেই মুখোস পরাইয়া লুকাইয়া বা বাঁকা করিয়া দেখাইয়া সে উদ্দেশ্য সফল করাই পন্থা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সমস্ত সৃষ্টিটার মূলে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাণের বা সৃষ্টির আবেগ নিহিত রহিয়াছে, আবার সৃষ্টি নষ্ট করারও মূলে রহিয়াছে সংহারের তাড়না। যে আবেগ প্রেমে সফলতা আনয়ন করে তাহাই ব্যবসাতে মানুষকে দেউলিয়া করে, যে প্রেরণায় মানুষ শ্রেষ্ঠ 'গেরস্ত' রূপে সমাজে পরিচিত হয় সেই প্রেরণাতেই সে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া চির অখ্যাতিভাজন হয়। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানালোচনা করিয়া সজ্ঞমনের আবেগ আলোড়ন করিয়া আমরা স্বরাজ্য-পার্টির উত্থান বা মডারেটের পতনের যথার্থ ব্যাখান করিতে পারি, আবার কোন বিষয় ধামাচাপা দিতে হইলেও সেই সজ্ঞমনের আবেগটাকে মোচড় দিয়া তেরছা করিয়া দেখাইয়া সে কার্য্য সাধন করিতে পারি। বস্তুত এই আবেগের ব্যাপারটা একাধারে সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটক, সকল রহস্যের কারণ, সকল অকৃতকার্য্যতা বা সফলতার মূল, সর্ব্ব বিষয়ে সত্য ও মিথ্যা। এ হেন নির্গুণ আবেগের আরাধনা করিয়া গল্পের সূচনা করি।

*　　　　*　　　　*

সকালবেলা চা খাইতে বসিয়া সবে বিস্কুটে এক কামড় ও পেয়ালার দ্বিতীয় চুমুক মাত্র দিয়াছি এমন সময় বাহিরে ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তৎপরে দুমদাম শব্দ, হনন-মত্ত সেনানীর হিংস্র সিংহনাদ ও হতাহতের মরণ-কাতর-আর্ত্তনাদ! ভয়ে চায়ের ঢোক পাকস্থলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া ফুসফুসের দরজায় আসিয়া হানা দিল। কাশিতে কাশিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে শয্যা হইতে লেপখানা তুলিয়া লইলাম, শরীরে জড়াইলাম, দ্রুত গড়াইয়া পালঙ্কের নিম্নে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। যখন

জ্ঞান হইল, দেখিলাম আধো অন্ধকার আধো আলো। ভাবিলাম, তাইতো সন্ধ্যা হইল না কি? কোন প্রকারে মূর্চ্ছাকাতর লেপজড়িত আড়ষ্ট দেহটিকে নাড়া দিয়া ঈষৎ সজাগ করিয়া পালঙ্কের অধোদেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম ঘরের সকল আসবাবপত্র মায় চা ও বিস্কুট যথাস্থানে মোতায়েন রহিয়াছে। বাহিরে রাস্তায় গোলমাল নাই বলিলেই চলে। ঝাঁটা ও বুরুশ চালনা এবং দু একখানা ময়লা গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি ব্যতীত চরাচর শব্দহীন। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া ভারতীয় কায়দায় কারুকার্য্য করা রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রীটে ঢালা অলিন্দে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম সন্ধ্যা নহে, ঊষা। পূর্ব্বে লালের আভা, বারান্দার রেলিংএ প্রভাতী শিশিরের আর্দ্র সম্ভাষণ। কিন্তু একি? পূর্ব্ব গগনের সে লালকে যেন মুখ ভ্যাঙাইয়া অদূরের সরকারী খাজাঞ্চিখানার শীর্ষ হইতে একটা উৎকট রক্তবর্ণ পতাকা পতপত নিনাদে ভোরের হাওয়ার সহিত কলহ করিতেছে। আশ্চর্য্য হইলাম! কাল ঐ অট্টালিকা-শীর্ষে মহাত্মা গান্ধীপ্রণোদিত চরখাবহ ত্রিবর্ণ পতাকা জগতবাসীকে ভারতের অহিংসা-ডিগনিটি-অফ-লেবার-রাক্ষুসে-কারখানা-বাদ-বর্জ্জন প্রভৃতি কত কথা মৃদু ভাষে জানাইতে ছিল—আজ আবার এ কি উৎপাত। এ তো জাতীয় নব জাগরণের নূতন আশার সূর্য্যের আলো বিকিরণ করিতেছে না, এ যেন পশ্চিমের অস্তগামী তপনের বার্দ্ধক্যজটিল লালসার দেহে অস্ত্র সাহায্যে 'মঙ্কি গ্ল্যাণ্ড' বসান নকল যৌবনের লালিমা।

প্রাণে আতঙ্ক অথচ আত্মাপুরুষ কুতূহল-জর্জ্জরিত। 'যায় প্রাণ যাক' বলিয়া বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিতে চলিলাম ব্যাপারটা কি ও কত দূর গড়াইয়াছে। মার্ব্বেল বাঁধান সিঁড়ি বাহিয়া, অজন্তার অনুকরণে চিত্রিত করিডর অতিক্রম করিয়া, তিব্বতী মঠের নকলে উৎকীর্ণ কাষ্ঠে গড়া দরজা খুলিয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমেই কানে আসিয়া পশিল—বুরুশের খস্‌খস্‌ আওয়াজ ও তৎসঙ্গে মিহি গলায় স-দরদে রবীন্দ্রনাথের—

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি—

ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ। ধাঙ্গড়ের সঙ্গে বুরুষের তালে তালে এ গান কে গায়? এ আবার ফ্রয়েডীয় যাদুঘরের কোন্ কমপ্লেক্স? পুষ্পে ও পুরীষে মিলন, মানব প্রাণের কোন জটপড়া আবেগের ফলে এ অঘটন-ঘটন সম্ভব হইল?

গানটা ক্রমে নিকট হইতে আরও নিকটে আসিতে লাগিল; বুরুষের শব্দও নিখুঁত কাওয়ালিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি আশা করিতে লাগিলাম যে আজ বোধ হয় ধাঙ্গড় মহাশয় নিজে কাজে বাহির না হইয়া নিজ পরিবারের

অপর কাহাকেও প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন; তাই প্রাতে বুরুষ প্রান্তে এ তরুণ সমাগম।

কিন্তু যখন বুরুষ-চালককে দেখিলাম তখন নিমিষেই আমার সে কষ্টকল্পিত রোম্যান্স অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিলাম বুরুষ-চালক ও গায়ক একই লোক। চুড়িদার পাঞ্জাবি পরিহিত সুবিন্যস্ত কেশ এক যুবা, বুরুষ ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছে—ড্রেনের গন্ধকে তাহার প্রাণের কল্পনা কুসুমের প্রভাতী আহ্বান অগ্রাহ্য করিতেছে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

যুবক কিছু ময়লা সংগ্রহ করিয়া টিনের আধারে সযত্নে তুলিয়া অদূরস্থিত হুইলব্যারোতে রাখিল। গাহিল—

হ'ল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান গাওয়া—

আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, "ও মশায়, বলি শুনছেন? সকাল বেলা সুর ভাঁজবার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক কি আর ভাল কিছু পেলেন না? তাই সখের ধাঙ্গড় সেজে নর্দ্দমাতে 'প্রথম ফুলের প্রসাদ' খুঁজে বেড়াচ্ছেন?"

যুবক একটা অবাধ গতিশীল ভঙ্গীতে ঘাড়খানা অল্প ফিরাইয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কমরেড, কর্ম্মক্লান্তির আবেশের মধ্যে যে পুষ্পের সৌরভ লুকান আছে, তার কাছে মধ্যযুগের বেগম-মহলের গুলবাগের খোসবয় কিছুই না।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, ভালবেসে যা করেন তাতেই আনন্দ, আর আনন্দ থাকলেই সৌরভ এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমায় যে প্রিয় সম্ভাষণটা করলেন ওটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না।"

যুবক মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখে, বললাম 'কমরেড' অর্থাৎ কি না বন্ধু। দুনিয়ার যেখানে যেখানে যে কোণে মানুষের ছেলে খেটে খাচ্ছে, শক্ত হাতে কপাল থেকে খাটুনির ঘাম মুছে ফেলছে, সেখানের হাওয়াতে একটা নতুন ফুল আপনা হ'তে ফুটে উঠেছে—বন্ধুত্বের ফুল—সহকর্ম্মের সৌরভ তার প্রাণে, সাহচর্য্যের রঙে সে ফুল রঙীন—সহস্রদলের মতই তার পাপড়ি আকারে বিভিন্ন কিন্তু পরিপূর্ণ শক্তি, প্রাণ, সৌন্দর্য্য ও সমগ্রের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে মূল্যে এক অর্থাৎ বহু বিভিন্ন মানবে বহু ক্ষেত্রের শ্রমের মধ্যে এই পুষ্পের বিকাশ এবং আকার ও কর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যেও সকল শ্রমিকের সম্মান ও প্রয়োজনীয়তা সমান।"

কি যেন একটা আবেগ আমার প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। রুসো, টলষ্টয়, মার্কস, ক্রপট্‌কিন, লেনিন প্রভৃতি মহা মহা পুরুষের বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। কর্ম্মের মধ্যে সাম্যের অমরত্ব যেন

আমায় পূজায় ডাকিতে লাগিল। যে ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া আমার শত পূর্ব্ব পুরুষকে কর্ম্ম-ক্ষয়ের মধ্যে নিব্বাণ ও নির্ব্বাণের মধ্যে সর্ব্ব জীবের মুক্তি ও মুক্তির মধ্যে মিলন দেখাইয়া আসিয়াছে, সে বুদ্ধ যেন আজ চঞ্চল হইয়া কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি হস্তে নিজ ভ্রম সংশোধনে মাতিয়া উঠিল। যেন আফিমের সম্মোহন বাণ ব্যর্থ করিয়া মদিরার উদ্দাম নেশায় নূতন করিয়া প্রাণ মৃত্যুর পথ খুঁজিতে লাগিল। বুকের রক্ত হিমের আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া বন্যায় জাগিয়া উঠিল। উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া বলিলাম, "ঠিক বলেছ বন্ধু, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমায় বল, আজ হঠাৎ ভারতের জড় অস্তিত্বের তুষারার্দ্র অঙ্গনে এ আগুণ কি ক'রে জ্বালাতে সক্ষম হ'লে।"

যুবক বলিল, "শোননি। কাল প্রাতে যে দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে। সমগ্র ভারত আজ কর্ম্মীর শ্রমের মূল্য বাবদ তার সম্পত্তি ব'লে প্রমাণ হয়ে গেছে। সর্ব্বত্র আমাদের জয় হয়ে গেছে। আমরা যুগ যুগ ধ'রে অনুপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের সম্ভোগ-ব্যাধিতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিলাম, আমাদের সকলের উপর কাল প্রাতে সামাজিক ভাবে অস্ত্র-প্রয়োগ হয়ে গেছে—কেউ কেউ আমরা নীরোগ হয়ে কাজে লেগে গেছি—আর কেউ কেউ 'বাট দি পেশেণ্ট সাকাম্বড' বলিয়া নিজ নিজ অকর্ম্মণ্যতা বহন ক'রে পরপারে গমন করেছে। তুমি বন্ধু, কি ঘুমচ্ছিলে, যে এত বড় কথাটা জান না ?"

আমি সলজ্জ কণ্ঠে বলিলাম, "না ঘুমিয়ে থাকিনি, মুর্চ্ছিত হয়ে ছিলাম।" যুবক বলিল, "দিনে আট ঘণ্টা পুরো কাজ করতে হবে। দশ মিনিট বেরিয়ে গেল। কমরেড, আজ তবে..।" নির্ব্বাক হইয়া একটা ভঁইষা গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম তাহার চালক একজন সাহিত্যিক-জাতীয় যুবক। মনে হইল, ভাবের বাজারে ভিড়ের মধ্যে কলম চালান আর শকট-সঙ্কুল রাজবর্ত্মে এক জোড়া উদ্দাম মহিষ চালনা দুইয়ে কি সাদৃশ্য অথচ কি পার্থক্য। সে একই আবেগ, শুধু অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র।

ভঁইষা গাড়ীর গাড়োয়ান যেন আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিল, "হ্যাঁ বন্ধু, এ লাঙ্গুল মর্দ্দনের যে গৌরব তার পাশে মাইকেলের মেঘনাদ-বধ লেখা, রবীন্দ্রনাথের বলাকা রচনা মধুমক্ষিকার দুর্দ্দমনীয় আবেগের কাছে প্রজা-পতির ফরফরায়নের সামিল। দেখো যেন 'ষ্ট্যাগনেণ্ট' করো না। চরিত্রে সর প'ড়ে যাবে। খালি নাড়া দাও। কর্ম্মের ঘোল-মোড়ায় ফেলে জীবন-দুগ্ধকে মন্থন কর ; তবেই না মুক্তির নবনীত তোমার নিজের হয়ে দেখা দেবে।"

মুগ্ধ হইলাম। চালায় মহিষ অথচ কি উপমা-কুশলতা। কর্ম্ম চাই কর্ম্মের জন্যই হিমাচল অপেক্ষা তাহার ক্রোড়চর ছাগশিশু অধিক গৌরবময়, উদর

অপেক্ষা হস্ত, কপাল অপেক্ষা নয়ন, খাটিয়া অপেক্ষা ছারপোকা এবং পথ অপেক্ষা পথের কুক্কুর অধিক জীবন্ত। এই কারণেই স্বাস্থ্য অপেক্ষা ব্যাধি, পুণ্য অপেক্ষা পাপ এবং আত্মা অপেক্ষা অবয়ব অধিক চিন্তাপ্রসূ। সমগ্র সৌর-জগৎ, সমস্ত সৃষ্টি চাক্ষুষ ভাবে মানব সন্তানকে দেখাইয়া দিতেছে, ঘোর, ঘোর, পাক খাও, চল, দৌড়াও, স্থান ও কালের বক্ষে ক্রমাগত নিজের চঞ্চল পদচিহ্ন এখানে ওখানে সেখানে আঁকিয়া দাও, জয় কর, সব আপনার করিয়া নাও—মাথা ঘুরিতে লাগিল।

এই জগত এই সৃষ্টি ইহার মধ্যে কর্ম্মের এই প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীলতার আবেগ অথচ এতদিন শুধু ব্রিজ খেলিয়া কাটাইতেছিলাম। লজ্জায় ঘৃণায় ঘাড় হেঁট করিয়া গৃহের দিকে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ম্মের জগতে প্রায়শ্চিত্ত আন্তরিক হয় না—বাহ্যিক প্রবলতার সহিতই তাহা পাপীর মস্তকে আসিয়া পড়ে।

বিপ্লবায়িত নগরীর পথ ছাড়িয়া গৃহে চলিলাম। আবেগে টেলিফোনের তারোপবিষ্ট বায়সকুলকেও লাল মনে হইতে লাগিল। কবে এক দিন হোলির আবেগে, ধামারছন্দে ব্রজবাসী চরাচর বিশ্বকে লাল দেখিয়াছিল—আজ আবার রূপ-রসে মাতিয়া আমরা জগতকে লাল দেখিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম। দরজায় দেখিলাম এক জন হ্যাটকোটধারী ইংরেজতনয় উবু হইয়া বসিয়া তোলা উননে রুটি সেঁকিতেছে। আমায় প্রবেশেচ্ছুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি চাই। বলিলাম, আমি গৃহের মালিক, নিজের গৃহে প্রবেশ করিতে চাই। সে বলিল, মালিক আবার কি পদার্থ? আমি কিঞ্চিৎ চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কে যে, আমার দরজায় বসিয়া রুটি সেঁকিতেছে! সে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দরজার পথে আর এক বিপত্তির আবির্ভাব হইল। খোঁচা খোঁচা আচাঁচা-দাড়ি এক ব্যক্তি ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল। আমি এবার সত্যই চটিয়া গিয়া বলিলাম, "তুমি কে হে বাপু? আমার বাড়ী চড়াও হয়ে কি করছ?"

সে ব্যক্তি যেন হতভম্ব হইয়া গেল। বলিল, "বাড়ী? বাড়ী আবার কাহারও হয় না কি?

আমি বলিলাম, "তামাসা রাখ। কার হুকুমে আমার বাড়ীতে তোমরা ঢুকে বসে যা-ইচ্ছে-তাই করছ?"

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল। ইংরেজ পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লোকটা কি পাগল?"

ইংরেজ তনয় অতঃপর আমায় সমঝাইয়া বলিল যে, দেশের আইন অনুসারে বাড়ী ঘর আর কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। সকল কর্মীদের ব্যবহারের জন্য সকল বাড়ী বর্ত্তমান আছে। যে যত অধিক শ্রমের কার্য্য করে তাহাকে তত উত্তম বাসস্থান রাষ্ট্র হইতে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। খোঁচা-দাড়ি-বিশিষ্ট ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী মিলে মোট-বহনের কার্য্য করে এবং ইংরেজটি নিজে সেই মিলেরই ইঞ্জিনীয়ার। শ্রমাল্পতা হেতু ইংরেজকে বাড়ীর প্রবেশ-পথটি বাসের জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রম-বাহুল্যের জন্য মোটবহনকারীকে বাড়ীর অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমি বলিলাম, "আর আমি?"

এবার উভয়ে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কর?" আমি বলিলাম, "কিছু না, শুধু লেখাপড়া বক্তৃতা ইত্যাদি।"

খোঁচা দাড়ি লোকটা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা বেশতো, ভাবছ কেন। আমাদের এখানে ঝাড়-পোঁছের কাজে লেগে যাও আর কি? খাওয়াদাওয়ার অভাব হবে না। শুতেও পাবে।" আমি আপ্যায়িত হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিব এমন সময় ইংরেজ ব্যক্তি আমায় বলিল যে, আমার পক্ষে মানে মানে কোন শ্রমের কার্য্যে লাগিয়া যাওয়াই মঙ্গল, কারণ, তাহা না করিলে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় আমার জন্য যে কার্য্যের ব্যবস্থা হইবে তাহাতে আমার অনভ্যস্ত শরীরের শ্রম লাঘব হইবে না। সুতরাং আমি কাজে লাগিয়া গেলাম।

*　　　*　　　*

সকাল বেলা খোঁচা দাড়ির খাবার ব্যবস্থা করি, তারপর সে মিলের প্রাচীনযুগের ম্যানেজারের ও বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের সম্পত্তি মোটরটাতে চড়িয়া বেড়াইতে যায়। ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব গাড়ী চালায়। আমি সেই সুযোগে আমার সখের লাইব্রেরিতে গিয়া ঢুকি, যেখানে কেতাবের উপর কেতাব সাজাইয়া তাহার উপর বসিয়া লোকটা মেটে কলিকায় কড়া তামাক খাইয়াছে, সেখানটা পরিষ্কার করি। বাহগুলিকে যত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তুলিয়া রাখি যেন আমি প্রাচীন গ্রীসের কোন ক্রীতদাস, গোপনে আপনার উৎপীড়িত সন্তানদিগকে মনিবের চোখ এড়াইয়া আদর করিতেছি। হায় সাম্য, আজ তোমার ধাক্কায় কালিদাসের কাব্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কমরেড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাগ্যে কালিদাস মরিয়াছেন, না হইলে বুঝিবা তাঁহাকে দিয়া নব যুগের কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য

কম্পোজ করান হইত। অজন্তার গুহা-চিত্র অঙ্কন আজ ঘর-লেপার সামিল। হে সাম্য, তুমি অবশেষে মানুষকে কোথায় না লইয়া ফেলিবে!

বিকালে মিল হইতে ফিরিয়া আমার মনিব আমারই লিখিবার টেবিলের উপর শুইয়া নাক ডাকায় যতক্ষণ না নৈশ ভোজনের জন্য তাহাকে জাগান হয়। মানুষটা রোজ বড় বড় শিল্পীর চিত্র দেখে আর হিঃ হিঃ করিয়া হাসে। গ্রামোফোনে উৎকৃষ্ট গান বাজনা শুনিয়া কড়িকাঠ হইতে পাপোষ পরিমাণ হাই তোলে। ইংরেজটা বলে, পরে ইহার শিক্ষার সহিত রুচির উন্নতি হইবে; আমি বলি, হ্যাঁ তবে ও তখন আর মোট বহিবে না।

কষ্টে দিন কাটে। ভাবি আবার কবে যুগচক্র উন্নতির চরমে উঠিয়া নিম্নাভিমুখী হইবে।

সমাপ্তি

বন্ধু বলিলেন, "বেশ লিখিয়াছ। প্রায় সত্যের মতই কষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে ও দ্বিতীয় দৃশ্যে কমিউনিষ্টিক বিপ্লবের প্রতি লেখকের মনোভাব বিভিন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "উভয় দৃশ্যেই একই আবেগের বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছি। প্রথম দৃশ্যে দেখাইয়াছি, পরকীয় কমিউনিজম্, দ্বিতীয়ে স্বকীয়। উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা শুধু পরদ্রব্যেষু ও স্বীয়দ্রব্যেষুর বিভিন্নতা মাত্র।" বন্ধু বলিলেন, "সাবাস।"

"তন্দ্রাহরণ"

ঐতিহাসিক কাহিনী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৯)

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজকুমারী তন্দ্রার মন একেবারে খিঁচড়াইয়া গিয়াছে। মধুমাসের সায়াহ্নে তিনি তাই প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া একাকিনী দ্রুত পায়চারী করিতেছেন এবং গণ্ড আরক্তিম কারয়া ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম!

অনেকদিন আগেকার কথা। ভারতীয় রমণীগণের মন তখন অতিশয় দুর্দ্দমণীয় ছিল; মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কনৌজে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী তন্দ্রার বয়স আঠারো বৎসর, ফুটন্ত রূপ, বিকশিত যৌবন। তথাপি মধুমাসের সায়াহ্নে তাঁহার মন কেন খিঁচড়াইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, তাঁহার আসন্ন বিবাহই একমাত্র কারণ।

কিন্তু আঠারো বৎসরের বিকশিত-যৌবনা কুমারী বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন? একালে তো এমনটা দেখা যায় না। তবে কি সেকালে—

না তাহা নয়। সেকালেও এমনই ছিল। কিন্তু কুমারী তন্দ্রার আপত্তির কারণ—তাঁহার মনোনীত স্বামী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ চন্দ্রানন মাণিক্য। কথাটা বোধ করি পরিস্কার হইল না। আসল কথা—বর বাঙাল।

যতদিন এই বিবাহ রাজা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর গবেষনার বিষয়ীভূত ছিল, ততদিন কুমারী তন্দ্রা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু হঠাৎ শিরে—সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ চন্দ্রানন বিবাহ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজধানীতে ডেরাডাণ্ডা ফেলিয়াছেন।

গোড়া হইতেই তন্দ্রার মন বাঁকিয়া বসিয়াছে। তবু তিনি গোপনে প্রিয়-সখী নন্দাকে পাঠাইয়াছিলেন—চন্দ্রানন মাণিক্য লোকটি কেমন দেখিবার জন্য। নন্দা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে—যুবরাজ দেখিতে শুনিতে ভালই, চালচলনও অতি চমৎকার, কিন্তু তাঁহার ভাষা একেবারে অশ্রাব্য। 'ইসে' এবং 'কচু' এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সহযোগে তিনি যাহা বলেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না।

শুনিয়া কুমারী তন্দ্রা একেবারে আগুন হইয়া গিয়াছেন। একি অত্যাচার। তিনি রাজকুমারী বলিয়া কি তাঁহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই? হউক সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যুবরাজ—তবু বাঙাল তো। দেশে কি আর রাজপুত্র

ছিল না ? আর রাজপুত্র ছাড়া রাজকুমারী বিবাহ করিতে পারিবেনা এই বা কেমন কথা !

কুমারী তন্দ্রা রাজসভায় নিজ অনিচ্ছা জানাইয়া তীব্র লিপি লিখিয়াছিলেন। উত্তরে মন্ত্রীগণ কর্তৃক পরামর্শিত হইয়া রাজা কন্যাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, চন্দ্রানন মহা বীরপুরুষ, উপরন্তু বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে বিবাহে অস্বীকৃত হইলে নিশ্চয় কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন— প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গোঁ অতি ভয়ানক বস্তু। সুতরাং বিবাহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তদবধি ক্রোধে অভিমানে কুমারী তন্দ্রার চোখে তন্দ্রা নাই। তাই মধু-সায়াহ্নে একাকী প্রাসাদশীর্ষে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে গণ্ড আরক্তিম করিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কেন মরিতে রাজকন্যা হইয়া জন্মিলাম।

* * *

সহসা একটি তীর হাউইয়ের মত প্রাসাদ পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া তন্দ্রার পদপ্রান্তে পড়িল। বিস্মিত হইয়া তন্দ্রা চারিদিকে চাহিলেন। রাজ-প্রাসাদশীর্ষে কোন্ ধৃষ্ট তীর নিক্ষেপ করিল ? তন্দ্রা ছাদের কিনারায় গিয়া নিম্নে উঁকি মারিলেন।

ঠিক নীচেই জলপূর্ণ পরিখা প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার পরপারে একটি উষ্ণীষধারী যুবক উর্দ্ধমুখ হইয়া গুম্ফে তা দিতেছে। তন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া সে হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিল।

চতুস্তল প্রাসাদের শিখর হইতে যুবকের মখাবয়ব ভাল দেখা গেল না ; তবু সে যে বলিষ্ঠ ও কান্তিমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্দ্রা বিস্ময়া-পন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তীরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তীরের গায়ে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে।

লিপি খুলিয়া তন্দ্রা পড়িলেন—

"ছলনাময়ী নন্দা, আর কতদিন দূর হইতে দেখিয়া অতৃপ্ত থাকিব ? তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার মনস্কাম সিদ্ধ কর, আমার মন আর বিলম্ব সহিতেছে না, যদি আমাকে বঞ্চনা কর, নিজেই পরিতাপ করিবে, পরদেশী বন্ধু কতদিন থাকে ?

সদয় হও—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, একবার সাক্ষাৎ হয় না ?— তোমার অনুগত বন্ধু।"

লিপি পড়িয়া কুমারী তন্দ্রা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ইদানীং প্রিয় সখী নন্দা যখন তখন ছলছুতা করিয়া ছাদে আসে। এই তাহার অর্থ। ঐ কমকান্তি বিদেশী নন্দাকে দেখিয়া মজিয়াছে ; নন্দাও নিশ্চয় তাহার

প্রতি আসক্ত। দুইজনে কাছাকাছি হয় নাই, দূর হইতেই প্রণয়। তীরের মুখে প্রেম!

সহসা তন্দ্রার দুই নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি সন্তর্পনে উঠিয়া গিয়া আবার উঁকি মারিলেন। ধৈর্য্যশীল যুবক তখনও উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া গুম্ফে তা দিতেছে।

কবরী হইতে কাজললতা লইয়া চুলের কাঁটা দিয়া তন্দ্রা লিপি লিখিলেন, হাত কাঁপিতে লাগিল। লিপি শেষ হইলে তীরের গায়ে জড়াইয়া পরিখার পরপারে ফেলিয়া দিলেন। নিরুদ্ধনিশ্বাসে দেখিলেন, যুবক সাগ্রহে তীর তুলিয়া লইল।

* * * * *

নন্দা ছাদে আসিয়া তন্দ্রাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, 'প্রিয় সখি, তুমি এখানে'?

তন্দ্রা তপ্তমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। নন্দা ছাদের এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর বলিল, 'কতক্ষন এখানে এসেছ?'

তন্দ্রা আর আত্মসম্বরন করিতে পারিলেন না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; 'নন্দা, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। হয়তো কাল সকালে উঠে আর আমাকে দেখতে পাবিনা। সখী তোর কাছে যদি কখনও অপরাধী হই, ক্ষমা করিস।'

নন্দা রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'ছি সখি, ও কথা বলতে নেই। চল, নীচে চল। কাজল'লতা যে পড়ে রইল, আমি নিচ্ছি। চুলের কাঁটাও খসে পড়েছে দেখছি। সখি, উতলা হয়ো না; তোমার ভাগ্যদেবতা তোমায় নিয়ে হয়তো একটু পরিহাস করছেন, দেবতার পরিহাসে কাতর হ'লে কি চলে?'

শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অশ্রুভরা স্বরে তন্দ্রা কহিলেন, 'নন্দা, আজ রাত্রে আমি একা শোব, তুই যা। আর দেখ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সেই বর্ব্বরটাকে যদি তোর পছন্দ হয়, তুই নিস।' মনে মনে বলিলেন, 'অদল-বদল।'

নন্দা জিভ কাটিয়া চোখে আঁচল দিল, 'ওমা ওকি কথা। আমি যে তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই।'—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। নন্দার এই পলায়ন একেবারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া থামিল।

* * *

রাত্রি দ্বিপ্রহরের যাম-ঘোষণা থামিয়া যাইবার পর, রাজকুমারী তন্দ্রা

প্রাসাদের গুপ্ত পথ দিয়া পরিখা পার হইয়া বাহিরে গেলেন। তাঁহার বরতনু বেষ্টন করিয়া আছে রাত্রির মতই নিবিড় নীল একটি উর্ণা।

নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে একটি তরুণ সুদৃঢ় হস্ত আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কেহ কথা কহিল না; দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল, তরুণ সুদৃঢ় হস্তধারী তন্দ্রাকে একটির পৃষ্ঠে তুলিয়া দিল; তারপর একলম্ফে অপরটির পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল। নক্ষত্রখচিত অন্ধকারে দুই কৃষ্ণকায় অশ্ব ছুটিয়া চলিল, পৌণ্ড্রভূক্তির সীমান্ত লক্ষ্য করিয়া।

দণ্ড কাটিল, প্রহর কাটিল, কত নক্ষত্র অস্ত গেল। সম্মুখে শুকতারা বিস্ময়াবিষ্ট জ্যোতিষ্মান চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

দিগন্তহীন প্রান্তরের মাঝখানে প্রভাত হইল; তখন বল্গার ইঙ্গিত পাইয়া অশ্বযুগল থামিল। কুমারী তন্দ্রা মুখের নীল উর্ণা সরাইয়া পাশে অশ্বারোহী মূর্ত্তির পানে চাহলেন। দৃষ্টিবিনিময় হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে একটি তরুণ কন্দর্প। পক্ক দালিম্বের মত তার দেহের বর্ণ। পেশল অথচ পেশীবদ্ধ দেহ, মুখে পৌরষ ও লাবন্যের অপূর্ব্ব মেশামিশি। নবজাত গুম্ফের নীচে একটু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমারী তন্দ্রার চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত হইয়া আসিল। দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন, এ যে তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর।

সহসা অনুতাপে তন্দ্রাব হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'আর্য্যপুত্র, আমার ছলনা ক্ষমা কর। আমি নন্দা নই—আমি তন্দ্রা।'

তরুণ কন্দর্প হাসিলেন, গুম্ফে ঈষৎ তা দিয়া সুধামধুর স্বরে কহিলেন,—'ইসে—সেডা না জাইনাই কি চুরি কৈরা আন্ছি? রাজকুমারী তুমি বরই চতুরা; কিন্তু আমার চৈক্ষে যদি ধূলাই দিতি পারবা তো তোমারে বিয়া করতি আইলাম কিয়ের লাইগা'?

তন্দ্রা চমকিত হইলেন; বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া স্খলিত স্বরে কহিলেন, 'তুমি—তুমি কে?'

যুবক কলকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'আরে কচু—সেডা এখনো বোঝাবার পার নাই? আমি চন্দ্রানন মাণিক্য—ইসে—প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুবরাজ। হ—সৈত্য কইলাম।'

* * *

দুইটি অশ্ব অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি মন্থর গমনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পথে ফিরিয়া চলিয়াছে। তন্দ্রার করতল চন্দ্রাননের দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ। তাহার স্খলিত বেণী মস্তক মাঝে মাঝে যুবরাজের বাম স্কন্ধের উপর নত হইয়া পড়িতেছে।

তন্দ্রা কহিলেন, 'যুবরাজ, কী সুন্দর তোমার ভাষা, যেন মধু ঝ'রে পড়ছে। কতদিনে আমি এ ভাষা শিখতে পারব?'

চন্দ্রানন তন্দ্রার মনিবন্ধে একটি আনন্দ-গদগদ চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'ইসে—আগে বিয়া তো করি, তারপর এক মাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা একমাসে ভুইলা যাইতে পারবা না?'

সুখাবিষ্ট কণ্ঠে তন্দ্রা বলিলেন, 'পারমু'।

*　　*　　*

কুইনিন

সজনীকান্ত দাস

(১৯০০)

সেবনের পূর্বে

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই কত আর,
কুচুকুচু দেলায় দে রাম, ঘুচুক হাহাকার।
খাতির যত বাড়ছে তত বইছে চোখে নীর,
সসম্মানে চলছি সোজা বৈতরণীর তীর!
গলায় চড়ে ফুলের মালা, হাঁড়িই নাহি চড়ে—
ইঁদুর এবং চামচিকাদের আড্ডা হেঁসেল-ঘরে।
স্বয়ং আমি যশের নেশায় ফুলে ফেঁপেই থাকি,
অন্নবিহীন পরিবারের কে হায় মোছায় আঁখি!
গলায় মালা না পরিয়ে নগদ মালার দাম
হাতে দিলে—এই গরিবের একটু হ'ত কাম।
জেনে রেখো—এ নয় আমার একার ইতিহাস,
মায়ের সেবার ভার যে নিলে তারি সর্বনাশ!
দেশের সেবা করলে হেথায় কলামুলোর ভেট
মিলত যদি কোনক্রমে চলত পোড়া পেট।
শুধুই খাতির দেঁতো হাসির, শুধুই "প্রণাম দাদা,
জমিদারের পাইক এল—তারে দাও'সে বাধা,
পুলিস আসে—গুলি খেতে এগিয়ে তুমি যাও,
কলেরাতে মরছে দুখী—উপায় কি বাতলাও!
ইস্কুল আর টিউব-ওয়েল না বসালেই নয়,
পায়ের নড়ি ছিঁড়ে তুমি ঘুচাও মারীভয়।"
সব ক'রে যাই হাসিমুখে, জয়ধ্বনির ধুম—
শুনতে শুনতে শূন্যোদরে তোফা লাগাই ঘুম।

মনে পড়ে, একদিন রাম দফাদারের মেয়ে,
বালবিধবা—বললে পথে আমার মুখে চেয়ে,
"কোথায় যাবে বিনা ছাতায় বোশেখী এই রোদে?"
—চলেছিলাম পলাশপুরে চৌথ-প্রতিরোধে—

"একটুখানি জিরিয়ে তুমি যাও দাদাঠাকুর।"
কাতর ছোট মিনতি সেই দরদ-ভরাতুর
ঠেলতে নারি, থামল স্বতই ক্লান্ত পায়ের গতি ;
পুব-দাওয়াতে মাদুরখানি বিছায় যশোমতী,
গাড়ু-ভরা জল আনে আর গামছা পরিষ্কার,
তালপাতার এক পাখা হাতে, কতক্ষণই আর ?
আধ ঘণ্টা—বাতাস ক'রে ঘুম পাড়াল মোরে।
ঘুম ভাঙতেই দেখি, যশো সদর-দুয়ার ধ'রে
দাঁড়িয়ে আছে, সন্ধ্যে হতে নেইকো বেশি দেরি।
কাঁকণতলায় ঘাটে বুঝি বন্ধ হ'ল ফেরি,
তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেলাম পলাশপুর।
বামুনহাটি ফিরনু যখন, বাতাস ভরপুর
যশোর আমার নাম জড়িয়ে বিশ্রী কথায় যত,
গিন্নী করেছিলেন নেহাত অনেক পুজোব্রত—
তারি জোরে সামলে নিলেন, যশোমতীর বাপ
পাঠিয়ে তারে শ্বশুরবাড়ি থামায় কুৎসা-পাপ।
এমনি কেলেঙ্কারির স্মৃতি যশের ফাঁকে ফাঁকে
সরস ক'রে রেখেছিল জেলের জীবনটাকে।
দেখতে পেতাম শুয়ে শুয়ে আধো ঘুমের ঘোরে,
দাঁড়িয়ে আছে যশোমতী দুয়ারখানি ধ'রে,
গুমট গরম সওয়া কঠিন যখন রুদ্ধ 'সেলে'
তালের পাখার লাগত হাওয়া; মনের পাখা মেলে
উড়ে যেতাম নিঝুম যখন বামুনহাটি গ্রাম,—
বলতে ভুলে গেছি অজিত চাটুজ্জে মোর নাম।

সাতটি বছর জেলে ছিলাম তিরিশ সনের পর,
ক্বচিৎ খবর পেতাম আমার ঘরণী আর ঘর
ভাঙতে ভাঙতে অভাব এবং অনটনের ঝড়ে
কোনো ক্রমে আছে টিকে—রাজার গুপ্তচরে
যতটুক করার করে নিত্যি খবর-খোঁজ,
কুমোর কামার হাড়ি মুচির কৃপায় চলে রোজ।

খবর-কাগজ একটা দুটো হাওয়ায় এলে উড়ে
দেখতে পেতাম, বেঁচে আছি স্বমুখ-পাতা জুড়ে
কতই মোদের কীর্তিকথা নিজেরাই না জানি।
দিনের আলো রাতের আঁধার জানায়, কালের ঘানি
চলছে বরাবরের মত; মুক্তির সংগ্রাম
রফারফির পালায় যখন ঠেকল অভিরাম,
ধস্তাধস্তি বেধে গেল হিন্দু-মুসলমানে,
পরস্পরের মুখে তাকাই, বুঝি না ছাই মানে।

দুদিন পরে হঠাৎ জেলের ফটক গেল খুলে—
দম আটকে মরিই বুঝি মালায় এবং ফুলে।
সভায় সভায় কলকাতাতে একজিবিটেড হ'য়ে
বামুনহাটি পালিয়ে বাঁচি। ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
বাড়ির এবং পতিব্রতার অন্নটুকুই বাকি ;
কোন ক্রমে শতেক ছেঁড়া ধুতিতেই গা ঢাকি
দিলেন দেখা, লাগল ভাল, ক্ষীণ তৃতীয়ার চাঁদ,
ভেঙে গেল অনেক দিনের চোখের জলের বাঁধ।

লোকের মুখে শুনতে পেলাম যশোমতীর যশ,
দেশের কাজে লোককে দেশের করলে শেষে বশ।
নঈতালিম ট্রেনিং নিয়ে দূর ওয়ার্ধা থেকে
গোকুলপুরের আশ্রমে আজ সেও বসেছে জেঁকে।
তাহার মত কর্মী নাকি হাজারে এক মেলে,
মধ্যিখানে দুটি বছর বাস করেছে জেলে।
রামধুন যা গান করে রাম দফাদারের মেয়ে,
গান্ধীজীকে করল খুশি দুবার তাহা গেয়ে।
শুনে কেন ভরল জানি খুশিতে মোর মন
পড়ল মনে সেই বোশেখের দুপুর-নিমন্ত্রণ।

সেবাশ্রমের আপিসটাতেই আবার বসি জেঁকে
দিনে দিনে পশার বাড়ে, মানুষ ধরে ছেঁকে।
কোথা থেকে আসতে থাকে চাল ডাল নুন তেল,
লাউ একটা, পটল কিছু, একটা পাকা বেল

কর্মী জোটে ধর্মভীরু, আসর ওঠে জ'মে,
আমি শুধুই হুকুম করি। ক্রমে ক্রমে ক্রমে
নতুন ইলেকশনের ধুয়া উঠল চতুর্দিকে
ওপর থেকে হুকুম পেয়ে নামটি দিলাম লিখে।
আবার তেমনি ঘুরে বেড়াই জেলায় গ্রামে গ্রামে,
কর্মীরা সব সঙ্গী থাকে ডাইনে এবং বামে ;
আবার আমার কণ্ঠে ফোটে সেই পুরাতন খই,
মালাই শুধু জোটে না, হয় বিষম যে হৈ-হৈ।
এ-দল আসে ও-দল আসে, বদলে বদলে পাঠ
একই পত্র লেখে সবাই একই রকম ঠাট।
এমনি ক'রে সাচ্চল্লিশের এলো আগস্ট মাস,—
কাটা পড়তে ভারতভূমি কাটল তাঁহার ফাঁস।
বেওয়ারিস রাজ্য তখন নিলাম হ'ল ভোটে,
স্বদেশসেবী জেল-পাখীরা রাজ্যপাটে ওঠে।
বরাত জোরে ছিল আমার জেলের লিখন ভারী,
আমি হলাম মন্ত্রী নিয়ে সায়েব সেক্রেটারি।

সেবনের পরে

যথারীতি হলপ প'ড়ে সেক্রেটারিয়েটে
বসনু এসে শুভদিনে গামছা বেঁধে পেটে।
পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারি গড়ুই শিবনাথ—
হিজলি জেলে আলাপ, শুধু দুকুড়ি আর সাত
ফোঁটার খেলায় ওস্তাদি সে দেখিয়েছে অ্যাদ্দিন—
ঘরে ঢুকেই সেলাম করে, ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টিন
সামনে ধরে হাসিমুখে চমকে উঠে চাই—
বিড়ি ছিল কৌটোভরা বের ক'রে তাই খাই।
হিসেব রাখি, প্রথম দিনেই এল সাতাশ জন—
সেক্রেটারি, ডেপুটি তার, বাঁটুল বোসের বোন,
বাঁটুল বোস যে ডি. ভি. সি.তে কণ্ট্রাক্টারি ক'রে
সেলাম ঠুকতে আসে নিত্যি নতুন মোটর চ'ড়ে,
পলিটিকাল সার্কেলে তার বোনের খুবই নাম
রূপসী আর বিদুষী আর চমকপ্রদ ঠাম—

এই হ'ল তিন, মাড়োয়ারী এল উনিশ শেঠ
বেঁটে এবং ভারী এবং জালার মত পেট,
বাকি পাঁচটি বোম্বেওলা বোরা মুসলমান
কোথায় স্কুলে হাসপাতালে করতে চাহে দান
শুধু অনুমতির প্রার্থী ; আনন্দিত চিত্তে
দিলেম আমি অনুমতি—আকারে-ইঙ্গিতে
দাতা এবং সেক্রেটারির বার্তা-বিনিময়
পড়ল চোখে, কেন জানি জাগল মনে ভয়।
ফিরে এলাম ভয়ে ভয়েই ক্যামাক স্ট্রীটের ঘরে
বিছানাতে শুয়ে শুয়ে মন যে কেমন করে।
গৃহিণীকে কলকাতাতে না আনলে আর নয়,
ভাঁড়ার শূন্য, তবু গাঁয়ে নিত্যি চোর-ভয়,
তার ওপরে সাপ-শেয়ালের অত্যাচারও আছে,
কিন্তু তাঁকে আনতে টাকা চাই যে অনেক কাছে।
তারি সঙ্গে পড়ল মনে যশোমতীর কথা—
সামলে নিলাম, বাজল বুকে গোপন-একটু ব্যথা।

চমকে উঠি, হঠাৎ এসে খবর দিল দ্বারী,
বাঁটুলবাবু সেলাম জানান, কাম জরুরি ভারি।
উঠে বসি ধড়মড়িয়ে, বললে বাঁটুল বোস,
অসময়ে শুয়ে যে সার্, একটু অসন্তোষ
মুখে যেন মাখা সারের, খুলে বলুন সার্,
জানতে পেলে সাধ্যমত করব প্রতীকার।
কথায় কথায় প্রকাশ পেল দেশের বাড়ির কথা,
দৈন্য আমার। পরোয়া কি তার, বহুত বদান্যতা
সমুদ্যত আছে নাকি দেশ-সেবকের কাজে—
চাপড়ে টেবিল বললে বাঁটুল। শিউরে উঠি লাজে।
রাত্রি যত বাড়ে তত নেতিয়ে এল মন,
শেষকালেতে মধ্যরাতে ঘটল নিষ্ক্রমণ
বাঁটুল বোসের সঙ্গে সুতোর সামান্য পারমিট—

গিন্নী এসে হাজির হলেন তাহারই পিঠপিঠ
বলতে আজকে লজ্জাও নাই, পরমসমারোহে ;

প্রথম পদস্খলন যদি সতীর চিত্ত দহে
দ্বিতীয়কে দিতে বাধা উপায় তাহার নাই—
শেষাশেষি সতী হয় যে পরম প্রগল্‌ভাই।
গিন্নী এলেন, সঙ্গে সঙ্গে হরেক সরঞ্জাম
কোথেকে যে জুটল এসে, কে দিল তার দাম
কার্পেট আর সোফা-সেটি, রেফ্রিজারেটার
এবং তারো দুমাস পরে সিডানবডি কার—
কে দিল তা বলব নাকো, গোপন ইতিহাস,
তার বদলে দেশের হ'ল কি ঘোর সর্বনাশ—
এসব কথা চেপে রেখে এটুক মাত্র বলি
সকল ধর্মবোধে আমার দিলাম জলাঞ্জলি।

দেখতে দেখতে গজায় ভুঁড়ি একটু নেয়াপাতি—
লজ্জা ঢাকতে নারে যে আর খদ্দরী নয়হাতী,
প্রস্থে দিঘে বাড়ে বহর, চুকল বিড়ির পাট—
কাঁচি ক্যাপস্টান গোল্ডফ্লেকও বদলে বদলে ঠাট,
প্যাকেট থেকে টিন, শেষে ফাইভ ফাইভ ফাইভ,
এবং তরল জনি-ওয়াকার বিকল্পে বি-হাইভ।
রাত্রি একটু ঘন হ'লে বাঁটুল বোসের বোন—
এ-পার ও-পার দুই পারেতে চলত টেলিফোন
মিহি এবং মোটা গলায়; কেকা এবং কুহু—
এক হওনের ব্যাকুলতায় কাঁপত মুহুর্মুহু
দুহুঁর হাতের রিসিভারই, পরম পরিতোষে
গিন্নী শুয়ে পান চিবোতেন বিরাট তক্তপোশে।
আরাম-আহার পেয়ে তখন তিনি বিপুলকায়া,
গয়না শাড়ি গাড়িতে তাঁর জন্মেছিল মায়া,
তাতেই তিনি খুশি ছিলেন চক্ষু দুটি বুজে—
ঠোঁট দুখানি চেপে রেখে লিপস্টিক্ আর রুজে।

বাড়ে বাহির-অন্দরেতে ক্রমিক ব্যবধান,
সভায় সভায় জোড়ে গিয়ে গলার মাল্যখান

গিন্নীহস্তে গছিয়ে দিয়েই ডিউটি স্বামীর শেষ—
ঘরের মানুষ ঘরে থাকেন ; আমার থাকে দেশ।
গভীর রাতে পঞ্চজনে ‘পাঞ্চো’ মোরা করি
ককটেল আর বুলস্টোরিতে সামলে ডুবো তরী
টলতে টলতে ভেসে বাঁচাই অনেক ঘুর্ণি-পাক।
তবু কি ছাই রেহাই আছে, গভীর নিশির ডাক
কেমন ক’রে শুনে ফেলে ত্যাঁদোড় রিপোর্টার!
দৈনিকেতে কেচ্ছা বেরোয়, চুনকামেতে তার
অনেক হয় যে অদল-বদল সরকারী দপ্তরে—
উদোর পিণ্ডি শেষাশেষি বুধোর ঘাড়ে পড়ে।

একটি কথা চুপি চুপি রাখছি ব’লে ভাই,
আরাম আছে, সুখও আছে, স্বস্তি কেবল নাই।
এই কুইনিন খাওয়ার পরে অঙ্গ যে যায় জ্ব’লে,
জুড়োবে না এ জ্বালা হায় একদম না ম’লে।
মনে পড়ে, অন্নবিহীন অতীত দিনের সুখ—
মানুষ এসে ভালবেসে জুড়িয়ে দিত বুক,
অভাব-অনাটনের দায়ে যখন চোখের জলে
ভাসলে সমব্যথীর বাহু জড়াত এই গলে।

ভাবতে ভাবতে পড়ল মনে যশোমতীর কথা,
আমার ক্ষণিক আরাম লাগি তাহার ব্যাকুলতা।
মধ্যরাতে মত্ত মগজ হয় একদম চুর—
গোকুলপুরের আশ্রম সে কোথায় কতদূর?

বাঁটুল বোসের কানে খবর পৌঁছে অচিরাৎ—
বললে হেঁকে চাপড়ে টেবিল, করব বাজিমাৎ,
আপনি শুধু হুকম করুন—শিল্প-প্রদর্শনী
খুলে একটা পাঠাই তাঁরে পত্র-আমন্ত্রণী।
এলেই তিনি ব্যবস্থা তার হবেই একটা সার্,
বাঁটুল শর্মা দেখলে চোখে অনেক অভিসার,
এই বাহুতে ঘটিয়েছি সার্ অনেক যোগাযোগ,
সারিয়েছি সার্ অনেক প্রভুর অনেক কিসম রোগ।

একলা যদি না হয় হাসিল সহায় আছে বোন,
আপনি তো সার্ জানেন নীতার খুবই দরাজ মন।

কুটির-শিল্প-প্রদর্শনী ইডেন-বাগান ঘিরে,
হরেক রকম মালের মেলা বসল গঙ্গাতীরে।
গোকুলপুরের আশ্রমটাই আসলো পুরোপুরি,
যশোমতীর তদারকে রইল তাঁবু জুড়ি

কর্মীরা সব সেই বাগানেই, সেও একটা ঘরে।
বাঁটুল বোসের ব্যবস্থাতে দেখাও পরস্পরে
হ'ল যখন নিঝুম তাঁবু, অনেক গভীর রাতে;
গিয়েছিলাম তৈরি হয়েই, ছিলাম না আপনাতে।
সঙ্গীরা সব দেখতে গেছে 'প্লাবন' অভিনয়,
কৌশলী শ্রী বাঁটুল বোসের প্ল্যানেই সুনিশ্চয়।

তাঁবুর ভিতর ঢুকতে—ফিরে চাইল যশোমতী,
"অজিতদাদা।" ব'লেই এল এগিয়ে দ্রুতগতি:
"আপনি এখন, রাত্রে এত, কি হয়েছে দাদা?"
আমার ভেতর নরপশু হঠাৎ পেয়ে বাধা
পালাতে চায় ল্যাজ গুটিয়ে, যশো ধরল হাত,
বললে, "তুমি অসুস্থ ভাই, অনেক হ'ল রাত,
চল তোমার সঙ্গে গিয়ে পেঁৗছে দিয়ে আসি।"
ফুটল বোধ হয় আমার মুখে অতীত কালের হাসি
"চল" ব'লেই বাইরে এসে নিশীথ-অন্ধকারে
প্রথম আমি হাঁফ ছাড়িলাম, ভর দিয়ে তার ঘাড়ে
পেঁৗছে 'কারে', পেঁৗছে গেলাম ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ি—
গিন্নী তখন ঘুমে বেহুঁশ জানল শুধু দ্বারী।

প্রদর্শনী-শেষে সবাই ফিরল গোকুলপুরে,
শুধু নয়কো যশোমতী। আমার অন্তঃপুরে
ঠাঁই নিল সে। সেলাই হাতে বসত ড্রয়িং-রুমে
ডিনার শেষে বৌদিটি তার এলিয়ে পড়ত ঘুমে।

মৌতাতেরি সময় ব'লে আমার উঠত হাই—
সদর থেকে ফিরে যেত ইয়ার-বন্ধুরাই।
হাসি গল্পগুজব শেষে গাইত সে রামধুন
নিজেই দিত গেলাস ভ'রে মাত্রা ক'রে ন্যূন।
মাত্রা হ'ল শূন্য যেদিন অবাক হয়ে দেখি,
আসল গিন্নী পাশেই আছেন, দূর হয়েছে মেকি,
দূর হয়েছে কখন তাঁহার শাড়ি-গাড়ির নেশা
পান-দোক্তা-রুজের সাথে নিদ্রা নিরুদ্দেশা।
কাঁচি ধুতি ভয়েল শাড়ি সব হ'ল খদ্দরী।
ক্রমে ক্রমে বিড়ি আবার জলল ওষ্ঠোপরি,
শিশিবোতলওলা সরায় খালি বোতল টিন
ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল সাবাস এ কুইনিন।

যশোমতী বিদায় নিয়ে ফিরল আশ্রমেতে,
গিন্নী কাঁদল বিরহে তার ভুঁয়ে আঁচল পেতে ;
উঠল যখন বললে হঠাৎ, "এখানে আর নয়,
এমন চাকরির মুখে আগুন, গরিবের কি সয়
মন্ত্রীত্ব আর রাজত্ব ছাই। চল বামুনহাটি।"

পত্র লিখে পদত্যাগের, গুটিয়ে চাটিবাটি
সত্যি গিয়ে হাজির হলাম গাঁয়ের ভাঙা ঘরে
সুস্থ হয়ে স্বস্থ হয়ে যশোমতীর বরে।

কদিন ধ'রে সম্পাদকের স্তম্ভে দৈনিকের
প্রশংসায় যে বান ডেকে যায় প্রাচীন সৈনিকের—
গদির চেয়ে বড় যে জন মানল মাটির দাবি ;
কেউ জানে না কোথায় পেলাম হারিয়ে-যাওয়া চাবি।

———

মেজাজ

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

(১৯০১-১৯৫৮)

মহারাজ মারিতে উদ্যত হইয়া বসিয়া আছেন। সংবাদ দিল খানসামা মনিরুদ্দি। সে জানালার ফাঁকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অফিস ঘরের বারান্দায় যাঁহারা পায়চারি করিতেছিলেন, নিমিষে স্বীয় আসন গ্রহণ করিয়া হিসাবপত্রে অস্বাভাবিক মনোযোগী হইয়া উঠিলেন।

...পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ। হাত ঘড়ির আওয়াজও শোনা যায়।

মহারাজার অধিনে আমলা-তন্ত্রে দীক্ষিত হইবার আশা ছিল, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিট পর সেরেস্তাদার ব্যোমকেশ বাবু একবার শিবনেত্র করিয়া সকলকে দেখিয়া লইলেন। মুখ তুলিলেন না। আরো কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

নিতাই বাবু অত্যন্ত সাহসী। অনেক দিন কাজ করিতেছেন। তিনি একবার কাশিলেন, এবং থুথু ফেলিতে বারান্দায় গিয়া একবার উঁকি মারিয়া উপরে চাহিলেন। মহারাজার বসিবার ঘর দ্বিতলে।

মতিবাবুর স্থান নিতাইবাবুর পাশেই। মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'ল?"

"দেখা যায় না।"

"আমার আবার দুদিন ছুটির দরকার।"

"কাল চেষ্টা ক'রো।"

আরো কিছুক্ষণ ঐভাবেই কাটিল। এরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর। প্রায় মরিয়া হইয়াই ব্যোমকেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম - "মহারাজ কি আজ আর নীচে নাম্‌বেন না?"

তিনি খিঁচাইয়া উঠিলেন। "শুনছেন আজ তাঁর মেজাজ ভাল নাই।"

"আমার আবার একটু কাজ ছিল।"

ব্যোমকেশবাবু কোন উত্তর দিলেন না। বুঝিলাম অত্যন্ত চটিয়াছেন। আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

মতিবাবু আবার নিম্নস্বরে নিতাইবাবুকে বলিলেন "কি করা যায়, আমার ছুটি না হ'লে যে চল্‌বেই না দাদা,—কি করি?"

"কিছুই করা যায় না; লোকটা যা বেয়াড়া।"

"কিন্তু দাদা—"

"চুপ।"

অগত্যা মতিবাবু চুপই করিলেন।

কেদার একটি চাবুক লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিতেছিল। ব্যোমকেশবাবু নিজে উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কেদার ভৃত্য। ব্যোমকেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেদার, ব্যাপার কি ?"

"কিসের ?"

"হাতে চাবুক যে ?"

"মহারাজ ঘোড়ার চাবুক কিন্‌তে বাজারে পাঠিয়েছিলেন।"

"মেজাজ কেমন ?"

"কেন, ভালই ছিলতো।"

বোমকেশবাবু মনিরদ্দির সংবাদটি সবিস্তারে বলিলেন। কেদার বিচলিত হইল। বলিল—"তাহ'লে এখন চাবুক হাতে দেওয়া ঠিক নয়, চাবুক এখানেই থাক্। আমি খবর নিয়ে আসছি।" কেদার ভিতরে চলিয়া গেল।

টেবিলের উপরে চাবুক যেন উদ্যত খড়্গের মতই ভয়াবহ মনে হইতে লাগিল। ব্যোমকেশবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উঠিলেন। আলমারীর পিছনে চাবুকটি রাখিয়া দিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুই বলা যায় না।

পুলিনবাবু একমনে লিখিতেছিলেন। এইবার কলমটি রাখিয়া সন্তর্পণে আঙুলগুলি মট্‌কাইলেন। পরে পকেটে হাত দিয়া চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। শেষে একটি ডিবা বাহির করিয়া টেবিলের আড়ালে অতি সন্তর্পণে খুলিলেন। পুনরায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি পান বাহির করিলেন। মুখ মুছিবার ভান করিয়া পানটি মুখের ভিতর চালান করিলেন। একবারমাত্র ডিবা বন্ধ করিতে খুট্ করিয়া শব্দ হইল—আর কোন শব্দ নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল।

হঠাৎ ব্যোমকেশবাবু বলিলেন—"ব্যাটা এতক্ষণ করে কি ?" বুঝিলাম কেদারের কথা হইতেছে। কেহ কোন উত্তর দিল না।

ভিতরে ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইল। থালা বাটী ভাঙিল বুঝি!!

সকলের মাথাই টেবিলের উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িল। আমার সম্মুখে টেবিল ছিল না তাই মাথা ঝুঁকিল না, কিন্তু বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। উপায় তো কিছু ছিল না। মহারাজার সহিত দেখা না করিলে চাকরীটি হাত ছাড়া হইবে। চাকরীর যা বাজার! বসিয়াই রহিলাম।

* * *

কেদার সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিল। কাহারও সহিত দেখা হইল

না। নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। উপরে না উঠিলে কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে না। কেদারের পা কাঁপিতে লাগিল। সত্যই উপরে যাইবে কিনা স্থির করিতে তাহার কিছু সময় লাগিল। অফিসের বাবুরা কেদারকে খাতির করিত; সে মহারাজার খাস ভৃত্য। অনেক খবর সে দিতে পারে। অনেককে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধারও করিয়াছে। স্বয়ং ব্যোমকেশবাবু পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিয়া কথা বলেন। সেই কেদার উপরে উঠিতে ভরসা পাইতেছে না। সে যদি মহারাজার মেজাজের খবরটি আনিতে না পারে, সকলে তাহার ক্ষমতায় সন্দিহান হইবে। সুতরাং তাহার সম্মান বজায় রাখিতে হইলে সংবাদটি আনা চাইই। কেদার সিঁড়ি ধরিল। কয়েকটি ধাপ পার হইতেই ক্ষেন্তি ঝির সহিত দেখা ক্ষেন্তি কতকগুলি বাসন লইয়া নামিতেছিল। মুখ খুব প্রসন্ন ছিল না। কেদার তাহার অত্যন্ত নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ক্ষেন্তি, তোর মুখ শুক্‌নো কেন?" কণ্ঠস্বর সহানুভূতিপূর্ণ।

"তাতে তোর কি?"

"ব্যার কি রে?"

"কিসের?"

"এদিকে আয়, সব বলছি।"

কেদার ক্ষেন্তিকে লইয়া কলতলায় গেল। বলিল—"তুই কিছু জানিস্, মহারাজার মেজাজ নাকি আজ একেবারে মারমুখী।" আর কিছু বলিতে হইল না। ক্ষেন্তির হাত হইতে বাসন পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দ।

উপর হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল "ভাঙ্ ভাঙ্, সব ভেঙে ফেল্।" কেদার আর দাঁড়াইল না। সে তাহার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

* * *

মতিবাবুর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সত্যই তাঁহার ছুটির বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার শালীর বিবাহে শ্রীরামপুর যাইতেই হইবে। স্ত্রী নয়নতারাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। তিনি উঠিয়া ব্যোমকেশ বাবুর নিকট গেলেন। বলিলেন "কি করা যায় স্যার, আপনি একটি উপায় না কর্‌লে তো আর আমি বাঁচিনা।"

"আমি কি কো'রব, শুনি?"

"আপনি একটু ব'লে দিলে—"

"শেষে আমি মারা যাই আর কি?"

"আপনি একটু বুঝিয়ে বললেই—"

"আহা, তুমি বুঝছ না, কেদার না ফিরলে কিছুই হবে না।"

মতিবাবু ম্লান মুখে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

আমিও বেকার জীবনের দুর্ভোগ ভুগিতে লাগিলাম। মতিবাবু চাকরী করিয়া এবং আমি চাকরী না করিয়া প্রায় একই প্রকার অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। কথাটি বলিবার উপায় নাই—কেহ না কেহ খিঁচাইয়া উঠিবে। মাত্র একজনের মেজাজের উপর নির্ভর করিয়া এতগুলি প্রাণী কি করিয়া যে এতদিন কাজ করিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কেদার সেই যে গেল তাহারও আর কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না।

* * *

কেদার ঘুমায় নাই। তাহার চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি অত্যন্ত সজাগ হইয়া আছে। মনিরুদ্দির পদশব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া আসিল।

"ব্যাপার কি ভাই?" কেদার জিজ্ঞাসা করিল।

"কি জানি, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"খবরটি পাই কি ক'রে?"

"বিন্দি ঝি তো মহারাজার কাছে ঘুর্ ঘুর্ করে; দেখ না জিজ্ঞেস্ ক'রে বিন্দিটাকে।

"বিন্দি আবার সব কথা ব'লে দেয়, সাহস হয় না।"

কিন্তু উপায় কি?"

অদৃষ্ট যখন প্রসন্ন হয়, তখন অনেক অভাবনীয় ঘটনাই ঘটিয়া যায়। এ সময়ে বিন্দির উপর হইতে নামিবার কথা নহে। দেখা গেল সেই বিন্দি নামিয়াছে এবং কেদারের ঘরের দিকেই আসিতেছে। কেদার এবং মনরুদ্দি দুই জনেই খুব মনোযোগের সহিত তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, মুখে চিন্তার কোন ছায়া পড়ে নাই বরং ঠোঁটের কোনে যেন হাসি উঁকি মারিতেছে। কিন্তু কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না। এ সময়ে কেদারের কাছেই বা কি প্রয়োজন।

"চাবুক এনেছিস্? মহারাজ চাইছেন।"

বিন্দি প্রশ্ন করিল।

"চাবুক!!"

"হ্যাঁ,—যেন আকাশ থেকে পড়লেন; তা'হলে আনিস্‌নি তো? দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি।"

বিন্দি, শোন্ বল্‌ছি; মহারাজার মেজাজ কেমন বল্‌তো?"

"মেজাজ আবার কেমন।" বিন্দি ফিরিয়া চলিল। কেদারও তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইল।

* * *

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া একটি মশক রক্ত শোষণের স্থান নির্ব্বাচনে ব্যস্ত।

সে যেখানেই বসে সেস্থানটি তাহার পছন্দ মত হয় না। দুপা হাঁটিয়া আবার অন্য স্থানে হুল ফুটাইয়া পরীক্ষা করে। এই প্রকার প্রায় পাঁচ সাতটি স্থান পরিবর্ত্তন করিল।

একবার নিশ্চিন্ত হইয়া রক্ত শুষিলেই তাহার মশক-লীলা সংবরণ করানো যায় মনে করিয়া মহারাজা হস্ত উত্তোলিত করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনিরদ্দি জানালার ফাঁকে তাহাই দেখিয়াছিল—খবর পাওয়া গেল।

আমার বাল্য জীবনে "রাজা হও" বলিয়া অনেক গুরুজনেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একেবারে নিরাশ করিবনা—মনে করিয়াছিলাম। রাজা হইতে না পারিলেও রাজ কর্ম্মচারী হইতে পারিব আশা ছিল। কিন্তু আর ধৈর্য্য রহিল না মতি বাবুর ছুটি হইল কিনা না জানিয়াই সরিয়া পড়িলাম।
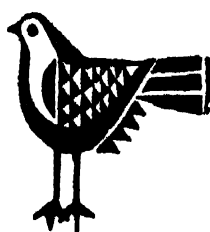
রাজবন্দী

মনোজ বসু

(১৯৩১)

কুমুদনাথকে জেলে নিয়ে পুরল। জেলার বিনোদ সমাদ্দার অতিশয় ভদ্রলোক—ফর্শা চেহারা, মাথায় টাক। টাকের লজ্জাতেই বোধহয় সব সময় হ্যাট পরে থাকে। অফিসের ভিতর চেয়ারে বসে কাজ করছে—তখনও দেখা যায় মাথা হ্যাটে ঢাকা। কুমুদনাথকে নিয়ে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠল।

ইণ্টারভিউর দিন ভয়াবহ কাণ্ড। কুমুদের স্ত্রী ইন্দুরাণী এবং ছোট ভাই নিখিল আসে দেখা করতে। এই দু-জনকে ভিতরে আসতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাইরে লোকারণ্য। কুমুদের জন্য বহু জিনিষপত্র গেটে জমা দেয়। নানা রকমের মিষ্টি, ঘরে তৈরি চন্দ্রপুলি, বই, ফুল, কাপড়-চোপড়, যে সময়ের যে ফল—ইত্যাদি ইত্যাদি। উপহার-সম্ভার দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায়, বাজারে এ সময়টা সেরা জিনিষ কি কি পাওয়া যাচ্ছে। ষোল আনা যে কুমুদের কাছে পৌঁছয়, তা নয়। যা পৌঁছয়, তাতে তার শুধু নয়—জেলখানায় উৎসব পড়ে যায় সকল শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে। দেখা করে বেরুবার সময় অপেক্ষমান জনতা ইন্দুরাণীদের ঘিরে ফেলে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিটি কথা শোনে। কেমন আছে কুমুদ, কি রকম তার চেহারা হয়েছে, কি কথা বলল সে। এক কথা বার বার শুনেও যেন তৃপ্তি পায় না।

বিনোদের কোয়ার্টার জেল-গেটের সংলগ্ন দোতলায়। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সে কাণ্ড দেখে, দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাত্র গোটা তিন-চার দেয়ালের ব্যবধানে কুমুদ এসে দাঁড়িয়েছে—এই উপলব্ধি চঞ্চল করেছে বিপুল জনতাকে। শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি। লোকের ইচ্ছা—এত কাছাকাছি যখন কুমুদনাথ এসে গেছে মুখোমুখি দেখা না-ই বা হল—তাদের ভালবাসা ও একাত্মতা গলার জোরে পৌঁছে দেবে তার কানে। এই অসংখ্য মানুষ এখনো তার অনুগামী, তারই কথা ভাবে, একটুখানি চোখের দেখা পাবার জন্য একান্ত লালায়িত তারা—জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মনের সেই আকুতি প্রকাশ করে।

বিনোদের বুড়ি মা সভয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

কি হয়েছে বাবা? অত চেঁচায় কেন?

বিনোদ বলে, একজন রাজবন্দী এসেছেন অফিস-ঘরে—

ওরে বাবা। কোন্ রাজাকে বন্দী করেছিস, কত প্রজা তার—সমস্ত ভেঙে-চুরে ফেলবে যে! তোদের ওরা গেলে কোথায়—বন্দুক-টন্দুক নিয়ে দাঁড়াক।

বিনোদ বলে, তুমি ঘরে যাও মা, এখানে দাঁড়িও না। কিচ্ছু করবে না—চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হলে আপনি চলে যাবে।

বাঁধ দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখার উপমা বিনোদের মনে এসে যায়। উদ্ধত ইটের পাঁচিলে কুমুদকে আলাদা করে রেখেছে মানুষের সান্নিধ্য থেকে। প্রবল বিক্ষোভের সামনে পাঁচিল যেন থরথর করে কাঁপছে।

মাসখানেক পরে জানা গেল, নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেছে ঐ সমস্ত লোক। জেলখানার পূর্ব দিকে এক খাল। খাল চওড়া বেশি নয়, কিন্তু স্রোত আছে। ওপারে সারবন্দি দালান-কোঠা। বাড়িগুলোর সামনে সদর রাস্তা, পিছনের অংশটা এই খালের দিকে। অনেক বাড়ি থেকে পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে খালের জলে; বাড়ির লোক খালে স্নান করে, বাসন মাজে।

বিনোদ খবর শুনল—তারপর এক সময়ে নিজে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করল—খাল-পারে ঐ সব বাড়ির উঠানে সকালবেলা লোক জমায়েত হচ্ছে। দু-তিন শ লোকের কম হবে না। দোতলার পূর্ব্বের বারাণ্ডায় কুমুদনাথ এসে দাঁড়ায়—শুভ্র খদ্দরে আবৃত দেহ, প্রভাত-সূর্যের আলো ঠাকুরদেবতার মতো তার মুখের চারিপাশে আভা বিস্তার করে। কুমুদকে চাক্ষুষ দেখে নমস্কার করে লোকজন বিদায় হয়ে যায়।

এ পর্যন্তও সহ্য করা চলে। কিন্তু সাহস ক্রমশ বেড়ে চলেছে লোকের। সুউচ্চ কণ্ঠে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন?

কুমুদনাথ হেসে জবাব দেয়, ভাল—

শেষে যুক্তি-পরামর্শও চলতে লাগল এপারে-ওপারে।

সরকারি তোড়জোড় বড্ড বেশি আপনারা জেলে আসবার পর থেকে। কেশবপুর থানার উপর তবু এখনো জাতীয়-পতাকা উড়ছে। একদিন গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি।

কুমুদনাথ বলে, এই শেষ-যুদ্ধ। নেতার মুখ চেয়ে থেকো না। করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা!

খালের ওপার থেকে শত শত কণ্ঠে চিৎকার ওঠে, করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা!

বিনোদের বুকের মধ্যে গুরগুর করে ওঠে। পারতপক্ষে এদের নিয়ে সে ঘাঁটাঘাটি করতে চায় না, চোখে দেখেও যথাসম্ভব চোখ বুজে থাকে। নেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়, চাকরি-জীবনে ঠেকে ঠেকে এই তার শিক্ষা। উপরওয়ালার কানে এ সব তুলতে নেই। রাজবন্দী বড় বেয়াড়া চিজ—রাজ-রাজড়ার মতোই এদের মেজাজের হদিস পাওয়া দায়। মিষ্টি করে বুঝিয়ে

বলতে গেলেও অনেক সময় উল্টো-উৎপত্তি ঘটে। হয়তো বেঁকে বসবে—পূবের বারাণ্ডা থেকে ঘরেই ঢুকতে চাইবে না আর। হয়তো বা খাওয়া বন্ধ করবে। আর খবরের কাগজগুলো অমনি ঢাক পেটাতে শুরু করবে। তখন সামলাও ঠেলা! অতএব সে একটা কথাও বলল না কুমুদনাথকে অথবা আর যারা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়। কিংবা পুলিশ দিয়ে খাল-পারের জনতাকে তাড়া-হুড়ো করল না। শুধু জেল-বিভাগে এক প্রস্তাব পাঠাল, পূবের দেয়াল আরও উঁচু করা আবশ্যক। রাজবন্দীরা থাকে ঐদিকে, তাদের পক্ষে পাঁচিল টপকে পালানো একেবারে অসম্ভব নয়। এমনি একটা দৃষ্টান্ত যখন দেখা গেছে হাজারি-বাগ-জেলে।

গাড়ি গাড়ি ইট বালি সিমেণ্ট এসে পড়ল। জন কুড়িক মিস্ত্রি এক সঙ্গে কাজে লেগেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি সমাধা হওয়া দরকার।

বিনোদ ওদিকে গেলে ছেলেরা কলরব করে ওঠে, কি মশায়, কত উঁচু করবেন আর?

বিনোদ বলে, কি করি বলুন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখুন না যত খুশি—চাঁদ-সূর্য, কালো মেঘ, সাদা সাদা মেঘ। বাইরে তাকিয়ে মুশকিল করেন কি না। দেয়ালেরও কান আছে, কে কোথেকে রিপোর্ট করেছে—

পাঁচিল আকাশচুম্বী হয়ে আড়াল করে দিল ওপারের মানুষ। তবু সকাল-বেলা জনসমুদ্রের গর্জন ক্ষীণ হয়ে এপারে আসে। ভয় লাগে বিনোদের। রক্ষা এই, মুখের গর্জনই শুধু—কামান-গর্জন নয়। এ গর্জনে মনে পীড়া দেয়, কিন্তু পাঁচিল ভাঙে না। মন আরও শক্ত করা প্রয়োজন, তখন কিছুই বিঁধবে না আর মনে।

* * *

পাশা উল্টেছে। দেশ স্বাধীন। কুমুদনাথ একজন মন্ত্রী। ইন্দুরাণী হেসে বলে, রাজবন্দীর বন্দী-দশা কাটল। এবারে রাজা।

কুমুদনাথ জবাব দেন, তমিও ইন্দুরাণী নও আর। ইন্দুটুকু বাদ দিয়ে ডাকব এবার থেকে।

ইংরেজ এত বড় রাজত্ব ছেড়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

কুমুদনাথ বলে, ইচ্ছে করে কি গিয়েছে? এ দেশে থাকা একেবারে অসম্ভব দেখে তখনই পাত্তাড়ি গুটোলো।

ভ্রূকুঁচকে ইন্দু বলে, ভারি ক্ষমতা তো তোমাদের। অস্ত্রের মধ্যে মুখের বক্তৃতা আর কাজের মধ্যে জেলে গিয়ে বহাল তবিয়তে ভালমন্দ খাওয়া, খেলা-ধুলা করা, ঘুমানো—

কুমুদনাথ স্বীকার করে নেয়, তা সত্যি। আমরা কে? ইংরেজ তাড়াল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জেলের বাইরে যারা ছিল, তারাই। রাজা বলতে গেলে—ওরাই তো! আমাদের ভালবাসে, বিশ্বাস করে—ওদেরই সেবার জন্য তাই এই চাকরি দিয়েছে।

পুরো বছর কেটে গেছে। সরকারি বাড়িতে আছে এখন তারা। বড় বড় হল, বিশাল কম্পাউণ্ড, কার্পেট-বিছানো সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি। ইন্দু-রাণীর ষোল বছর একটানা কেটেছে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ছোট ঘরে। সকাল-বিকাল উনুন ধরাতে নাকের জলে চোখের জলে হত। সে সব এখন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

সোম আর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে সাড়ে-ন'টা অবধি কুমুদনাথ দেখা করে সাধারণের সঙ্গে

কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। নিখিল পাশন্যাল-সেক্রেটারি হয়েছে—বিচার-বিবেচনা করে জনকয়েককে একের পর এক নিয়ে আসে দোতলার বসবার ঘরে। টং করে ঘড়িতে আওয়াজ হয় সাড়ে ন'টা বাজবার। নিখিল বাইরে এসে বলে আজকে এই অবধি। আসুন তবে আপনারা। জয় হিন্দ!

ইন্দুরাণী থই পাচ্ছে না এই অনভ্যস্ত পরিবেশে। রোগা একফোঁটা মানুষটি এত বড় বাড়ির মধ্যে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যায়। জেলে না থাকা সত্ত্বেও কুমুদনাথের সঙ্গ তিলার্ধকাল পাওয়া যায় না। জরুরি কাজের জন্যে কোন কোন দিন সন্ধ্যার আগেই সোজা সে বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে ফাইলের মধ্যে ডুবে যায়। ইন্দুরাণী রেকাবিতে ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে দরজার ধারে দাঁড়ায়। পায়ের শব্দে কুমুদ এক নজর তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, কি খবর?

ইণ্টারভিউয়ে এলাম অনেক খোশামুদি করে আমাদের নিখিল বাবুকে। সেই যেমন সেকালে করতে হত, মনে নেই?

বোসো—

ইন্দুরাণী বসল সামনের চেয়ারটায়। সেদিন সকালে এক ব্যাপার হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ আনাগোনা করছিল ইন্দুরাণীর মনের মধ্যে। বলে, আচ্ছা—মানুষ মানুষের কাছে আসবে, তার জন্য অত কড়াকড়ি কেন তোমাদের?

কাজকর্মের অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, কত লোকের কত রকম মতলব থাকতে পারে। সবাইকে তো খুশি করতে পারি নে। করা সম্ভবও নয়।

ইন্দুরাণী বলে, অনেকেই তো খুশি নয় দেখলাম। ফটকে এত লোক এসে হল্লা করে গেল, কি ভয় করছিল যে আমার!

কুমুদ বলে, ভয়ের ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল। খেতে পাচ্ছে না, কাপড়

জুটছে না—মরীয়া হয়ে উঠছে মানুষ। নিখিল ফোন করে দিতে দু-লরি আর্মড-পুলিশ এসে পড়ল। তখন সুড়-সুড় করে সব পালাল।

ইন্দু বলে, পুলিশ-পাহারায় এইরকম থাকতে হবে আমাদের?

শয়তান মানুষের অভাব নেই। সাবধানে থাকাই ভাল।

ইন্দুরাণীর একবার ইচ্ছা হল—বলে, ছেড়ে দাও এ চাকরি; যেমন ছিলে—চলো তেমনি ভাড়াটে-বাড়ির একতলায়। কিন্তু সে জীবনের কথা ভাবতে গেলে এখন শিউরে ওঠে সে। এই প্রাসাদ, এমন রাজভোগ, এত খাতির-প্রতিপত্তি সব জায়গায়।

সে শুধু বলল, ঐ যে ওরা ডান হাতের মুঠো আকাশে ছুঁড়ে হুমকি দেয়—প্রতিকার কর এর একটা।

গম্ভীর হয়ে কুমুদনাথ বলে, হবে বই কি। নিশ্চয় হবে।

ভারে ভারে ইট-বালি-সিমেণ্ট এসে পড়ল। ইন্দুরাণী ঠাট্টা করে বলে, পাঁচিল উঁচু করে রাজাকে বন্দী করবার আয়োজন বুঝি?

কুমুদ বলে, যত সব বজ্জাত লোক—নিচু পাঁচিল টপকে হয়তো বা কম্পাউণ্ডের ভিতরই ঢুকে পড়বে। কিছু বলা যায় না ওদের কথা।

এমনি সময় নিখিল এসে বলল, কণ্ট্রাক্টর একবার দেখা করতে চাচ্ছে। পাঁচিলের এদিকে কাঁটা-তারের বেড়া কি রকম ভাবে হবে, সেইটে ভাল করে বুঝে নিতে চায়।

ইন্দুরাণী সরে গেল। গান্ধিটুপি-পরা কণ্ট্রাক্টর—ফর্সা চেহারা। কুমুদনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মাথা নিচু করে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে কণ্ট্রাক্টর বলে, আমায় স্যার চিনতে পারছেন না? রিটায়ার করার পর কণ্ট্রাক্টরি করছি আজকাল।

মাথার গান্ধিটুপি খুলে ফেলল। টাক চকচক করছে। বিনোদ সমাদ্দার।

শিখ

প্রমথনাথ বিশী

(১৯০২)

১

আকন্দপুর ও মুকুন্দপুর কলিকাতার সন্নিকটে দুইখানি ছোট গ্রাম। দু'খানিকে একটি গ্রাম বলিলেও চলে—কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা দুইটি গ্রাম বলে, আমরাও বলিব। আকন্দপুর মুসলমান গ্রাম, মুকুন্দপুর হিন্দু গ্রাম। এ পাড়া ও পাড়া দুটি গ্রাম। দুই গ্রামের লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য আছে, যাতায়াত আছে—মাঝখানে একটি মাঠ ও একটি পথের মাত্র দূরত্ব।

এই ভাবে তাহাদের চলিতেছিল, এমন কত বৎসর চলিয়াছে কেহ বলিতে পারে না, এবং সবাই ভাবিত এমনি ভাবেই চলিবে। এমন সময়ে কলিকাতায় ১৬ই আগষ্টের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়া উঠিল; সে খবর আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরে পেঁৗছিল। প্রথমে জনশ্রুতিতে পেঁৗছিল। তার পরে ডেলিপ্যাসেঞ্জারের বর্ণনায় পেঁৗছিল, দুই গ্রামের অনেক লোক কলিকাতায় ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি করে—তার পরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সচিত্র ও সরসভাবে পেঁৗছিল। ফলে আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল।

দুই গ্রামই ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের প্রত্যাবর্তনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে—তাহাদের মুখে আধুনিকতম খবর পাওয়া যাইবে। ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল ফিরিলে মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর তাহাদের ঘিরিয়া বসে।

মুকুন্দপুরের হিন্দুদের আসরে বক্তা বলিতে থাকে—ভাইসব, হিন্দু আর রইলো না; আমি স্বচক্ষে দেখেছি পাঁচ হাজার মুসলমানে মিলে অমুক পাড়াটা জ্বালিয়ে দিলো, হিন্দুরা যেমনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি মুসলমানেরা তাদের উপর প'ড়ে তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেললো। একটা প্রাণী বাঁচলো না।

শ্রোতারা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু কেহ শুধায় না, এত হিন্দু মরিল অথচ বক্তা বাঁচিল কি ভাবে?

আকন্দপুরের মুসলমান শ্রোতাদের মধ্যে মুসলমান ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলিতে থাকে—ভাই সব, আল্লার নিতান্ত কৃপায় আমি বেঁচে ফিরেছি। অমুক পাড়ায় আর মুসলমান একটাও নেই—হিন্দুরা সব মেরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, যখন আর একটাও মুসলমান পেলো না, হিন্দুরা গোরস্থান থেকে মুসলমানের দেহ তুলে তাদের পুনরায় হত্যা করলো।

শ্রোতারা ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে। সকলেই বুঝিতে পারে তাহাদের সংবাদ দানের উদ্দেশ্যেই আল্লা বক্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরের আসর জমে, এবং নিত্য নূতন উত্তেজনার আগুনে তাহারা হাত পা তাতায়। কোন দিন খবরে ন্যূনতা জন্মিলে শ্রোতারা অসন্তোষ প্রকাশ করে—ফলে বক্তাকে প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে সুর ও রং চড়াইয়া বক্তৃতা করিতে হয়।

এইরূপ প্রত্যক্ষদর্শন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা শুনিয়া হিন্দুরা ভীত ও মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়। যদি জিজ্ঞাসা করো, এক শ্রেণীর সংবাদে দুই দলের এমন ভিন্ন ব্যবহার কেন? তবে বলিব, যাহার যেমন স্বভাব। হিন্দুরা চিরকাল ভীত ও মুসলমানেরা সর্বত্র উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন?

ইতিমধ্যে আকন্দপুর ও মুকুন্দপুরের সৌহার্দ্য ও বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান কেহ অপরের গ্রামে প্রবেশ করে না, দূর হইতে একে অপরকে দেখিলে সন্দিগ্ধভাবে তাকায়, পরস্পরের চাদরের তলে কি আছে অনুমান করিতে চেষ্টা করে—এবং যে যাহার গ্রামের দিকে দ্রুত প্রস্থান করে।

মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর রাত্রি জাগিয়া গ্রাম পাহারা দেয়, দিনে পালাক্রমে ঘুমায়, আর দিনে রাতে জটলা পাকাইয়া বসিয়া তামাক খায়। দুই গ্রামেরই তামাকের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

একদিন মুকুন্দপুরের সংবাদদাতা হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। শ্রোতারা শুধাইল—ব্যাপার কি?

সংবাদদাতা বলিল—শিখ।

সবাই শুধাইল—সে আবার কি?

সংবাদদাতা বলিল—কলিকাতায় যে কয়টি হিন্দু আজো জীবিত আছে সে কেবল শিখদের দয়াতে।

এই বলিয়া সে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পঞ্চাশ জন শিখে পঞ্চাশ হাজার মুসলমান মেরে নিকেশ ক'রে দিয়েছে।

কেহ শুধাইল—শিখ কি?

কেহ বলিল—এক রকম কামান।

কেহ বলিল—উড়ো জাহাজ।

সংবাদদাতা বলিল—পশ্চিমে হিন্দুর নাম শিখ, লম্বা চওড়া চেহারা, মস্ত চুল, ইয়া গোঁফ দাড়ি, হাতে লোহার বালা।

শ্রোতাদের একজন বলিল যে, সে একবার কলিকাতায় গিয়া মোটর গাড়ীতে একটা শিখ দেখিয়াছে—ওই রকমই চেহারা বটে।

তখন আর একজন বলিল—ভাই জনকয়েক শিখ এনে গাঁয়ে রাখা যাক না।

অপর একজন বলিল—একজনই যথেষ্ট। আকন্দপুরে আর ক'টা মুসলমান।

সংবাদদাতা বলিল—ভাই, শিখ আনা মুকুন্দপুরের কর্ম নয়। তারা প্রত্যেকে রোজ দেড় মণ গম, আধ মণ ছোলা, পনেরো সের আটা, আড়াই সের ঘি খায়—তাছাড়া নগদ পাঁচশ টাকা নেয়। পারবে? কল্‌কাতায় বড় লোকেরা আট দশ জন করিয়া শিখ পুষিতেছে। আমরা পারবো কেন?

সকলেই বুঝিল শিখ-পোষণ তাহাদের সাধ্যাতীত—তবু এ হেন শিখ যে ধরাধামে আছে ইহাতেই তাহারা কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল।

আকন্দপুরের আসরে সংবাদদাতা তখন মুসলমান শ্রোতাদের বলিতেছিল—ভাইসব, আল্লা বুঝি আমাদের কথা ভুলে গিয়েছেন, নইলে পাঁচটা শিখে পাঁচ হাজার মুসলমানকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে পারবে কেন?

একজন শ্রোতা বলিল—কেন মুসলমানদের কি শিখ নেই।

সংবাদদাতা বলিল—পাবে কোথায়?

পূর্বোক্ত শ্রোতা বলিল—কিনে আনলেই পারে।

সংবাদদাতা উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিল—শিখ অস্ত্র নয়।

একজন শুধাইল—তবে কি বোমা?

সংবাদদাতা বলিল—শিখ এক রকম হিন্দু। যেমন লম্বা চওড়া, তেমনি সাহসী, তেমনি বলবান!

সবাই শুধাইল—শিখ কেমন ক'রে চিনবো?

সংবাদদাতা বলিল—তাহাদের লম্বা চুল, প্রচুর গোঁফ দাড়ি, আর হাতে তাদের লোহার বালা। সেই বালার ঘায়েই তারা মাথা ফাটিয়ে দেয়।

এই বলিয়া সে সকলকে সাবধান করিয়া দিল—ভাইসব, কোন লোকের হাতে লোহার বালা দেখ্‌লে কাছে ভিড়োনা, সে শিখ।

সকলে ভাবিল—মুকুন্দপুর ভাগ্যে এখনো শিখ আনে নাই।

একজন বলিয়া উঠিল—ভাই, ওরা যদি শিখ আনে!

সংবাদদাতা বলিল—আল্লার কাছে প্রার্থনা করো ওদের যেন তেমন মতি না হয়।

অপর একজন বলিল—তবু যদি আনে—তখন?

সংবাদদাতা বলিল—তাহলে গ্রাম ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় থাক্‌বে না।

তাহার উত্তর শুনিয়া সকলে মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল, তামাক খাইতেও উদ্যম হইল না।

মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে জপিতে লাগিল—শিখ, শিখ, শিখ।

২

একদিন রাত্রে মুকুন্দপুরের হিন্দুগণ সচকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মুসলমান, মুসলমান এসেছে, পালাও, পালাও।

অমনি হিন্দুরা বাড়ীঘর ফেলিয়া, স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া কচুবনে গিয়া লুকাইল। এই জন্যেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর বাড়ীর পাশে একটি কচুবন সযত্নে লালন করিয়া থাকে। কচুবনে লুকাইয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—স্লা-অহিংসা প্রচার ক'রে আমাদের কী সর্বনাশই না করেছে, নইলে একবার দেখে নিতাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিল কোন মুসলমান আসিল না—তৎপরিবর্তে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ লণ্ঠন হস্তে বাহির হইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল—কই গো তোমরা কোথায়? ছেলে মেয়েরা ডাকিতে লাগিল—বাবা, কাকা, দাদা—কই তোমরা?

কচুবন হইতে উত্তর হইল—মুসলমান খুঁজতে এসেছিলাম—না। বেটারা পালিয়েছে।

মুকুন্দপুর সে রাত্রে বলাবলি করিতে লাগিল—আহা যদি একটা শিখ পেতাম।

সে রাত্রে আকন্দপুরের মুসলমানগণও চঞ্চল হইয়া উঠিল—ওরা হিঁদুদের দেখিতে না পাইয়া বলিল—ভাগ্যিস ওদের গ্রামে কোন শিখ নেই। তাহলে আজ কারো রক্ষা ছিল না।

পরদিন মুকুন্দপুরে একজন শিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেমন করিয়া আসিল, কি জন্য আসিল, কে তাহাকে প্রথম দেখিতে পাইল, কেহ জানে না, আমরাও জানি না। তবে সে যে শিখ তাহাতে কাহারো সন্দেহ রহিল না। কলিকাতার পথে ঘাটে, মোটরে ট্যাক্সিতে যেমন শিখ দেখিতে পাওয়া যায়—অবিকল তেমনি। তাহার চুল লম্বা, দাড়ি গজাইয়াছে, আকৃতি দীর্ঘ, হাফ প্যাণ্ট পরিহিত, আর অনেকদিন বাংলা দেশে আছে বলিয়া বাংলা ভাষাটা শিখিয়াছে। মুকুন্দপুরের অধিবাসীরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—কেহ বলিল, শিখজী, কেহ বলিল, পাঁয়জী, কেহ বলিল, সর্দারজী। শিখজী প্রত্যুত্তরে কেবল হাসিল। সকলে সেই হাসির অমৃতটুকু বাটিয়া লইয়া পান করিল। একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার, শিখ সম্বন্ধে সে বিশেষজ্ঞ, কারণ একদিন বাস-এর ভাড়া না দিয়া নামিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে কন্‌ডাক্টার তাহাকে আচ্ছা করিয়া কয়েক ঘা মারিয়াছিল, সেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারটি শিখের বাম হাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সকলে দেখিল তাহার বাম হাতে একটি লোহার তাগা! শিখের অব্যর্থ লক্ষণ।

সকলে বলিল—সর্দারজী, তোমাকে আমাদের গ্রামে থাকতে হবে।

শিখ রাজি হইল।

তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহার ভোগের জন্য যথাসাধ্য ছাতু, ডাল, রুটি, পেঁয়াজ ও মৎস্য মাংসাদির ভোগ জোটাইতে থাকিল। শিখ বৈঠকখানার দরজা ভেজাইয়া একখানা তক্তপোষের উপরে শুইয়া পড়িল। মুকুন্দপুরের সাহস বাড়িয়া গেল।

সংবাদটা ক্রমে আকন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল—মুকুন্দপুর একটি শিখ আনিয়াছে। আকন্দপুরের মুখ শুকাইল।

একজন বলিল একবার খোঁজ নিয়ে আসা দরকার।

কিন্তু যাইবে কে? এর চেয়ে যে সাপের গর্তে হাত দেওয়া সহজ।

তখন একজন সাহসী মুসলমান বলিল—আমি যাইব। সে জাহাজের খালাসী। জাহাজে চাপিয়া দেশ বিদেশে গিয়াছে, কত ঝড় ঝাপটা সহ্য করিয়াছে—তাহার সাহস না হইবার কথা নয়। সে গণৎকারের বেশ পরিধান করিয়া ফোঁটা তিলক কাটিয়া ঝোলাঝুলি লইয়া মুকুন্দপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—নৈমুদ্দি ফিরলে হয়।

নৈমুদ্দি মুকন্দপুরে প্রবেশ করিবামাত্র হিন্দুরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল—মুসলমান বলিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না—আর পারিলেই বা কি? গণৎকারের কোন জাতি নাই।

সকলে শুধাইল—বাবাজী, আমাদের গাঁয়ের কোন বিপদ আছে কিনা বলো তো।

গণৎকার গাঁয়ের একজনের হাত দেখিয়া বলিল—বিপদ ছিল বটে, তবে কেটে গিয়েছে, কারণ একজন বীর পুরুষ তোমাদের গাঁয়ে এসেছেন।

তাহার কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল, বলিল—ঠিক। তখন সকলে গণৎকারকে শিখের নিকটে লইয়া গেল, বলিল—বাবাজী একবার সর্দারজীর হাতখানা দেখ তো।

শিখ কৌতূহলে হাত বাড়াইয়া দিল। নৈমুদ্দি ভালো করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার চুল দাড়ি আকৃতি দেখিল, কিন্তু যখনি তাহার বাম হাতের তাগা দেখিল তাহার মুখ শুকাইল, গা কাঁপিতে লাগিল, কম্প উপস্থিত হইল, মূর্ছা হয় আর কি। গণৎকার বলিল—আমার জ্বর এসেছে, আমি চল্‌লাম। এই বলিয়া সে ঝুলি ঝোলা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল এবং সোজা আকন্দপুর পৌঁছিয়া বলিল—ভাইসব, আল্লার নাম করো, আর রক্ষা নেই। মুকুন্দপুরের শয়তানরা শিখ এনেছে। তার বাঁ হাতে লোহার তাগা।

এই কথা শুনিয়া আকন্দপুরের মুখ শুকাইল, অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে রওনা হইল, যাহারা থাকিল নিতান্ত বাধ্য হইয়াই থাকিল। তাহারা উচ্চস্বরে আল্লার নাম করিতে লাগিল।

এদিকে মুকুন্দপুরের সাহস ও আনন্দের অবধি রহিল না। আর কচুবনে লুকাইতে হইবে না। ভরসায় কোন কোন সাহসী পুরুষ কচুর শাক সমূলে উৎপাটন করিয়া কলিকাতায় গিয়া উচ্চমূল্যে বেচিয়া আসিল। কিন্তু যেমন তাহাদের সাহস বাড়িল, তেমনি খরচও বাড়িল। কারণ শিখের খাদ্য ভীমের খাদ্য। মুকুন্দপুর ধার করিয়া, চাঁদা তুলিয়া ছোলা, রুটি, মৎস্য মাংস প্রভৃতি শিখের ভোগ জোগাইতে লাগিল। শিখ নিজে রাঁধিয়া খায়। কাজেই আহার্য দ্রব্যগুলি সকলে শিখের ঘরে রাখিয়া দিয়াই খালাস। শিখ সারাদিন একাকী ঘরে বসিয়া থাকে, বাহিরে আসে না, কেহ তাহার ঘরে সাহস করিয়া ঢোকে না। জানালার ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে দেখে শিখজী আছে কিনা। শিখজী অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকে, কখনো কখনো পায়চারি করে—আর আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলে না।

সেই ডেলিপ্যাসেঞ্জারটি সকলকে বুঝাইয়া বলে—এ কি তোমাদের বাঙালী যে গল্প গুজব ক'রে সময় কাটাবে! এ যে শিখ!

সকলে ভাবে, অনেক ভাগ্যে তাহারা একজন শিখ পাইয়াছে।

মুকুন্দপুরের একজন সাহসী লোক দূর হইতে আকন্দপুরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বলিল—ওরা সব পালিয়েছে, কেবল দু'চার জন মেয়েছেলে মাত্র আছে।

একজন সাহসী হিন্দু বলিল—চলো, এবারে ওদের গ্রাম লুঠ করে আসি।

তাহার কথায় সকলেব মুখ শুকাইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, কেহ কেহ মূর্ছিত হইয়া পড়িল, যাহাদের বাক্‌শক্তি তখনো ছিল তাহারা বলিল—গান্ধী—যে হিংসা করতে নিষেধ করেছে, নইলে একবার দেখিয়ে দিতাম হুঁ—হুঁ আমরা কি আজকার লোক...

ইতিমধ্যে কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দাঙ্গা থামিয়া আসিল। একজন ডেলিপ্যাসেঞ্জার আসিয়া বলিল—আর ভয় নেই। কলিকাতায় শিখেরা সব মুসলমান মেরে ফেলে দিয়েছে—সেখানে সব শান্ত।

ইহা শুনিয়া সকলে শোভাযাত্রা করিয়া শিখের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শিখজীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জনতার মধ্যে একজন শিক্ষক ছিল সে বন্দীবীর কবিতাটি আবৃত্তি করিল। তখন সকলে সাহসে ভর করিয়া ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—শিখ অন্তর্ধান করিয়াছে।

সকলে শুধাইল—শিখজী কোথায় ?

তখন সবচেয়ে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলিল—প্রয়োজনকালে যিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, প্রয়োজন ফুরোতে তিনিই নিয়ে গিয়েছেন। এই বলিয়া সে সন্তবাণি যুগে যুগে আবৃত্তি করিল। সকলে যুক্তকরে জগদম্বার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

*　　　*　　　*

পরদিন মুকুন্দপুরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন—আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। আমার ছেলেটি, একই ছেলে আমার, লায়েক ছেলে, এমন ছেলে হয় না—এই বলিয়া একবার চোখ মুছিলেন। তারপরে বলিতে লাগিলেন—হঠাৎ তার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়, করলাম ডাক্তারি, কবরেজি, টোট্‌কা, এমন কি কাঁচড়াপাড়ার তাগা কিছুই বাদ দিইনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হ'ল। ক'দিন আগে সে ঘরের দরজা খুলে, পালিয়ে গিয়েছে। কত জায়গায় খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছি। একজন বল্‌লে—ক'দিন আগে এই গাঁয়ের দিকে এসেছিল। আপনারা কি দেখেছেন ?

শ্রোতারা ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—আহা, বড়ই দুঃখের কথা! কিন্তু এদিকে তো আসে নি।

অপর একজন শুধাইল—কি রকম চেহারা বলুন তো—

ভদ্রলোক বলিলেন—দীর্ঘ আকৃতি, চুল দাড়ি অনেক কাল না কাটবার ফলে লম্বা হ'য়েছে, কারো সঙ্গে বড় কথা বলে না, আপন মনে বিড় বিড় ক'রে একা থাক্‌তেই ভালোবাসে, আর বাঁ হাতে আছে একটা লোহার তাগা!

বর্ণনা শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইল।

তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন—বর্ণনায় কাজ কি—একখানা ছবিও সঙ্গে আছে।

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিলেন। ছবির দিকে তাকাইয়া শ্রোতার দল সমস্বরে বলিয়া উঠিল—শিখজী!

পিতা একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, অনেকটা সেই রকমই দেখতে হ'য়েছিল, বাড়ন্ত বয়স কিনা!

আর্টিস্ট

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(১৯০৩)

দুপুর বেলা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলুম, শুনলুম আমার নামে কোত্থেকে এক টেলি এসেছে।

চিঠির মোড়ক না খোলা পর্যন্ত শিহরিত আঙুলের মুখে অর্ধোচ্চারিত প্রত্যাশার ভাষা, টেলির বেলায় সব সময়েই একটা মূঢ়, নিরবয়ব আতঙ্ক।

স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি। টেলি এসেছে সুদূর লামডিং থেকে। চুনী—আমাদের চুনী আসামের জঙ্গলে মাত্র দশ ঘণ্টার ম্যালেরিয়ায় অকস্মাৎ মারা গেছে।

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম। শীতের আকাশে কোথাও যেন আর এক ফোঁটা রোদ নেই। যেন একটা আর্দ্র, আহিম অন্ধকার আমার সমস্ত অস্তিত্বকে সহসা পিষে ধরেছে। অলস, ম্রিয়মান রোদে গা ভিজিয়ে খানিক আগে মনে-মনে কবিতার উড়ু-উড়ু মৃদু কয়েকটা লাইনে কল্পনার তা দিচ্ছিলুম, তারা স্তব্ধতার শূন্যে গেল হারিয়ে। চুনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি কবিতারও অকাল মৃত্যু ঘটল।

কী যে করা যায় কিছু ঠিক করতে পারলুম না। চলে গেলুম রমেশের আপিসে। টাইপ-রাইটারের উপর একসঙ্গে তার দুই হাত চেপে ধরে বললুম,—ভীষণ দুঃসংবাদ।

—কী? রমেশের আঙুলগুলো আমার হাতের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে এল।

পকেট থেকে বের করে দেখালুম টেলি। আমাদের চুনী আর নেই।

—বলিস কী? রমেশ চেয়ারের পিঠে পিঠটা ছেড়ে দিলো: আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। এমন দুর্দান্ত ছিল ওর প্রাণশক্তি। হাতের মুঠোটা বাঘের থাবার মত প্রচণ্ড। দুই চোখে ঝড়ের কাল দীপ্তি। গলায় যেন বাজ ডাকছে। তার মৃত্যুটা যেন সূর্যের আকস্মিক নির্বাপণের মতোই অসম্ভব।

—বরং আত্মহত্যা করলেও বিশ্বাস করতুম। শেষকালে ম্যালেরিয়ায় মরে যাওয়া? রমেশ ভয়ে হেসে উঠলো: কে করেছে টেলি? কে এই অমরেন্দ্র?

—লামডিং-এর কোনো বন্ধু বা আত্মীয় হবে হয়তো। যেখানে গিয়ে উঠেছিল। টেলিটা উলটে-পালটে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললুম: পরে চিঠি আসবে লিখেছে।

—কিন্তু লামডিং ও গেল কবে? এই সেদিন তো ওকে ম্যানাস্‌ক্রিপট বগলে করে কর্ণয়ালিশ ধরে যেতে দেখলুম।

—এই সেদিন, সেদিনও আমার কাছে এসেছিলো ওর একটা গল্পের ইংরিজি অনুবাদ করে দিতে পারি কি না। টাকার ভীষণ দরকার, অথচ মাথায় নাকি কিছু নতুন গল্প নেই। অনুবাদটা পেলে বোম্বাই না কোথাকার কী কাগজ থেকে কিছু পেতে পারে সম্প্রতি। অথচ তার আগেই—

রমেশ দুই হাতে তার টাইপ-রাইটারের চাবি টিপতে লাগল। বললে,—টাকা, টাকার জন্যে শেষকালটা কেমন মরিয়া হয়ে গেছল। না হ'য়ে বা উপায় কী! কত বললুম কোথাও একটা আপিসে-টাপিসে ঢুকে পড়—সাহিত্য করে কিছু হবে না। কে শোনে কার কথা! কী গোঁ, কী সতীত্ব, মরবে অথচ ধর্মভ্রষ্ট হবে না। যাক, রমেশ আবার চেয়ারে হেলান দিল: ভাগ্যিস বিয়ে করে রেখে যায় নি।

—কিন্তু সমস্যাটা তাতে বিশেষ প্রাঞ্জল হয়েছে বলে মনে হয় না। বললুম, বিধবা মা, তিনটি ছোট বোন, বড়োটির প্রায় বিয়ের বয়েস, এক দাদা আছেন—ট্র্যাম-য়্যাকসিডেণ্টে আজ বছর দুই ধরে প্যারালিটিক, বিছানায় শোয়া—তারো আছে ক'টি ছেলে-পুলে, সমস্ত সংসার ছিল চুনীর মাথার উপর। সমস্ত সংসারে শুধু ওই ছিল রোজগেরে—লিখে-টিখে যা পেত এদিক-ওদিক। এখন কী যে উপায় হবে কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

রমেশ বললে,—বাড়িতে জানে?

—কী করে জানবে? বোধ হয় নয়। বোধ হয় আমাকেই গিয়ে বলতে হবে। আপাদমস্তক শিউরে উঠলুম: তুইও আমার সঙ্গে যাবি, রমেশ।

—কিন্তু আগে খোঁজ নেয়া দরকার। অমরেন্দ্র না-কার আগে সবিস্তারে চিঠি আসুক। কোনো শত্রুর কারসাজি নয় তো? রমেশ চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল: আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছি না, চুনী আর নেই—আমাদের সেই চুনী।

বিশ্বাস করা এমনিই শক্ত। টেলির আঁকাবাঁকা নীলচে ক'টি অক্ষর ছাড়া আর কোথাও এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। স্পষ্ট দিবালোকে পৃথিবী তার অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বললুম,—মানুষের মৃত্যুটা সবসময়েই ভীষণ সত্যবাদী। তার আকস্মিকতা-তেই সে বেশি স্পষ্ট, বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখন কী করা যায়? ওর মা'র কাছে গিয়ে কী করে এই খবর দেব?

—দাঁড়া, ভেবে দেখি। আমিও তোর সঙ্গে যাব। রমেশ আমার হাত

ধরে টান মারলো : চল্ টিফিন্-রুমে। দু' কাপ আগে চা খেয়ে নিই। গলাটা আমার শুকিয়ে আসছে।

রমেশকে নিয়ে সন্ধ্যাসন্ধিতে চুনীদের বাড়ি গেলুম। নোংরা, অন্ধ একটা গলির শেষ-প্রান্তে, তা-ও ভিতরের দিকে, দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট, নিচু একটা গর্ত। শীতের সন্ধ্যায় স্যাঁতস্যাঁত করছে। এ বাড়ির বাতাস কোনোদিন যেন রোদের মুখ দেখে নি। অন্ধকারটা যেন কালো মস্ত একটা মরা পাখির মতো তার ভারি পাখায় ঘর জুড়ে পড়ে আছে।

খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই চোখ একটু সজুত হয়ে এল।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল : কে?

—আমি, আমি প্রসাদ। আমাব সঙ্গে এই আমার একটি বন্ধু।

কাঁথার তলা থেকে চুনীব মা উঠে এলেন। বয়সে যত নয়, দারিদ্র্যে গেছেন জীর্ণ হয়ে। বললেন,—এসো, এসো, তোমাদের কাছেই খবর পাঠাবো ভাবছিলুম। চুনী কোথায় গেছে বলতে পারো?

শুকনো একটা ঢোক গিলে বললুম,—কেন, চুনী বাড়ী নেই?

—কলকাতায়ই নেই। তিন দিন হল, গেল-বেস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো, আর তার কোনো পাত্তাই নেই। তোমাদের সঙ্গে ওব দেখা হয় নি?

—না তো। অনেক দিন দেখা নেই বলে আমরাই বরং ওর খোঁজ নিতে এসেছিলুম। কোথায় গেছে কিছুই বলে যায় নি?

—সে ছেলে আবার বলবে! মা অবহনীয় দুর্বলতায় মেঝের উপর বসে পড়লেন : যা মুখে এল তাই না আমাকে বলে পাগলটার মতো বেরিয়ে গেল। তারপর একটিবারের জন্যেও এমুখো হবার নাম নেই। সামান্য একটা চিঠি পর্যন্তও নয়। মা হঠাৎ কান্নার অসহায়তায় ফুঁপিয়ে উঠলেন : আমি তো তোমাদের দেখে ভাবছিলুম তোমরা আমার চুনীর কিছু খবর নিয়ে এসেছ।

গলাকে যথাসম্ভব তরল রাখবার চেষ্টা করলুম। বললুম,—আমার সঙ্গে কম-সে-কম প্রায় দুই হপ্তা দেখা নেই। নতুন এক কাগজ বেরুচ্ছে তাই ওর একটা লেখা চাইতে এসেছিলুম। তা—ও হঠাৎ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল কেন?

—আর বোলো না। মার কান্না এবার শব্দে প্রতিহত হতে লাগল : বাড়িওলা সেদিন বাড়ি এসে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল, ওকে বলেছিলাম তার একটা প্রতিবিধান করতে। ও ক্ষেপে উঠে বললে, বাড়ি-ওলাকে ও এখুনি গিয়ে খুন করে আসবে। আমি টিটকিরি করে বলেছিলুম,

ওর ন্যায্য টাকা দিতে পারিস না, আবার মুখ করিস কার ওপর ? করবেই তো তাকে অপমান যে ঠাট করে মাসের পর মাস পরের বাড়িতে থাকবে অথচ ভাড়ার টাকা গুনতে পারবে না। তার আবার কিসের মা, কিসের কী ? এই না বলা, আর ছেলের সমস্ত রক্ত গেল মাথায় উঠে। দু'হাতে জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে ছত্রখান করে দিয়ে যা মুখে এল তাই আমাকে বলতে-বলতে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

গলায় হাসির আমেজ এনে বললুম,—কী বললে ?

—সে আমি মুখে বলতে পারব না। মুখে ওর কোনোদিন কিছু বাধে নাকি ?

—না, বলুন, আমাদের বলতে কী বাধা ?

মা দুই হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন : বললে, 'পারব না, পারব না আমি এই গুষ্টি গেলাতে। আমি কে, আমার কী, আমি কেন তোমাদের সবাইকে খাওয়াতে যাব ? আমি একা, আমাকে সবাই মিলে তোমরা বাঁচতে না দাও, আমার মরণ তোমরা কি করে বন্ধ করতে পারবে ? আমি মরবো, আমি মরবো, মা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন : যা মুখে এল তাই বলতে-বলতে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। ভাতের থালাটা পর্যন্ত ছুঁলো না।

ঘরের মৃত, ঠাণ্ডা অন্ধকার মুখের উপর প্রেতায়িত নিশ্বাস ফেললে। অন্ধকারে যেন অস্তিত্বের কোন সীমা খুঁজে পেলুম না।

পিছন থেকে রমেশ বলে উঠল : একেবারে ছেলেমানুষ।

—এমনি ছেলেমানষি আরো কতোবার করেছে, রাগারাগি করে কতোদিন গেছে ঘর থেকে বেরিয়ে, আবার একটি দিন পুরো যেতে-না-যেতেই কোত্থেকে নিয়ে এসেছে টাকা জোগাড় করে—এমন করে একসঙ্গে এতোদিন আমাদের ফেলে রাখে নি। কী যে মুশকিলে পড়েছি, প্রসাদ, কী বলব ? হাঁড়িতে একটা কুটো পর্যন্ত নেই—ছেলেপুলেগুলো কাল থেকে ঠায় উপোস করে আছে। তোমরা একটু খোঁজ করে রাগ ভাঙিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারো ? ও নিজেই বা এতোদিন কী করে থাকতে পারছে চুপ করে ? ও জানে না আমাদের অবস্থা ? ও জানে না ও ছাড়া আমাদের কী গতি হবে ?

রমেশ জিগ্গেস করলে : লামডিংএ অমরেন্দ্র বলে আপনাদের কেউ আছে জানেন ?

—অমরেন্দ্র ? মা চমকে উঠলেন : কেন ? অমরেন্দ্র তো আমার দূর সম্পর্কের বোনপো হয়। লামডিংএ তার মস্ত কাঠের কারবার। কেন, তার কী হলো ?

—না, কিছু হয়নি। একটা উড়ো খবর শুনেছিলুম চুনী নাকি লামডিংএ গেছে সেই অমরেন্দ্রের কাছে।

—পাগল। তার হবে আবার সেই সুমতি! অমরেন্দ্র তার কারবারে ওকে নেবার জন্যে কতো ঝোলা-ঝুলি, পেরেছে ওকে বাগ মানাতে? ব্যবসা বা চাকরী ওর দু' চক্ষের বিষ। ওর তপস্যা হচ্ছে সাহিত্য, খেতে না পাক, গুষ্টি-সুদ্ধু মরুক সবাই মিলে, তবু ও ছাড়বে না ওর নেশা। ওটা ওর কাছে ঠিক ধর্মের মতো। বলে, যার যা কাজ মা, যার যা ব্রত। বলে, তুমি বলতে পারো আগুনকে তুমি পোড়াতে পারবে না, দিতে পারবে না আলো, হতে পারবে না লাল? তেমনি মা আমি। আমার যা করবার তাই আমি করব, তাই আমি করব আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ও যাবে লামডিং, অমরেন্দ্রের কারবারে! উদ্বেগে অস্থির হয়ে মা আবার উঠে দাঁড়ালেন: তা হ'লে তো অমরেন্দ্রই আমাকে আহ্লাদে একেবারে টেলি করে খবর দিতো। লামডিংএ যাবে বলে তোমাদের কাছে ও কিছু বলেছিল নাকি?

—না, বলে নি ঠিক, তবে হ্যাঁ, শুনেছিলুম যেন কোথায়, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। রমেশ হাঁপিয়ে উঠল।

মা আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন: যে করে পারো ওর একটা খবর এনে দাও আমাকে। আমি এমনি করে যে আর পাচ্ছি না। এতদিন ধরে রাগ করে থাকবার ছেলে তো ও নয়। ও যে মা'র দুঃখ ভীষণ বুঝতো, সবায়ের দুঃখ।

বললুম,—না, নিশ্চিন্ত থাকুন, খবর এনে দেবো ঠিক। কোথায় আবার যাবে?

রমেশ তার মনিব্যাগ থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করল। আমি তো অবাক।

রমেশ বললে,—এ সামান্য ক'টা টাকা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। ক'টা দিন চালান যতদিন না চুনীর খবর পাওয়া যায়।

মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে গেলেন: না, না, তা কি হয়? চুনী জানলে মনে করবে কী? আবার ক্ষেপে যাবে, আবার যাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে। ওকে তোমরা চেনো না।

—না, এটা ওকে ওর গল্পের জন্যে অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি মাত্র, ওর গল্প আমরা চাই-ই। রমেশ নোট দুটো কোনো রকমে মা'র হাতে গুঁজে দিল।

খবরটা কিছুতেই ভাঙতে পারলুম না। দু' দিন ধরে সমস্ত পরিবার ঠায় উপোস করে আছে।

কিন্তু রমেশের ব্যবহার সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করেছে। বরং কঞ্জুস বলেই

তার একটু অখ্যাতি ছিল, বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে আঙুলের ফাঁকে একটি পয়সাও তার গলতো না। সে কিনা অনায়াসে কুড়ি-কুড়িটে টাকা বার করে দিলে। চুনীর ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু হায়, বন্ধুর এই মহানুভবতা দেখবার জন্যে আজ সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে বা বেঁচে থাকতে অবিশ্যি তার উপর আমরা এমন মুক্তহস্ত হতে পারতুম না।

অমরেন্দ্রের চিঠির জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বন্ধুদের মধ্যে একবার ঠিক হয়েছিল লামডিংএ কাউকে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সেই দিনই দুপুরে অমরেন্দ্রের চিঠি এসে হাজির। সমস্ত ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার আগে প্রায় সাড়ে ন'টার সময় তার জ্বর আসে—দেখতে দেখতে একশো পাঁচ, ছয়, সাত উঠে এল মাথায়। যাকে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়া। চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। ডাক্তার, ইন্‌জেক্‌শান, আইস্‌ব্যাগ—ষ্টেশন থেকে দু'মন বরফ পর্যন্ত আনানো হয়েছিল। লোকজন সেবা-শুশ্রূশা—যতদূর হ'তে পারে। তবু কিছুতেই কিছু হলো না। জ্বর নেমে গেল প্রায় চারটের কাছাকাছি, সঙ্গে-সঙ্গে সব গেল নিবে; জল হয়ে। দশ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

তারপর চিঠিতে খবরের কাগজের ভাষায় অমরেন্দ্র দীর্ঘ এক বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, বাঙলা দেশের আকাশ থেকে একটি উদীয়মান, উজ্জ্বলন্ত নক্ষত্র হঠাৎ খসে পড়ল। তার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্যে তার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের অবহিত হওয়া উচিত। বাঙলা-সাহিত্যের যা ক্ষতি হল—সে আর এক শোকাবহ, দীর্ঘ বক্তৃতা। অমরেন্দ্রের কারবার এখন ভারি মন্দা, চারদিক দেখতে-শুনতে হচ্ছে, তাই এই দুঃসময়ে মাসিমার সঙ্গে এসে সে দেখা করতে পারছে না। তবে চুনীর জন্যে কোনো মেমোরিয়্যাল ফাণ্ড তৈরী হলে সে একুনে একশো টাকা দিতে রাজি আছে।

মনে-মনে হাসলুম। চুনী আজ নেহাৎ মরে গেছে বলেই, তোমার ব্যবসার মন্দায়মান অবস্থা সত্ত্বেও, তুমি এক কথায় একশো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলে। কিন্তু যতদিন ও বেঁচে ছিল, ততদিন ভুলেও হয়তো একখানা পোষ্টকার্ড খরচ করে ওর খবর নাওনি। বাঙলা-দেশের আকাশ থেকে একটা তারা-ই খসেছে বটে। সে-খবরটাই শুধু পেলে, কিন্তু কখন সেটা উঠেছিল বলতে পারো?

চুনীলালের জীবনের সমস্ত ছবিটি আমার মনে পড়ল। সে সেই জাতের সাহিত্যিক ছিল না যারা পয়সার জন্যে জনসাধারণের মুখ চেয়ে সাহিত্যকে জার্নালিজমের পর্যায়ে নিয়ে আসে। তাতে তার নিজের তৃপ্তি কী হত ছাই কে জানে, পয়সা হত না। এ-পর্যন্ত কেঁদে-ককিয়ে বই লিখেছে সে মোটে

পাঁচখানা—তাও প্রকাশকের ফরমায়েসে নয়, নিজের তাগিদে, বই ছাপাতে তার তাই বেগ পেতে হত ভীষণ, জনসাধারণের কথা না বলে সে নিজের কথা বলবে—এই আস্পর্ধার জন্যে তাকে দাম বলে যা নিতে হত সেটাতে তার কাগজ ও কালির দাম উঠে আসত কিনা সন্দেহ। অথচ সে আমার মতো শীতের রোদে ইজিচেয়ারে আধখানা শুয়ে কবিতায় গলে যেতে বসেনি, নেমে এসেছিল সে গদ্যের রূঢ় বন্ধুরতায়। তবু কেন যে সে বেশি লিখছে না, লেখাটাকে বুদ্ধিমানের মতো করে তুলছে না একটা অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যা, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য ছিল। জিগ্‌গেস করলে বলত: কী লিখব, কাদের জন্যে লিখব? মূর্খ পাবলিকের বুদ্ধির সমতলতায় সে নেমে আসতে পারে নি, তাই তার উপর ভাড়াটে ছুটো সমালোচকরা প্রসন্ন ছিল না। আর চুনীলাল লিখেই খালাস, একবার চেয়েও দেখত না বইয়ের সম্পর্কে আর তার কোনো কর্তব্য থাকতে পারে কিনা। বইয়ের কাটতির জন্যে বিজ্ঞাপন লেখার কসরৎও যে সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ, সে বিষয়ে তার অজ্ঞান ছিল অভ্রভেদী। ঘরে-বাইরে এখানে-ওখানে নিজের বইয়ের ঢাক পেটাবার সূক্ষ্ম কৌশলটা এতদিনেও সে আয়ত্ত করতে পারে নি। বন্ধু-বান্ধব ধরে কী করে সভা-সমিতি ডাকানো যায়, কী করে আদায় করা যায় প্রোফেসরদের সার্টিফিকেট, কারু কোনো অসংলগ্ন মৌলিক উক্তিকে কেমন ছলনা করে ছাপার অক্ষরে টেনে আনা যায়—সাহিত্য-ব্যবসায়ের এ সব প্রাথমিক আবাল-বৃদ্ধজ্ঞেয় নীতি সম্বন্ধে সে ছিল একেবারে নিশ্ছিদ্র। তবুও তাকে কিনা আসতে হয়েছিল এই সাহিত্যে—এই সাহিত্যিক উপজীবিকায়। নিয়তির সামনে তার পুরুষকার টিকতে পারল না।

চুনীর মৃত্যুর খবরটা পরদিন দৈনিক কাগজে সমারোহে ছাপা হয়ে গেল। আজ আর কেউ চুনীকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত নয়: একজন তরুণ বাঙালি সাহিত্যিক অকালে তিরোধান করল খবরের কাগজের দপ্তরে সেটা একটা মস্ত খবর। তার দাম আছে। তার জীবনের না থাক, মৃত্যুর তো বটেই। কোনো-কোনো কাগজ তার উপরে প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত লিখেছে। বাঙলা-ভাষার ক্ষতি কষতে গিয়ে শোকের উৎসাহে বাঙলা ভাষাকে আর তারা কেউ আস্ত রাখে নি।

দৈনিক কাগজ নিবে গিয়ে ক্রমে মাসিক-কাগজের দিন এল। নানা জায়গা থেকে আমার কাছে চিঠি আসতে লাগল চুনীলালের কোনো অপ্রকাশিত লেখা বা ফটো এনে দিতে পারি কি না। ওদের বাড়ির সেই অন্ধকার গর্ত হাতড়াতে-হাতড়াতে কয়েকটা লেখা বার হল: খুচরো তিনটে গল্প, আর ছেঁড়া-খোঁড়া একটা নাটিকা। মা বাক্স থেকে তার কিশোর-বয়সের সুকুমার একখান

ছবি খুলে দিলেন। চুনীলালের শেষ সম্পত্তিগুলি নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

সম্পাদক দামিনীভূষণ চুনীর জীবদ্দশায় তার উপর প্রায় খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু আজ মৃত্যু তার স্মৃতির উপর অপরিম্লান একটি মহিমা এনে দিয়েছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছে তাকে আজ যথার্থ অনুপাতে। আজ তাকে মূল্য দিতে কারু কোনো লোকসান নেই, কেননা সে মূল্য সে আর নিজ হাতে নিতে আসছে না। তাকে প্রশংসা করতে আজ আর কিসের লজ্জা, কিসের ভয়, যখন সে নিঃশেষে মরে গেছে। মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত আর আছে কি।

পৃষ্ঠায় যে-গল্পটি সব চেয়ে বড়ো দামিনীভূষণ সেটি গ্রহণ করলেন। একবার পড়ে পর্যন্ত দেখলেন না। তার দরকার ছিল না। চুনীলালের লেখাটা তাঁর কাগজে আজ একটা মস্ত বিজ্ঞাপন—সেটা তিনি ব্যবসার চোখে সহজেই ধরতে পেরেছেন। আজ তার লেখা ছাপায় চুনীলালের দরকার নেই—দরকার দামিনী-ভূষণের। বলা বাহুল্য, প্রায় অর্থনৈতিক নিয়মেই দামটা একটু বেশী চাইলুম। দামিনীভূষণ এক কথাতেই রাজি, আমার মতের জন্যে অপেক্ষা না করে সটান একটা পঞ্চাশ টাকার চেক কেটে দিলেন। বললেন: ওঁর বিপন্ন, দরিদ্র পরি-বারের কথা ভেবেই সংখ্যাটা একটু ভদ্র করলুম।

দামিনীভূষণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চারপাশের কৃপাজীবীর দলও মমতায় দ্রবীভূত হয়ে গেল। আলোক গদগদ হ'য়ে বললে—কিন্তু এ টাকায় বড়ো জোর একমাস চলতে পারে। তারপর? দামিনীবাবুর মতো স্বজনবৎসল লোক তো আর বেশি নেই বাংলা-দেশে।

বললুম—না, আমরা একটা চুনীলাল-মেমোরিয়াল ফাণ্ড খুলব ভাবছি।

—খুলুন, দামিনীভূষণ সহসা সামনের টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারলেন: একশো বার খোলা উচিত। এই নিন, আমিই দিচ্ছি প্রথম চাঁদা। বলে বুক পকেট থেকে মনি-ব্যাগ খুলে আমার দিকে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরলেন।

কৃপাজীবীদের কেউ-কেউ করুণ, মৃত্যুম্লান চোখে দামিনীভূষণের দিকে চেয়ে রইল। কেউ-কেউ উল্লাসে ঢলে পড়ে বললে: কী উদার, কী মহান।

চুনীলালের মৃত্যুতে দামিনীভূষণ উদারতার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে-ছেন বটে। ভাগ্যিস সে মরেছিল, নইলে তাঁকে এমন মহৎ বলে হয়তো আমরা দেখতে পেতুম না।

দামিনীভূষণ আর্দ্র গলায় বললেন,—আমি শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলুম, চুনীবাবুর লেখা এমন কিছু নিন্দনীয় ছিল না। শুধু কাগজের পলিসির জন্যেই

তাঁকে রাইট-য়্যাণ্ড-লেফট গাল দিতে হয়েছে। মানুষ না মরলে তাকে আমরা বুঝতে শিখি না কখনো। কী বলো হে রাজেন?

—আমিও তোমাকে এতদিন এই কথাই বলব-বলব করছিলুম। বাবরি চুলে উদাস একটি ছোকরা গুনগুনিয়ে বলে উঠল।

চুনী নিতান্ত আর বেঁচে নেই বলেই আজ তার এত সৌভাগ্য।

বাকি লেখা দুটোও উঁচু দামে অতি সহজেই বেচে এলুম। এই মহলায় থিয়েটার খুব ভালো জমবে মনে করে তার সেই নাটিকাটিও পেশাদার এক থিয়েটার-পার্টি কিনে নিল।

আশ্চর্য, স্বপ্নেও কেউ যা কখনো ভাবতে পারিনি। আজ আর তার সমালোচনার কথা উঠতেও পারে না, বেরুতে লাগল কেবল উচ্ছ্বসিত, উলঙ্গ প্রশংসা। দামিনীভূষণের রাজেন সংস্কৃতবহুল গম্ভীর বাঙলায় "সাহিত্যে চুনী-লালের বিদ্রোহ" সম্বন্ধে জাঁকালো, প্রকাণ্ড এক প্রবন্ধ বার করলে। (পৃষ্ঠা গুনে সে দাম পাবে অবিশ্যি) তার দেখাদেখি, এটাই নতুনতম ফ্যাশান ভেবে, আর-আর কাগজও সুর মেলাল। চুনীর বইগুলি কাটতে লাগল প্রায় হু-হু শব্দে, দু' মাসে বইটার প্রায় এডিশন হয়! যে-বইটার সে কপি-রাইট বেচে দিয়েছিল, তার বিক্রয়াধিক্য দেখে প্রকাশক আপনা থেকেই দয়াপরবশ হয়ে কিছু মোটা টাকা চুনীর মায়ের নামে ধরে দিলেন। নাটিকাটাও সেই সঙ্গে জমজমাট হয়ে উঠল।

আজ চুনীলাল নেই। কিন্তু তার বাড়ির অবস্থা এ ক'মাসে বেশ শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকলে শত চেষ্টা, শত সংগ্রাম করেও -বাড়ির একখানা ইট সে খসাতে পারত না। কিন্তু তার তিরোধানের কল্যাণে সবাই উঠে এসেছে এখন ভালো পাড়ায়, ফাঁকা, রোদালো বাড়িতে। চুনীলালের মৃত্যু সমস্ত পরিবারের পক্ষে প্রসন্ন একটি আশীর্ব্বাদ।

আমিই তার টাকা পয়সার তদারক করছি—মেমোরিয়াল ফাণ্ডটাও আমারই হাতে। বর্ষার নদীর মতো ক্রমশ তা কেবল ফেঁপেই চলেছে—প্রতি সপ্তাহে খবরের কাগজে জমার তালিকাটা দেশের সামনে পেশ করছি। আজ চুনী-লালের অনুরাগী ভক্তের আর লেখাজোখা নেই, দূর মফস্বল থেকে অপরিচিততম পাঠক পর্যন্ত তার সাধ্যাতীত দিচ্ছে পাঠিয়ে। যতদিন চুনীলাল বেঁচে ছিল কেউ তাকে চিনত না, আজ তার মৃত্যু সমস্ত দেশের কাছে একটা অনপচেয় ঐশ্বর্য। জীবনে সে ছিল নির্বাক, নির্বাপিত, কিন্তু মৃত্যুতে সে আজ মুখর, অন্ধকারে সে আজ দীপ্যমান। মৃত্যুই আজ তার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন, শ্রেষ্ঠ রচনা।

তার জন্যে আর আমরা কেউ শোক করছি না।

ফাণ্ডের টাকাটা দিয়ে চুনীলালের নামে একটা লাইব্রেরি স্থাপনার জল্পনা চলছিল। এই বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে দেশবাসীর একটা মত আহ্বান করেছিলুম, সবাই প্রায় রাজি দেখা গেল। কেউ-কেউ শুধু বললে,—সঙ্গে চুনীলালের একটি প্রস্তরমূর্তিও স্থাপিত করা হোক।

কমিটি থেকে তাই পাশ করিয়ে নিয়ে নিচে একা ঘরে হিসেবের খসড়ার উপর অন্যমনস্কের মতো চোখ বোলাচ্ছিলুম, হঠাৎ দরজার কড়াটা যেন হাওয়ায় নড়ে উঠল।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। পাড়াটা নিঝুম। আলো নিবিয়ে উপরে শুতে যাচ্ছি, দরজার উপর আবার কার ভারি হাতের শব্দ হল।

বললুম—খোলা আছে। ধাক্কা দিন।

দরজাটা সজোরে দু' ফাঁক হয়ে খুলে গেল।

চমকে আর্তকণ্ঠে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলুম। মুহূর্তে সমস্ত শরীর শীতের পাতার মতো শুকিয়ে এল। চারদিক থেকে দেয়ালগুলি যেন হেঁটে-হেঁটে সরে এসে আমাকে চেপে ধরেছে। পায়ের নিচে মেঝেটা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

লোকটা শব্দ করে চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসল। হাসিমুখে, প্রফুল্ল, পরিচিত স্বাভাবিকতায় বললে,—অতো ভয় পাচ্ছিস কেন? চিনতে পাচ্ছিস না আমাকে?

চাপা গলায় আবার একটা চীৎকার করতে যাচ্ছিলুম, চুনীলাল তেমনি তার প্রবল উচ্ছ্বসিত পৌরুষে অজস্র হেসে উঠল। বললুম: তুই, তুই কোথেকে?

—স্বর্গ থেকে বললে বিশেষ নিশ্চিন্ত হবি না নিশ্চয়ই। চুনীলাল কোটের বোতামগুলি খুলতে-খুলতে বললে,—আপাতত লামডিং থেকেই আসছি। কত পেলি? জমলো কত আমার ফাণ্ডে?

তার মুখের উপর রুখে উঠলুম: লামডিং থেকে আসছিস মানে?

—হ্যাঁ, ফাণ্ডের টাকাটা নিয়ে যেতে এসেছি। বেশ একটা ডিসেণ্ট সংখ্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বলে চুনীলাল আবার শূন্যতা কাঁপিয়ে হেসে উঠল: বেশ পাবলিসিটি করেছিস, প্রসাদ। আমিও তাই আশা করছিলুম। ব্যবসায় বেশ মাথা খুলেছে দেখছি।

চেয়ারের পিঠে ভেঙ্গে পড়ে আবার তার সেই পরিতৃপ্ত আলস্য।

তার হাতটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলুম। হাড়ময় নীরক্ত হাত

নয়, দস্তরমতো মাংসল, সুস্থ, নধর। বললুম : এ কী ভীষণ কথা? তুই না মরে গেছিস?

—মরেই গেছি তো নিঃশেষে মরে গেছি। চুনীলাল পরিষ্কার, প্রখর দাঁতে আবার হেসে উঠল : আমি তো আর সাহিত্যিক নই, আমি এখন অমরেন্দ্রের কাঠের কারবারে।

বিপদ মানে বিপদবারণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৩)

নিত্যানন্দ ছেড়ে দিয়েছে।

কোন্ নিত্যানন্দ আর কি ছেড়ে দিয়েছে সে, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।

নিত্যানন্দের নাম, কি তার সেই সেদিনের কাজগুলোর কথা ভাবলেই, চোখ ঢুলুঢুলু মন উদাস হয়ে যায় এমন লোকের অভাব নেই।

হ্যাঁ, নিত্যানন্দ মানে সেই নিত্যানন্দ মুস্তোফি, 'নি' স্বাক্ষর আঁটা যার সেই মধু-মাখানো মন-উদাস-করা ছবিগুলো একদিন মাসের পর মাস বিখ্যাত 'জলধর' মাসিক পত্রিকায় বেরিয়ে ছেলেছোকরা থেকে বুড়োদের পর্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ছবির প্রদর্শনীতে যার ছবি দেয়ালে লাগাতে না লাগাতে লুট হয়ে গেছে নিলেমের চড়া দরে। নাক-উঁচু সমালোচকেরা আর হিংসায় জলে-মরা সমধর্মীরা 'ছবি না চিনির দানা' বলে যার নাম করলে বাঁকা হাসি হেসেছে, আর এ ধরনের নিন্দুকদের মুখে কালি দিয়ে যার সুখ্যাতি আর সুখ্যাতির চেয়ে সমৃদ্ধি বেড়েই গেছে।

নিত্যানন্দের ছবি যে দু'রকমের তা বোধ হয় নাম করা মাত্র মনে পড়বে সবার। নিসর্গ আর নারী। সে নিসর্গও যেমন নারীও তেমনই,—ঠিক একই রকমের বুকটা ফাঁকা করে দেয় অবশ আবেশে, মৃদু শিহরণের ঢেউ তোলে শিরায় শিরায়।

নিত্যানন্দের নিসর্গ তবু আশ্চর্য কিছু নয়। এই এ দেশেরই খাল-বিল নদী-পুকুর-ঘাট, বন-বাদাড়, হাট-বাট-গাঁ। কিন্তু একবার দেখলে আর চোখ ফেরায় কার সাধ্য। যে ছবিই দেখি মনে হয়, তল্পিতল্পা গুটিয়ে ওইখানে গিয়ে ডেরা বাঁধি।

আর নারী। তারাও তিলোত্তমা উর্বশী পরী বিদ্যাধরী কেউ নয়। কুটনো কোটা, বাসন মাজা, ঘর নিকোনো শ্যামলা সাদামাটা মেয়ে। কস্তাপাড় কি ডুরে শাড়ি পরা।

আইবুড়ো হলেও রক্ষে নেই। সাত ছেলের বাপ হলেও তাই।

গাঁটছড়া যার পড়ে নি, এ ছবি দেখার পর পরীক্ষার পড়ায় মন বসানোই তার শক্ত। আর হৃদয়ের পাট যার চুকে গিয়েছে বলে ধারণা, সে হঠাৎ যদি টাক মাথার বিজ্ঞাপন দেখে গন্ধতেল মাখতে বসে তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

মানে, নিত্যানন্দর ছবিতে জাদু আছে।

ছবি দেখে নিত্যানন্দকে কিন্তু চেনা যাবে, না। ছবি যা সে আঁকে, মানুষটা তা থেকে আলাদা।

নিত্যানন্দ পাড়াগাঁয়ের ছবি আঁকে, থাকে শহরের একেবারে খানদানী পাড়ায় সার্ভিস-ফ্ল্যাটে। সে পাক্কা সাহেব, যে মহলে সে ঘোরে ফেরে সেখানে রাঁধুনী-ঝিয়েরাও কস্তাপাড় কি ডুরে শাড়ি পরে না। রাঁধুনী-ঝিই নেই সেখানে। আছে বাবুর্চী আয়া।

এ-হেন নিত্যানন্দ ক্লাবে পার্টিতে আড্ডা দিয়ে, চৌরঙ্গী পার্ক ষ্ট্রীটে মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে মধু-মাখানো তুলির টানে অগণন ভক্তের মন গলিয়ে আর দু-চারজন হিংসুকরে চোখ টাটিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, হঠাৎ তার হল কি!

হল বিপদ।

বিপদ মানে বিপদবারণ চৌধুরী, ছেলেবেলার বন্ধু। গেঁয়ে ভূত। মফস্বলের ভূতপূর্ব ছোটখাট জমিদার, বর্তমানে হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগলের কারবারী, অর্থাৎ পোলট্রি ডেয়ারির মালিক।

সেই বিপদবারণ একদিন সকালে নিত্যানন্দর ফিটফাট সার্ভিস-ফ্ল্যাটে এসে মূর্তিমান মফস্বলের মত আবির্ভূত।

পরনে হাতকাটা বেঢপ শার্ট, পায়ে ওয়াটারপ্রুফ লাল-কালো রবারের জুতো।

আরে, তুই কোথা থেকে!—তার আপাদমস্তক দেখে একবার ভেতরে ভেতরে শিউরে এক হাতে লম্বা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে আর এক হাতে ড্রেসিং-গাউনের একটা বোতাম দিতে দিতে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করলে।

মেচেন্দা থেকে আসছি ভাই, তোর কাছে একটা বিশেষ দরকারে। এ ফ্যাসাদে তুই-ই ভরসা।

তোর আবার কি ফ্যাসাদ! জমিদারি তো এখন সরকারের হাতে।

জমিদারি নয় ভাই—

তা হলে গরু ছাগল?—নিত্যানন্দ তাকে কথা বলতেই দিলে না: তুই তো গরু ছাগল হাঁস মুরগী নিয়ে কলোনি করেছিস শুনেছি; কিন্তু তোর ও সব স্বগোত্রদের সম্বন্ধে আমার তো কোন কিছু জানা নেই। আমি বরং ভাল ভেটেরিনারী ডাক্তার কাউকে ঠিক করে দিচ্ছি।

না ভাই, ভেটেরিনারী দরকার হবে না।—ফাঁক পেয়ে বিপদবারণ বললে, তুই-ই পারবি।

আমি গরু ছাগলের ব্যবস্থা করতে পারব!—নিত্যানন্দর চোখ কপালে

উঠল। ভাবল, বিপদটা ছেলেবেলাতেই একটা গাঁইয়া আপদ ছিল, এখন আবার ক্ষেপেও গেছে নাকি!

গরু ছাগল নয়, আদব-কায়দা। বললে বিপদবারণ।

আদব-কায়দা! তোদের সে ধাপ-ধাড়ায় আদব-কায়দা লাগে নাকি! গরু-ছাগলদের এত উন্নতি হয়েছে!

বলছি বার বার গরু ছাগলের জন্য নয়, তবু গরু ছাগল গরু ছাগল!—বিপদ চটে উঠল: আদব-কায়দা আমার দরকার।

বিপদ চটলেও বিপদ। নিত্যানন্দ তাই একটু মোলায়েম করে বললে, ও তোর! সে তো একই কথা। কিন্তু তোর আবার আদব-কায়দা কিসের দরকার? ওসব বালাই তো ছিল না কোন কালে।

সেই জন্যেই তো মুশকিল হয়েছে!—গরজ বড় বালাই বলে বিপদবারণও ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা হয়েছে: শেষকালে না জেনে-শুনে আনাড়ীর মত একটা কেলেঙ্কারি করব!

কি কেলেঙ্কারি? কি না জেনে-শুনে?—এবার নিত্যানন্দের বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত।

এই ধর পাঁউরুটি ডান দিকের, না বাঁ দিকের প্লেট থেকে নিতে হয়?

অ্যাঁ!—ঈষৎ স্মিতবদন।

কিংবা ধর টেবিলের তোয়ালে গলায় গুঁজতে হয়, না, কোলে পাততে?

অ্যাঁ!!—ভ্রূকুঞ্চন।

সুপ খাবার সময় হুস্ হুস্ করে শব্দ করতে নেই জানি, কিন্তু প্লেটটা কোন্ দিকে হেলাতে হয়, সামনে, না, উল্টো?

অাঁ!!!—বিস্ফারিতনয়ন।

আর ধর, মাছ আর মাংস খাবার কাঁটা নাকি আলাদা, তা চেনা যায় কি করে?

অ্যাঁ!!!!—মুখব্যাদন।

খাওয়া হয়ে গেলেই বা ছুরি কাঁটা কি ভাবে রাখতে হয়?

গট্ খট্ খটাস্। নিত্যানন্দের মুখের পাইপটাই মেঝেয় পড়ে গেল! নিত্যানন্দের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিপদবারণই ব্যস্তসমস্ত হয়ে মেঝে থেকে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নিত্যানন্দের হাতে তুলে দিয়ে কাতরভাবে বললে, এই সব তোকে শিখিয়ে দিতে হবে ভাই। এখুনি। আর সময় নেই।

কিসের সময় নেই?—নিত্যানন্দ খানিকটা সামলেছে।

ওই যে বার্থ-ডে পার্টি।

কার ?

সে একজনের, তুই হয়তো চিনবি না।—বিপদবারণ কুণ্ঠিত।

শুনিই না তবু।—নিত্যানন্দ উৎসুক।

আইরিন রায়ের।—বিপদবারণ লজ্জিত।

আইরিন রায়ের ?—নিত্যানন্দের মুখে এবার একটু বাঁকা হাসি যেন দেখা দিল : মেজর রায়ের মেয়ে ?

হ্যাঁ।—বিপদবারণের কণ্ঠ শ্রদ্ধায় স্তিমিত।

বিলেত থেকে সোশ্যাল সায়েন্সের ডিগ্রী নিয়ে সবে ফিরেছে ?

হ্যাঁ।—বিপদবারণ বিগলিত।

আইরিন রায়ের বার্থ-ডে পার্টিতে তোর নেমন্তন্ন হয়েছে ?—নিত্যানন্দ মুস্তাফীর কণ্ঠে বিস্ময় না বিরক্তি বোঝা যায় না।

এখনও ঠিক হয় নি। তবে হবে বোধ হয়।—বিপদবারণ নিত্যানন্দকে একটু হতভম্ব হতে দেখে যথাসাধ্য সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলে : মানে, হবে বলেই ভাবছি, কারণ, কি বলে, আমার ঠাকুরদা দুঃখহরণ চৌধুরীর সঙ্গে মেজর রায়ের পিসেমশাই না কে, মানে, আইরিনের কি রকম দাদু হন, তাঁর খুব ভাব ছিল কিনা, মানে, আমাদের মেচেন্দার জঙ্গল মহলেই প্রায় শিকারে আসতেন, আর তখন শিকার মানে বেশ ভাল, ওই কি বলে বাঘটাঘও পাওয়া যেত কিনা, আর মানে, বাঘ তাঁরা কখনও শিকার করতে না পারলেও একবার একটা খটাশ না কি···

নিত্যানন্দের আর ধৈর্য্য ধরা সম্ভব হল না : খটাশের সঙ্গে তোর নেমন্তন্নের সম্পর্ক কি ?—সে ধমক দিলে।

না, খটাশের সঙ্গে কি করে সম্পর্ক থাকবে। তবে, মানে, আমি এসে দেখা করেছি কিনা।

দেখা করেছিস মেজর রায়ের বাড়ি গিয়ে ? নিজে থেকে ?—নিত্যানন্দ বিমূঢ়।

নিজে থেকে না তো কি। ওঁরা তো প্রথম চিনতেই পারেন না। অনেক করে পরিচয় দিতে হল।—বিপদবারণ অম্লানবদন।

তা অত করে পরিচয় দিতে যাওয়ার দরকার ?

নিয়তি।—বিপদবারণের স্বর গাঢ় হল : নইলে আমি তো প্রথম যেতেই চাই নি। কবে কোন্ কালে কি সুবাদে আলাপ ছিল এখন তার কি ? নেহাত মার পেড়াপিড়িতে বাধ্য হয়ে গেছলাম। কিন্তু গেছলাম ভাগ্যিস। অর্থাৎ ও-যাওয়া ভাগ্যের লিখন।

তার মানে ?

মানে, না গেলে তো আইরিনকে দেখতে পেতাম না, আর আইরিনের সঙ্গে দেখা আমার তো না হয়ে পারে না।

নিত্যানন্দ স্তম্ভিত নির্বাক।

বিপদবারণই আবার আসল কাজের কথায় ফিরে এল : না ভাই, আদব-কায়দাগুলো আমায় শিখিয়ে দিতে হবেই। না দিলে ছাড়ছি না।

বিপদবারণ ঘণ্টা দুয়েক বাদে বিলাতী আদব-কায়দা যথাসম্ভব শিখে বিদায় নিলে। নেহাত জরুরী আর একটা কাজ না থাকলে আরও ঘণ্টা কয়েক শিখতে তার আপত্তি ছিল না।

যাবার সময় একবার জিজ্ঞাসা করলে কথায় কথায়, আইরিন রায়কে তুই চিনিস্ না কি ? পরিচয় তো জানিস দেখলাম।

নিত্যানন্দ এবার হাসতেও পারল না। বললে, হ্যাঁ, ওই একটু আধটু চিনি।

ওঃ, একটু আধটু!—তাচ্ছিল্যভরে বলে বিপদবারণ চলে গেল।

নিত্যানন্দ হাসবে, না, কাঁদবে, বুঝতে পারল না।

শহরের সেরা হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট-রুমে আইরিন রায়ের বার্থ-ডে পার্টিতে কিন্তু সত্যি সত্যিই দেখা গেল বিপদবারণ ধর্মতলার মার্কামারা স্যুট পরে এসে হাজির।

নিমন্ত্রিত হোমরা-চোমরা অনেকেই। আইরিনের এক পাশে নিত্যানন্দের আসন আর এক দিকের আসনটা তখনও খালি। মেজর রায়ই বসবেন। হঠাৎ দূর থেকে নিত্যানন্দকে দেখতে পেয়ে একেবারে যেন লম্ফ দিয়ে বিপদবারণ সেখানে এসে পড়ল। এসেই নিত্যানন্দের পিঠে এক চাপড়।

আরে, তুইও নেমন্তন্ন পেয়েছিস দেখছি!

নিত্যানন্দ সামলে ওঠার আগেই আইরিনের অন্য ধারের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিপদবারণ বসে পড়েছে দেখা গেল। দু-একজনের ভুরু হয়তো কপালে উঠল। নিত্যানন্দ কি বলতেও গেল, কিন্তু বলা আর হল না।

মেজর রায় বসতেই আসছিলেন। তিনিই পেছন থেকে হাত তুলে নিত্যা-নন্দকে থামিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসলেন।

তারপর বিপদবারণ ভোজপর্ব যে ভাবে সমাধা করল তা স্মরণ করতেও নিত্যানন্দ এখনও শিউরে ওঠে। বেশ কয়েকটা ডিশ প্লেট ভাঙল, খানাও নষ্ট হল। না, বিপদবারণের স্বহস্তে নয়, কাঁটা-চামচ-ছুরির খেল দেখে বয়দের অবশ হাত থেকেই সেগুলো পড়ল।

আইরিনের সঙ্গে আলাপ জমাতেও সে ত্রুটি রাখল না।

নিত্যানন্দের সঙ্গে আইরিনের লণ্ডনের হাইড পার্ক নিয়ে আলাপের মধ্যে সে বেচেন্দার সুষনোডাঙার গল্প ফাঁদল। টিউব-স্টেশনের এসকেলেটরের কথায় দইঝুড়ির বাঁধ থেকে ছেলেবেলায় তার কবে গড়িয়ে পড়ার কাহিনী শোনাল, আর বিলেতের অবিরাম বাদলার আলোচনায় তার বাবা সন্তাপহারী চৌধুরীর আস্ত একটা কাঁঠাল খাওয়ার বিবরণ কি করে যে নিয়ে এল সেইটেই আশ্চর্য।

পার্টি শেষ হবার পর যে যার বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময়ও দেখা গেল, তার উৎসাহ অনবদমিত।

আইরিন নিত্যানন্দের গাড়িতেই উঠছিল, এক গাল হেসে সেখানে হাজির হয়ে বিপদবারণ বললে, ও , এই গাড়িতেই যাচ্ছেন বুঝি! বেশ বেশ।—তারপর নিত্যানন্দের দিকে ফিরে ভর্ৎসনার সুরে বললে, তোর গাড়ি ছিল বলিস নি তো!

কটা কথা আর তোকে বলতে পেরেছি, অনেক কিছুই এখনও বাকি আছে।—বলে নিত্যানন্দ গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে চালাতে হুকুম দিল।

কয়েক সপ্তাহ তারপর কাটল। বিপদবারণ শহর ছেড়ে যে যায় নি নিত্যানন্দ তার যথেষ্ট প্রমাণ নিত্যই পেয়েছে।

আইরিনের সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে বসেছে হয়তো ; বিপদবারণ সেখানেই গিয়ে উপস্থিত : এই যে ছবি দেখতে এখানে এসেছ বুঝি। তারপর আইরিনকে লক্ষ্য করে : আপনার বাড়ি গিয়ে শুনলাম নিত্যর সঙ্গে সিনেমায় এসেছেন, তাই খুঁজে খুঁজে আমিও এসে পড়লাম।

খুঁজে খুঁজে ?—নিত্যানন্দ না বলে পারল না : তুমি সব সিনেমার ভেতর খুঁজলে কি করে ?

বাঃ, টিকিট কিনে কিনে।—বিপদবারণ কুণ্ঠাহীন : শেষে তো এইখানে এসে পেলাম।

আপনি বসছেন কোথায় ?—আইরিনকে ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করতে হল।

ওই নীচে দশ আনার সীটে। অন্য জায়গায় টিকিট কিনতে কিনতে পয়সা ফুরিয়ে গেল যে।

শেষ ঘণ্টা দিয়ে সৌভাগ্যক্রমে এবার হল্ অন্ধকার হল। বিপদবারণ বিদায় নিলে।

শুধু সিনেমায় নয়, বিপদবারণের অযাচিত উপদ্রব প্রায় সর্বত্র।

নিত্যানন্দের রাগও হয় হাসিও পায় বেচারার করুণ অধ্যবসায়ে।

এর পর মাঝে কয়েকটা দিন শুধু রেহাই পেল। বিদেশে বিরাট একটা

ছবির একজিবিশন হচ্ছে। ছবি নিয়ে তার উদ্বোধনের জন্যে নিত্যানন্দকে যেতে হল। থাকতেও হল কয়েকটা দিন নানা কারণে।

ফিরে এসে প্রথমেই একটা খবর পেয়ে সে তাজ্জব। তার ছবি বেচা-টেচার ব্যাপারে হিসাবপত্র দেখবার জন্যে যাকে রেখেছে, সে ভদ্রলোক মোটা একটি অঙ্কের চেক নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে জানালেন, তার এখানকার সমস্ত নতুন ছবি বিক্রি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

বিক্রি তার ছবি চিরকালই হয় এবং ভালই, কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিশেষ যখন শুনল যে অজ্ঞাত কোন এক তার ভক্ত একলাই সব কিনে নিয়ে চলে গেছেন।

এই আশ্চর্য খবরটা আইরিনকে দেবার জন্যে ফোন করতে যাবে, এমন সময় বিপদবারণের প্রবেশ।

তাকে দেখে যতটা, তার পোশাকে নিত্যানন্দ তার চেয়ে বেশী অবাক। তার পেটেণ্ট হাফশার্টও নয়, ধর্মতলার কোটপ্যাণ্টও না। বিপদবারণ সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছে।

কি ব্যাপার, হঠাৎ এ পোশাক ?—নিত্যানন্দের প্রথম প্রশ্ন।

আরতি বললে কিনা।—বিপদবারণ সলজ্জভাবে হাসল।

আরতি বললে! আরতি কে ?

আরতি আর কে ? ওকে এখন থেকে আরতি বলেই ডাকব কিনা।

ওকে আরতি বলে ডাকবে! কাকে ?—নিত্যানন্দ দিশেহারা।

ওই তোমরা যাকে আইরিন বল।

আইরিনকে আরতি বলে ডাকবে!—নিত্যানন্দ নিজের কানকেই বিশ্বাস করবে কি না ভেবে পায় না : ডাকবে কি তার সামনে, না, পেছনে ?

বাঃ, সামনে না হলে ডাকার মানে হয় নাকি!—বিপদবারণ একটু যেন বিরক্ত : আর সেই তো ডাকতে বলেছে।

কে বলেছে ? আইরিন ?

হ্যাঁ, আরতি। চিরকাল ধরে 'আইরিন' 'আইরিন' বলে কি ডাকা যায়। আর মা-ই বা কি মনে করবেন।

চিরকাল ধরে ডাকবে! মা কি মনে করবেন! কি আবোল-তাবোল বকছ!

ওঃ!—বিপদবারণ যেন অনুতপ্ত হয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করল। নিত্যানন্দের আঁকা একটি ছবি সে-খামে ছোট করে ছাপানো : ভুলেই গেছলাম, তোমাকে এটা দিতেই এসেছি। কাল আমাদের বিয়ে। মানে, আমার আর আইরিনের—থুড়ি, আরতির।

কিছুক্ষণ নিত্যানন্দের কথা বলবার কোন ক্ষমতাই রইল না। তারপর অতি কষ্টে সে জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা, যাবার আগে একটা কথা বলে যাবে।

নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমার কাছে আদব-কায়দা না শিখলে আজ কোথায় থাকতাম। তোমায় বলব না?

কি মন্ত্রে কার্যোদ্ধার করলে বলবে?

বিপদবারণ আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে নিত্যানন্দকে সুধা-সিক্ত করে বললে, ও, জান না বুঝি। তোমার এখানকার সব ছবি যে আমিই কিনে নিয়েছি। সেই ছবি রোজ একটা করে আরতিকে উপহার দিতাম। সে ছবি দেখতে দেখতে আর আমার কাছে আমাদের মেচেন্দার গল্প শুনতে শুনতে ও ক'দিনেই কেমন যেন হয়ে গেল। বিয়ের কথা বলতেই মত দিয়ে ফেললে।

না, সেই থেকে নিত্যানন্দ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে।

সে এখন রঙের ব্যবসা করে, ছবির রঙের নয়, দরজা-জানলার।

চুপি চুপি

অন্নদাশঙ্কর রায়

(১৯৩৪)

বনোয়ারীলাল তার স্ত্রী ইন্দুকে চুপি চুপি বল্লে, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

ইন্দু সাশ্চর্য্যে বল্লে, "আমার সঙ্গে?" সকৌতূহলে বল্লে, "কী কথা?"

"ভয়ে বল্‌ব কি নির্ভয়ে বল্‌ব?"—বনোয়ারীর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। যেন সে হাসি চাপ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে।

"না, আমার শুনে কাজ নেই।" ইন্দু খিল খিল করে হেসে বল্লে, "তুমি যা বল্‌বে তা আমি জানি।"

"তাই নাকি?" বনোয়ারী সকৌতুকে বল্লে, "বলো দেখি আমি কী বল্‌ব?"

"কী বল্‌বে?" ইন্দু মাথা দুলিয়ে বল্লে, "বল্‌বে—এই—একটা কিছু তামাসার কথা। কোথায় কারুর কাছে শুনে এসেছ।"

"না, না।" বনোয়ারী পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেল। "না, না, তামাস নয়। সত্যি। আমি ভারি ভাবিত হয়ে পড়েছি।"

ইন্দুও ভাবিত হলো। তবু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ। তুমি ভাব্‌বে। হাসি ছাড়া তোমার মুখে অন্য কিছু কি কেউ কোনোদিন দেখেছে মা গো, বিদূষক যদি কেউ থাকে এ যুগে তবে সে তুমি।"

বনোয়ারী সখেদে বল্লে, "আমি ভাব্‌ব না তো কে ভাব্‌বে, ইন্দু। বেকা বসে আছি শ্বশুরবাড়ীতে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গোটা দুই ছেলেমেয়ে হয়ে গেল আরো হবে যদি না—"

"যদি না?"—ইন্দু ভ্রূকুঞ্চন কর্‌লে।

বনোয়ারী ইন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কী যে বল্লে তা আমর আড়ি পেতে শুনিনি।

ইন্দু ক্রোধে লজ্জায় উত্তেজনায় ও ঘৃণায় অপরূপ হয়ে বল্লে, "ভদ্রলোকে ছেলে না তুমি? ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন কথা বল্‌তে তোমার সাহস হয়?"

"চুপ, চুপ, ইন্দু। চুপ, চুপ।"

"চুপ, চুপ? চুপ করব কেন? বল্‌ব গিয়ে মা'কে, বল্‌ব বাবাকে, বল্‌ সবাইকে।"

"লক্ষীটি—"

"ছাড়ো, হাত ছাড়ো। ভিজে বেড়াল। আমি ভাবলুম কী নতুন তামাসার কথাই শোনাবেন। না, জন্মসংযম—"

"তোমার পায়ে পড়ি, ইন্দু।"

"ও কী! ছি, ছি! তোমার আজ হয়েছে কী?"

এর দু বছর পরে বনোয়ারীর চাকরী হলো। চাকরীই যখন হলো তখন আরো একটি ছেলে হয়েছে বলে চিন্তা করা অশোভন। বনোয়ারী বরঞ্চ খুসী হয়ে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে ঘটা করে আপিসের লোকজনকে খাওয়ালে। বল্লে, "এ আমার তৃতীয় সন্তানের কল্যাণে।" ছেলেটি পয়মন্ত।

চতুর্থ সন্তানটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে—সে আরো বছর দেড়েক পরের কথা—তখন যমে মানুষে টানাটানি। যাকে বলে tug of war একবার যম বলে, "হেঁইও।" একবার মানুষ বলে "হেঁইও।" অবশেষে যমই হলো কাবু। প্রায় আঠারো মাসের সঞ্চয় ডাক্তারকে গঁপে দিয়ে বনোয়ারী শুনুলে ডাক্তারের এই প্রশ্ন, "আপনি কি মানুষ, না মেষ?" ডাক্তার এমন গালাগালি দিলে যে বনোয়ারীর বিশ্বাস হলো সে বাপ হয়ে গুরুতর অপরাধ করেছে।

শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখভাব সেই ডাক্তারের মুখের মতো। শ্বাশুড়ী বল্লেন, "আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে; তার এই দশা। আহা, বাছা রে। কেন তোকে আগে আনাইনি।"

বনোয়ারী কাজের মধ্যে ডুব মেরে বাঁচ্‌ল। স্ত্রীকে সে ভালোবাস্‌ত। বিরহে যে দিন দিন মোটা হলো তা নয়। তবু এক রকম শান্তিতে বাস করায় তার ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা গেল। বিরহের সঙ্গে বেশ বনিবনা করে এনেছে এমন সময় স্ত্রী এসে সশরীরে উপস্থিত। বাপের বাড়ীতে তাঁর আর কিসের অধিকার, ভাইদের সংসার হয়েছে, তারাই যা করবে তাই হবে। ইত্যাদি।

বনোয়ারী চার সন্তানের সহিত তাদের মা'কে দেখে চতুর্গুণ খুসী হলো। তা হোক্‌। কিন্তু আসল কথাটি ভুল্‌ল না। এখন তার চাকরী হয়েছে। শ্বশুরের গলগ্রহ নয়। অম্লান মুখে বলে, "দীক্ষা নিয়েছি। অসিধার ব্রত করতে হবে।"

ইন্দু তো ফেল্লে হেসে। ভুরু দিয়ে শাসিয়ে বল্লে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।" ত্রেতাযুগে একমাত্র লক্ষ্মণ ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পেরেছিলেন। কোনো যুগে অন্য কেউ তা পেরেছে বলে পুরাণে উল্লেখ নেই। কাজেই বছর না ঘুরতেই পঞ্চম সন্তানের আগমনের বার্ত্তা এলো। বনোয়ারী এত লজ্জিত হয়ে পড়ল

যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারলে না। দিলে তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে।

পঞ্চম সন্তানটি ইন্দুকে বাঁচতে দিয়ে নিজেই যমের রথে উঠল। যাতনায় ও শোকে ইন্দুর চেহারা হলো ইন্দুরের মতো। তার সে লাবণ্য নেই, তার স্বাস্থ্যও গেছে চিরকালের মতো ভেঙে। শ্বশুর রুখে বল্লেন, "অমন জামাইয়ের জেল হওয়া উচিত।" শ্বাশুড়ী কপালে কাঁকন হেনে বল্লেন, "আমার নাতি রে।" বুড়োরা ফোক্‌লা মুখে বল্লেন, "এ কালের ছেলেরা সংযম কাকে বলে জানে না।" বুড়ীরা তুড়ি দিয়ে বলাবলি কর্‌লেন, "নাতির মুখ দেখ্‌তে পাওয়া কলিযুগে ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌ছে।"

বনোয়ারী স্ত্রীকে দেখ্‌তে এসে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লে, "তুমি বছরখানেক মা'র সঙ্গে কোথাও গিয়ে শরীর সারাও।"

ইন্দু যদিও ইন্দুর হয়েছে, তবু তারও তো একটা অভিমান আছে। সে বল্লে, "তুমি আরেকটি বিয়ে করো। আমার এ শরীর আর সারবে না।"

বনোয়ারী তাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লে, "যখন তোমাকে চুপি চুপি একটি কথা বলেছিলুম তখন শুনলে তো এমন দুর্দ্দশা হতো না।"

ইন্দু ফোঁস করে উঠ্‌ল।—"আবার সেই বেয়াদবী। মনে রেখো আমি তোমার স্ত্রী। রক্ষিতা নই।"

বনোয়ারী যেন হোঁচট খেয়ে পড়ল।

কয়েক মাস রাঁচিতে কাটিয়ে গায়ে স্বাস্থ্যের জলুস নিয়ে ইন্দু একদিন বনোয়ারীর কর্ম্মস্থলে এলো। বল্লে, "তোমার কথাই শুন্‌ব। শ্রীরামবাবুর স্ত্রীর কাছে বিস্তর সদুপদেশ পেয়েছি। হাজার হোক্ পতি পরম গুরু।"

বনোয়ারী কতটা উৎফুল্ল হলো তা ব্রতচারীমাত্রেই অনুমান কর্‌তে পার্‌বেন। বগল বাজিয়ে লাফ দিয়ে বড় বড় কবিদের ভালো ভালো কবিতা ভুল আওড়ালে। বল্লে, "এত দিনে জান্‌লেম যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম ধন্য রে ধন্য।"

বনোয়ারী যা মনে করেছিল তা নয়। শ্রীরামবাবুর স্ত্রী কোন এক স্বপ্নাদ্য মাদুলী ও সন্ন্যাসীদত্ত ঔষধের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। একদিন ভি-পি'তে সেই সব আপদ এসে হাজির। বনোয়ারী তর্ক করে বল্লে, "ওসব মনকে চোখ ঠারার সরঞ্জাম। মন ভুল্লেও দেহ ভুল্‌বে না। বৈজ্ঞানিক সাজ আনাতে হবে।"

ইন্দু বল্লে, "ও যে কৃত্রিম।"

বনোয়ারী বল্লে, "ওষুধ বুঝি কৃত্রিম নয়।"

ইন্দু বল্লে, "ওষুধ হলো গাছ-গাছড়ার থেকে তৈরী।"

"ছাড়ো, হাত ছাড়ো। ভিজে বেড়াল। আমি ভাবলুম কী নতুন তামাসার কথাই শোনাবেন। না, জন্মসংযম—"

"তোমার পায়ে পড়ি, ইন্দু।"

"ও কী। ছি, ছি। তোমাব আজ হয়েছে কী?"

এর দু বছর পরে বনোয়ারীর চাকরী হলো। চাকরীই যখন হলো তখন আরো একটি ছেলে হয়েছে বলে চিন্তা করা অশোভন। বনোয়ারী বরঞ্চ খুসী হয়ে প্রথম মাসের মাইনে দিয়ে ঘটা করে আপিসের লোকজনকে খাওয়ালে। বল্লে, "এ আমার তৃতীয় সন্তানের কল্যাণে।" ছেলেটি পয়মন্ত।

চতুর্থ সন্তানটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে—সে আরো বছর দেড়েক পরের কথা—তখন যমে মানুষে টানাটানি। যাকে বলে tug of war. একবার যম বলে, "হেঁইও।" একবার মানুষ বলে "হেঁইও।" অবশেষে যমই হলো কাবু। প্রায় আঠারো মাসের সঞ্চয় ডাক্তারকে সঁপে দিয়ে বনোয়ারী শুনুলে ডাক্তারের এই প্রশ্ন, "আপনি কি মানুষ, না মেষ?" ডাক্তার এমন গালাগালি দিলে যে বনোয়ারীর বিশ্বাস হলো সে বাপ হয়ে গুরুতর অপরাধ করেছে।

শ্বশুর এসে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তাঁর মুখভাব সেই ডাক্তারের মুখের মতো। শ্বাশুড়ী বল্লেন, "আমার দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটিমাত্র মেয়ে; তার এই দশা। আহা, বাছা রে। কেন তোকে আগে আনাইনি।"

বনোয়ারী কাজের মধ্যে ডুব মেরে বাঁচ্‌ল। স্ত্রীকে সে ভালোবাস্‌ত। বিরহে যে দিন দিন মোটা হলো তা নয়। তবু এক রকম শান্তিতে বাস করায় তার ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা গেল। বিরহের সঙ্গে বেশ বনিবনা করে এনেছে এমন সময় স্ত্রী এসে সশরীরে উপস্থিত। বাপের বাড়ীতে তাঁর আর কিসের অধিকার, ভাইদের সংসার হয়েছে, তারাই যা কর্‌বে তাই হবে। ইত্যাদি।

বনোয়ারী চার সন্তানের সহিত তাদের মা'কে দেখে চতুর্গুণ খুসী হলো। তা হোক্। কিন্তু আসল কথাটি ভুল্‌ল না। এখন তার চাকরী হয়েছে। শ্বশুরের গলগ্রহ নয়। অম্লান মুখে বলে, "দীক্ষা নিয়েছি। অসিধার ব্রত কর্‌তে হবে।"

ইন্দু তো ফেল্লে হেসে। ভুরু দিয়ে শাসিয়ে বল্লে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে।" ত্রেতাযুগে একমাত্র লক্ষ্মণ ঐ ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে পেরেছিলেন। কোনো যুগে অন্য কেউ তা পেরেছে বলে পুরাণে উল্লেখ নেই। কাজেই বছর না ঘুর্‌তেই পঞ্চম সন্তানের আগমনের বার্ত্তা এলো। বনোয়ারী এত লজ্জিত হয়ে পড়ল

যে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পার্‌লে না। দিলে তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে।

পঞ্চম সন্তানটি ইন্দুকে বাঁচ্‌তে দিয়ে নিজেই যমের রথে উঠ্‌ল। যাতনায় ও শোকে ইন্দুর চেহারা হলো ইন্দুরের মতো। তার সে লাবণ্য নেই, তার স্বাস্থ্যও গেছে চিরকালের মতো ভেঙে। শ্বশুর রুখে বল্লেন, "অমন জামাইয়ের জেল হওয়া উচিত্।" শাশুড়ী কপালে কাঁকন হেনে বল্লেন, "আমার নাতি রে।" বুড়োরা ফোক্‌লা মুখে বল্লেন, "এ কালের ছেলেরা সংযম কাকে বলে জানে না।" বুড়ীরা তুড়ি দিয়ে বলাবলি কর্‌লেন, "নাতির মুখ দেখ্‌তে পাওয়া কলিযুগে ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌ছে।"

বনোয়ারী স্ত্রীকে দেখ্‌তে এসে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লে, "তুমি বছরখানেক মা'র সঙ্গে কোথাও গিয়ে শরীর সারাও।"

ইন্দু যদিও ইন্দুর হয়েছে, তবু তারও তো একটা অভিমান আছে। সে বল্লে, "তুমি আরেকটি বিয়ে করো। আমার এ শরীর আর সা্‌বে না।"

বনোয়ারী তাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লে, "যখন তোমাকে চুপি চুপি একটি কথা বলেছিলুম তখন শুনলে তো এমন দুর্দ্দশা হতো না।"

ইন্দু ফোঁস করে উঠ্‌ল।—"আবার সেই বেযাদবী। মনে রেখো আমি তোমার স্ত্রী। রক্ষিতা নই।"

বনোয়ারী যেন হোঁচট খেয়ে পড়্‌ল।

কয়েক মাস রাঁচিতে কাটিয়ে গায়ে স্বাস্থ্যের জলুস নিয়ে ইন্দু একদিন বনোয়ারীর কর্ম্মস্থলে এলো। বল্লে, "তোমার কথাই শুন্‌ব। শ্রীরামবাবুর স্ত্রীর কাছে বিস্তর সদুপদেশ পেয়েছি। হাজার হোক্ পতি পরম গুরু।"

বনোয়ারী কতটা উৎফুল্ল হলো তা ব্রতচারীমাত্রেই অনুমান কর্‌তে পার্‌বেন। বগল বাজিয়ে লাফ দিয়ে বড় বড় কবিদের ভালো ভালো কবিতা ভুল আওড়ালে। বল্লে, "এত দিনে জান্‌লেম যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম ধন্য রে ধন্য।"

বনোয়ারী যা মনে করেছিল তা নয়। শ্রীরামবাবুর স্ত্রী কোন এক স্বপ্নাদ্য মাদুলী ও সন্ন্যাসীদত্ত ঔষধের নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন। একদিন ভি-পি'তে সেই সব আপদ এসে হাজির। বনোয়ারী তর্ক করে বল্লে, "ওসব মনকে চোখ ঠারার সরঞ্জাম। মন ভুল্লেও দেহ ভুল্‌বে না। বৈজ্ঞানিক সাজ আনাতে হবে।"

ইন্দু বল্লে, "ও যে কৃত্রিম।"

বনোয়ারী বল্লে, "ওষুধ বুঝি কৃত্রিম নয়।"

ইন্দু বল্লে, "ওষুধ হলো গাছ-গাছড়ার থেকে তৈরী।"

বনোয়ারী বল্লে, "রবারও গাছের রস থেকে প্রস্তুত।"

ইন্দু মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, "ছি, ছি, যে মানুষ বুঝেও বুঝ্বে না, তাকে বুঝিয়ে বলা কী ঝক্‌মারী!"

বনোয়ারীও ঠিক্ সেই মন্তব্যই কর্‌লে।

স্বামী-স্ত্রীতে মতবিরোধ হলে স্ত্রীর মতই বহাল থাকে। এই হচ্ছে সনাতন বিধি।

যথাকালে ইন্দুর মাথায় উঠ্‌ল ওষুধের বিষ। সে যে একদিন পাগল হয়ে যাবে এর আভাসও দিলে।

বনোয়ারী তাকে এডাতেই চায়। ইন্দু বলে, "রুগ্ণ বৌ মনে ধর্‌বে কেন? আরেকটি বিয়ে করো।"

বনোয়ারী তার মুখে হাত দিয়ে বলে, "পাগল! কী যে বলো—"

ইন্দু হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন সুরে বলে, "পাগল বৈ কি। বল্‌বেই তো পাগল। পুরানো বৌকে পাগল অপবাদ না দিলে তো নতুন বৌ আন্‌তে পার্‌ছ না।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, এ কী সঙ্কট। হে ভগবান, হে আল্লা, হে গড্, তোমরা সকলে মিলে এ হতভাগ্যের একটা গতি করো।

গতি যা হলো তা মামুলি। ষষ্ঠ সন্তান আস্‌ছেন নোটিস্ পাওয়া গেল।

বনোয়ারী বল্লে, "ঔষধ বিফল বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। তবু ভালো যে হাজারটা টাকা 'পুরস্কার' পাওযা যাবে।"

ইন্দ বল্লে, "কী! আমি যাবো সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ কর্‌তে। তুমি স্বামী হয়ে এমন ইঙ্গিত কর্‌লে।"

বনোয়ারী বেচারার ইতিমধ্যে ভুঁড়িটি অন্তর্হিত হয়ে মাথায় টাক পড়েছিল। যেন একটি চর ডুব্‌ল, আরেকটি চর উঠ্‌ল। সে দিশাহারা হয়ে বল্লে, "বেশ, বেশ। স্ত্রীবুদ্ধি।"

ইন্দু তথাপি ভ্রম স্বীকার কর্‌লে না। বল্লে, "দেশের জন্যে আমার এই স্বার্থত্যাগ। দেশকে বলবান কর্‌তে হলে তার জনবল বাড়াতে হবে।"

বনোয়ারী বল্লে, "ঠিক বলেছ। ইংরাজের চেয়ে সংখ্যায় সাতগুণ হয়েও তাঁদের সমকক্ষ হতে পারা যাচ্ছে না, আটগুণ হয়ে দেখা যাক্ কী হয়।"

"দেখ্‌বে, এইবার স্বরাজ হবে।"

"হ্যাঁ, আরো দলাদলি বাড়বে। পরস্পরের মাথায় বাড়ি দেবার লোক আরো দরকার হবে।"

বনোয়ারীও প্রায় সৈনিক হয়ে উঠেছিল।

বৌকে তার বাপের বাড়ীতে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে বনোয়ারী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার শ্বশুর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার স্ত্রী তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে পাগল।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, পুরো পাগল হয়েছে তা হলে।—আরো দুশো মাইল দৌড় দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার চাকরী এখনো আছে। তোমার স্ত্রীর দুঃখ চোখে দেখা যায় না।"

বনোয়ারী ভাব্‌লে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছি। দুঃখ মিথ্যা। চাকরী মায়া।—আরো তিনশো মাইল পাড়ি দিলে।

শ্বশুর বিজ্ঞাপন দিলেন, "বাবা বনোয়ারীলাল, ফিরে এসো। তোমার ষষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রসূতী ও সন্তান দু'জনেই নিরাপদ।"

বনোয়ারী তখন পণ্ডিচেরীতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (sixth senseএর) তপস্যায় মগ্ন। ষষ্ঠ সন্তানের সংবাদ তার চক্ষুরিন্দ্রিয় গোচর হলো না।

বেঁচে থাকো সর্দি কাশি

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৯০৪)

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানলা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানলা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ঔষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়।'

তবু গেলুম তাঁর বাড়ী। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, 'সর্দির ঔষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দু'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যর। সর্দির ঔষুধ নেই? কত চান? সর্দির ঔষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে, বাও করে বাঁহাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদন করে পরি-তোষের স্মিতহাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সাবে?'

বললেন, 'গলায় একটু আবাম বোধ হয, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু আধটু কমে। আমি কখনো পবখ করে দেখিনি। সব পেটেণ্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিনা পযসায পাওযা। তবে সর্দি সাবে না, এ কথা জানি।''

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন, সর্দিব ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সাবে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কাণ্ট হেগেলেব দেশ। বললুম, 'অ।'

ফিস্‌ফিস করে ডাক্তাব বললেন, 'আবেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে ব্যামোব দেখবেন সাতান্ন বকমেব ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সাবে না।'

ততক্ষণে আবাব আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আবম্ভ কবে দিয়েছি। নাকচোখ দিযে এবাব আর বাইন-ওডাব না, এবাবে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজেব রুমাল আব একটা ওয়েস্ট-পেপাব বাস্কেট আমাব দিকে এগিযে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভবে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমাব মুখে হয়ত একটু বিবক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

বললেন, 'তর্জমা কবে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুব' লাতিন নাম জানিনে, 'হাতী' হল 'এলেফাণ্ট' আব 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।

'মানে?'

'আব বুঝে দরকাব নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশ পানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা। হাতী আর ঘণ্টা গালাগাল হয় কি করে। একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে।'

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিধে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতির কি রাগিণী। তারই মত তাঁর বুণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না। তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ও রকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক খ্রিলেগেড্ রেস্।' ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।'

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। কারণ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসে-ছিলেন—আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।'

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া

যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনার দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো করতে পারিনি, কি করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না!'

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়েব চেযেও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পাবে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না কবে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমাব চলবে না। আমি কি খাগখেযালির চেঙ্গিসখান না হাজারো প্রেমের ডন্ জুযান্?'

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ কবা যায়।'

'কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে, আমাদেব মাঝখানে তিন-খানা মাত্র ছোট টেবিলেব যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেবিযে ওঁব কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পডলে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হযে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তাব ফন্দিফিকিব আব আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায় আব বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পডলে হযে যায একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এসব পাগলামি কবছে কি কবে।'

'এ জীবনে সেই দিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কাবণ পূর্ণ একঘণ্টা ধবে ভেবে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পাবলুম না, আলাপ করি কোন্ কাযদায। কিন্তু এহেন দয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেবিয়ে যেত।'

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়ীতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এতো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটী, গণ্টা। খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আট জনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কা-ধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করালেন। একি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়া-গামী প্রিজনার-ভ্যান? চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?'

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য) নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুট-পাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।'

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ীর কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল্।'

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরি, নত্র দাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।'

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হ'ত না।'

'জানলা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানলাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।'

'মা-মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।'

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপব আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না,' 'আপনি কেন মিছে মিছে,' ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস্ ব্যস্' কবেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি; আপনি কখনো রাইনল্যাণ্ড গিয়েছেন? না? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।'

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কি করে? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।'

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ— ? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোনে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুণ গুণ করে বললুম,

"জয করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায রে।"

ডাক্তার বললেন, "খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর; জীবমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইযোরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ

শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টি-সেপ্টিক্‌ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তারপর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা চেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রূয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না ; ওহে খানসামা, এদিকে—,ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।'

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারী ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু' একবার ব্লাশ্‌ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।'

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আব দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টাণ্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তাব বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক বস্ত্রে। এমন ভান কবে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্‌বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে মুখে এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এস্তার।'

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্‌।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনেব ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকে সাহায্য করেন।'

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে। বাপ-মা নেই। এক, খণ্ডার পিসির বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পরতে দেয়, ব্যস্। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী জোগাড় করে মাস্টারী করে।'

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্দী করে রেখেছে যে চকিতা হরিণীর মত সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বলনুম 'একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে ককখনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।'

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজী হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্রাটেজিক পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ।'

'যা-কিছু আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন্-টিনের ভিতর মাছের মত। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বলসুম, 'আপ যাইয়ে, পর বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁয় ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেণ্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস্; আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর! টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখের অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভাব নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মত কাছে টেনে আনতে পারি।'

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ও রকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস্ একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে, হাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, 'কড়া না হলে প্রেম মেলে না।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে

পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।'

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।'

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমার একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়। যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ীর সামনে ফুটপাথে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার ; যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজী হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।'

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম, বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাব্লিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশী সময় নেই। অথচ গরম টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ীর দিকে—মা-মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, 'দুগ্গা বলে ঝুলে পড়লুম।'

'ডাক্তার বললেন, সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ীর সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নিচে—আপনাদের পাগলা ফারেনহাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নিচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।'

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ, নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।'

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল।'

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।'

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, তার টুকটুকে লাল ঠোঁট দু'টি ব্লু-ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনি-নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।'

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।'

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন; পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।'

'কতক্ষণ এ রকম ধারা কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।'

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, 'দরজা খোল।'

'পিসি'।

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।'

'আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মতো বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি।'

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না,' 'কেলেঙ্কারি,' 'শোবার ঘরে পরপুরুষ,' 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার,' এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ'গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।'

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম,

'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্‌। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী, আমি এভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব এত দিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।'

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হাঁ করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস। মুখের কুঁচকানো, এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।'

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বলল ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।'

'এভা তখনো অচৈতন্য।'

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ীর সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।'

'মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে এভা যে এ বাড়ীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ্‌ কট্‌লেট্‌ এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে

ধরে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হত।'

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ ; সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালীর সোনালি রোদে রূপালী প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যাণ্ডের শ্যামলিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছু দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নিচু করে ফরাসিস্ কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলি প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

পাঞ্চজন্য
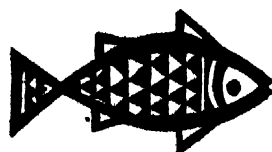
শিবরাম চক্রবর্ত্তী

(১৯০৫)

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গাঁয়ে ছিলেন না, তাঁর ছেলে পতিতপাবনই চিঠিখানা খুলল।

" সদর দেকে বড় দারোগা এবং সার্কেলবাবু যাচ্ছেন তোমাদের এলাকায়। জলপথে তাঁরা যাবেন, অতএব জলপথেই যেন সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসন্তোষের কারণ না ঘটে সেদিকে হুঁশিয়ার থেকো। তাঁরা যেন কিছু না মনে করেন বা মনে করার কোনো ওজর না পান—সেদিকে বিশেষ নজর রাখবে।"

সদর থেকে ওদের কোনো শুভার্থীর চিঠি।

চিঠি পড়ে পতিতপাবনের মুখ কুচকে গেল।

"ভারী মুশকিলে পড়লাম তো। বাবা এখন ক'দিনে ফিরবেন কে জানে, ইদিকে আমি—!" বলল সে। মানে,ওর যা যা বলবার ছিল তার কিছুই বলল না।

"মুশকিল কিসের? যেমনটি লিখেছে তেমন তেমনটি করলেই হবে।" আমি ওকে উৎসাহ দিই।

"জলপথে সংবর্ধনা কি করে যে করব আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে। অনেক নৌকো জড়ো ক'রে আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে হবে বোধ হয়? কিন্তু অতো নৌকোই বা আমি পাই কোথায় এখানে? তাছাড়া এখন এ গাঁয়ে কি অতো নৌকো আছে?"

পতিতকে দারুণ দুশ্চিন্তায় নিপতিত দেখা যায়।

"আরে পাগল! জলপথের মানে কি তাই? মোটেই তা নয়।" আমি জানাই।

সবে প্রথম শ্রেণীতে পা দিলেও বাংলা ভাষায় আমি উত্তম পুরুষ—বাল্যকাল থেকেই। নামে জনার্দন না হলেও ভাবগ্রাহীতায় চিরদিনই আমি ওস্তাদ। দারোগার পথ আর আমাদের পথ কখনো এক হতে পারে না, সহপাঠিকে আমি বুঝিয়ে দিলাম। আমরা জেলে যাই এবং ওরা জেলে যাওয়ায়। আমরা যখন ঠিক এক পথের পথিক নই, আমাদের জলপথও নিশ্চয় আলাদা হবার কথা।

আমার ভাবার্থ শুনে পতিতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল—"ওব্ বাবা! এর মধ্যে য়্যাতো রহস্য?"

"কিন্তু সেও তো এক মুশকিল," হাঁ-কার বন্ধ করে সে বললে: "ওসব এখন পাই কোথায় এখানে? এধারে কি ওই সব চীজ্ পাওয়া যায়?"

"সদরে কাউকে পাঠিয়ে দাও না, নয় দু' এক বোতল নিয়ে আসুক গে।" আমিই বাতলাই।

কে যাবে এখন সদরে? আর কখন যে ওরা এসে পড়বে তাই বা কে জানে।—অতঃপর এই দ্বিবিধ সমস্যা দেখা দিল।

"আমার কি? আমি মানে ব'লে দিয়েই খালাস। তোমরা যাতে মানে মানে এবং প্রাণে প্রাণে রেহাই পাও তার পথ দেখিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। আমার কর্তব্য শেষ। তারপর করা না করা তোমার ইচ্ছে।" নিস্পৃহের মতো আমার কথা। যে বস্তু অন্দরের পথ দিয়ে যাতায়াত করলেই লোকে ভয় খায়, পাছে বন্ধুকৃত্যের দায়ে তাই আনতে আমাকে সদরপথে পা বাড়াতে হয়, তার গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।

"দাঁড়া, একটা আইডিয়া পেয়েছি।" সে বলে ওঠে: "আগের বার যখন মামার বাড়ি গেছলাম না কলকাতায়? আমার মামাকে একটা জিনিস বানাতে দেখেছিলাম। তার নাম পাঞ্চ।"

"হ্যাঁ, ট্রামগাড়ীতে কলকাতার কণ্ডাক্টররা ক'রে থাকে আমি জানি।" ঘাড় নাড়ি আমি: টিকিটের ওপর করে।"

"আরে, সে পাঞ্চ নয়, এ অন্য রকম। পাঁচরকমের বোতল থেকে একটু একটু ক'রে ঢেলে খুব নেড়েচেড়ে বানাতে হয়। মেলে নাকি হাতে হাতে স্বর্গ।...আমি খেয়ে দেখিনি, মানে, ফাঁক পাইনি চাকবার। মামাটা যা চালাক, দেরাজে চাবি দিয়ে রাখত।"

"এখানে বলে গিয়ে এক রকমেরই পাওয়া যাচ্ছে না, সে পাঞ্চ এখানে হবে কি ক'রে শুনি?" ওর আদিখ্যেতায় আমি অবাক্ হই।

"এখানে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই না হয় বানানো যাবে। প্রোসেসটা আমার জানা আছে তো। দ্যাখ না, কী করি!"

খেজুরের রস হাঁড়িখানেক পাওয়া গেল, আর পতিত কোত্থেকে খানিকটা তাড়ি জোগাড় করে আনল। আমিও পেছুবার ছেলে নই, যতটা তাড়াতাড়ি পারি বিপদকালে দোস্তকে সাহায্য করাই আমার দস্তর। সুসময়ে যেসব বন্ধুর দেখা পাওয়া যায়, আর অসময়ে কেবল যাদের বন্ধুরতা দেখা দিতে থাকে, তাদের অন্যথা বলেই চিরদিন নিজেকে আমি মনে ক'রে এসেছি। অতএব আমার পিসেমশাই কী একটা টনিক খেতেন—যার শতকরা ত্রিশভাগ নিছক অ্যাল্‌কহল্ ব'লে নোটিশ মারা ছিল—তার থেকে বেশ কিছুটা আমি সরিয়ে নিয়ে এলাম।

এই ত্র্যহস্পর্শের ওপরে আবার সিদ্ধি এসে পড়ল। সিদ্ধিলাভের ফলে উম্দা হয়ে পানীয়টা এতক্ষণে খাবার যোগ্য হয়েছে ব'লে আমার ধারণা হোলো।

বলতে কি, আমার একটু নেশাই লাগলো যেন। "চেখে দেখব পাতে নাকি একটু?" লালায়িত হয়ে জিগ্যেস করলাম।

"না না। এখন না। আগে অতিথি-সৎকার হোক্, তারপরে যদি থাকে তো আমরা।" পতিতেরও লালসা দেখা দিলেও সে আত্মসংবরণ করতে জানে। মামার বাড়ি থেকে সেই শিক্ষা সে লাভ ক'রে এসেছে।

কিন্তু এ যা হয়েছে, এমন দেবভোগ্য জিনিস, অতিথিসেবার পরে আমাদের পাতে দেবার মত থাকবে কিনা সন্দেহ হয়। আমি খুঁত খুঁত করি।

"কিন্তু যাই বলো এ তোমার সেই পঞ্চরং তো হোলো না"—খুঁত খুঁত করতে করতে একটা খুঁত ধরা পড়ে আমার কাছে—"চারটে জিনিস পড়ল এতে কেবল। তবে একে চতুর্বর্গ লাভ বলতে পারো বটে। বলতে গেলে তাও নেহাত কম নয়।"

"এক্ষুনি একে পাঞ্চ বানিয়ে ফেলছি, দ্যাখ্ না।" এই ব'লে সে বাবার লাল কালির বোতলটা ওর ভেতরে বেবাক ফাঁক করে ফ্যালে।—"এই নে তোর পঞ্চরং। হয়েছে এবার?"

হয়নি বলা কঠিন। কেননা পঞ্চত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে পানীয়ের রং যা খুলেছিল কি বলব। এমন কি নিজেকে আমি জলচর দারোগার মতই সতৃষ্ণ বোধ করতে লাগলাম।

প্রায় কুজোখানেক সংবর্ধনা তৈরি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দারোগা-বাবুর বজরা এসে ভিড়েছে, পাহারাওয়ালা এসে খবর দিল। কেবল দারোগা-বাবুর মজুদ হওয়াই নয়, সেই একই বজরায় তার নিজেরও যে আমদানি সেই খবর জানাতেও সে কসুর করল না।

যাক্, সংবর্ধনা যখন প্রস্তুত, তখন বজ্রাঘাতে আর কিসের ভয়? আমি আর পতিত নদীর দিকে দৌড়ালাম। তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে আনতে হবে তো।

দারোগা এবং সার্কেলবাবু আপাততঃ নামবেন না, বজরাতেই থাকবেন জানালেন। দারোগাবাবু আরো জানালেন যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল যদি একটু পরিষ্কার—

আর জানাতে হোলো না। ওতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি পতিতকে চোখ ঠারলাম—যার সরলার্থ—কী। কী বলেছিলাম? প্রথম কথাই তেষ্টার কথা—দেখচ তো এখন? ঠ্যালা বোঝো।

কিন্তু ঠ্যালা বোঝার কিছু ছিল না তাই রক্ষে। কুঁজো বোঝাই পরিষ্কার হয়ে রয়েছে, কেবল তাকে ঠেলে নিয়ে আসতেই যা দেরি। "এক্ষুণি আনছি," বলে' দৌড় মারলো পতিত।

"ছেলেটাকে বলে দেওয়া হলো না। আমার জন্যেও অমনি এক গ্লাস আনত।" সার্কেলবাবু বললেন। তাঁকেও বেশ তৃষ্ণার্ত দেখা গেল।

"আপনি ভাববেন না। ও কুজোভর্তি নিয়ে আসবে।" আমি আশ্বাস দিই।

"শুধু জল আনলেই যথেষ্ট। আবার যেন খাবার টাবার আনবার হাঙ্গাম না করে।" দারোগাবাবু মন্তব্য করলেন।

বলতে বলতে পতিত সেই কুজো ঘাড়ে (নিজে আরেক কুজো হয়ে) আর গোটা চারেক গেলাস হাতে এসে হাজির। সেই কুঁজো নিয়ে আমরা সবাই বজরার ভেতরে গিয়ে জড়ো হলাম। বেশ বড় গোছের বজরা। ভেতরে বেশ প্রশস্ত জায়গা। শোবার, বসবার, নড়বার চড়বার কোনো অসুবিধা নেই।

বড়ো বড়ো দু' গ্লাস টইটুম্বুর ক'রে দেওয়া হোলো।

"একি! এ কী জিনিস? সরবৎ নাকি?" জিগ্যেস করলেন দারোগাবাবু।

পতিত তদুত্তরে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বলতে না দিয়ে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সরবৎই বটে। ওই বানিয়েছে। ওর মামার কাছ্ থেকে শেখা এক রকমের এস্‌পেশাল্‌ সরবৎ।" পতিতকে চোখ টিপে বাধা দিয়ে আমিই সদুত্তর দিলাম—চোখ টেপার মানে হচ্ছে—ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে চলতে হয়, বলতে হয়, বুঝলি রে হাবা?

পতিত আমার ইঙ্গিত বুঝল, কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

"স্পেশাল সরবৎ? তাই নাকি? তা রং দেখলে তাই মনে হয় বটে।" সার্কেল অফিসার সাগ্রহে গ্লাসটা তুললেন।

পাহারাওলাও আড়াল থেকে একটা হাত বাড়ালো। সেও তো জলপথে এসেছে, তার সংবর্ধনাই বা আলাদা হবে কেন? সেটা কি নেহাত বিসদৃশ হবে না? তার লোটাতেও একটু ঢেলে দেওয়া হোলো।

বজরার মাঝি দুজনাও বেশ দেখা গেল লোলুপ: "আমাদেরও একটু পেসাদ দেবেন বাবুরা।"

তাদেরকেও বাদ দেওয়া যায় না। তাদের বদ্‌নাতেও বেশ খানিকটা দেওয়া হোলো। এখন আমাদের পালা।—পতিত বলেছিল, অতিথিসৎকার ক'রে বাকী থাকলে—এবং সে বুদ্ধি ক'রে দু'টো গ্লাস বেশীই এনেছিল—নিঃসন্দেহ উক্ত আমাদের জন্যই। কুঁজোর ভেতরে বাকী কিছু আছে কিনা আমি উঁকি মারলাম।

"বাঃ ফাস্ কেলাস।" গেলাস ফাঁক ক'রে ব'লে উঠলেন দারোগা।

"এমন সরবৎ জীবনে খাইনি।" সার্কেলবাবুরও গেলাস খালি। এবং খালি সাধুবাদ।

"বঢ়িয়া চীজ।" পাহারাওলাও জানাতে দ্বিধা করল না।—"বড়ি বঢ়িয়া চীজ।"

"তোমরাও একটু খাও। কষ্ট করে করেছ।" দারোগা বললেন।

"হ্যাঁ, খাব বইকি সার্। খাচ্ছি এই যে।" আমি তার সম্মতিতে সায় দিতে দেরি করি না।

পতিতও চটপট আরো দু'গ্লাস ভর্তি ক'রে ফ্যালে—তার এবং আমার গো-গ্রাসের উপযুক্ত দু' গ্লাস।

গ্লাস মুখে তুলতে গিয়ে দারোগার দিকে আমার নজর পড়ল। বজরার গায়ে ঠেসান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন—কি রকম যেন ঋজুভাবে দণ্ডায়মান মনে হোলো। সাধারণতঃ মানুষ, বিশেষ করে' দারোগা মানুষরা এভাবে দাঁড়ায় না, দাঁড়িয়ে আরাম পায় না। আমার পিসেমশাইকে প্রাণায়াম করবার কালে ওই ধবণে বসতে দেখেছি। ওতে প্রাণাযাম হতে পারে, কিন্তু প্রাণের আরাম হয় না, পরীক্ষা ক'রে দেখা আমার। কিন্তু কোণঠাসা হযে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—এ আবাব কী প্রাণায়াম দাবোগাবাবুব?

দারোগাবাবুর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, একেবাবে কাঠ। নট্ নড়ন চড়ন। নট্ কিচ্ছু। চক্ষু স্থিব, কিন্তু দুই চোখ দিয়ে কী অনির্বচনীয় মধুবৃষ্টি হচ্ছে—এমন প্রাণকাড়া চাউনি দেখা যায় না। আব সাবা মুখে যা অপার্থিব আহ্লাদ! পুলক যেন থই-থই করছে।

সার্কেলবাবুব দিকে তাকালাম। তাঁরও তদ্‌গত ভাব, তথৈবচ অবস্থা। আত্মহাবা হয়ে তিনি ব'সে পড়েচেন। এইটুকুই তাব বাহুল্য। আমার হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ল। পতিত মুখে দিতে যাচ্ছিল, ঘুষি মেরে তার গেলাসটা আমি খসিয়ে দিলাম।

"কী সর্বনাশ।" আমি আর্তনাদ করে উঠেছি—"এতগুলোকে তুমি খুন করলে?"

"দূর। তা কি হয়?" বলল পতিত—কিন্তু তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা।

"পাহারাওলাটার দিকে তাকাও।" আরেক দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কিন্তু সত্যি বলতে, তার পানে তাকানো যায় না। মাঝিগুলোর তো হুঁশ নেই, বজরার মাঝেই তারা কাত। কেবল পাহারাওলাটা তখনো যুঝছে। বোধ হয় ওই পঞ্চ রংয়ের এক রং—সিদ্ধিটা একরকম রপ্ত ছিল বলেই এখনো কিছুটা জ্ঞান-গম্যি ওর রয়ে গেছে।

আনন্দে গদগদ ভাব নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে আসছিল।

"তোমাকে গেরেপ্তার করতে আসচে মনে হয়।" আমি বললাম।

পতিত নিরুত্তর—নিস্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে। আর একটু এগিয়ে অভিন্নদশা লাভ করে পাহারাওলাও বজরা নিল।

"একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেচো—পাহারাওলাটাকেও খাইয়ে দিয়েছো।" আমি বলি, "তা না হলে এতক্ষণে আমাদের হাতে হাত-কড়া পড়ে যেত। নদীর এধারটায় কেউ বড় আসে না, সেটাও এক বাঁচোয়া। চলো এবার ভালয় ভালয় সরে পড়ি। পালিয়ে যাই এখান থেকে।"

আমার কথায় কান না দিয়ে পতিত দারোগাকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়—"দারোগাবাবু! ও দারোগাবাবু!"

বাতাহত কদলীকাণ্ডবৎ ব'লে একটা কথা আছে না? পতিতের বাত শুনে আর ঝাঁকুনি খেয়ে দারোগাবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে প্রায় সেইরকম ক'রে পড়তে যাচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে আমি বাধা দিলাম—তাঁর আর সে কাণ্ড করা হোলো না। ধরে ফেলে ফের তাঁকে সেই বজরার গায়ে ঠেক্‌নো দিয়ে রাখা হোলো। আর তিনি স্থির প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন—তাঁর ভাববিহ্বল মুখ নিয়ে।

তারপর একে একে বাকীদেরও নেড়ে চেড়ে দেখা গেলো—কারো বেলা কোনো ব্যতিক্রম নেই। হালের মাঝি থেকে পাহারাওলা পর্যন্ত সবার এক হাল। সবাই সমান নিস্পন্দ—সবার মুখেই সেই দেবদুর্লভ বোকা হাসি।

"তোমার পাঞ্চের জন্যেই এই রকম হোলো।" আমি বললাম।

পতিত কিছু বলল না, প্রত্যেকের বুকে কান পেতে শুনতে লাগল।

পাঞ্চের জন্য হোলো বটে, কিন্তু পাঞ্চের কোন্‌টার জন্য হোলো, আমি ভাবি। ওর মধ্যেকার কতকাংশের দায়িত্ব আমারো ছিল তো। সেই টনিকটার থেকেই এই টনিক এফেক্ট কিনা কে জানে। না কি, বোতলের সেই লাল কালিই শেষে এই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে? ভাবতে হয়।

"না না প্রাণ আছে।" বলল পতিত: "ধুক্‌ধুক্‌ করছে বুক। নিশ্বাস পড়ছে সবার—খুব আস্তে আস্তে যদিও—তবুও বেঁচে আছে সবাই।"

"কিন্তু কতোক্ষণ আর থাকবে সেই হচ্ছে কথা।" আমি বলি: তোমার পাঞ্চের জন্যই—" আবার আমার পাঞ্চজন্যনিনাদ।

"তোমার বকর বকর থামিয়ে কি ক'রে এদের চৈতন্য ফেরানো যায় সেই চেষ্টা একটু দেখবে?" ধমক দিল পতিত।

মহাপ্রস্থানোন্মুখ পাণ্ডবদের দিকে তাকালেন—যেন কয়েকটি মোমের পুতুল। প্রত্যেকের মুখে প্রসন্ন দিব্য ভাব। যেন এই জীবন এবং এই পৃথিবীর প্রতি

কারো আসক্তি নেই। সবাইকে মার্জনা করে' মার্জিত হয়ে সশরীরে স্বর্গলাভ ক'রে ব'সে আছেন সবাই।

অজ্ঞানাচ্ছন্নকে চৈতন্যদানের যতগুলি পদ্ধতি জানা ছিল—গালে চড় মারা থেকে শুরু ক'রে গা হাত পা টিপে দেওয়া তক্ কিছু বাকী রইলো না—এমন কি, একজন জলেডোবা লোককে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দানের যে কৌশল একদা দেখেছিলাম তাও পরীক্ষা করতে কসুর করা হোলো না—কিন্তু সমস্তই বৃথা হোলো।

শেষ পর্যন্ত পতিত দারোগার পায়ে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিলে—অন্য কোনো উপায় না দেখে। কিন্তু তথাপি তিনি মিষ্ট হাসি হাসতে লাগলেন।

"আর কোনো পথ নেই। ডাক্তার ডাকো এবার।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকি আর সাধ করে গলায় ফাঁস পরি—মাইরি আর কি! বন্ধু ছাড়া এমন সদুপদেশ কে দেবে?" পতিত আমার দিকে রোষকষায়িতনেত্রে তাকালো: "কিন্তু ভাই, ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই, ভয় করে না একটুও, কিন্তু বাবা যে ফিরে এসে প্রথমেই একচোট ঠ্যাঙাবে সেই কথাই আমি ভাবছি।" পতিতকে প্রায় কাঁদো কাঁদো দেখা যায়।

"আচ্ছা, আমি বলি কি বজরার তলায় ছ্যাঁদা ক'রে বজরাসমেত ডুবিয়ে দিলে কেমন হয়? অবিশ্যি, এখন না, এরা সব মারা গেলে তারপরে—মারা তো যাবেই।" আমি ভরসা দিই।

"নদীর কূলে কখনো বজরা ডোবে? ডোবালেও মাথার দিকটা উঁচু হয়ে জেগে থাকবে।" পতিত জানায়।

"আহা, এখানে কেন? নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, আমি আবার সাঁতার জানিনে।"

"আমি জানি।" পতিত বলে এবং প্রস্তাবটা ভুরু কুঁচকে ভাল ক'রে তলিয়ে দ্যাখে—হ্যাঁ, তাহলে বোধ হয় মন্দ হয় না। এতক্ষণে একটা বন্ধুর মত উপদেশ দিয়েছিস্ বটে। হ্যাঁ, তাহলেই ব্যাপারটা একদম চুকে যায়—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। সাক্ষী সাবুদ কিচ্ছু থাকে না। তুই আবার সাঁতার জানিস্‌নে—বলছিলি না?"

প্রস্তাবটার অসুবিধার দিক্‌টা আরো ভাল ক'রে আমার নজরে পড়ে এবার। কী জবাব দেব ভেবে পাইনে।

"ভয় খাসনে তুই। আমি তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। আমি তো সাঁতার জানি।" পতিত অভয় দেয়।

ও যা আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে তা মা মহানন্দাই জানেন—আমারো আর জানতে বাকী থাকে না।

তখন আমাকে অন্য এক সদুপায় বার করতে ঘোরতরভাবে মাথা ঘামাতে হয়।

"ওদের যদি কোনো রকমে বমি করানো যায় তাহলে পেটের ওই সব বেরিয়ে গিয়ে বেহুঁশ অবস্থাটা কেটে যেতে পারে।" আমি বলি: "ঘুরপাক খাওয়ালে হয় না?"

কথাটা পতিতের মনে লাগে। আর তক্ষুণি তক্ষুণি ও কাজে লেগে যায়।

দু'টো বিছানার চাদর বজরার দু'দিকে খাটানো হয়—চাদরের চারটে খুঁট দড়ি দিয়ে শক্ত করে' খুঁটোর সঙ্গে লাগিয়ে ফ্যালে।

"এইবার দোলনার মতো হোলো না? কি বলিস? এবার ওদের একে একে এতে চাপিয়ে খুব কষে ঘুরপাক খাওয়ানো যাক। মনে হচ্ছে এতেই হবে।" পতিত সমস্কৃতের পণ্ডিতের মতন মুখখানা বানায়।

"আগে দারোগা আব সার্কেলটাকে তোল্—ওগুলোর ব্যবস্থা পরে।" পতিত ওদের অঙ্গে বাবুর যোগ কবা নিষ্প্রয়োজন বোধ করে; কাবু অবস্থায় স্বভাবতঃই তখন কারো বাবুত্ব ছিল না।

দারোগা দাঁড়িয়েই ছিলেন—বোধ হয় দোলনায় চাপার অপেক্ষাতেই। আমি আর পতিত দুজনে ধরাধরি ক'বে তাঁকে দোলনায় তুলে শুইয়ে দিলাম। সার্কেল বজরার মেঝেয় ততক্ষণে স্ট্রেট্ লাইন্ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকেও ধ'রে তোলা হোলো।

"ব্যস, দে এবাব ঘুরপাক—নাগব দোলায়।" এতক্ষণে পতিতের একটু উৎসাহ দেখা দেয়।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে দোললীলা চলল। খানিকক্ষণ একে দোলাই, তারপর লাফিয়ে গিয়ে ওকে দোল দিতে হয়। দোলানোব চোটে গা আড়পাড় ক'রে আমার পেটে যাকিছু ছিল সব গলা দিয়ে গলে এল।

"ফল দেখা দিয়েছে।" বলল পতিত। বেশ স্ফুর্তির সঙ্গেই বলল।

নবোদ্যমে লাগা গেল আবার। আরেক ঘণ্টা ঘুর্ণিপাকের পরে এবার পতিত বমি ক'রে বসল।

আমি কিছু বললাম না। শুধু তাকিয়ে দেখলাম।

"এতক্ষণে আমার সত্যিই একটু আশা হচ্ছে।" পতিত নিজেই জানালে।

আমার কিন্তু আশাপ্রদ কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না। দারোগার মুখের মিষ্ট হাসি অবশ্যি মিলিয়ে এসেছিল, মাঝে মাঝে তিনি শ্রুভঙ্গী করছিলেন এবং

কেমন যেন একটা কাতরতার ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর আননে—কিন্তু হলে কি হবে, বমন করার কোনো আগ্রহ সেখানে নেই। সার্কেলবাবুর লক্ষণও সুবিধে-জনক বলে ঠেকলো না।

চললো ঘুরপাক। খানিক পরে দারোগাবাবু অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তাঁকে নড়তে-চড়তে দেখা গেল।

"এই! দেখছিস কি? চট্ ক'রে এগুলো সরিয়ে ফ্যাল্।" পতিতকে ইশারা করতেই সে কুঁজো, গেলাস—স্পেশাল সরবতের যাকিছু মাল মসলা সব—নদীগর্ভে জলাঞ্জলি দিল। প্রমাণ কখনো রাখতে আছে? আর রাখলেও দারোগার কাছাকাছি রাখা ঠিক নয় নিশ্চয়ই?

আস্তে আস্তে দারোগাবাবু অতিকষ্টে দোলনার মধ্যে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। "আমি···এ কোথায়···আমার কী হয়েছে?" তাঁর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল।

"আপনার অসুখ করেছে?।" উচ্চকণ্ঠে বলল পতিত।

"অসুখ? কী অসুখ করল?···আমি এরকম করে' শুয়ে কেন? এভাবে কে আমাকে শোয়ালে? এতো আমার বিছানা নয়।"

"আজ্ঞে, জলপথে যে অসুখ ক'রে থাকে সেই অসুখ।" আমি জানালাম: "যার নাম সী সিক্‌নেস্। অর্থাৎ সামুদ্রিক পীড়া—তাই আপনার হয়েছে।"

"আর এ রকম ব্যামো হলে যে রকম করে শোয়ানো নিয়ম সেই ভাবেই আপনাকে রাখা হয়েছে।" পতিত বলে দিল।

বজরার ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে মহানন্দাকে তাঁর মহাসমুদ্র বলে ভ্রম হোলো কিনা জানিনে, কিন্তু মেঝেয় তাকিয়ে সামুদ্রিক পীড়ার যাবতীয় লক্ষণ চাক্ষুষ প্রমাণের মতো চারিধারে ছড়াছড়ি দেখলেন এবং সেই দৃশ্য দেখে আবার তাঁকে বমি করতে হোলো।

আর তখন একেবারে নিজের সম্মুখেই হাতেনাতে তিনি প্রমাণ পেলেন।

প্রমাণের সঙ্গে প্রমাণ যোগ করা, মিলিয়ে দেওয়া এবং খাপ খাওয়ানো দারোগাদের চিরকেলে পেশা। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

মেয়েদের পছন্দ

বিরূপাক্ষ

(১৯০৫)

মেয়েরা যে কী পছন্দ করেন এইটেই আজ পর্যন্ত বুঝতে পারা গেল না। জীবনে কোনোদিন ওঁদের পছন্দমত জিনিস কিনে আনতে পেরেছেন? বছর দুয়েক আগের কথা বলি। পূজো ঘনিয়ে আসছে, পরে জিনিসের দাম হু-হু করে বেড়ে যাবে, এই বেলা সব কিনে-কেটে নিয়ে এস—এই তাগাদা রথযাত্রার দিন থেকে বাড়িতে শুরু হল। তার পরের দিন থেকে মনে করুন, কাপড়, জামার ছিট, মাকিন, লংক্লথ আনতে শুরু করা হলেও, তিন মাসের মধ্যে একটা জিনিসও তাঁদের পছন্দসই হল না—শেষে ষষ্ঠির দিন নিজেরাই কি ভাবে সে সমস্যার সুরাহা করলেন কে জানে। মধ্যিখান থেকে আমার প্রাণান্ত। এক-একটা আইটেম ধরুন—মাথার চিরুনি, চুলের কাঁটা, ফুলেল তেল, পাউডার। কলকাতা শহরে এর যা যা ভ্যারাইটি পাওয়া যায় তা এনেছি, পছন্দ হয় নি। চিরুনি দেখে মন্তব্য হয়েছে, ওতে মেয়েদের মাথার চুল আঁচড়ানো যায় না, মাছের আঁশ ছাড়ানো যায়, দরকার হলে নারকেল-কুরুনি হিসেবেও চলতে পারে। একটা জিনিস দেখলে চিনতে পার না, আশ্চর্য!

বেশ, রেখে দাও। দিশী মোষের সিং বলেই এনেছিলুম, নয় ফেরত দেব। ···চুলের কাঁটাগুলো চলবে তো?

না।—বেশ জোর প্রতিবাদ এল: ওর চেয়ে ঝাঁটার কতকগুলো কাটি কিনে আনলে না কেন? তাতে দুই কাজই চলত।

বেশ, রেখে দাও।···পাউডার?

বলবার পূর্বে গান-পাউডারে আগুন দেওয়ার মত সবাই মার্ মার্ করে উঠলেন।

আচ্ছা, তুমি কী? রাস্তায় সেই চার আনা করে প্যাকেট বেচে তাই কিনে আনলে? নিজে মেখো, বাহার খুলবে।

দেখি ফুলেল তেলটা? কি রকম গন্ধ?

কি রকম কেরোসিন কেরোসিন গন্ধ বেরুচ্ছে না? দেখ্ তো বিল্লী।

বিল্লী ওপরে প্লাসটিকের ছিপিটা খুলে ফোঁস ফোঁস করে একবার গন্ধ টেনেই বলে উঠল, সত্যি, একেবারে রেড়ীর তেল-তেল বলে মনে হচ্ছে। বিচ্ছিরি!

ঘুন্টি আগ্রহ করে নাকটা কাছাকাছি বাড়িয়েই বলে উঠল, এঃ—ম্যা গো! গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে। দিশী তেল, ও আর কত ভাল হবে।

গিন্নীর স্বর চড়ল: আমি জানি, চিরকাল দু পয়সা এক পয়সা কমের

জন্যে যত পচা তেল কিনে নিয়ে আসবে, ওই জন্যে কারুর মাথায় একগাছা চুল থাকছে না। দূর করে ফিরিয়ে দিয়ে এস এসব।

তেলেব ছিপিটার ঢাকনি খুলে দেখি, ও বাবা, শিশির মুখে আবার গালা দিয়ে সোনার ছিপি আঁটা। সুগন্ধ, দুগন্ধ কিছুই নেই. সম্পূর্ণ নির্গন্ধ—কিন্তু সে কথা বললে তো ওইখানেই রায়ট্ বেঁধে যাবে। অতএব আবার কাগজে প্যাক করে জিনিসগুলি ফিরিয়ে নিয়ে চললুম। হঠাৎ মনে হল, পকেটে সাবান আছে, এটা যদি পছন্দ হয় দেখি।

বার করে হাতে দিতেই গিন্নী খপ করে সেটি আমার পকেটেই পুরে দিয়ে বলে উঠলেন, রেখে দাও, কাপড়-কাচা সাবানের জন্যে বাড়িতে অনেক বার্-সোপ আছে, তুমি গায়ে মাখবার সাবান এনো।

এইটেই তো গায়ে মাখার সাবান।

ও মা!—বলেই তিনি গালে হাত দিয়ে অন্যান্য মেয়েদের দিকে চাইলেন, তাঁরাও চোখের যা এক্স্প্রেশন দিলেন তাতে মনে হল সিনেমায় কটা ক্লোজ-আপ্ দিলে লোকে পরিচালকের তারিফ করত।

আমি নির্বাক। গুটি গুটি চলতে শুরু করলুম। গিন্নীর বোধ হয় দয়া হল, বলে উঠলেন, তা এখুনি আবার কোথায় সাতমুল্লুক পেরিয়ে ফেরত দিতে চললে? পরে যেয়ো না।

বললুম, না এই মোড়েব দোকান থেকে এনেছি, ফেবত দিয়ে আসি।

কি কাণ্ড! বলিহারি তোমাব আক্কেলকে। মোড়ের দোকানে মুড়ি, ল্যাবঞ্চুস বেচে, ওদের কাছ থেকে কেউ এসব জিনিস আনে?

আমার রাগ হল, বলে উঠলুম, মোড়ে দোকান করেছেই বলে সেটা খারাপ হল। ওদের দোকান দেখেছ কখনও? ভাল জিনিস ওরা যথেষ্ট রাখে, কিন্তু তোমরা কি তা নেবে?

সমস্বরে অন্য মেয়েরা বলে উঠলেন, কিচ্ছু রাখে না। সেদিন এক কাটিম স্থতো কিনে আনা হল, সব পচা। যত পুরনো মালের ডিপো।

বেরিয়ে গিয়ে তখনই মোড় থেকে বিলিতী ফেস্-পাউডার, অস্ট্রেলিয়ান চিরুনি, ফ্রান্সের এসেন্স, আমেরিকান সাবান এনে নাকেব সামনে ধরে দিলুম।

শিশি দেখেই সব আহ্লাদে ডগমগ: দেখ দেখি, কি এনেছিলে আর এসব কী জিনিস! দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। এ পাউডারটার কত দাম বলছে?

সাড়ে চার টাকা। ইলেক্ট্রিকের শক্ খাওয়ার মত চমকে সেটি তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে গিন্নী বলে উঠলেন, ও বাবা!···চিরুনি?

আড়াই।

সর্বনাশ। সাবান তিনখানা ?

সাড়ে সাত টাকা।

ফিরিয়ে দিয়ে এস, এখুনি ফেরত দিয়ে এস। ও ডাকাত। তোমার বোকা-সোকা দেখে একেবারে হাতে মাথা কাটতে চায়।

চিৎকার করে বলে উঠলুম, আরে ছাই, নেবে কি না বল। না নাও ফেরত দিয়ে আসি, আমি আর কিছু কিনে আনতে পারব না। ওরা দু-চার পয়সা বেশী নিতে পারে, কিন্তু ওগুলোর এইরকমই দাম।

বেশ, তোমায় কিছু কিনতে হবে না। ভেবলি যখন কলেজে বেরুবে ফেরবার পথে কিনে আনবে 'খন।

যাক, প্রসাধনের পর্ব চুকল, এল কাপড়ের তাগাদা: একবার যাও না দোকানে গা। হু-হু করে যে রোজ দর বেড়ে যাচ্ছে দু-চারখানা ভাল দেখে শাড়ি, এগারো গজ মার্কিন—এমনি সাধারণ ধরনের এনো, খুব দামী নিতে হবে না, ন গজ ভাল ছিট, সাত গজ লংক্লথ কিনে নিয়ে এস তো।

আনা হল। শাড়ির পাড় দেখে সবার হাড় পর্যন্ত জ্বলে গেল।

আচ্ছা, সত্যি তোমার কি পছন্দ বলে কোন জিনিস নেই ? এই চুড়িপাড় শাড়ি—এ তো পরে-পরে লোকে ছ্যা-ছ্যা করে ফেলেছে, এ মানুষে পরে ? ফেরত দিয়ে এস। আর মার্কিন কত করে নিলে ?

সাড়ে চোদ্দ আনা করে গজ।

সে দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা, একটু খাপি দেখে আনলে কি হত ? এই রকম জ্যালজেলে কাপড়ে মেয়েদের সায়া হয় ?

ও-সব আর ফেরত হবে না। থান থেকে কেটে দিয়েছে।

ফেরত না হয় বালিশের ওয়াড় হবে, রেখে দাও।

চটে বলে উঠলুম, নিজেই তো পঞ্চাশবার করে বলে দিলে এমনি মোটা-মুটি সাধারণ কাপড় হলেই চলবে, আবার এখন উল্টো কথা বলছ কেন ?

কেন বলব না ? সাধারণ কাপড় বলে তুমি যে এমন খেলো জিনিস আনবে তা তো বাপের জন্মে কখনও ভাবি নি। লংক্লথ কত করে নিলে ?

এক টাকা ছ আনা করে গজ ?

একেবারে তোমার দু গালে চড় মেরে পয়সাগুলো ঠকিয়ে নিয়েছে। আমারই ভুল হয়েছিল তোমায় এ সব আনতে বলা। এই সেদিন বাড়িতে ফিরিওয়ালা এক টাকা করে লংক্লথ নেবার জন্যে আমাদের সাধাসাধি করতে লাগল। তা-ই নিলুম না। এখন উনি এই গলা-কাটা দাম দিয়ে···যাকগে

মরুকগে, লংক্লথ মার্কিন নয় থাক্। তুমি কাপড়গুলো আগে ফেরত দিয়ে এস, ও আমরা নোব না···দর কত বলছে?

থাক্, দর শুনে আর কী করবে? যখন নেবেই না।

তবু শুনিই না।

এগুলো পনেরো টাকা জোড়া, আর এইগুলো চোদ্দ টাকা।

আমার দরকার কি মিলের কাপড়ে? আমি নয় আর কিছু বেশী দিয়ে দিশী তাঁতের কাপড় নোব, ঢের টিঁকসই হবে।···ওদের তাঁতের কাপড় নেই?

থাকবে না কেন? আমি সে-সব আনতে পারব না।

অমনি রাগ হয়ে গেল? লোকে তো পাঁচটা দেখে-শুনে কিনবে, না, কি?

তোমাদের দেখাশুনার শেষ নেই। এবার দোকানে গিয়ে নিজেরা দেখে-শুনে নিয়ে আসবে। আমি মুটের মত পাঁচশো-বার কাপড়ের বোঝা মাথায় করে এনে একবার তোমাদের কাছে আর একবার দোকানে ছোটাছুটি করতে পারব না।

বেশ, তাই যাব আমরা দোকানে। তোমার ওই চেনা দোকানটিতে তা বলে নয়। ওখানে যদি মনোমত একটা কোন জিনিষ পাওয়া যায়।

নিরুত্তর থেকে কাপড়গুলো নিয়ে আবার যথাস্থানে ফেরত দিয়ে এলুম। মাসখানেক ধরে শুধু তাগাদা শুরু হল: হ্যাঁ গা, কবে আমাদের নিয়ে বেরুচ্ছ?

দাঁড়াও, কারুর একটা গাড়ি ঠিক করি।

আচ্ছা। এই ফাঁকে তুমি আমার একটা চটি, ভেল্টুর একটা পাম্পশু, টেবলির একটা ফিতে বাঁধা জুতো, পোঁট্লার একটা ডার্বি কিনে নিয়ে এস না।

সে সব মাপ না দিলে হবে না।

মাপ কাগজে আগে থেকে নেওয়া ছিল—সঙ্গে সঙ্গে হাতে এসে গেল। বললুম, ওতে কি হবে? ওরা সঙ্গে চলুক, তার পর কিনে দোব'খন।

ওরা কখন যাবে? ওদের সময় কই? সকালবেলা ইস্কুল, বিকেল বেলা তুমি থাক না, রবিবার দিন একটু এ-ধার ও-ধার যায়। তোমার পঞ্চাশটা কাজ —তুমি কখন সময় করে ওদের নিয়ে যাবে না-যাবে তার জন্য ওরা হাঁ করে বসে থাকবে?

তাও বটে। যুক্তি অকাট্য। অতএব জুতো আনা গেল। কিন্তু এনেই হল সর্বনাশ।

এটা কিসের চামড়ার তৈরী? রাস্তার ধারে যারা সাজিয়ে বসে তাদের কাছ থেকে কিনে আনলে বুঝি? এঃ, এটা একেবারে সদ্য কাঁচা চামড়া। দুরদুর, এর আবার কোন সেপ আছে? আচ্ছা, কোত্থেকে একগাদা উদ্ভুটে

সব জুতো আনলে বল তো ? তোমাকে কিছু আনতে বলাই আমার ঘাট হয়েছে। আজকাল ছেলেমেয়েরা এই জুতো পরে বেরুলে লোকে পা থেকে খুলে তাদের মুখে মারবে, বলবে—হ্যাঁ রে, তোদেব একটা পছন্দ-অপছন্দের বালাই নেই ?

কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একটু গরম হয়েই বলে ফেললুম বেশ, মারে আমার মুখেই মাববে। বলবে—বাবা কিনে দিয়েছে।

তোমার নয় লজ্জা ঘেন্না নেই, যা হয় একটা হলেই হল। ওদের তো বলে একটা প্রেস্টিজ আছে তো ? তুমি ওগুলো নিয়ে যাও। আচ্ছা, তার আগে তোরা পায়ে দিয়ে দেখ তো মাপে ঠিক হচ্ছে কি না ?···কষা হচ্ছে তো ? জানি তৈরী জিনিস জন্মে ভাল হয় না। ওটা ঢলঢল করছে পায়ে ?···হবেই। আচ্ছা, তোমায় যে মাপগুলো দিলুম সেগুলো কোথায় ফেললে ?

এই তো। মেপে দেখ না।

ওমা, এটা কার মাপ ? এটা তো টেবলির পায়ের। ওটা ? হুঁঃ, পোঁটলার সঙ্গে ঠিক হচ্ছে তো ? আমি জানি উনি যখন গেছেন তখন সব উল্টো-পাল্টা করে আনবেনই। যাও, নিয়ে যাও বাপু। আচ্ছা, চটিটা পরে দেখি···এ ক নম্বরের আনলে ? বলে দিলুম সাত নম্বরেব আনবে, তা নয় একেবারে চোদ্দ নম্বরের নিয়ে এসেছ ! এর চেয়ে দুটো কুলো কিনে নিয়ে পায়ে দড়ি বেঁধে চললেই তো জুতো কেনার খরচ বেঁচে যেত। জ্বালাতন।

বুঝতে পারলুম কোথাও একটা মাপের গণ্ডগোল হয়তো হয়েছে। কিন্তু মাপের গণ্ডগোল মেটালেও শেপের গণ্ডগোল থেকেই যাবে, শেষকালে মেয়েরা ক্ষেপে বাড়িতে কুরুক্ষেত্তব করবেন। বললুম, যে যার পছন্দ করে জুতো কিনে নিক, আমি টাকা দিয়ে দোব।

তা হলে আমার চটিটা শুধু তুমি কিনে নিয়ে এস।

এই চটি কিনতে, পছন্দ করাতে যে কী ঝুটোপুটি করতে হল, সে বলবার নয়। ঠিক, গুনে সাত দিন হাঁটাহাঁটি করলুম, প্রায় পছন্দমাফিক চটির জন্যে কান্নাকাটি পড়ে যাবার উপক্রম। অবশেষে সাড়ে ছ টাকায় একটি চটি কিনে, গঙ্গাস্নান করে, মাথায় জলপটি বেঁধে ছ দিন বিছানায় শুয়ে। উঠলেই চরকির মত মাথা ঘুরতে লাগল।

দাঁড়ান, এখনও শেষ অঙ্ক বাকি।

মহালয়ার দিন। বন্ধুকে পেট্রোলেব দাম দোব বলে একটি গাড়ি কোন ক্রমে ঠিক করা গেল। গিন্নী, টেবলি, ঘুন্টিও আরও দুটি মিসিবাবা উঠলেন গাড়িতে।

পাড়ার কাছে দোকানে যাওয়া হবে না। চল কলেজ ষ্ট্রীটে। বেলা তখন আড়াইটে।

একটি বড় দোকানে বাহিনী প্রবেশ করলেন। ছটা গাঁটরি ধপ ধপ করে ঘরের বারান্দা থেকে নীচে নামানো হল। তিনটে লোক কাপড়ের হরির লুট দিয়ে দিলে। পাড় পছন্দ হয় তো খোল নিয়ে মন খুঁতখুঁত করে। খোল পছন্দ হয় তো পাড় গোল বাধায়। নাঃ, ঠিক আমরা যা চাইছি তা এখানে নেই।

চারটের সময় সেখান থেকে এঁরা বেরিয়ে পাশের দোকানে ঢুকলেন। সেখানেও গোটা দশেক গাঁটরি নেমে এল। এঁরা প্রত্যেকটি পরীক্ষা করলেন, তারপর কোন কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে আর একটা বড় দোকানে খুশীমত ঢুকে পড়লেন। তখন সাড়ে ছটা।

আমি একটু হতভম্ব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। ফিরতেই দেখি, ওঁরা নেই, শুধু গাঁটরিবাঁধনে-ওয়ালারা আমার দিকে চোখের সার্চলাইট ফেলছে। ফিরে ফিরতে তাদের ষোল জোড়া চোখের প্রেমের চাউনি সহ্য করা অসম্ভব। একেবারে দৌড় দিয়ে আমায় পালাতে হল।

এখানে তখন শাড়ি বেনারসীর হাট বসে গেছে। আমি বিরক্ত হয়ে গিন্নীর কানে কানে বলে উঠলুম, আচ্ছা, কি করছ, বল দেখি তোমরা। নেবে তো দিশী শাড়ি, বেনারসীর পুটলিগুলো খুলিয়েছ কেন?

গিন্নী মৃদুস্বরে অথচ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, থাম, আমাদের কি পাঁচবার বেরোনো হয়। যখন একবার বেরিয়েছি তখন সব দরগুলো জেনে নিই না।

এদিকে পুজোর ভিড় বাড়ছে। এঁরা দর জানছেন। রাত তখন সাতটা।

শেষে দোকানদাররা বুঝলে এঁদের দর কত, তখন পঁচিশ টাকার জিনিসের দাম পঁইষট্টি টাকা, পঁইষট্টি টাকার কাপড়কে এক শো-পঁচিশ টাকা হাঁকতে লাগল। তাদের দর শুনে মনে মনে নাকানি-চুবুনি খেয়ে এঁরা হাঁকপাঁক করতে করতে পালালেন।

আমি তার আগেই বেগতিক দেখে সরেছি। আমার কেবল ভয়, পাছে লোকগুলো আমায় চিনে রাখে, তা হলে আব এ রাস্তায় দিযে ট্রামে বাসে যাওয়া যাবে না। আমাকে দেখেই ওরা আঙুল দিয়ে লোককে দেখাতে শুরু করবে, আর ওঁদের জন্যে আমি লোকের কাছে একটা হাসির খোরাক হয়ে উঠব।

যাই হোক, কলেজ ষ্ট্রীট শেষ হয়ে গেছে, এখন চল মার্কেটে। সেখানে প্রায় প্রত্যেক দোকানে ঢুকে একমেটে দোমেটে করে কাপড়ের রোল খুলে খুলে ওঁরা দেখলেন, পছন্দও হল; কিন্তু বিপুয্যেয়ে দাম হাঁকছেন বলে নেওয়া হল না। এই জিনিসই নাকি সেদিন লীলারা বড়বাজার থেকে পাঁচ টাকা করে কমে কিনে এনেছে।

টেবলি বলে উঠল, আমাদের কলেজে অনীতারা এর চেয়ে অর্ধেক ওর

চেয়েও চমৎকার একটা শাড়ি কিনে এনেছে। আহা, কী তার রঙ, ল্যাভেণ্ডারের কলারের ভেতের দিয়ে ফিকে নীলের চেকনাই বেরিয়ে আসছে।

যাক, চল, তা হলে একবার রাসবিহারী অ্যাভিনিউটা ঘুরে দেখে আসা যাক। একটা তোয়ালেও তো কিনতে হবে? এখানে সব গলাকাটা দাম। —গিন্নী মুখ ভেটকে বলে উঠলেন।

রাত্তির তখন আটটা। ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলছে। ড্রাইভারকে আট আনা চা খেতে দিয়েছিলুম, ইতিমধ্যে সে ফিরে এসেছে। বললুম, চল বালিগঞ্জ—গড়িয়াহাটা।

গাড়ি চলল। চৌরঙ্গীতে পেঁ ৗছেই বলল, বাবু দু গ্যালন তেল নিয়ে নিই, নইলে আবার রাস্তায় থেমে যাবে গাড়ি।

আমি বললুম, সে কী হে? এই তো আসবার সময় শ্যামবাজারে এক গ্যালন তেল নেওয়া হল। এর মধ্যে আবার? গ্যালনে এ গাড়ি ক মাইল যায়?

আজ্ঞে, পাঁচ থেকে ছ মাইল। ভারী গাড়ি কিনা। তা ছাড়া একটু তেল চুইয়ে পড়ে।

সে কী হে, তেল চুইযে পড়ছে! গ্যালনে মাত্তর পাঁচ মাইল ছ মাইল যাচ্ছে, অথচ তোমাব বাবু রোজ ওই গাড়ি চাপেন?

ড্রাইভার দাঁত বার করে হেসে বলল, বাবু তো কখনও এ গাড়ি চাপেন না—বন্ধু-বান্ধব ধরাধরি করলে এই গাড়িটাই বাব করতে বলেন।

বুঝলুম বন্ধুব মনোভাবটা। জীবনে যাতে আব কেউ কখনও গাড়ি না চায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। ওঃ, মানুষ কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা।

পেট্রোল নিতে হল। হিসেব করে দেখলুম, এব চেয়ে ঘণ্টা হিসাবে ট্যাক্সি ভাড়া নিলেও দরে যথেষ্ট সুবিধে হত। কিন্তু তখন উপায় কি। পাঁচ গ্যালন পেট্রোল নিয়ে নিলুম, কি জানি এর পর হয়তো আবার দাঁত বার করে বলবে যে, বাবু, টায়ার গেছে, একখানা না কিনে নিলে এ আর আপনাদের বাড়িতে পেঁ ৗছে দিতে পারবে না। নয় ঠেলতে হবে, অতএব প্রতিবাদে দরকার নেই।

আটটা পঁচিশ মিনিটে বালিগঞ্জ পেঁ ৗছনো গেল। সেখানেও সেই একই দৃশ্যের অভিনয়, তবে দেখলুম এক গজ ছিট হাতে নিয়ে ঘুণ্টিটা বেরিয়ে এল, অবশ্য ছ-সাতখানা দোকান ইন্‌স্পেকশনের পরে।

আমি লজ্জায় আর মোটর থেকে নামি নি। স' নটা আন্দাজ তাঁরা মোটরে ফিরে এসে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, কেনা-কাটা শেষ হয়েছে তো ?

উত্তর এল হতাশার সুরে : নাঃ, আজ রাত্তির হয়ে গেছে, ওরা দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে কিনা, সব দেখাতে পারলে না।

আমি তখন গুম খেয়ে গেছি। রাগটা কোন মতে দমন করে গম্ভীর সুরে বলে উঠলুম, চোদ্দটাকা বোধ হয় পেট্রোল গেল, আমি আর তোমাদের নিয়ে রোজ রোজ বেরুতে পারব না।

গিন্নী করুণাপরবশ হয়ে বলে উঠলেন, কে তোমায় বেরুতে বলছে ? আজকে তো সব দর যাচাই করে নিলুম, কাল-পরশু একটা কাছাকাছি জায়গা থেকে কিনে নিলেই চলবে।

মোটর স্টার্ট দিল কিন্তু মাঝপথে উকি তুলতে লাগল। আমার তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল, আবার পেট্রোল কেনাবে নাকি ? বাপের জন্মে কখনও নিজের মোটর চড়বার তো সুযোগ হয় নি, তাই জানব কি করে মোটরের কী ধাত।

ড্রাইভার ঈষৎ দন্ত ফাঁক করে বলে উঠল, একটু মবিল দরকার বাবু, বেশী নয়—এক গ্যালন হলেই চলবে, এই টিন এনেছি সঙ্গে।

নাও বাবা, কিনে নাও, হেঁচকি বন্ধ কর এর। আশ্চর্য, মবিল কেনার পর সে একবার টিনটি কোথাও ঠেকালে কি না-ঠেকালে, মনে হল কোন কল-কব্জায় ঢালেও নি, গাড়ি একেবারে যাকে বলে ফরফর করে উড়ে চলল।

হঠাৎ রাস্তায় দেখা গেল, ভবানীপুরের একটি হোসিয়ারির দোকান তখনও খোলা। রাত তখন সাড়ে দশটা।

এই—এই—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওই তো তোয়ালে ঝুলছে দোকানে। একটা কিনে নিই।

আধ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে। একটি তোয়ালে হাতে একগাল হাসতে হাসতে গিন্নী স-বাহিনী ফিরে এলেন।

দাঁড়িয়ে থাকলে নাকি তেল আবার বেশী চুঁয়োয়, অতএব আর দু গ্যালন কিনে নিন বাবু। ড্রাইভারের উক্তি।

নাও বাবা, যত পার কেনো। এবার সিধে বাড়ি।

পেট্রোলের দোকানে পেট্রোল ভরা হচ্ছে আর আমি শুনছি পেছনে গিন্নীর কথামৃত : দেখলি তো ? এই তোয়ালে উনি সেদিন আমাদের দেখিয়ে গেলেন দু টাকা ছ আনা করে। অথচ সেই একই জিনিস আমি কিনলুম দু টাকা পাঁচ আনায়। কত সস্তা পড়ল বল্ দেখি ? বাজারে বেরুলে পাঁচটা দেখে-শুনে কিনতে হয়, শুধু হুড়ুম-দুড়ুম করলেই হয় না।

দুনিয়া দেখার ঢং

লীলা মজুমদার

(১৯০৮)

'সেদিন সকালে আমার বাল্যবন্ধু সবিতা এসেছিল পাশের বাড়ি থেকে—ঐ যে হল্‌দে বাড়িটা—ওটা ওরই মায়ের বাড়ি। রাগে-দুঃখে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, চোখে বিদ্যুতের ছটা। কোনো ভূমিকা না করেই বলল, যতই দিন যায়, মানুষের স্বার্থপরতা দেখে ততই অবাক হই। মা কিছুতেই কাশীতে গিয়ে থাকবেন না, বলেন ওঁর পক্ষে ও সব হবে ভণ্ডামী। ওদিকে কাশীতে মেজ-দিদিমণিরা কদ্দিন ধরে দুটো ঘর নিয়ে আছেন, তাঁদের পাশেই আরেকখানি ঘর ও পাওয়া যাচ্ছে, তার কাছেই কলঘর। ওঁরা মা'র দেখা-শুনা করতেও রাজী আছেন, আর হবেন নাই বা কেন, আজ কুড়ি বছর ধরে ওঁদের মাসে-মাসে কুড়ি টাকা বরাদ্দ হয়ে আসছে। কেন? না মেজদিদিমণির মা আমার বাবার মা'র অনেক সেবা করেছিলেন। আর বোলো না ভাই, সেও আজ ষাট বছর হতে চলল, তখন তাঁদের অবস্থাও খুব ভালো ছিল। তারপর দুঃসময়ে পড়ে ছিলেন, আর অমনি আমার বাবা গলে জল হয়ে গিয়ে ওঁদের জন্য যাবজ্জীবন কুড়ি টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। মেজদিদিমণির বয়স এখন ষাট বছর আর ওঁর ঐ বিধবা ছোট বোনটির তিপান্ন। কাশীর হাওয়ায় ওঁরা যদি আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর না বাঁচেন তো কি বলেছি।'

এই অবধি শুনে সবিতাকে এক পেয়ালা চা করে দিলাম। চা নাড়তে-নাড়তে সবিতা বললে 'বুঝলি, আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে মাসে-মাসে কুড়িটে করে টাকা গুণতে হবে ওনাদের। আরে ঐ কুড়ি টাকা হলে আমার আয়াটার মাইনের অর্ধেক হয়ে যেত। আচ্ছা, তুই-ই বল্‌, ওঁদের জন্য যখন আমরা এতদিন এত করে এসেছি, সত্যি কথা বলতে কি প্রায় সমস্ত ভরণপোষণই চালিয়ে এসেছি; কারণ বাড়ি ভাড়া মাত্র সাত টাকা, বাকি তেরো টাকা দিয়ে তোফা আছেন ওঁরা, মেজদিদিমণির শুনেছি সরষের তেল সহ্য হয় না, ঘী চাই, যত সব নবাবী। আর ওঁর ভাইপোরা বুঝি মাসে-মাসে আরও কুড়িটে টাকা দেয়। আচ্ছা, তুই-ই বল্‌, এর কোনো মানে হয়? নিজের ভাইপো, তারা দেবে না তো কি রামধন চাটুয্যে এসে দিয়ে যাবে? এমন নয় যে বেকার, ইলেকট্রিক্‌ আপিশে আড়াইশো টাকা মাইনে পায়, তাই দিয়ে কালীঘাটে বৌ ছেলে বুড়ি মা নিয়ে খাসা আরামে থাকে। আর জ্যেঠিকে দেবার বেলা মাত্র কুড়িটে টাকা। বলি না, পৃথিবীর লোকদের স্বার্থপরতা দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।'

সবিতা পেয়ালা নামিয়ে রেখে, পান মুখে দিয়ে বললে, 'ঐ যে মার কথাটা বল্‌ছিলাম। তা উনি কিছুতেই কাশী গিয়ে থাকবেন না। কত করে বুঝিয়ে বলছি ব্যাঙ্কের তহবিল তো গড়ের মাঠ, ওঁদের ঐ আদুরে জগাইটি কি কিছু সরায়নি বলতে চাস্? বাবা নেহাত কম রেখে যান নি, বাড়িটা আর হাজার কুড়ি তো হবেই। আমরা তো ঐ দুটি বোন, আমি আর কী নিয়েছি, সারাজীবন তো কাটিয়ে এলাম বোম্বাইয়ে, এখন উনি পেনসেন নিয়েছেন, এবার আমাদেরও একটা আস্তানার দরকার। এদ্দিন তো সাতেও ছিলাম না, পাঁচেও ছিলাম না, বিপদে-আপদে অসুখ-বিসুখে, সেবাব কাশ্মীর বেড়ানোর সময়, আর মেয়ের বিয়ের সময় দু-এক হাজার করে নিয়েছি বই তো নয়। আব ওদিকে তো মাসে-মাসে বাড়ি ভাড়ার তিন শো টাকা জমা হচ্ছে, তবহিল কি করে খালি হয়ে যায়, সে তো বুঝি না।'

সবিতা জুতো খুলে পা উঠিযে বসল, আমিও একবাব উঠে গিযে রান্নাঘরে মুরারীকে বলে এলাম, 'চিংড়িমাছটা তুমি যেমন পাবো কর, আমার আব এবেলা রান্নাঘরে আসা হবে না।'

সবিতা তাকিয়ায ঠেস দিযে হতাশভাবে বলল, 'স্বার্থপরতার কথা আর কি বলব, ভাই। বললাম, ঐ ভাড়াটেরা উঠেই যাচ্ছে আমবাও কলিকাতায় আসছি, এমন চমৎকার যোগাযোগ আব হয় না। আমিই ওপব তলাটা নিয়ে নিই। তবে ঐ তিনশো দেওয়া তো আমাব সাধ্যি নেই, তবে চেষ্টা-চরিত্তির করে, দেড়শো দিতে পারি, আর এই বাজাবে একতলাটার জন্য স্বচ্ছন্দে দু'শো পাওয়া যাবে, বেশিও যেতে পাবে। কাশীতে তোমাব কি-ই বা খরচ হবে মাসে বড় জোর আশী টাকা, আচ্ছা একশোই ধরলাম, বাকিটা ব্যাঙ্কে বাখতে পারবে। ব্যস সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তা মা'র কিছুতেই পছন্দ নয়। সাধে রাগ করি।'

এতক্ষণে একটু সুযোগ পেয়ে বললাম, 'তবে তিনি কী চান?'

'কী চান বলব? উনি চান আমার বিধবা ছোট বোনটিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসে কাছে রাখবেন. তাব ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। সেখানে পাড়াগাঁযে কিছু নাকি হচ্ছে না; আরে পাড়াগাঁর ছেলেরা কি মানুষ হয় না? ওর শ্বশুব বুঝি মারা গেছেন, দেওরদের সে রকম অবস্থা নয়, জারা ভালো ব্যবহার করে না। তা করবে কেন, যেমন ঝগড়াটি! আরে সেবার পূজোর সময় সামান্য কারণে আমার সঙ্গে কি ঝগড়াটাই না করল! জগাই চারটে সিনেমার পাশ এনেছিল, আমি বললাম জগাই, আমি, আমার মেয়ে আর তার ঐ বন্ধুটি যাই,

আমরা সেরকম বাংলা সিনেমা দেখবার সুযোগ পাই না। তাই নিয়ে রোহিনী কান্নাকাটি পর্যন্ত করল, কি না ওরাও পাড়াগাঁয়ে থাকে, ওর ছেলেও সিনেমা দেখে না। ভাবতে পারিস, মা ওকেই সাপর্ট করলেন। রাগ করে আমরা কেউ তো গেলামই না, রাতে বাড়িতে খেলামও না, মেয়ের ঐ বন্ধুর কাকীর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করলাম, তারাও সব শুনে একেবারে সক্ড্। আজকাল ভাই, মা-ই বলিস কি বোনই বলিস, কেউ কিছু নয়।'

সবিতা একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই এখানে থামতে বাধ্য হল। আমি বললাম, 'তা ভাই, তোর মা-বোনেব সাহায্য দিয়ে কি দরকার? তোর অমন স্বামী রয়েছেন, ছেলে চাকরী পেয়ে গেছে, মেয়েব বিয়ে হয়ে গেছে, দিব্যি নিরিবিলিতে জীবনটা কাটিয়ে দে—না, কারো ধার ধারবার দরকার নেই।'

সবিতা তাই শুনে ভারি খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'যা বলেছিস ভাই, গোটা জীবনটাই তো নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিলাম। বিয়ে হয়ে অবধি ঐ বোম্বাইয়ে থেকেছি, আত্মীয়স্বজন কেউ ধাব কাছ দিয়ে ঘেঁষবাব সুবিধে পায়নি। বাবা থাকতে মা-রা দু-তিনবার গিয়েছিলেন, বাবা চোখ বুজলে আর অত ট্রেন ভাড়া খরচ করতে রাজী হলেন না। বুঝলি ভাই, বৎসরান্তে নিজের মেয়েকে চোখে দেখার চেয়ে ওঁদের কাছে ট্রেন ভাড়াটাই বড় হল। এই সংসার। আমার কি সন্দেহ হয় জানিস? নির্ঘাৎ বোহিনী কেঁদেকেটে চিঠিপত্র দেয়, এ-নেই-ওনেই করে। আর মাও সমবেদনায় ভেসে গিয়ে ওকে টাকা পাঠান। ট্রেনভাড়া জুটবে কোত্থেকে? আর আমার ছেলেমেয়েদের ঐ পূজোতে, নববর্ষে, জন্মদিনে একখানা করে কাপড় ছাড়া লবডঙ্কা। তাও ভাই আমাদেরও যা দেন, রোহিনীদেরও তাই। এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? ওরা থাকে পাড়াগাঁয়ে, ওদের অত কাপড়-চোপড়ের কি দরকারটা শুনি? সত্যি ভাই, নিজের মা হলে কি হবে, ওঁদের একটু উড়নচড়ে স্বভাব। আমার বিধবা ননদও দেশে থাকেন, আমি ভাই ওঁদের ঐ একবার পূজোর সময় একজোড়া কবে মোটা মিলের কাপড় দিই। আমাদের চাকরবাকরদের জন্য তো আসেই, সেই একেবারে এক সঙ্গে মিল থেকে উনি বন্দোবস্ত করে দেন, একখানা-দুখানা তো আর নয় একেবারে বিশ-পঁচিশখানা। দৃষ্টি কৃপণতা আমরা একেবারে দেখতে পারি না।'

আরেকটা পান মুখে দিয়ে সবিতা বল্ল, 'ভাগ্যিস বাড়িতেই তুই আছিস তাই সময়ে-অসময়ে ছুটে চলে এসে মনের দুঃখটা একটু ঝেড়ে ফেলতে পারি। জানিস, ঐ জগাইটা আজকাল ভারি মাতব্বর হয়ে উঠেছে। সুখে-দুঃখে তাঁদের মস্ত বড় পরামর্শদাতা। এতদিন ওর বোনই মা'র দেখাশুনো করত, এদানিং তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ঐ সব মধ্যবিত্ত মনোভাব আর কি। মেয়ে দিব্যি

নিজের চেষ্টায় করে খাচ্ছে, মাস-কাবারে কুড়িটা টাকা হাতখরচা পাচ্ছিল। অমনি করে কত কুড়ি টাকাই যে জলের মতো খরচ হচ্ছিল সে আর কি বলব। মেয়ে স্বাধীন হবে তা না। কোথাকার একটা ছেলে শ্রীরামপুরে কারখানা আছে না কি, তারই সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। এখন নাও ঠেলা। মাকে কে দেখে তার ঠিক নেই। শুনে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। মা বলেন কি কর্তাকে কিছু করতে হবে না, জগাই যেমন আমাদের তদ্বির করত করবে। যেমন মাসে-মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতাম, তাই দেব।—শুন্‌লি তো, ওকে যে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয়, তাও এই প্রথম শুনলাম।'—আব রোহিনী এসে আমার দেখাশুনো করবে, মোড়ের স্কুলে ওর ছেলে ভর্তি হবে, আসছে বছর স্কুল ফাইনেল দেবে, নিশ্চয় ভালো করেই পাশ করবে। বড় ভালো ছেলেটি।—ঐ আমাকে একটু ঠেস্ দেওয়া হল আর কি। আমিও ভাই রেগে গেলাম, কত আর সহ্য করা যায় বল। চেঁচিয়ে বললাম: বেশ তো তাই কর না। আর জগাইকেও জামাই করে ঘরে তোল না কেন।—বলে সেই যে ঘরে খিল দিলাম, ওঁদের সঙ্গে পাঁচদিন একটিও কথা বলিনি। মেয়েটিকেও বলেছি বেশি কথা না বলতে। দেখ, কত আব সহ্য কবা যায়, তাই বল?'

বলতে বলতে সবিতার মেয়ে সুমিতা উঠিপড়ি কবে ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, 'ওমা, শুনলে, দিদিমা তোমাদেব খবব দিতে বলল তুমি সেদিন যেমন পরামর্শ দিয়েছিলে জগাইমামার সঙ্গে মাসিব বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সবাই মিলে ঐ বাড়িতে থাকবে, দেখা-শোনার লোকেব অভাব হবে না, সমীরেব পড়ার ভাবনা থাকবে না। বিদ্যাসাগরমশাই নাকি ঐ রকমই বলতেন। ওকি মা! ও মাসিমা! মা যে ভির্মি গেল!'

ঠেকা

আশাপূর্ণা দেবী

(১৯০৮)

তিন মেয়ে আগেই এসে গেছে।

বড়, মেজ, ছোট। নেহাৎই কাছে পিঠে থাকে তারা, তাদের আসার মধ্যে না আছে প্রতীক্ষার উত্তেজনা, না আছে কৌতূহলের রোমাঞ্চ। হামেশাই তো আসা যাওয়া করে তারা বাসে, ট্রামে, রিক্শায়—ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে আসছে বলেই কি আর নতুন হয়ে গেছে।

বড় মেয়ে সুষমা যে রিক্শার বদলে আস্ত একখানা ট্যাক্সীতে চড়ে এসেছিল —সে শুধু এবার সব ছেলেমেয়ে ক'টাকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনেছে বলেই। সাতটি ছেলেমেয়ে মানেই তো সাত বস্তা জামা কাপড়! কাজেই কমপক্ষেও গোটা তিন-চার ট্রাঙ্ক সুটকেস।

মেজ, ছোট যেমন আসে তেমনিই এসেছে নিজের নিজের সুবিধে মত। অসুবিধেয় পড়বার ভাবনাও নেই! ওর বাপের বাড়ি এসে থাকলে তল্পী-বাহকরা তো নিত্য সন্ধ্যাবেলা এসে হাজ্‌রে দেবেই। কি হবে মেলা বাক্স-বিছানার ঝামেলা বাড়িয়ে ?

কিন্তু সেজ মেয়ে অণিমার কথা একেবারে স্বতন্ত্র।

তার আসাটাকে নেহাৎ 'আসা' মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! 'আগমন' বল্‌লেই ভালো হয়। আর—আগমনের জন্যেই তো প্রতীক্ষার উত্তেজনা!

ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সাত বছর পরে বাঙলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করলো সে।

আবার সাত বছরটাও শেষ কথা নয়।

রাজপুতনার মরুভূমি থেকে ঘষটাতে ঘষটাতে দিন তিনেক পরে শুকনো শুকনো মুখ আর উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে বাঙলার মাটিতে এসে ঠেকার সাধারণ রীতির বদলে একেবারে তাজা চেহারা নিয়ে আকাশ থেকে অবতরণ!

সে মহিমার জন্যে কৌতূহলের রোমাঞ্চ থাকবে বৈ কি।

শূন্যপথের মহিমা এদের মত গৃহস্থদের ঘরে এখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি।

সকাল থেকে তাই সকলের মধ্যেই অলক্ষ্যে একটা 'সাজ সাজ' ভাব। কিছুটা ত্রস্ততা কিছুটা চাঞ্চল্য।....'অণু এসে পড়বে—কাজ-কর্ম সেরে নে সবাই ....'অণু এলো বলে, ঘরদোরগুলো গুছিয়ে ফেল তোরা'....সেজমাসী আসছে শীগ্‌গির খেয়ে নে খোকন' 'সেজমাসী আসছে জামা-কাপড় ময়লা করিসনে খুকু'....অনবরতই শোনা যাচ্ছে এমনি সব শব্দ।...আবার বোধ করি উত্তেজনার

লজ্জা ঢাকতে মাঝে মাঝে যোগ করা হচ্ছে—'আহা কতকাল পরে আসছে বেচারা'...:সেইটাই একমাত্র কারণ ঔৎসুক্য আর চাঞ্চল্যের। যেন সেজ জামাইয়ের পদমর্যাদার গুরুতর ওজনটা কিছুই নয়। যেন অনেকদিন বাপের বাড়ি আসতে না পাওয়ার মত দুঃখজনক কারণটা নেহাৎই বেচারা করে তুলেছে তাকে।

বিয়ের বর নিজেই গেছে বিমানঘাঁটি থেকে অভ্যর্থনা করে আনতে, মোটা টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে ট্যাক্সী চড়িয়ে আনবে। এ ত আর নেহাৎ গেরস্থ সেজ পিসি নয়, যে—শ্রীরামপুর থেকে নিয়ে আসতে গিয়েও মনে মনে হিসেব কষতে বসা হবে—ইণ্টারে না এনে থার্ড ক্লাসে আনলে খরচটা কতটা কম হতো। এ অণু।

অবশেষে এলো সেই পরম মুহূর্ত।

দিদিরা ছুটে এলো, এলো ছোট বোন ও তাব ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, এলেন মা আর বাবা। ঝি চাকর, বিয়ে বাড়িব আগন্তুক অভ্যাগত সবাই এলো আশে পাশে পিছনে।

বিরহের আব আনন্দের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ মা'র চোখ দিয়ে জল পড়লো দু'ফোঁটা, দিদিরা প্রকাশ কবলো স-কলবব আনন্দোচ্ছাস, ছোটবোন তনিমা ঈষৎ ঈর্ষান্বিত হলো তন্বী সেজদিব তনুলাবণ্যে। ভাবলে—হবে না কেন, ছেলেপুলে না হলে অমন সবাইযেবই—

শুধু হতাশ হলো ছোট ছোট বোনপো বোনঝিরা।

মা'র আর মাসীদের থেকে খুব বেশী প্রভেদ আবিস্কার কবতে পাবলো না তারা অ-পূর্বদৃষ্ট সেজমাসীর মধ্যে থেকে।...এই সেজমাসী। এর জন্যে এতো আয়োজন।

—দেখলি—বাচ্চু, বাবলু, মা ঠকিয়ে ঠকিয়ে তাড়াতাড়ি খাইযে নিলো। ধেৎতারি, খেলবি চল্'—বলে দলপতি খোকন শিশুবাহিনী নিয়ে প্রস্থান করলো।

অতঃপর বড়ো বাহিনীরা তৎপব হলো—অণিমাব পথক্লেশ দূর করতে। ক্লেশ যতোই না হোক, সেইটাই যে স্নেহ প্রকাশের একমাত্র পথ।

—মা—! অণুকে কি ওই শুকনো গজা অপরূপ বোঁদে দিযে জল খেতে দেওয়া হবে নাকি ?

মা'র কাছে এসে ভঙ্গীর সঙ্গে প্রশ্ন করলো মেজ মেয়ে প্রতিমা। মাও এতোক্ষণ ঠিক ওই কথাই ভাবছিলেন, বিয়েবাড়ির বিরাট পর্ব জলখাবারের হিল্লে করতে বুদ্ধি করে দু'দিন আগে দেদার বোঁদে আর গজা ভাজিয়ে রেখেছেন বটে, কিন্তু অণুর সামনে প্রথম নম্বরেই সে বস্তু বার করা সম্ভব কিনা। অথচ

'শাঁখ সন্দেশ' 'রাজভোগ রসগোল্লার' প্রস্তাবটা অন্য মেয়েরা কিভাবে নেবে কে জানে। তাই মেয়ের প্রশ্নে দুর্বলভাবে বললেন—তাতে আর কি হয়েছে? ঘরের মেয়ে—

—তা'হলে—তুমিই দাওগে যাও, আমার দ্বারা হবে না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে প্রতিমা।

অতএব নিরুপায় হয়েই বলতে হয় সরমাকে—তবে না হয় বাপু এক কাজ কর, ভাঁড়ার ঘরে পুরুত মশায়ের জন্যে ভালো মিষ্টি আনা আছে, ঠাকুরঝিকে বলে বার করে নে, আমি আবার আনিয়ে রাখছি।

—তাই বলো বাবা—বলে আঁচল উড়িয়ে চলে যায় প্রতিমা ভাঁড়ার ঘরের উদ্দেশে।

—মা, মাছের ন্যাজাগুলো সমস্তই এ্যতো টুকু টুকু করে কাটা হয়েছে মানে? সুষমা মোটা দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এলো—অণুর পাতে কি দেওয়া হবে?

'ওদের ওখানে মাছ পাওয়া যায় না'—এমনি একটা অজুহাতে মা মাছের ন্যাজার আয়তনের কথা সকালবেলা একবার তুলেছিলেন বটে, তবে নানা কাজে সম্পূর্ণ তদারকী করে উঠতে পারেন নি। ইতস্ততঃ করে বলেন—কে জানে বাছা, গৌর কোন্ ফাঁকে কুচিয়ে রেখেছে। কি আর হবে? ওই দিগে যা, বরং দু'খানা দাগার মাছ বেশী করে—

—বেশী তো আনিয়েছো কতো—মা'র কানে ঢুকতে পারে এমন অস্ফুট স্বরে মন্তব্যটি করে আবার রান্নাঘরের দিকে হাঁসফাঁস করতে করতে এগোয় সুষমা।

বিয়ের এখনো দু'চারদিন দেরী, সত্যই কিছু বোজবোজ আর ঝাঁকা ভর্তি মাছ আনতে পারছেন না সরমা, নেহাৎ খাবার মানুষের আন্দাজেই হিসেব করে আনান। কাজেই অপমানটা নীরবে পরিপাক করে নিতে হয়। না নিলে উপায় কি? উত্তর দিলেই তো বচসা। তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? 'বোবার শত্রু নেই' এই নীতিই সব থেকে গ্রহণ-যোগ্য নীতি।

দুপুর বেলা—তনিমা এসে টেনে নিয়ে যায়—বাবার ঘরের শেতল পাটি, আর দাদার ঘরের টেবিল ফ্যান। সেজদির দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের আয়োজন-ভার নিজেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে সে। গরম এখনো তেমন পড়ে নি বলে, বিয়ে বাড়ি হলেও—ঘরে ঘরে পাখার ব্যবস্থা চালু করা হয় নি, কিন্তু সেজদির সম্বন্ধে তো হাতপাখা নিয়ে মাটিতে পড়ে ঘামার ছবি কল্পনা করা যায় না।...

নিজের বাড়িতে নাকি শোবার ঘর 'এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড করা' অণুর। সেজদির সুখ-সুবিধের দিকে সতর্ক পাহারা না দিলে?...ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বইতে থাকেন।

অণুর-সুখ-সৌভাগ্যের মহিমায় সবাই বিনম্র। অণুর রূপগুণের আলোচনায় প্রত্যেকে মুখর।

কিন্তু অণিমা কেন হাঁপিয়ে উঠছে?

ওযে কিছুতেই সকলের সঙ্গে সমান হতে পারছে না। অথচ কিসের এই ব্যবধান?...বড়লোক বলেই কি?...কিন্তু ও যে বড়লোক এ তথ্যটা সকলের মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে চেষ্টার তো ত্রুটি করছে না? বিনয় আর অমায়িকতায় তো টেক্কা দিচ্ছে সবাইকে।

নিজে থেকে আহামরি করে খেয়েছে—পাঁচদিনের বাসি আর শুকনো বোঁদে, ভাঁড়ার ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয় বসে মহোৎসাহে লেগে গেছে সজনে ডাঁটা ছাড়াতে; যে দেশে তরকারির রাজা সজনে ডাঁটা আর মাছের রাজা কুচো চিংড়ি দুর্লভ, সেই অখাদ্য মেড়োর দেশের ব্যাখ্যানায় পঞ্চমুখ হয়ে—'আহা' কুড়িয়েছে মা পিসির কাছে। ধূলো কাদা মাখা, আর হাতে পায়ে খড়ি ওঠা, বোনপো বোনঝিগুলোকে টেনে টেনে তেল ঘষেছে, সাবান মাখিয়েছে, গল্প বলে বলে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে সব ক'টাকে। বাচ্চাগুলোকে কোলে করে বেড়াচ্ছে অনায়াস ভঙ্গীতে। বেছে বেছে পরছে—অপেক্ষাকৃত সস্তা শাড়ী-গুলো, অনেক সন্ত্রস্ত নিষেধ হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে—খুঁজে খুঁজে করছে রাজ্যের ওঁচা কাজগুলো। রাত্রে নেটের মশারি ঢাকা স্বতন্ত্র বিছানার প্রলোভন ত্যাগ করে বোনেদের সঙ্গে মাটিতে ঢালা বিছানার একপাশে নিচ্ছে আশ্রয়,.....তবু কিছুতেই কেন একাত্ম হ'তে পারছে না ওদের সঙ্গে?

এখনো—এততেও কি ওরা ঠেলে রেখেছে অণিমাকে সমীহর দূরত্ব দিয়ে?

কিন্তু তাই বা বলা যায় কি করে?

অনেকটাই তো সহজ হয়ে গিয়েছে সকলের ব্যবহার।

সরমা নিজেই তো যখন তখন ডেকে ফরমাস করছেন এটা ওটা। ওর সেলাইয়ের হাত সূক্ষ্ম বলে বাবা রিপু করিয়ে নিয়েছেন পুরনো পাঞ্জাবীর ফাটা ঘাড়।

তবু কেন বাইরে পড়ে থাকে অণু?

কিছুতেই কেন ভেতরে ঢুকতে পাবে না? ওদের রাজ্যে অণুর প্রবেশ নিষেধ করলো কে? সে রাজ্যে ঢোকবার টিকিট কি?

বোনে বোনে এক হলেই মজলিসের ঘটা!

তার ওপর আবার সমবয়সী সেজপিসি। যেমনি আমুদে, তেমনি বক্তা,—সোনায় সোহাগা। বিয়ের উৎসবটা উপভোগ করছে বটে এরা। খেতে বসে এঁটো থালার সামনে একবেলা কেটে যায়, রাত্রে বিছানায় শুয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে আসে গল্পের ঠেলায়।

প্রত্যেকেই বক্তা।

বক্তব্যের আর শেষ নেই। ছেলেমেয়েগুলো ওঠে....কাঁদে...বলে 'গরম হচ্ছে'...'খিদে পাচ্ছে'...—এরা তখন রেগে উঠে খানিকটা চেঁচায়, দু'চার ঘা ঠেঙানি দেয় আর বলে 'কী জ্বালা'। আবার সুরু করে পুরনো গল্পের জের থেকে।....আর মজা এই—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে আলোচনাই করুক তার মূল ওই 'জ্বালা'।

অবিশ্যি সে 'জ্বালাটা' ঠিক ছেলে কান্নার নয়।

সেই সব জ্বালা-কেন্দ্রিক ঘোরালো আলোচনার নায়ক হচ্ছে—নৃশংস পুরুষ-জাতির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি পতিদেবতা। তাদের দুর্ব্যবহারের জ্বালায় অহরহ ছটফট করছে এরা।

কোলের ছেলেটাকে থাবড়াতে থাবড়াতে সুষমা সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য করে—বলিসনে ভাই বলিসনে, পুরুষ জাতটাই অমনি। হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল একেবারে। এই পায়ের বেড়িগুলো যদি না থাকতো তো কোন্‌দিন ওঁর ঘর সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দেশত্যাগী হ'তাম।...রাগের বেলায় পর্বতপ্রমাণ রাগ আছে বাবুর, তখন পৌরুষ দেখে কে? কর্তব্যের বেলায় দেখগে—কচি-খোকাটি।...এমন বেতালা কথাবার্তা শুনলে মনে হয় জলে ডুবি না আগুনে পুড়ি। এই এদিনেই দেখ্‌ছ না, আসবার আগে পরামর্শ করতে গেলাম 'বিনুর বৌকে কি দেবো', মস্ত বিবেচনা দেখিয়ে বললো কিনা—তা চারটে টাকার কমে মুখ দেখলে কি ভালো দেখাবে? শোন্‌ তোরা? এতে মানুষের মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে কি না? এই দু'মাস হলো চার হাজার টাকা খরচ করে নিজের বোনেব বিয়ে দিয়েছে, আজ আমার ভাইয়ের বিয়েতে চারটে টাকা নগদ বিদেয়। আমিও ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে নয়। আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে চৈতন্য করিয়ে দিলাম, তখন তড়বড় করে গিয়ে এম, বি, সরকার থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে একটা পেন্‌ডেণ্ট এনে হাজির।...দেখে হাসবো না কাঁদবো? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে যার খালি গলায় বেড়াচ্ছে, তাঁর এতো নবাবী। রেখে দিয়েছি হারটা রমার জন্যে। বৌভাতের দিন পরিয়ে দেবো দেখিস। বুদ্ধি করে এখানের স্যাকরাকে দিলাম একটা আঙটি গড়াতে। এমনি করে সংসার চালাতে হয় আমাকে। দিনরাত তাই বলি—কি

করবো, হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, নইলে কোন্ কালে তালাক দিয়ে চলে যেতাম। কথায় পারে না আমার সঙ্গে।

বক্তব্য শেষ করে বেশ একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সুষমা। যেন এইমাত্র সেই প্রতিপক্ষকেই নিয়েছে এক হাত।

প্রতিমার বক্তব্য আর এক প্রকার।

বরটি তার কচিখোকা তো মোটেই নয়, বরং অতি পাকা। 'বৌ' পদার্থটিকে পরম পদার্থ ভাববে—এমন বোকামি তার নেই। পয়সা জিনিষটা যে তার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান, এ জ্ঞান তার আছে। কোনো সাধ আশাই তাই পূর্ণ হয় না প্রতিমার। সে ক্ষোভ তার প্রতি কথায়।

বলে—হ্যাঁ, বুঝতাম যে পয়সাব অভাব, কি করবে। থাকতেও যে 'নেই নেই' 'হায় হায়' করে, এই ঘেন্নায গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে আমার। সখ কোরো না—সাধ কোবো না, ছেলেপুলেব একটা আবদার মিটিও না, দিনরাত ওর সংসারে দাসী বাঁদীর মতো খাটো, তাহলেই ওব পক্ষে খুব ভালো। যদি বলেছো—'চাই' কি 'দবকার' ব্যস তা'হলেই মারমুখী।...কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলবো! আমার অবুঝপনার জন্যে নাকি ওকে চুবি ডাকাতি করতে হবে এবার! জামাইবাবু তো দেড়ভবি সোনা বের কবেছেন, ও কি একটা সিঁদুর কৌটোর উর্দ্ধে উঠবে? মনেও কোবো না তোমবা! অপমানেব ভয়ে তুলিই নি ওকথা, যা বিবেচনা হয করুক! কার মান অপমানেব ভাবনায় যে এত চক্ষুলজ্জা আমাদেব! ...এই তো—আসার আগে বল্‌লাম—নিজের কথা চুলোয় যাক—ছেলেমেয়েদের তো পোষাক-আসাক কোনো ছাই নেই, কি পরে বিয়ে বাড়ি যাবে? শুনে এই লম্বা চওড়া এক লেকচাব ...'বিলাসিতাই নাকি সকল দুঃখের মূল, চক্ষুলজ্জাই হলো মহাশত্রু'। ...এ সব লোকেব বিয়ে কবে সংসার পাতবার কি দবকার বলতে পাবো? কী ভাবে যে এই বারো বছর কাটালাম তা' আমিই জানি। আর কেউ হলে—

আর কেউ হলে যে একটা আত্মঘাতী কাণ্ড ঘটতে পারতো এ বিষযে আর সন্দেহ থাকে না—প্রতিমার দীর্ঘ নিঃশ্বাসমিশ্রিত কথার সুবে।

অবাক হয়ে যায় অণিমা। সন্ধ্যে হতে না হতেই যখন অফিস-ফেরতা দুই জামাইবাবু সহাস্যবদনে শ্বশুববাড়ি এসে ঢোকেন, তখন তো দিদি দুজনকে দেখলে এমন সন্দেহ মনের কোণেও আসে না যে ওই দুই পাষণ্ড ব্যক্তির নির্যাতনের জ্বালায়, একজন দেশত্যাগী আর একজন আত্মঘাতী হবার চিন্তা মনে পোষণ করছে।

সেজ পিসির জ্বালা আবার আর এক জাতের।

ভাইঝিদের সঙ্গে ধ্বনিগত পার্থক্য বড়ো বেশী না থাকলেও মূলগত প্রভেদ আছে। বরের দায়িত্বহীনতার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হচ্ছে সে অহরহ।

শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে?... ছেলের 'যায় যায়' রোগে লোকটা নাকি নিশ্চিত চিত্তে দাবার আড্ডায় গিয়ে বসে থাকে, বৌয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে দেখে অম্লান বদনে ছিপ ঘাড়ে বেরিয়ে পড়ে তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে। রেশনের টাকা হাতে করে বেরিয়ে তাসের বাজী হেরে আসে, ছেলের পরীক্ষার 'ফী' জমা দেবার সঙ্গতি ভেঙে বন্ধুদের দলে ভিড়ে পুরী বেড়াতে যায়।...

নজীরের কি সংখ্যা আছে?

ছেলে দুটোর লেখা-পড়ার কথা ভাবে না, মেয়েটা বড়ো হয়ে উঠছে সে চিন্তা নেই, একা সেজ পিসি মেয়ে-পুরুষের কাজ চালিয়ে কী ভাবে যে ঠাট বজায় রেখেছে এই আশ্চর্য্য।

নিজস্ব সরল ভাষায় বর্ণনা করতে থাকে সে—সে মহাভারত কি বলে ফুরোবার রে? না—আদ্যোপান্ত পারবে কেউ বলতে? ক্ষেপে কেন যাইনি এখনো, তাই মাঝে মাঝে ভাবি। ভাইফোঁটার দিন দাদাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠালাম, বাবু কলকাতায় এসে বন্ধুর বাড়ি আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যে বেলা সিনেমা দেখে, রাত দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ার ভাগ ছাতাটি বিসর্জন দিয়ে গেলেন কোন্ চুলোয়। ছাতার যম। একটা মানুষ একটা জীবনে একে একে তেরোটা ছাতা হারিয়েছে—শুনেছিস্ কখনো এমন সৃষ্টিছাড়া কথা?...এইবার এতোদিনে শিক্ষা হয়েছে আমার। আর দিই না, বলি—পুড়ুক রোদে, ভিজুক জলে। যার যেমন কর্মফল।

সুষমা বলে ওঠে—আহা সেই জেদ নিয়ে চুপ করে থাকলে যদি চলতো! আমার 'ইনিটি'ও তো দু'দুবার শাল-র‍্যাপার হারালেন, 'লাগুক ঠাণ্ডা' বলে খালি গায়ে রাখতে পেরেছি? রোগে পড়লে ভুগবে কে? তুই না পাড়ার লোকে?

—ভুগি ভুগবো—সেজ পিসি উত্তর দেয়—ওর সঙ্গে তো ভোগারই সম্পর্ক! আমি তো ভেবে ভেবে বুঝেছি—সাত জন্মের শত্তুর মরে এক জন্মের ইষ্টি দেবতা হয়। ....'ও বলে মাঝে মাঝে—'হচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সুখের দিন আসছে, ডাইভোর্স বিলটা পাশ হলো বলে,—বয়েস ফুরিয়ে যাবে না, তখন! দেখে-শুনে মনের মতন একটা জোগাড় করো —।' আমি বলি...রক্ষে করো মশাই, আর কাজ নেই। আবার কোন্ চোদ্দ জন্মের শত্তুর এসে মালা বদল করতে চাইবে। তার চেয়ে এই ভালো। তবু সয়ে গেছে। 'বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভরী, সেই বিষেই গড়াগড়ি' এই দশা আমাদের।....উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতেই কি কসুর করি? হায়া নেই। লজ্জা নেই। গাল খেয়ে গনগন করে বেরিয়ে

যায়, ইলিশ মাছ হাতে দাঁত বার করে বাড়ি ফেরে। কী জ্বালায় যে আমি জ্বলছি; সাধ করে বলি—ওর গুণের কথা লিখতে গেলে মহাভারত। বলি তো তাই—আমি যাই মেয়ে তাই তোমার মতন লোকের সংসার করছি। আর কেউ হলে চুলোচুলি করেই দিন কাটতো। মায়া নেই মমতা নেই আক্কেল বিবেচনার বালাই মাত্তর নেই, কিম্ভূত।...আরো বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে তবে থামে সেজপিসি।''''আরম্ভ করে তনিমা।

তনিমার জ্বালার রূপ আবার আরো কিম্ভূত। একেবারে আলাদা।

শুনলে অবাক লাগে।

ওর বরের নাকি ধারণা সংসার সুদ্ধ যতো পুরুষ, সবাই ওর বৌয়ের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে কুদৃষ্টি হানছে। বৌকে তাই অহরহ আগলে বেড়ায় ছোকরা।

—জেলের কয়েদীর অবস্থাও আমার থেকে ভালো।—মন্তব্য প্রকাশ করে তনিমা। নিজের দুরবস্থা বোঝাতে আবও প্র াঞ্জল করে আনে বর্ণনার ভাষা।

—খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই ওর। মণিব্যাগে পুবে রাখবার জিনিস নয়, লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখবার জিনিস নয়, করে কি তাই বলো? চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে পারলেই বাঁচতো। উপায় নেই, অন্নচিন্তা তো আছে? কোন্ প্রাণে যে অফিস যায় তাই ভাবি।....বাতিকে বাতিকে নিজে পাগল হবে, আমায় পাগল করবে।

—আসতে যে দিলে বড়ো? সেজ পিসি প্রশ্ন করে—চোখছাড়া করে এতোদিন রাখতে হবে তো?

সে কথা আর বোলো না! গলায দড়ি দেবার ভয় দেখিয়ে তবে আসবার পারমিশন পেয়েছি। ওর ইচ্ছে সঙ্গে করে এনে নেমন্তন্ন খাইয়ে নিয়ে যায়। আমার এ জ্বালার কাছে তোমাদের ওসব কিছু নয় বাবা। সেজদি যোধপুর থেকে একা এসেছে শুনে ওতো অজ্ঞান।

এতোক্ষণে কথা কয় অণিমা—কই? একা তো আসি নি। সেই যে বল্লাম —অফিসের একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসছিলেন কলকাতায—

—তবে তো আরো ভালো—মুখে কাপড় দিযে খুক খুক করে হেসে ওঠে তনিমা।

বলে—বেশ আছে সেজদিটা। কোনো জ্বালা নেই। ববটি সদাশিব, ছেলেপুলের ঝক্কি নেই, অভাবের 'অ' কাকে বলে জানেনা। সংসার জিনিসটা যে কী চীজ্ বুঝতেই হলো না। দেখলে—হিংসে হয়।

যা বলেছিস। শ্যামলের মতন ভালো মানুষ তো আর দ্বিতীয় দেখলাম না।

হেসে ওঠে আর তিনজন।

—তাই আমাদের অণুর মুখে কখনো একটা বাক্যি শুনি না। আছে ভালো। সত্যি দেখলে হিংসা হয়।

'হিংসে হওয়ার' পক্ষে কোরাস্ দেয় বটে সকলেই, কিন্তু বলার ভাবে মনে হয় যেন করুণাই হচ্ছে ওদের। ....যেন 'ভালো মানুষ' বরের মতো খেলো আর সস্তা জিনিস জগতে কিছু নেই। আহা তাই নিয়েই ভুলে আছে। বেচারা।

হঠাৎ নিজেকে ভয়ানক অপদস্থ লাগে অণিমার।

ভারি বঞ্চিত মনে হয় নিজেকে।

সত্যিই তো অণিমার কোনো বক্তব্য নেই।....ও যে সুখী আর সন্তুষ্ট সেকথা তো একবার বললেই পুরোনো হয়ে গেলো। তারপর? তারপরেই তো অণিমা মূক?....তাই ওরা অণিমাকে 'বড় লোক' করে সমীহ করে বটে, কিন্তু কৃপা না করেও পারে না—সুখী আর সন্তুষ্ট বলে। ভাবটা যেন—আহা বেচারা! বুঝলো না সংসার চীজ্‌টার ভেতর কতো রস।····বুঝলো না—'জ্বালা' নামক তীব্র দাহকারী কড়া মদটাকে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মধ্যে কী রোমাঞ্চকর স্বাদ। ....আহা কী ফাঁকা জীবন ওর।

অপদস্থ অণিমা এইবার বুঝতে পারে কেন ও কিছুতেই দলে মিশে যেতে পারছে না, কিছুতেই পারছে না ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে।....ওর অভিযোগ নেই, বক্তব্য নেই।

তাহলে কি অণিমা খেলো হয়েই থাকবে?

কেন? সে কি আরো বেশী জিতে যেতে পাবে না? প্রমাণ দিতে পারে না আরো বেশী জ্বালার? সেইটাই যখন এমন মূল্যবান সম্পদ।

তাই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—দেখো নি তাই হিংসে করতে পারছো, দেখলে করতে না।

—কেন রে বাবু? —প্রতিমা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে—তোর আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস কিসের? শ্যামলের স্বভাবে তো কোনো দোষ দেখি না।....রূপে গুণে আলো করা—

অণিমার কি নেশা লাগলো? প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার নেশা?

তাহলে?

তাই অবলীলাক্রমে বলছে—তোমরা তাই ভেবেই নিশ্চিত আছো, আমিও আর বলি না কিছু। কি হবে সবাইকে দুঃখ দিয়ে।

এবারে তিনজনেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—কি রে অণু? কি ব্যাপার? শ্যামলের স্বভাব চরিত্রে কোনো কিছু—!

—'কিছু' বলে আর অগ্রাহ্য করতে পারছি কই বড়দি? এতোদিন তো নীরবে সয়ে এসেছি, এখন—অনেক কিছুই শুরু হয়েছে।

কথা শেষ না হতেই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে অণিমার।

কিন্তু শেষ করবার দরকারই বা কি?

এইটুকুই তো যথেষ্ট। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা হয়ে গেছে তার।

অণিমার ওই অসমাপ্ত কটি কথার ধাক্কাতেই মুহূর্তে কতো তুচ্ছ হয়ে গেলো সুষমা, প্রতিমা, তনিমা, সেজ পিসি?

বুদ্ধিহীন স্বামী নিয়ে ঘর করায় জ্বালা আছে বৈ-কি, মমতাহীন স্বামীর ঘরও দুঃখজনক সন্দেহ নেই, দায়িত্বহীন স্বামী নিয়ে সংসার করা কম যন্ত্রণাদায়ক নয়, আর সন্দেহবাতিক স্বামীর স্ত্রীর দুর্দশা তো বলে কাজ নেই, কিন্তু—

চরিত্রহীন স্বামীর ঘর করা?

তার কাছে ও দুঃখগুলো হাস্যকর ছাড়া আর কি? এরপর অণিমাকেই ঈর্ষা করুক ওরা।

ওদের রাজ্যে শুধু প্রবেশ করেই ক্ষান্ত হয় নি সে, ফার্স্ট ক্লাস টিকিটেই ঢুকেছে।

আচ্ছা—অণিমা কি অস্বাভাবিক? অণিমা কি অবাস্তব? ওর বোকামিটাই হাস্যকর পাগলামি? তাই বা বলা যায় কি করে?

সৃষ্টি করা দুঃখের যন্ত্রণা জাহির করে বেড়ানোর বোকামিটা কি একা অণিমারই? আদি অন্তকাল থেকে—ওই জিনিসটাকে মূলধন করেই তো পৃথিবীতে চরে খাচ্ছে মেয়েরা। ওই তো প্রধান সম্পদ তাদের, পরম আশ্রয়।

নানা ছন্দে নানা ভাষায় সশব্দ উচ্চারণে, অনুচ্চারিত ঘোষণায় অবিরত তারা এই কথাই তো শুনিয়ে আসছে—'দেখো আমরা কত দুঃখী....'দেখো—আমাদের কতো জ্বালা'....'দেখো—আমরা কতো সহ্য করে চলেছি!' 'অতএব—পূজার নৈবেদ্যটি আমাদের জন্য রেখো!'

এই তো পারমিট।

এর জোরেই তো আদায় করে আসছে তারা সুযোগ-সুবিধে, শ্রদ্ধা, করুণা.... এর মহিমাতেই তো সেই অপরাধী পুরুষ জাতিকে দিয়েই রচনা করাচ্ছে স্তবগান, জাগ করে রেখেছে তাদের অপরাধ-বোধ।

দুঃখের বিলাস না হলে চলবে কেন মেয়েদের? এর চাইতে দামী বিলাসিতা আর কি আছে?

আচ্ছা—দৈব দুর্যোগে সত্যিই যদি পৃথিবীতে এমন দুর্দিন আসে, যেদিন

অভিযোগ করবার কোনো পথ থাকবে না মেয়েদের? সাম্য-ব্যবস্থার রাম-রাজত্বে নারী-পুরুষের অধিকার-রেখা টানা হবে—একই লাইনে, সামাজিক সুবিচার, আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তালাচাবি পড়ে যাবে—চিরমুখর রমণী-রসনায়। সেদিনকার সেই সত্যকার দুঃখী নিরাশ্রয় মেয়েদের চেহারাটা কি হবে? বক্তব্য ফুরোলে আর কি রইলো তাদের?

সেই বোবা মেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ঠাসা ফাঁকা মনের অগাধ শূন্যতা পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

কি নিয়ে নিজেদের বিকশিত করে তুলবে সুষমা প্রতিমা সেজ পিসির দল?

কি দিয়ে টেক্কা দিতে চাইবে বোকা অহঙ্কারী অণিমারা?
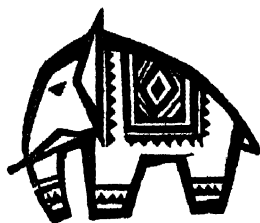
প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচ

দেবেশ দাশ

(১৯১১)

ঘোমটাটা একটু একটু করে সুরধুনীর মাথা থেকে নেমে এল। ইস্কুল পালানো নয়। শ্বশুরবাড়ী পালিয়ে সুরধুনী স্বামীর সঙ্গে ইডেন গার্ডেন টেস্ট ক্রিকেট খেলা দেখতে এসেছে। টিকিট আগে থেকেই কেনা আছে। রিজার্ভ করা টিকিট। তবু ভিড়ের জন্য কিউয়ের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে। সবাই ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি করছে। নানারকম টিপ্পনীও ঝাড়ছে। বাপের বয়সী থেকে নাতির বয়সী, চোখে চালসে-পড়া স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস থেকে চোখে ঝিলিক-হানা তরুণী সব বয়সের লোক থাকা সত্ত্বেও। প্রায় সব জিনিসের উপরই ট্যাক্স বসেছে। শুধু মুখের উপর এখনো বসেনি।

ওই সব হরেক রকম হাল্কা কথাবার্তা শুনতে শুনতে সুরধুনীরও মনটা ডানা মেলে উড়ু উড়ু করতে লাগল। ঘোমটা ত' উড়ে গেলই, শাড়ীর আঁচলটাও একটু যেন দোলা খেতে লাগল এদিক সেদিক।

চারদিকে চেয়ারগুলিতে কত পুরুষ, কত মেয়ে। সুরধুনী আজ তাদের সবার মধ্যে একজন। সবার কথাবার্তাই কানে আসছে। ওর সুন্দর মুখের উপর অনেকের নজর পড়ে সুন্দরতর করে তুলছে। কোথায় গেল বাগবাজার ?

না, বাগবাজার চোখের সামনেই চলছে। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা টপাটপ গোলগাল রসগোল্লা মুখে ফেলে দেওয়ার মত রসাল ক্যাচ গুলো মাটিতে ফেলে দিচ্ছে।

ওদের ঠিক পেছনেই এক বক্তিয়ার ছোড়দা আর তার বান্ধবী বসেছে। ওঃ, কি কথাবার্তাই না কইছে ওরা! একেবারে লজ্জা-সরম কিছুই নেই।

এদেশের ফিল্ডাররা নন্দদুলালের মত হেলে-দুলে গোঠে ধেনু চরাবার ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে ওই বেহায়া মেয়েটা কিনা একেবারে এই ভর দুপুরে গুণ গুণ করে গান সুরু করে দিল—

কানু কহে রাই
কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই।

ভাবের আবেগে ছোকরাও গানের আখর ধরে সুরু করল—

আমি তোমার প্রেমের কি বা জানি ॥

চকিতে একবার পিছন দিকে চেয়ে সুরধুনীর নিজেরই লজ্জা পেল। এদের

একটুও লজ্জা সরম নেই। মেয়েটা এসেছে কোন্ না কোন্ পাড়াতুতো ছোড়দার সঙ্গে। আর সুর মিলিয়ে দুজনে গাইছে।

ইতিমধ্যে বুকফাটা কারবার হয়ে গেল একটা। একজন নন্দদুলাল ননী-মাখান হাত তুলে আকাশের চাঁদ দেখবার জন্য মুখ ঘোরাল। কিন্তু, হায় হায়, ওটা চাঁদ নয়—সূর্য্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নেহাৎ একটা বল।

দুলাল ততক্ষণে বোধ হয় ননীচোরাব বাল্যকাল কাটিয়ে কিশোর প্রেমিক হয়ে গিয়েছে। সেও বোধ হয় ভাবল—আমি তোমার প্রেমেব কি বা জানি। বল ধরার ব্যাপারে আমি নেই।

বলটা ততক্ষণে বাউণ্ডাবীব কাছে দাঁড়ান ফিল্ডাবের কাছে এসে বিশেষ একটা ঠগবাজি কবল। আমাদের খেলোযাড় ফুটবলেব বল ধরবাব জন্য হাত দুখানা তৈরি রেখেছিল! কিন্তু বলটা মায়াবী ক্রিকেটের বল সেজে নাড়ু-গোপালের ভঙ্গিতে দাঁড়ান শ্রীমানের দু'হাতেব মাঝখান দিয়ে মাটিতে নেমে এল।

সহ্য করতে না পেরে পিছনেব মেয়েটি বেণী দুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হেঁকে উঠল,—ইউ গেট্ আউট্। বেরিয়ে যাও খেলার মাঠ থেকে।

সবাই বাঁকা চোখে তরুণীব দিকে তাকাল। কিন্তু তার তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘাড় দুলিয়ে বেণী নাচিযে সে আবাব বসে পড়ল।

না। সে নিজে বসে পড়েনি। চোখে কাল চশমা আঁটা সেই ছোড়দা না কে সেই হাত ধরে টেনে ওকে বসিযে দিল।

পাশেব একজন দর্শক ঝাল-ছোলা চিবোতে চিবোতে চোখে মিষ্টি মেখে নিজের মনেই যেন বলল,—ওরা যে নিজেরা সেই বোম্বাই মাদ্রাজ থেকে খেলতে আসছে সেটাই আমাদের ভাগ্যি। তা না হলে এমন টেস্ট ম্যাচটা আর হত কোত্থেকে? চেপে যান, চেপে যান দিদিমণি।

একজন অচেনা লোকের এ বকম গায়েপড়া টিপ্পনী আব ডাকে দিদিমণি মোটেই ঘাবড়াল না। কিন্তু ওই অভদ্র লোকটাকে একেবারে উপেক্ষা করে ওর গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে মিনু, অর্থাৎ সেই পিছনের দিদিমণিটি বলে উঠল,—বুঝলে ছোড়দা, আমাদের মুবদ শুধু নিজেব গাঁটের পয়সা খরচ কবে অন্যের খেলা দেখা আর অন্যের কথায় কাণ পাতা। আরে বাবা, সাবাদিন মাঠে মেহনৎ, দৌড় ঝাঁপ, রোদে পোড়া। ছ্যাঃ, ওসব কি ভদ্রলোকের কাজ? তার চেয়ে ঝাল-ছোলা চেবান অনেক ভাল।

ঝাল-ছোলা চেবান মুখ ঝাল মেরে গেল এই উত্তরে। চোখজোড়া বড় মিষ্টি হয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু এখন যেন লঙ্কাগুড়ো এসে পড়ল তাতে।

সুরধুনী লক্ষ্য করতে ভুল করল না। মনে মনে এই দিদিমণির তারিফ করল।

ছোড়দাও ছাড়বার পাত্র নয়। বলল,—ঠিক বলেছ। এই দেখ না আমরা কেমন বুদ্ধিমান। সেই পেশোয়ার থেকে মাইশোর পর্যন্ত সব জায়গার লোক জড়ো করে এনে ওদের দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করাই। আর নিজেরা তোফা আরামসে তা দেখে যাই খরচা করে।

তা আমাদের দিয়ে আর কিই বা আশা আছে বল ছোড়দা। এই দেখ না, পাড়ার মেয়েরা ছাতে উঠলেই ছেলেদেরও মনে পড়ে যায় খোলা হাওয়া খাওয়ার কথা। তা মেয়েরা যদি কলা দেখিয়ে কিছুদিন ছাতে খোলাখুলি ঘুরেই বেড়ায় ত' ল্যাঠা চুকে যায়। ছেলেগুলোও শায়েস্তা হয়। তা বোকাগুলো লজ্জাতেই জড়োসড়ো।

আর ছেলেগুলো? ছোড়দার গলায় মজার আমেজ পাওয়া গেল।

ছেলেগুলোও তেমনি ভীতু কোথাকার। তাকাবি ত' ভাল করেই তাকা। আমরা কিছু কর্পূরের মত উবে যাব না। রাস্তাঘাটেও তাই। ছেলেমেয়েদের সহজভাবে মেশা কেউ আর শিখল না এখনো।

ইতিমধ্যে আমাদের অতিথিরা তাদের ভানুমতীর খেল সাঙ্গ করে ভারতীয় দলকে ব্যাটিং করতে নামাল। ভারতীয়রা কিন্তু স্বার্থপরের মত উইকেট আঁকড়িয়ে পড়ে থাকার লোক নয়। দলের অন্য খেলোয়াড়দেরও দর্শকদের চোখে তুলে ধরার সুবিধা দিতে হবে। তাই চটাপট ওরা পরের জন্যই প্রাণ দিতে লাগল।

হঠাৎ পেছনে কে একজন ফিস্‌ফিস্‌ করতে লাগল,—বেড়ে আছে ব্যাটা। একটা নতুন চাকরী পেয়েছে ত' হাতে স্বর্গ পেয়েছে। কনেওয়ালা বাড়ীতে চায়ের আসর মাৎ করে বেড়াচ্ছে।

একটু পরেই মিনুর গলা শোনা গেল,—দেখ ছোড়দা, এই সেই চেক্‌নাই মার্কা তরুণ মনে হচ্ছে। কন্যাবতীর ঘাটে ঘাটে রাজহংস পাখা মেলে ভেসে বেড়ায়। ভিড়বার নামটি অবশ্য নেই।

ছোড়দাও সায় দিল।—বলল,—ঠিক বলেছ। একেবারে প্রেমের পরমহংস। এ হচ্ছে পাকা খেলুড়ে, যদিও স্পোর্ট নয়। নীর থেকে ক্ষীরটুকু চেখে সরে পড়বার তালে থাকে।

প্রদ্যুম্ন চানাচুর কিনবার জন্য সুরধুনীকে এই ভিড়ের মধ্যে একা ছেড়ে খানিকক্ষণের জন্য সরে পড়েছিল। ইতিমধ্যে সেই পেছনের চেয়ারের মিনু এসে সামনের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ল। সুরোকে বলল,—আপনার বন্ধুটি না

একটুও লজ্জা সরম নেই। মেয়েটা এসেছে কোন্ না কোন্ পাড়াতুতো ছোড়দার সঙ্গে। আর স্বর মিলিয়ে দুজনে গাইছে।

ইতিমধ্যে বুকফাটা কাররার হয়ে গেল একটা। একজন নন্দদুলাল ননী-মাখান হাত তুলে আকাশের চাঁদ দেখবার জন্য মুখ ঘোরাল। কিন্তু, হায় হায়, ওটা চাঁদ নয়—সূর্য্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে নেহাৎ একটা বল।

দুলাল ততক্ষণে বোধ হয় ননীচোরার বাল্যকাল কাটিয়ে কিশোর প্রেমিক হয়ে গিয়েছে। সেও বোধ হয় ভাবল—আমি তোমার প্রেমের কি বা জানি। বল ধরার ব্যাপারে আমি নেই।

বলটা ততক্ষণে বাউণ্ডারীর কাছে দাঁড়ান ফিল্ডারের কাছে এসে বিশেষ একটা ঠগবাজি করল। আমাদের খেলোয়াড় ফুটবলের বল ধরবার জন্য হাত দুখানা তৈরি রেখেছিল। কিন্তু বলটা মায়াবী ক্রিকেটের বল সেজে নাড়ু-গোপালের ভঙ্গিতে দাঁড়ান শ্রীমানের দু'হাতের মাঝখান দিয়ে মাটিতে নেমে এল।

সহ্য করতে না পেরে পিছনের মেয়েটি বেণী দুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হেঁকে উঠল,—ইউ গেট্ আউট্। বেরিয়ে যাও খেলার মাঠ থেকে।

সবাই বাঁকা চোখে তরুণীর দিকে তাকাল। কিন্তু তার তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘাড় দুলিয়ে বেণী নাচিয়ে সে আবার বসে পড়ল।

না। সে নিজে বসে পড়েনি। চোখে কাল চশমা আঁটা সেই ছোড়দা না কে সেই হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল।

পাশের একজন দর্শক ঝাল-ছোলা চিবোতে চিবোতে চোখে মিষ্টি মেখে নিজের মনেই যেন বলল,—ওরা যে নিজেরা সেই বোম্বাই মাদ্রাজ থেকে খেলতে আসছে সেটাই আমাদের ভাগ্যি। তা না হলে এমন টেস্ট ম্যাচটা আর হত কোত্থেকে? চেপে যান, চেপে যান দিদিমণি।

একজন অচেনা লোকের এ রকম গায়েপড়া টিপ্পনী আর ডাকে দিদিমণি মোটেই ঘাবড়াল না। কিন্তু ওই অভদ্র লোকটাকে একেবারে উপেক্ষা করে ওর গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে মিনু, অর্থাৎ সেই পিছনের দিদিমণিটি বলে উঠল,—বুঝলে ছোড়দা, আমাদের মুরদ শুধু নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে অন্যের খেলা দেখা আর অন্যের কথায় কাণ পাতা। আরে বাবা, সারাদিন মাঠে মেহনৎ, দৌড় ঝাঁপ, রোদে পোড়া। ছ্যাঃ, ওসব কি ভদ্রলোকের কাজ? তার চেয়ে ঝাল-ছোলা চেবান অনেক ভাল।

ঝাল-ছোলা চেবান মুখ ঝাল মেরে গেল এই উত্তরে। চোখজোড়া বড় মিষ্টি হয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু এখন যেন লঙ্কাগুড়ো এসে পড়ল তাতে।

সুরধুনী লক্ষ্য করতে ভুল করল না। মনে মনে এই দিদিমণির তারিফ করল।

ছোড়দাও ছাড়বার পাত্র নয়। বলল,—ঠিক বলেছ। এই দেখ না আমরা কেমন বুদ্ধিমান। সেই পেশোয়ার থেকে মাইশোর পর্যন্ত সব জায়গার লোক জড়ো করে এনে ওদের দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করাই। আর নিজেরা তোফা আরামসে তা দেখে যাই খরচা করে।

তা আমাদের দিয়ে আর কিই বা আশা আছে বল ছোড়দা। এই দেখ না, পাড়ার মেয়েরা ছাতে উঠলেই ছেলেদেরও মনে পড়ে যায় খোলা হাওয়া খাওয়ার কথা। তা মেয়েরা যদি কলা দেখিয়ে কিছুদিন ছাতে খোলাখুলি ঘুরেই বেড়ায় ত' ল্যাঠা চুকে যায়। ছেলেগুলোও শায়েস্তা হয়। তা বোকাগুলো লজ্জাতেই জড়োসড়ো।

আর ছেলেগুলো? ছোড়দার গলায় মজার আমেজ পাওয়া গেল।

ছেলেগুলোও তেমনি ভীতু কোথাকার। তাকাবি ত' ভাল করেই তাকা। আমরা কিছু কপ্পূরের মত উরে যাব না। রাস্তাঘাটেও তাই। ছেলেমেয়েদের সহজভাবে মেশা কেউ আর শিখল না এখনো।

ইতিমধ্যে আমাদের অতিথিরা তাদের ভানুমতীর খেল সাঙ্গ করে ভারতীয় দলকে ব্যাটিং করতে নামাল। ভারতীয়রা কিন্তু স্বার্থপরের মত উইকেট আঁকড়িয়ে পড়ে থাকার লোক নয়। দলের অন্য খেলোয়াড়দেরও দর্শকদের চোখে তুলে ধরার সুবিধা দিতে হবে। তাই চটাপট ওরা পরের জন্যই প্রাণ দিতে লাগল।

হঠাৎ পেছনে কে একজন ফিস্‌ফিস্ করতে লাগল,—বেড়ে আছে ব্যাটা। একটা নতুন চাকরী পেয়েছে ত' হাতে স্বর্গ পেয়েছে। কনেওয়ালা বাড়ীতে চায়ের আসর মাৎ করে বেড়াচ্ছে।

একটু পরেই মিনুর গলা শোনা গেল,—দেখ ছোড়দা, এই সেই চেক্‌নাই মার্কা তরুণ মনে হচ্ছে। কন্যাবতীর ঘাটে ঘাটে রাজহংস পাখা মেলে ভেসে বেড়ায়। ভিড়বার নামটি অবশ্য নেই।

ছোড়দাও সায় দিল।—বলল,—ঠিক বলেছ। একেবারে প্রেমের পরমহংস। এ হচ্ছে পাকা খেলুড়ে, যদিও স্পোর্ট নয়। নীর থেকে ক্ষীরটুকু চেখে সরে পড়বার তালে থাকে।

প্রদ্যুম্ন চানাচুর কিনবার জন্য সুরধুনীকে এই ভিড়ের মধ্যে একা ছেড়ে খানিকক্ষণের জন্য সরে পড়েছিল। ইতিমধ্যে সেই পেছনের চেয়ারের মিনু এসে সামনের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়ল। সুরোকে বলল,—আপনার বন্ধুটি না

আসা পর্যন্ত একটু বসতে পারি এখানে? যদি কিছু না মনে করেন অবশ্য। এ চেয়ারটা থেকে ভাল দেখা যায়।

এ রকম ভাবে একেবারে অচেনা মেয়ে স্বামীকে বন্ধু বলাতে সুরো একটু কলাবৌ মেরে গিয়েছিল। বারণ করতে পারল না।

ছোড়দা পেছনে থেকেই কথা চালাল,—দেখ মিনু, ওই তরুণকে দেখে আমার দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছে। এই ইডেন গার্ডেনে, থুড়ি দেবতাদেব বাগানে, যে খেলা হচ্ছে তা প্রজাপতিব ক্রিকেট। ধরে নাও ওই নিটোল নিভাঁজ নবচাকুরে একজন ব্যাটস্‌ম্যান্‌। আমাদের কীর্তিমানদের জায়গায় ওকে দাঁড় করিয়ে দাও, একটুও বেমানান হবে না। অবশ্য বেচারা যে চিবকালই এমন চতুব নটবর ছিল তা নাও হতে পারে।

চোখে ঝিলিক হেনে মিনু বলল,—অর্থাৎ বাঘ প্রথম থেকেই ত' আর মানুষ-খেকো হয়নি।

ঠিক বলেছ।—বলেই পেছন থেকে ছোড়দা একটা ছোট্ট কাগজের পুঁটুলী ছুঁড়ে দিল মিনুব গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল,—তবে ওব মত ছোকরার দাওযাই হচ্ছে তোমার মত একটি বালিগঞ্জ মার্কা একালিনী।

একটুও অপ্রস্তুত হল না মিনু। ববং হেসে বলল,—একেবাবে হক কথা। পড়ত আমার হাতে, ঝেড়ে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম।

উসখুস কবে নড়ে বসল সুবধুনী। সত্যিই ত' অমন মেয়েব হাতে পড়লে তার বাগবাজার মার্কা......

না, গুরুজনদের সম্বন্ধে কিছু ভাবা ঠিক হবে না। থাক্‌গে।

প্রদ্যুম্নও ফিবতে এত দেবী কবছে। কেমনতবো মানুষ।

ছোড়দা আবাব হাঁকল,—বেচারা তরুণ হয়ত প্রথমে নিবীহ হরিণ-শাবকের মতই প্রেমাবণ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু তোমাব মত চিত্রাঙ্গদারা.........

সে কি ছোড়দা? এ যুগে চিত্রাঙ্গদা?—মিনুব গলায মজা ও খুসী মিলে জলতরঙ্গের বাজনা বেজে উঠল।

অবশ্য—অবশ্য—চিত্রাঙ্গদারা—আহা, স্নো পাউডাব রুজে লিপস্টিকে চিত্রিত অঙ্গ তোমাদের।

দেখুন, দেখুন ত' ভাই, ছোড়দা কি রকম অন্যায়ভাবে কথা শোনাচ্ছে আজকালকাব মেযেদের। আপনিও একটু আমার সাইড্‌ নিন।

সম্পূর্ণ অচেনা এই সপ্রতিভ সমবযসী মেয়েটিব কথা ঠেলে ফেলা শক্ত। সুরধুনী হেসে ফেলল। বলল,—আপনি নিজেই ত' একা একশ'। আমি আর আপনার টেনে কি বলব?

বাঃ, বলুন না আপনি যে, আমাদের শিকার করার দরকার হয় না। ছেলেরা নিজেদের জালে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে।

কালো চশমাটা আরো ভাল করে এঁটে ছোড়দা বলল,—তা হতে পারে। তবে শিকারে বেরিয়েই তরুণীরা এদিক সেদিক শর তাক করতে শুরু করে দেন।

কিন্তু ঘায়েল করতে পারেন না,—টিপ্পনী কাটল মিনু। সুরধুনী হেসে উঠল।

আহা, শোনই না নটবরের ইতিহাস। বেচারা হরিণশাবক শিকারের সন্ধানে ঢুকে চারদিক থেকে বাণ খেতে খেতে অস্থির হয়ে গেল। শেষে কুমারী মৃগয়া মিত্র ওকে প্রায় ঘায়েল করে আনল।

মৃগয়া মিত্র? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে—বলে উঠল মিনু।

অবশ্যই চেনা। তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছে এক একটি মৃগয়া মিত্র। যদি না হয়ে থাক তা'হলে হওয়া উচিত। সব মেয়েরই।

শুনলেন, শুনলেন কথাটা,—সুরধুনীর দিকে চেয়ে বলল মিনু। আমরা মেয়েরা নাকি মৃগয়া করি। দেখুন ত' বিয়ের পর কোন রকমে শ্বশুরবাড়ীর সবাইয়ের ধাক্কা সামলিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই দায়। আমরা নাকি আবার শিকার করি। আপনি কি বলেন?

সুবোর মনে একটা বিরাট নাড়া এসে যাচ্ছিল এই স্বাধীন সমবয়সী মেয়েটির কথাবার্তায়। জীবনের স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে। আহা এর মত যদি খোলা হাওয়ায় চড়ে বেড়ান যেত। তা'হলে ওই উঁচু দেওয়াল আর নীচু মনগুলো ওর জীবনকে এমনভাবে গলা টিপে ধরে রাখতে পারত না।

সুরো মাথা নেড়ে সায় দিল। আরো বলল,—ঠিক বলেছেন। বাঙ্গালী ঘরের বৌয়ের এই না জীবন।

পেছনের চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে ছোড়দা বলল,—কিন্তু নটবর যে আমাদের বিয়েই করতে চায় না। বলে, কখনই বিয়ে না। তা'হলেই হয়ে যাব গুড্ নাইট্ ভিয়েনা। ছাঁদনা তলায় একবার এলেই বাড়ী বাড়ী মজাসে ছাঁনার ডালনা মারা বন্ধ হয়ে যাবে।

আহা, বেচারার জন্য দুঃখই হচ্ছে। মিনুকে ফিস্ ফিস্ করে সকৌতুকে বলল সুরধনী।

কথাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল ছোড়দা। বলল,—মোটেই না। এখন থেকে ছোকরার শুরু হবে ক্রিকেট খেলা। বিয়ে যখন নয়, তখন প্রজাপতির ক্রিকেট চলবে।

এমন সময় ফিরে এল প্রদ্যুম্ন। হাতে তিন-চার প্যাকেট চানাচুর। কিছুই

না লক্ষ্য করে বলে বসল সুরোকে,—এই এনেছি চানাচুর। টেস্ট ম্যাচটা যখন ভেস্তে যাচ্ছে, এস একটু চানাচুরই খাওয়া যাক।

মিনু এগিয়ে এসে প্রদ্যুম্নের চেয়ারটা দখল করে থাকার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল,—এঁনার সঙ্গে যখন ভাব হয়ে গেছে, বসুন না আপনি পেছনে আমার চেয়ারটাতে। আর, একটা মজার গল্প হচ্ছে। শুনুন সেটা।

ছোড়দার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবার পর ছোড়দা খুব উৎসাহ করে প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচের ব্যাপারটা বলতে লাগল। উডেন গার্ডেনের বদলে খেলার আসর হবে চায়ের বৈঠকে। ব্যাটস্‌ম্যান গরদের গ্লাভস্ (দস্তানা), নাগ্‌রার প্যাড্ এসব দরকারী সাজে সেজে ক্যাপের বদলে কবির মত পাঁশনে চশমা পরে নিজের উইকেট বাঁচাবার জন্য খেলার মাঠে নামবে। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে অন্যান্য ফিল্ডাররা। যথা কনের বোন, বৌদি, পাড়াতুতো বন্ধু এরা সব।

প্রদ্যুম্ন ফিরে আসার পর সুরো একটু আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। কিন্তু এসব শুনতে শুনতে সেও আর হাসি সামলাতে পারল না। চারদিকে অচেনা পুরুষদের মাঝখানেই পিছন ফিরে ছোড়দাকে বলল,—বাবাঃ, আপনি এত মজার মজার কথাও বলতে পারেন।

ছোড়দা দুহাত তুলে তাকে নমস্কার করে বলে উঠল,—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম্ তারপর শুনুন। তাদের ফিস্‌ফিস্, উস্‌খুস্, কাণাঘুষো এসবে একটা আবহাওয়া তৈরী হয়ে যাচ্ছে। বাউণ্ডারীর আশেপাশে, উইকেট থেকে দূরে, স্ক্রিনের পেছনে দর্শক হচ্ছে পাড়াপড়শীরা আর আত্মীয়রা। কখনো বাজান হয় না এমন একটা কটেজ পিয়ানো বা কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের বইও ছড়ানো আছে।

মিনু ফস্ করে বলল,—বাঃ, কনের বন্ধুরা সবাই ত' হাজির। কিন্তু বরের বন্ধুরা কি ফেলনা নাকি?

না, না। তারা হচ্ছে বদলী। অর্থাৎ সাবষ্টিটিউট বা 'ডিড নট ব্যাট' সেই দলে। যদি খেলা খতম হয়ে যায় তাহলে আর খেলতে নামতে পেল না। তবে ওদের দিকেও নজর থাকে। বিশেষ করে ওই সব বাড়তি ফিল্ডারদের

আপনার ছোড়দা কিন্তু বলেন বড় মজা করে,—বলল সুরধুনী। এই খেলার চেয়ে গল্পের খেলাটাই অনেক বেশী ভাল লাগছে।

পাত্র উইকেটের সামনে এসেই মাপজোখ সুরু করে দিল অবস্থাটার। একচোখ দেখেই বুঝে নিল যে টিপয়ে যে কেক্‌টা সাজান আছে সেটা হচ্ছে কনের নিজের হাতের তৈরী বলে পরিচয় দেওয়া ফারপোর কেক্। কনের হাতের সূচের কাজ বলে যে নমুনাগুলো সাজান আছে ওগুলো দোকান থেকে ভাড়া

কবে আনা। সব হবু কনের মায়ের চায়ের আসরেই হাজির হয়। বইগুলোর পাতাও কোনদিন কাটা হয়নি।

চারদিকেই যখন এত ভেজাল তা'হলে দুর্গা বলে তাড়াতাড়ি ঝুলে পড়াই ভাল,—বলে উঠল মিনু।

না, না। ঝুলে পড়বে এমন কাঁচা ছেলে আমাদের ব্যাটস্‌ম্যান্ নয়। সে চারদিকে নজর রেখে নিজের উইকেট সামলাতে লাগল। এমন সময় খেলার মাঠে নামলেন ভাবী শ্বাশুড়ী—উইকেট কিপিং করবার জন্য।

ফস্ করে ফণা তুলল মিনু—শ্বাশুড়ী? আই মিন্ ইংরাজীতে যাকে বলে মাদার-ইন্-ল? বাব্বা, সেই জন্যেই আমি কোনদিন বিয়ে করব না। শ্বশুর-বাড়ীর সবার সঙ্গে মানিয়ে ঘর করতে আপত্তি নেই। কিন্তু সব সময় ঢাক-ঢাক গুড-গুড, কোথায় পান থেকে চূণ খসল, কোথায় মেপেঝোকে ঘোমটা টানা হল না—এসবে বাবা আমি নেই। শ্বাশুড়ীগিরি বড় জবর। জান, খৃস্টানদের বিগামির (দুই বিয়ের) শাস্তি কি?

জেল।

উঁহু, হল না।

তবে জেল ছাড়াও সমাজে নিন্দে।

উঁহুঃ, অত সহজ শাস্তি নয়।

তবে শোন বলছি, দু দু খানা শ্বাশুড়ী।

সাবাস। ঠিক বলেছ। আজকাল আমেরিকাতে গুণ্ডারা নাকি বৌয়ের বদলে শাশুড়ীকে কিড্‌ন্যাপ করে লোপাট করে নিয়ে যায়। তারপর চিঠি লিখে শাসায়,—দাও পাঠিয়ে পাঁচ হাজার ডলার জলদি। না হলে এই দিলাম শাশুড়ীকে ফেরৎ পাঠিয়ে।

সুরো অর্থভরা চাহনীতে তাকাল মিনুর দিকে। একটু হেসে তার হাত-খানাতে একটু আলতো চাপ দিল।

প্রদ্যুম্ন সেটি লক্ষ্য করে খুসী হয়ে ছোড়দাকে বলল,—আচ্ছা বলুন ত' তার পর কি হল।

আবার ক্রিকেটের কাহিনী সুরু হল। মেয়ের মা ঘরে ঢুকে ব্যাটস্‌ম্যানের মতি-গতি-স্বভাব এসব নজর করতে লাগল। তারপর খেলার মাঠে নামল কনে। চারদিকে চোখে চোখে যেন হাততালি পড়ে গেল। পাত্রের চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পাত্র ব্যাটের মত করে হাত তুলে ছোট্ট একটু নমস্কার করল। মেয়ে তখন দেখাবে করপদ্মের একটু নাচন। এখন বলটাকে পাত্র ছিট্‌কে ছুঁড়ে বাউণ্ডারী করে বেরিয়ে যাবে, না কট আউট হবে না ক্লিন বোল্ড

হবে তা জানা নেই কারো। কনে বল ছুঁড়ল, কিন্তু পড়শী বা আত্মীয়া বা অন্য কেউ সে বলে ক্যাচ ধরে ব্যাটস্‌ম্যানকে সাবড়িয়ে দিল এমন অঘটনও ঘটতে পারে কখনো কখনো।

তা' কনে মাঠে নামার পর অন্য ফিল্ডারদের তখনো দরকার থাকে নাকি?—প্রশ্ন করল মিনু।

অবশ্য দরকার। ওরা আরো বেশী হুঁশিয়ার হয়ে কাছাকাছি এগিয়ে আসবে, যাতে কনের সঙ্গে বা ওদের সঙ্গে সব কথাবার্তাতেই এক-আধটা ক্যাচের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দরকার মত সরে গিয়ে মাঠটা খালি করে দিতেও আপত্তি নেই। যাতে রাণ করতে করতে বাউণ্ডারী হয়ে বল না বেরিয়ে যায় তার জন্য হুঁশিয়ার পাহারা বসান আছে।

বেচারা ব্যাটস্‌ম্যানের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে,—বলে উঠল প্রদ্যুম্ন।

মিনু ধারাল তলোয়ারের মত জবাব দিল,—আমার ত বরং কনের জন্যেই দুঃখ হচ্ছে। নিজে থেকে না পারছে যাচাই করতে, না ছাঁটাই করতে।

সুরো হাসিমুখে সায় দিল।

একটু থেমে আবার বলল মিনু,—অবশ্য ভেবে দেখ, একবার বিয়ে হয়ে গেলে তখন স্ত্রীর দাপট কত বেশী। ধর, বিয়ের পর একদিন ওরা দুজনে ইষ্ট-বেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছে এমন সময় যদি কোন আগেকার বান্ধবী এসে বলে, হ্যাল্লো,—ত ন কেমন হবে?

সুরো আর থাকতে পারল না। বলে উঠল,—এমন আর কি? তার চেয়ে ভেবে দেখুন যে সে তার আগেকার বান্ধবীকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছে এমন সময় যদি তার স্ত্রী এসে বলে,—হ্যাল্লো—তখন কেমন হবে?

সাবাস, সাবাস, খাসা বলেছেন আপনি। মিনু একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুরধুনীকে। বলল,—আপনার মত এমন মেয়ে আমি সারা কলকাতায় দুটি দেখিনি। আপনি মেয়েদের লীডার হতে পারবেন। আমার সঙ্গে এসে নারী সমিতিতে নাম লেখান।

হঠাৎ খেয়ালের বশে এমন একটা চটকদার কথা বলে স্বাধীন মনের পরিচয় যে সে দিতে পারবে তা কখনো নিজেই ভাবতে পারত না সুরধুনী। কিন্তু মন তার ছিল সজাগ, শুধু একটুখানি জোয়ারের ধাক্কার যা অপেক্ষা ছিল।

এর পর ছোড়দা আবার তার গল্প শুরু করল।

মেয়ে দেয় বল, ছেলে ঠেকায় ব্যাট, মেয়ের মা রাখে উইকেট আর পাত্রীপক্ষ করে ফিল্ডিং।

থামিযে দিযে সুবো বলে উঠল,—তবে ওভাবে ছুটাব বদলে পাঁচটা বল—পঞ্চশবেব কাববাব কিনা।

আব আম্পাযাব?—প্রশ্ন কবল প্রদ্যুম্ন।

চানাচুবেব খালি প্যাকেটটা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে ছোড়দা বলল,—আম্পাযাব হচ্ছে ঘটক ঠাকুব। অথবা কনেব পক্ষেব কোন হিতৈষী বা ববেব কোন বন্ধু। মোট কথা, খেলাব মাঠে সে সবাব নজবেব বাইবেই থাকে। তবে আসলে আম্পাযাব হচ্ছে প্রজাপতি। চট্ কবে হৃদযে আহত হয হিট উইকেট হবে, না সোজাসুজি ভদ্রলোকেব মত বোল্ড আউট হবে, না বেকাযদায় পড়ে এল-বি-ডাবলিউ হবে সে সম্বন্ধে এক আম্পাযাবই বায দিতে পারে। মোট কথা, নট আউট হযে বাঁধনছেঁড়া গরু মত যাতে না কেটে পড়তে পাবে সেদিকে কড়া নজব বাখা দবকাব।

খেলা ততক্ষণে শেষ হযে আসছিল। মিনুব হাত ধবে সুবধনী বলল,—আজ তাহলে আসি ভাই। আপনাব সঙ্গে কথা হযে কত যে ভাল লাগল। মনে হচ্ছে যেন নিজেকে চিনতে পাবছি।

ওকে প্রায় জড়িযে ধবে মিনু বলল,—নিশ্চযই নিজেকে চিনতে পাববেন। নিজেব পাযে নিজেব মন নিযে দাড়ানই হচ্ছে আমাদেব একটুখানি দাবী। আমবা নিজেব মন নিযে নিজেব জীবনে বাচতে চাই।

স্পর্শ

অমূল্য দাসগুপ্ত (সম্বুদ্ধ)

(১৯১১)

পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম একেবারে মরিয়া গেলেন।

অপরাধ তাঁহার নয়। তিনি আত্মরক্ষা করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবেককে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া দেহকে অনাহত রাখিতে পারেন নাই। দুইদিক এক-সঙ্গে সামলাইবার সামর্থ্য যদি বিধাতা তাঁহাকে না দিয়া থাকেন, সে ত্রুটি বিধাতার।

বিধাতার ত্রুটি, এমন কথা বলিবার সাহস অবশ্য সকলে রাখেনা। তাহারা বলিবে, দোষ সমস্তটাই কুপ্পারাপ্পার। সে যদি অমন অতর্কিতে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত না হইত, তবে দুর্বিপাকটাও ঘটিত না।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই রূপ। প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ একটি ঘটি ও একটি দাঁতনকাঠি হাতে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। দেহশুদ্ধি সমাধা করিয়া তিনি নদীর জলে নামিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। তারপর মৃদুস্বরে গীতার দশম অধ্যায় আবৃত্তি করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইলেন।

নদীর পাড় ধরিয়া পথ। বেদানাং সামবেদোঽস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী—বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে আচম্বিতে পথের বাঁক ঘুরিয়া কুপ্পারাপ্পা দেখা দিল।

পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়নম থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি শুদ্ধাচারী শুদ্ধবংশ সম্ভূত নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। কুপ্পারাপ্পা পারিয়া শূদ্র। শাস্ত্রমতে তাঁহার নিকটস্থ হইবার অধিকার কুপ্পারাপ্পার নাই।

এই নিষেধ একদিনের নহে, চির আচরিত বিধি। তিন হাজার সাত শত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমের দ্বাদশ-শতোত্তর ত্রিপঞ্চাশ পিতামহ স্বজাতীয় আর্য্যসেনার সহিত দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিলেন। তিন হাজার সাতশত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে দ্রাবিড় কুপ্পারাপ্পার দ্বাদশশতোত্তর ত্রিপঞ্চাশ পিতামহ সেই অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আর্য্য সংস্কৃতি বিস্তারের সেই সাধু প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চাহিয়াছিল। সেই অপরাধে তাহার ও তাহার বংশের যে যেখানে জন্মগ্রহণ করিবে সকলেরই আত্মা কলুষিত। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ যে স্থানে থাকিবেন তাহার আশি হাতের মধ্যে কুপ্পারাপ্পা আসিতে পারেনা। আসিলে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌কে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

অসময়ে অবেলায় স্নান করা তাঁহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নয়। তাই

কুম্মাবাপ্পার গলায় একটা ঘণ্টা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন দূর হইতেই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ সতর্ক হইতে পারেন।

কুম্মাবাপ্পাকে দেখিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। ঘণ্টার শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। দূর হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কুম্মাবাপ্পার গলায় ঘণ্টাটি বাঁধা আছে। তাহার দোলকটি কোন প্রকারে আটকাইয়া গিয়া থাকিবে, ঘণ্টার শব্দ হইতেছে না।

কুম্মাবাপ্পা আকাশ ও নদীর দিকে চাহিয়াছিল। ভ্রূকুটি কবিতানন পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌কে সে দেখিতে পাইল না। অসঙ্কোচ-গতিতে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নদীর চড়ায় তাহার নৌকাটি তোলা রহিয়াছে, ঝড় আসন্ন তাহার দৃষ্টি তাই নদীর দিকে।

উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া আসিতেছিল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলিয়া ব্যবধানটুকু মাপিয়া দেখিতে লাগিলেন। ব্যবধান আশি হাতের কম হইলেই স্পর্শদোষ ঘটিবে। তাঁহাকে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মাঘ প্রভাতের দুরন্ত শীতে তাঁহার স্নান করিবার উৎসাহ ছিল না।

কুম্মাবাপ্পা অগ্রসর হইতেছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম ও এক পা এক পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিলেন।

মাথার পিছনে বুদ্ধিহীন বিধাতা চক্ষু দেন নাই, হটিতে হটিতে ক্রমে তিনি নদীর কিনারায় গিয়া পড়িলেন। তারপর আর এক পা হটিতে যাইয়া একেবারে খাড়া পাড় ডিঙাইয়া নদীতে পড়িয়া গেলেন। পড়িতে পড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চীৎকার কুম্মাবাপ্পার কানে গেল। ব্যস্ত হইয়া সে নদীর কিনারায় ছুটিয়া আসিল। ঝুঁকিয়া দেখিল, পণ্ডিত বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ প্রখর স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

কুম্মাবাপ্পা চীৎকার করিয়া কহিল, ভয় নাই।

পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কুম্মাবাপ্পা সত্যই বলিয়াছে, ভয় নাই। তখন কুম্মাবাপ্পাও তাঁহার মধ্যে ব্যবধান অন্যূন দুইশত হাত। আশি হাতের কম হইলেই স্নান করিতে হইত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ আরেক ঢোক জল খাইলেন।

কুম্মাবাপ্পা নদীর তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল।

পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্ প্রাণপণে ডাকিয়া কহিলেন, দেখিস বেশী কাছে আসিস না।

সে ক্ষীণ কণ্ঠ কুম্মাবাপ্পা শুনিতে পাইল না। যেখানে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাহা ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কোমরে মস্তবড় একটা দড়ির বাণ্ডিল ছিল—তাহার নৌকার গুণদড়ি, সেই দড়ি খুলিয়া সে একটা দিক নদীর মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অব্যর্থ লক্ষ। দড়িটা একেবারে পণ্ডিত রামেশ্বর বাল-গঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমের গায়ে গিয়া পড়িল। প্রাণপণে সেটাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

কুম্মাবাপ্পা আবার চীৎকার করিল, ভয় নাই।

তীরের উপরে একটা বাবলা গাছ। তাহার গায়ে ভর রাখিয়া কুম্মাবাপ্পা ধীরে ধীরে দড়ি টানিতে লাগিলেন। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কট-নারায়ণম্‌ তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অগ্রসর হইতে হইতে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথা বলিবার শক্তি নাই, হস্তের ইঙ্গিতে কুম্মাবাপ্পাকে বলিলেন, সরিয়া যাও।

কুম্মাবাপ্পা বুঝিল। গাছের গায়ে দড়ি ঠেকাইয়া সে টানে টানে পিছনে হটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে সেই শীতে স্নান করাইয়া তাহার কোন লাভ নাই। ক্রমে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ তীরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখিলেন, কুম্মাবাপ্পা নদীর তীর ধরিয়া চলিতেছে।

আর পনরো ষোল হাত গেলেই তীর পান এমন সময়ে চকিতের মত একটা কথা তাঁহার মনে হইল। পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ শিহরিয়া উঠিলেন। কতকটা কণ্ঠে এবং কতকটা ইঙ্গিতে কুম্মাবাপ্পাকে প্রশ্ন করিলেন, দড়িটা কত হাত?

কুম্মাবাপ্পা কহিল, তিয়াত্তর হাত।

হা অদৃষ্ট!

কপালে করাঘাত করিয়া পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ দড়ি ছাড়িয়া দিলেন। দিয়াই জলে তলাইয়া গেলেন।

শাস্ত্রবচন হইতে দড়ি সাত হাত খাটো পড়িয়াছিল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেই সাত হাতের ব্যবধান পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণম্‌ পার হইতে পারিলেন না।

স্পর্শ দোষ ঘটিয়াছিল, স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করা হইল না। সেই পাপে পণ্ডিত রামেশ্বর বালগঙ্গাধর ভেঙ্কটনারায়ণমের আত্মা নরকে গেল। অবশ্য বিশুদ্ধ হিন্দু নরকে।

আর একজন মহাপুরুষ

বিমল মিত্র

(১৯১২)

"যে মহাপুরুষেব স্মৃতিব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবাব জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হযেছি, তাঁব আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবা তাদেব জীবন গঠন কবে—তাঁব জীবন-দর্শনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তবেই আজকে আমাদেব এই সভা সার্থক—আমি সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদেব অনুবোধ কবি, তাঁবা যেন এই মহাপুরুষেব সাধনাকে সফল কবতে চেষ্টা কবেন। বাংলাদেশ আজও নিঃস্ব হযনি আমাদেব অনেক সৌভাগ্য এই যে, করুণাপতিবাবু আমাদেব বাঙলা দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন

বামমোহন বিবেকানন্দেব বাংলাদেশ বঙ্কিমচন্দ্র ববীন্দ্রনাথেব বাঙলাদেশ, নেতাজী দেশবন্ধুব বাঙলাদেশ—এই বাংলা দেশেই আব একজন—আব একজন মহাপুরুষেব জন্মভূমি—ধন্য বাঙলাদেশ, ধন্য করুণাপতিবাবু—ধন্য আমবা—"

এক—একজন বক্তৃতা দেন আব প্রচুব হাততালি।

করুণাপতি বালিকা বিদ্যালযেব প্রাঙ্গণে বিবাট সভা বসেছে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা করুণাপতি মজুমদাবেব জন্মবার্ষিকী। ওপাশে করুণাপতি বাবুর বিবাট অযেলপেন্টিং। তাব ওপব প্রকাণ্ড একটা ফুলেব মালা ঝুলছে। লাল শালু আব হলদে চাদবেব ওপব পদ্মফুল আঁকা শামিযানা। ডাযাসেব ওপর গণ্যমান্য কযেকজন লোক। ফুড মিনিষ্টাব প্রধান সভাপতি। জেলখাটা কযেকজন দেশনেতা। কযেকজন সাহিত্যেব পাণ্ডাও উপবিষ্ট।

একে একে অনুষ্ঠান হচ্ছে, প্রথম শ্রেণীব কযেকজন ছাত্রীব সঙ্গীত, তাবপর সভাপতি ববণ, নান্দীপাঠ। প্রধান অতিথি, সভাব উদ্বোধক। মাল্যদান, তাবপব কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, একক সঙ্গীত, বক্তৃতা, শোনা গেছে, শেষে প্রচুর জলযোগেব ব্যবস্থাও আছে।

করুণাপতিব বড ছেলে তথাগত মজুমদাব বড ব্যস্ত। তাঁকেই সব দেখা-শুনা কবতে হচ্ছে। বর্ধমানেব এস. ডি. ও। তাবপবেব ছেলে বাতুল মজুমদার বেহাবেব সিভিল সার্জ্জেন। তাব পবেব ছেলে পল্লব মজুমদাব বেলওযেব চীফ ইঞ্জিনীযাব। তাবপব আবো অনেক আছে। সকলেব নাম জানি না,—মুখ চেনা। সবাই কৃতবিদ্য। সাত ছেলে তিন মেযে। সবাই আজ চাবদিক থেকে এসে জুটেছে, বাবাব জন্মবার্ষিকীতে তাদেবই তো খাটবার কথা। তবু মহা-পুরুষবা কোনও দেশকালেব গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই দেশের লোকদেরও দায়িত্ব কি কিছু কম।

ওপাশে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সার বেঁধে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে লিখছে। বাঁ-পাশে মহিলাদের জায়গা। তিন মেয়ের সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীও বড় পরিশ্রম করছেন। গণ্যমান্যরা যদি অভ্যর্থিত না হন, জল-যোগের আগেই যদি তাঁরা চলে যান! তীক্ষ্ণদৃষ্টি সব দিকে।

তথাগত একবার কাছে এসে নিচু হয়ে বললে—কাকাবাবু, আপনাকে কিছু বলতে হবে।—

মুখ তুলে চাইলাম, অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। সঙ্গে আর একটি ছেলে, বললাম এটি কে—তোমার ছেলে নাকি?

তথাগত বললে—না ছোট ভাই—দেখেননি একে—এর নাম পরাশর—পরাশর হাত জোড় করে নমস্কার করলে। বয়স বেশি নয়, দেখে মনে হলো যেন চিনি-চিনি

করুণাপতির সব ছেলেমেয়েদেরই চিনতাম। সাতটি ছেলে তিনটি মেয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন কিন্তু নামের এত বাহার ছিল না। কিন্তু পরাশর? এ কবে হলো?

বললাম—একে তো কখনও দেখিনি—তথাগত বললে—এ আমার ছোট-ভাই তাহলে এর পরেই কিন্তু আপনাকে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে—

তখন দেশসেবকদের একজনের বক্তৃতা চলছিল। করুণাপতিবাবুর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কত গোপন দান ছিল তাঁর। কত বিধবার ভরণ-পোষণ করতেন। দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে একদিন মানুষ হবে, সেই চিন্তাই সারাদিন করতেন তিনি। আজীবনের সমস্ত উপার্জ্জন কেমন করে এই 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ের' জন্যে দান করে গেছেন। নীরব, একনিষ্ঠ কর্মী তিনি—কখনও যশের জন্য লালায়িত হননি। ইনিয়ে বিনিয়ে তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন করুণাপতিবাবু আমাদের দেশের আর একজন মহাপুরুষ।—

একে একে সকলের বক্তৃতা হয়ে গেল।

তথাগত একবার কাছে এসে মুখ নীচু করে বললে—এবার আপনার পালা কিন্তু—

সভাপতি ফুড মিনিষ্টর নাম ঘোষণা করলেন।

আমি উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

করুণাপতি সম্বন্ধে আমি কী যে বলব। অথচ এই সভায় আমার চেয়ে তাঁকে আর কে অমন করে জানতো। প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

তখন দুজনেরই রেলের চাকরী। সিভিল সার্জ্জেনের বাড়ীতে আমাদের তাসের আড্ডা। সন্ধ্যে থেকে সুরু হয়েছে—তারপর রাত এগারোটাও বাজতে চললো। কম্পাউণ্ডার হরনাথ তখন বেশ কিছু মোটা রকম জমিয়ে নিয়েছে সিভিল সার্জ্জেন হয়েছে; আমিও আর স্যানিটারী ইনেস্পক্টার রামলিঙ্গমের তখন না হার, না-জিত। বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি।

এমন সময় সিভিল সার্জ্জেনের বাড়ীর কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

সিভিল সার্জ্জেন বললে—দেখতো ফলাহারী কে ডাকে—

জুন মাসের মাঝামাঝি। সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি নেমেছে। খেলাটাও বেশ জমে উঠেছে। কারুরই এখন ওঠবার ইচ্ছে নেই। আর বাড়ীও কারুর দূরে নয়। দু-পা গেলেই যে যার কোয়ার্টারে ঢুকে পড়া।

ভয় ছিল সিভিল সার্জ্জেনের। কিন্তু শমন এল আমারই।

ষ্টেশনের জমাদারকে পাঠিয়েছে করুণাপতি। স্ত্রীর ভীষণ অসুখ। এখনি যেতে লিখেছে। জমাদাব রামভক্ত হ্যাণ্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারে বারান্দায় নীলকোর্ট পরা জমাদারকে যেন যমদূতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হোক—তবু যেতে হবে। যেতেই হবে। ষ্টাফের অবশ্য মিথ্যে অসুখ করে। একদিন পবে দেখতে গেলেও চলে। শেষ পর্য্যন্ত একখানা আনফিট্ সার্টিফিকেটের পরোয়া, তাতে বড়জোব লাভ একটা রুইমাছ নয়ত কোলকাতা থেকে আনিয়ে দেওয়া একসের পটল। কিন্তু করুণাপতির সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ। এক জেলার মানুষ, এক স্কুল থেকে পাশ করা।

জিজ্ঞাসা করলাম—ডাউন গাড়ী কিছু আছে নাকি আবার,—

রামভক্ত বললে, কণ্ট্রোল অফিসে খবর নিয়ে এসেছি—'টু-নাইন্টিন্' অর্ডার হয়েছে সাড়ে বারোটায়। সেইটেতে যাওয়াই সুবিধের।

মালগাড়ীব ব্যাপার। সাড়ে বাবোটায় যদি অর্ডার হয়ে থাকে, তাহলে সাড়ে বারোটাতেই যে ছাড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। শেষ মুহূর্ত্তে ড্রাইভার 'সিক রিপোর্ট' করতে পারে। গার্ড ঘুম থেকে উঠতে দেরী করতে পারে। কত রকমের হাঙ্গামা।

তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুলাম। ঘটনাচক্রে গাড়ীও রাইট টাইমে ছাড়ল। মালগাড়ীর ব্রেকভ্যানের মধ্যে টিম্ টিম্ করছে হ্যারিকেনের আলো। দুটি ছোট ছোট বেঞ্চি, গার্ড নিজের বিরাট বাক্সটার ওপর বসতে বলল। রামভক্তও দরজাটা ভেজিয়ে কমোডটার পাশে হাঁটু জুড়ে বসলো। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

থ্রু ট্রেন। ঝড়ের মত উড়ে চলেছে। উড়ে চলুক আর নাই চলুক, অন্ততঃ

ভেতরে বসে আমাদের তাই মনে হচ্ছে। ঝন্ ঝন্, কট্ কট্ শব্দ আর দুলুনি। ঠিক দুলুনি নয় ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনির জ্বালায় বাক্সটা দুহাতে ধরে বসে আছি। কণ্ট্রোল অফিসে বলা ছিল যেন বড়মুণ্ডায় থামানো হয় গাড়ী। বড়মুণ্ডার ষ্টেশনমাষ্টার করুণাপতি।

ছোট ষ্টেশন বড়মুণ্ডা। রাত্তিরবেলা ষ্টেশনটাকে দেখাই যায়না। ছোট্ট একটা ঘর। জানলার কাঁচ দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য দেখা যাচ্ছে না। মালগাড়ীব ব্রেকটা থামলো ষ্টেশন থেকে একমাইলটাক দূরে। সাবধানে দুটো ধাপ নেবে রেলের লাইন আব দুপাশে জড়ো করা ব্যালাষ্ট। ক্রেপসোলের জুতো দুটো লাইনেব মধ্যেকাব জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে। চারি-দিকে জলা আব আগাছা। আব ধূ ধূ কবছে মাঠ। ঝড়েব ঝাপটা। ব্যাঙের আর ঝিঁঝিঁর ডাকে ভয কবে ওঠে। কেবল বিন্দুব মত দূরেব সিগন্যালের লাল আলোটা স্থির হয়ে জ্বলছে। নামবার পরেই লাল বিন্দুটা নীলে রূপান্তবিত হল—আর গাড়ীটা একটা ঝাঁকানি দিলে। তারপব চাকায়, স্পিংয়ে, ব্রেকে, ওয়াগানে, ইঞ্জিনে মিলে সে এক বিচিত্র ঝঙ্কার দিতে দিতে চলতে শুরু করলো।

ষ্টেশন থেকে দোতলা সমান নীচুতে করুণাপতির কোয়ার্টার। রামভক্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল।

করুণাপতি জাফরিওয়ালা দরজার সামনে দাঁড়িযেছিল। বললে—এসেছ, ভাই—বাঁচালে।—

সামনে জাফরি দেওযা বারান্দা, বাবান্দা মানে একফালি জাযগা। বৃষ্টির ছাটে ভেতরের সব ভিজে যায়। কিন্তু তাবই ভেতরে ঘুটের বস্তা, একটা তেলচিটে ডেক্ চেয়ার, দুখানা দড়িব খাটিয়া, বেতের দোলনা, ছেলেমেযেদের জুতোর বাণ্ডিল,—সব কিছু—

ছেঁড়া ফতুয়া গাযে করুণাপতি যেন বড় বিব্রতবোধ কবতে লাগল। হঠাৎ একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললে, বললে—কোথায় যে তোমাকে বসতে দিই—

বললাম—বসতে তো আসিনি, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—

বললে—না, না, তবু—ওই দেখ না—ঘর দেখছ তো—

ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলাম, বাবান্দার আলোটা ভেতরে গিয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘরটা জোড়া ময়লা মশারি, ঘরের ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই।

রামভক্ত ওষুধের ব্যাগটা নাবিয়ে দিয়েছে।

করুণাপতি বললে—তুমি আর দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন রামভক্ত, সারাদিন তো তোমার খাটুনির শেষ নেই—যাও একটু গড়িয়ে নাও গে—কাল সকাল থেকেই

আবার ডিউটি।—এখনতো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন—বুঝলে ভাই, রামভক্ত আছে বলে তাই দুটি ভাত পাচ্ছি—নইলে কী যে হতো—

বললাম—সে কথা থাক—বৌদিকে দেখি চল—

পাশের ঘরটাতেই রোগী শুয়ে, সাতফুট বাই ছয়ফুট একখানা ঘর। দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে একটি ছোট টেবিল ল্যাম্প, মাটির ওপর গিয়ে বসলাম।

বললাম—জ্বরটা নেওয়া হয়েছে নাকি—

—জ্বর নেব কি করে, থারমোমিটার কি আছে, একটা সাবান কিনতে গেলেও সেই বিলাসপুর যেতে হয়—আর কিনলেই কি থাকবে অপোগণ্ডোদের জ্বালায়—একটি দুটি নয়তো—দশটি যে—সোজা কথা—গাছ যে ওদিকে খুব ফলন্ত—বুঝলে কিনা—

জ্বর রয়েছে খুব। বুক পরীক্ষা করলাম, জিভ্ দেখলাম, একটু বরফ থাকলে ভাল হতো। শাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো। চোখের তলাটা টেনে দেখলাম—রক্তহীন। সমস্ত শরীরটাই যেন বড় নীল-নীল বলে মনে হলো। হাতের পায়ের শিরাগুলো নীল হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে।

করুণাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম—কখন থেকে এরকম হলো—

বললে—এই পরশু এমনি সময় থেকে, প্রথমে ভাবলাম পড়ে টড়ে গেছে বুঝি তারপর কাল সকাল থেকে এমন হলো যে, কাপড় একেবারে ভেসে গেল ভাই—শয্যাশায়ী একেবারে, ভাবলাম কী করি—আমি বইটা খুলে দেখে দিলাম দু ডোজ ক্যামোমিলা টু-হান্‌ড্রেড্—শেষে আজকের অবস্থা দেখে আর ভরসা হলো না,—রামভক্তকে পাঠালাম তোমার কাছে।—

জিজ্ঞেস করলাম—ক'মাস হলো

করুণাপতিও জানে না। স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁগো ক'মাস হলো তোমার—শুনছো—ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন ক'মাস হলো—

কোনও উত্তর না পেয়ে করুণাপতি শেষে নিজেই বললে—পাঁচ-ছ মাসের বেশি নয়।—

বললাম—বরফ যখন নেই, তখন কপালে জলপটি দিতে হবে, আর একটু গরমজলের ব্যবস্থা করতে পার—তলপেটে সেঁক দিলে ভালো হতো—

রামভক্তকে আবার ডাকতে হলো। করুণাপতি বললে—তোমার কষ্ট হলো রামভক্ত—কিন্তু আমি যে বিপদে পড়েছি কী করবে বলো—

সঙ্গে করে মিকশ্চার এনেছিলাম। দিলাম একদাগ খাইয়ে। কোন রকম চোট না লাগলে এমন হবার তো কথা নয়।

একটু পরেই রোগীর যেন বেশ আরাম হলো। দেখলাম ঘুম এসেছে।

করুণাপতি বললে—এবার বাইরে একটু বসবে চলো—তোমাকেও খুব কষ্ট দিলাম—

বাইরের ডেক্ চেয়ারটায় বসলাম। করুণাপতি সামনে টুল নিয়ে বসে আর একটা বিড়ি ধরালে, বাইরে তেমনি অঝোর বৃষ্টি, কল্ কল্ শব্দ করে সামনের রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

করুণাপতি বললে—সেরে যাবে—কী বলো ডাক্তার—

—দেখা যাক্—

করুণাপতি আবার বললে—কপাল, সবই কপাল—এত লোকই তো বিয়ে করেছে—কিন্তু এমন বছর বছর ছেলে হওয়া দেখেছ ভাই—এ যেন ঠিক কাঁঠাল গাছ—আজ বারো বছর বিয়ে হয়েছে, প্রথম দুটি বছর কেবল ফাঁক গিয়েছিল, তারপর সেই যে শুরু হলো, আর থামতে চায় না—নাগাড়ে চলেছে একটানা—কী খেয়ে যে এমন স্বাস্থ্য করেছে কে জানে বাবা, এমন ফলন্ত মেয়েমানুষ আমি আর দেখিনি—অথচ মাসের মধ্যে তো অর্ধেক রাত ঘরেই শুই না, নাইট্ ডিউটি করতে হয়—

মশারির মধ্যে ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

করুণাপতি উঠলো।

ওই বাঁশী বেজেছে—ও নিশ্চয়ই ক্ষেন্তি—করুণাপতি মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে কেমন টান পড়ে মশারির দুটো কোন খুলে গেল।

—দুত্তোর ছাই—এমন জানলে কোন্ শালা বিয়ে করতো—দুহাতে মশারিটা টেনে বাইরে সরিয়ে দিলে করুণাপতি। দেখলাম—গড়া গড়া ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে। একজন আর একজনের ঘাড়ে পা দিয়ে। গুণে দেখলাম দশটি। সাতটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দুটো-তিনটে ছেলে বিছানা বুঝি ভিজিয়ে দিয়েছিল। করুণাপতি সেই ভিজে বিছানার ওপরেই পিঠ চাপড়ে ক্ষেন্তিটার ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলে। ছোটটির বয়েস ৬ মাসের বেশী নয়। করুণাপতির দিকে চেয়ে দেখলাম, ও তো এমন ছিল না আগে, ও কি পৃথিবীর কিছু খবরই রাখে না! আজকালতো কত রকমের উপায় বেরিয়েছে। খবরের কাগজেও তো সে সব জিনিষের বিজ্ঞাপন থাকে।

ঘুম পাড়িয়ে উঠে এল করুণাপতি। আবার একটা বিড়ি ধরালো।

বললে—বিয়ের পর বোঁচা যখন প্রথম হলো, ভাবলাম আর নয়, একটি ছেলে—সামান্য যা চাকরি, একটি ছেলেকে ভালো করে মানুষ করে যাবো—কিন্তু বউ বললে আর একটি মেয়ে হলে হতো।—তা হোক বাস, তোমার যখন সখ, তখন হোক—কিন্তু পরের বছরেই হলো একটা ছেলে—তারপর থেকে

আর কান্নাই পেয়েনি ভাই—তাই বলি বউকে মাঝে মাঝে যে, তুমি কোন বড়লোকের ঘরে পড়লে ভাল হতো—ছেলে মেয়েগুলো অন্ততঃ পেটপুরে খেতে পেতো—এ আমার কাছে এসে শুধু ব্যাঙাচির মতো বাঁচা—একটা ভাল জামা কিনে দিতে পারি না—পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—তারপর যদি বাঁচে, তো লেখাপড়া শেখাবোই বা কেমন করে, আর মেয়ে তিনটের বিয়েই বা দেব কেমন করে ভগবান জানেন—

ফস্ ফস্ করে করুণাপতি বিড়িতে টান দিলে কিছুক্ষণ।

—এদিকে ভাই চাকরিটাও যদি একটু ভদ্রলোকের মতন হতো তো বাঁচতুম—হেড অফিসে মুরুব্বি তো তেমন নেই কেউ—এখন কেবল মাদ্রাজীর রাজত্ব, এই দেখনা ছিলাম বায়গড়ে, দু-পয়সা হচ্ছিল, দিন গেলে কিছু না হোক তিন-চারটে টাকার মুখ দেখতে পেতাম, কারবারী মহাজন দু-পাঁচজন দিত হাতে গুঁজে, ওয়াগণ-ভর্তি মুড়ি বুক হতো, মুড়িও পেতুম, ওয়াগান পিছু চার আনা হিসাবে আবার তা ধর তোমার গিয়ে বেশ ছিলাম সেখানে, মাইনেটায় হাত পড়তো না,—কিন্তু তেলেঙ্গীদের চক্ষুশূল হলো, হেড অফিসের আয়ার সাহেবকে ধরে ভেঙ্কটরাও সেখানে গিয়ে এখন রাজত্ব করছে আর আমায় বদলি করে দিয়েছে বড়মুণ্ডায় এখানে পানটি পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়—দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই—

রামভক্ত এসে বললে—এবার মা ঘুমোচ্ছে—আর কি জলপটি দিতে হবে—করুণাপতি বললে—না থাক্—এবার তুমি একটু বিশ্রাম করগে যাও, রামভক্ত কাল ভোর বেলা থেকেই তোমার তো আবার ডিউটি—

রামভক্ত চলে যাবার পর করুণাপতি বললে—এই রামভক্তকেই দেখনা—বেটা অনেক টাকার মালিক—সুদে খাটায়—এখনও আমার কাছে শতখানেক টাকা পায় বেটা—বিনাটিকিটের প্যাসেঞ্জাররা ছিট্‌কে-ছটকে ট্রেণ থেকে নেমে—এদিক ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, ও গিয়ে ধরে, তা মাসে ওর পঞ্চাশ-ষাট্ টাকা উপরি আয় দেশে বউ আছে, ছেলেপিলের বালাই নেই—টাকা পাঠিয়ে দেয়, আর এখানে একজন জোয়ান দেখে জাতওয়ালীকে রেখেছে সে-ই রান্নাবান্না করে, রোগ হলে সেবা করে .আর রোগ না হলে আরামসে পা টেপায়—

গল্প করতে করতে একটু যেন তন্দ্রার মতন আসছিল, হঠাৎ করুণাপতির ডাকে উঠে বসলাম। যন্ত্রণায় ছটফট করছে রোগী। উঠে ঘরে গেলাম। অবস্থা দেখে বড় ভয় হলো। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। মুখ নীল হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে আসে একবার আর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ, হাতের কাছে আর কোনও ওষুধও নেই। কিন্তু কেন এমন হলো।

বললাম—এখন বিলাসপুরে যাবার কোন গাড়ী আছে করুণাপতি—একটা ওষুধ আনলে হতো—

বৃষ্টির মধ্যেই করুণাপতি দৌড়ে একবার ষ্টেশনে গেল। তখুনি আবার ফিরে এসে বললে—সেই ভোরের আগে তো আর কোন গাড়ী নেই ডাক্তার—কী হবে—

সেদিন সেই রাত্রে মনে আছে, করুণাপতির স্ত্রীকে বাঁচাবার সেকি আপ্রাণ চেষ্টা আমার। যে ওষুধটা দরকার শেষ পর্য্যন্ত সেটা আনানোও হয়েছিল বিলাসপুর থেকে। কিন্তু রোগীর সমস্ত শরীর যেন ক্রমেই নীল হয়ে আসছিল।

করুণাপতি বলেছিল—টাকা থাকলে কি আজ আমার ভাবনা—

বললাম—টাকা দিয়ে কী জীবন পাওয়া যায় নাকি—

করুণাপতি বলে—টাকা নেই বলেই তো এই বড়মুণ্ডায় পড়ে আছি—এখনি যদি হেড অফিসে গিয়ে হাজার খানেক টাকা নিতাইবাবুর হাতে গুঁজে দিতে পারতাম—আর আমার সাহেবকে হাজার চারেক, তাহলে দেখতে ওই ভেঙ্কট-রাওয়ের জায়গায় আমিই গিয়ে বসতাম—বউও বাঁচতো, ছেলেপুলে গুলোকেও খাওয়াতে পরাতে, লেখাপড়া শেখাতে পারতাম—

সেদিন শেষরাত্রে করুণাপতির স্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত মারা গিয়েছিল। সমস্ত শরীরে কী যে একরকম বিষক্রিয়া শুরু হলো, কেমন সন্দেহ হলো আমার। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

সেদিন শোকসন্তপ্ত করুণাপতি আমার হাত দুটো ধরে কী অঝোর ধারে কান্না। বললে—তোমাকে বলেই বলছি ভাই—বউটাকে আমিই মারলাম আজ—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

করুণাপতি বলতে লাগলো—দশটা ছেলেমেয়ের পর একদিন যখন শুনলাম আবার নাকি একটা হবে—তখন ভাই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অষুধ আনালাম একটা—সেইটে খাওয়ার পর থেকেই—

করুণাপতি কথা শেষ করতে পারলে না।

অবস্থা নিজের চোখে তো আমি দেখেছি। তখনও ছেলেমেয়েরা সেই স্বল্প-পরিসর ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, করুণাপতির ছেঁড়া ফতুয়া আর ঘন ঘন বিড়ি খাওয়া, আর ওই নির্বান্ধব নিঃস্ব বড়মুণ্ডা ষ্টেশন—যেখানে ষ্টেশনমাষ্টারকে পয়সা দিয়ে পান কিনে খেতে হয়।

সেদিন যে ডাক্তার হয়েও মিথ্যে ডেথ্ সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম আমি, সে শুধু করুণাপতির মুখের দিকে আর তার অসংখ্য অপোগণ্ডদের দিকে চেয়েই।

কিন্তু সেদিন আমিই কী ভেবেছিলাম, সেই করুণাপতিকেই কয়েক বছর পরে রঙ্গমঞ্চের আর এক দৃশ্যে আর এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবো। কিন্তু অন্য ভূমিকা হলেও চামড়ার নীচের রক্তটাও ছিল দুজনেরই এক জাতের।

আমি সেদিন একটা আলু চুরির মামলায় সাক্ষ্য দিয়ে ফিরছি। যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরালো হয়ে বেধেছে। সিভিল টাউন থেকে বিকেল বেলা ফিরলাম তাজপুর জংশনে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাজপুর একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। আশে পাশে ধানের আর কাপড়ের মিল। বড় বড় চারপাঁচটা শহরতলীর কাছাকাছি শহরতলীর আশে পাশে। দুটো ডলোমাইটের খনি আছে ছ'মাইল দূরে। তারপর আছে চামড়ার কারবার। সিভিল টাউনটাই দেখবার মত। সিমেণ্ট করা রাস্তা, আর একদিকে চলে গেছে ডিহিরির ব্রাঞ্চ লাইন। জি-আই-পি'তে গিয়ে মিশেছে। ঘি, দুধ আর ছানার দেশ। ষ্টেশনের সামনে বুকের পাঁজরার মত অসংখ্য লাইন মাইল দুই জুড়ে পড়ে আছে। কালো গ্র্যানাইট পাথরের ষ্টেশন বিল্ডিং। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়ানদের কলোনী, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাড়োয়ারী, মহাজন, কিছুরই অভাব নেই।

দোতলার ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ওই সব দেখছিলাম।

একজন বেয়ারা এসে বললে--বড় সাহেব সেলাম দিয়া—

—কোন্ বড় সাহেব?

—টিশন মাষ্টার—

ষ্টেশন মাষ্টার। কোন্ সাহেব? তাজপুর জংশনের ষ্টেশন মাষ্টার বরাবরই তো সাহেব। আগে ছিল ম্যাক্‌মারকুইস্, তারপর আসে লি-বেনেট্ তারপর আর কে ছিল জানিনা। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য নিদ্দিষ্ট আরো কয়েকটা ষ্টেশনের মধ্যে তাজপুর জংশন একটা।

বেয়ারা আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—মজুমদার সাব্—

তারক মজুমদার। ওয়ালটেয়ারে ছিল, হয়ত প্রমোশন পেয়ে এসেছে, আমাকে চেনে, একবার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করেছিলাম তার। আমার হতে জীবন ফিরে পেয়েছে।

খস্ খস্ দেওয়া ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখলাম করুণাপতি মজুমদারকে—

বলাই বাহুল্য যে, অবাক হয়েছিলাম, সামনের এ্যাশট্রেতে চুরোটটা রেখে উঠলো করুণাপতি, উঠলো আমাকে অভ্যর্থনা করতে।

সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললে—শুনলাম তুমি এসেছিলে কোর্টে শুনেই তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু খবর পেলাম ওয়েটিং রুমে আরো অনেক

প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সে যা হোক—আজকে থাকছো তো—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে—

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে চক্‌চকে পালিশ করা পেতলের কলিং বেলটা বাজিয়ে দিলে করুণাপতি। বেয়ারা আসতেই হুকুম হয়ে গেল—ডাক্তার সাবকা সামান মেরা বাঙলোমে পোঁছা দেও ঔর পঁয়তালীকে মেরা পাশ ভেজ দেও—

পঁয়তালী এল। করুণাপতি বললে—ডাক্তার সাহেব খাবেন আজকে—বেশ মুখরোচক রাধোঁ দিকিনি কিছু—

আমার অবশ্য অবাক হবারই কথা। টেবিলের সামনে টাই স্যুট্ পরা করুণাপতি। বনাতের টেবিলের ওপর একটুকরো কাগজের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। সিগ্রেটের টিন্ রয়েছে একটা, তার পাশে জলন্ত চুরুট আধখানা। পুরোপুরি সাহেবি কায়দা কানুন। যেন ভিক্টোরিয়ান যুগের রোমান্টিক লেখকের লেখা কোনও উপন্যাসের গল্পের মতন। বিশ্বাস না হবার গল্প।

দু-চারজন মাড়োয়ারী মহাজন ওয়াগন সাপ্লাই নিয়ে কথা বলতে ঢুকলো।

করুণাপতি তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললে। তারপর বললে—চলো যাই।

করুণাপতির সঙ্গে বাইরে এলাম। তখনও দুচারজন পেছন পেছন আসছিল। করুণাপতি বললে—আজ হবে না—কাল সকালে সব এসো—ওয়াগন এসেছে সাত আটখানা—

যেন ক্ষুণ্ণ মনে সবাই বিদায় নিলে।

এ-বাঙলোয় আগে সাহেবরা বাস করে গেছে। সাহেবদের জন্যেই তৈরি। বাঙলোয় ঢুকতেই একজন এসে করুণাপতির হাতের টুপিটা আর গায়ের কোট খুলে নিলে। একটা গোল টেবিলের সামনে বসলাম দু'জনে। বললাম—সাতটায় যে আমার ট্রেন করুণাপতি—

—জানি—করুণাপতি বললে—কিন্তু এ-ও জানি যে তোমার আজ না গেলেও চলবে—

তারপর দুগ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ এলো। করুণাপতি বললে—রাত্রে তোমার জন্যে ভাত না রুটি, কী হবে ডাক্তার—

বড়মুণ্ডা ষ্টেশনের সেই ছোট রেলের খুলিটার কথাই আমার বার বার মনে পড়তে লাগলো। সাত ফুট বাই ছ' ফুট ঘর দুটোর চেহারা এখানে বসে মনে পড়া যেন অন্যায়। কিন্তু ক'টি বছরই বা কেটেছে। এরই মধ্যে কী এমন ঘটেছে যে এমন আমূল পরিবর্তন হতে হয়। যুদ্ধ অবশ্য বেধেছে—যুদ্ধে আমাদের পক্ষে

হারও হচ্ছে বটে—জিনিষ পত্রের দর বাড়ছে এই যা—বাঙলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে—এ দূর দেশে সে খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারা কোথায় সব ? বাড়ীটা যেন বড় নিস্তব্ধ মনে হলো। কোথায় বোঁচা ক্ষেন্তির দল ?

বললাম—ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখছিনে—

—তারা তো কেউ এখানে থাকে না আর—তথাগত এবার ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে ল'তে—ভাবছি ওকে দেব সিভিল সার্ভিসে আর রাতুল তো এবার ফাইনাল এম. বি. দিয়েছে, এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি—আর সেজ ছেলে পল্লবকে দিয়েছি শিবপুরে—আর সবগুলো হোষ্টেলে, বোর্ডিংএ থেকে পড়ছে—জানো তো এখানে থাকলে লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না—তাই......

শুধু বললাম—ভালই করেছ—কিন্তু......

করুণাপতি যেন বুঝতে পারলে আমার মনের কথাটা। বললে—তুমি ভাবছ ডাক্তার—এ সব কেমন করে হলো—কেমন করে যে হলো—আমিও ঠিক তোমায় বোঝাতে পারব না—সেই যে বড়মুণ্ডা ষ্টেশনে আমার স্ত্রী......খুনই তাকে করলাম বলতে পার—সেই হলো আমার শুরু—সেই স্ত্রী মরার পর থেকেই আমার সময় ভালো হলো ভাই—

তবু বুঝতে পারলাম না—

করুণাপতি বললে—আয়ার সাহেব রিটায়ার করলে আর রস্ সাহেব হলো এসট্যাবলিশ্‌মেণ্টের কর্তা—আর তখন হাতে ছিল বউয়ের গয়নাগুলো। সেই-গুলো সব বেচলাম—কয়েকহাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলাম হেড্ অফিসে—নিতাই বাবুও এখন রিটায়ার করেছে—তখন সেই চেয়ারে প্রমোশন পেয়েছে জগদীশবাবু। লোকটা বরাবর মাতাল জানতাম—সোজা একেবারে বাড়ীতে নিয়ে গেলাম দুটি আসল মাল—বোতলের চেহারা দেখেই চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো জগদীশ বাবুর—

করুণাপতি থামলো,—

বললাম—তারপর—

—তোমাকে বলেই বলছি—আর কাউকে তো এসব বলাও যায় না—তা'ছাড়া যত সহজে বলছি—জিনিষটা তো অত সহজও নয়—কিন্তু আমার যে তখন সঙ্গীণ অবস্থা, হয় এস্পার নয়তো ওস্পার—শেষে যে কী করে কী হলো—চাকা আমি গড়িয়ে দিলুম—আর সেও গড়িয়ে চলল,—নইলে সেই জগদীশবাবু যে আগে দেখা হলে কথাই বলতো না—এক গ্লাসের বন্ধু হয়ে গেলাম—আর শুধু কি তাই সেই বাঘের বাচ্চা রস্‌সাহেব, যাকে দেখলেই ভয় হতো, শেষকালে সে-ও নেশার ঝোঁকে কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে লাগলো।—

করুণাপতি গল্প বলে আর থামে একটু।

কেমন করে করুণাপতি বড়মুণ্ডা থেকে বদলি হলো নবাবগঞ্জে, সেখানে দিন গেলে তিন-চারটে টাকা হতো—সেখান থেকে বদলি হলো ভাটাপাড়ায়—সেখানে দিন গেলে গড়ে পঞ্চাশ-ষাট টাকা—তারপর যুদ্ধ শুরু হলো। সেখান থেকে বদলি নাইনপুরে, তারপরে বিলাসপুরে, তারপর টাটানগরে, তারপর এই আজপুরে। দিন গেলে এখানে তিনশো-চারশো টাকাও হয় কোনও কোনও দিন। এক-একটা ওয়াগন পিছু দুশো-তিনশো করে ঘুষ।

করুণাপতি বললে—গয়না বেচে সাতহাজার টাকা দিইছি বটে, দু'জনকে—সেটা ঘুষই বলতে পারো—কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ আসলে ভাগ্য—কই, কত লোকই তো এমন ঘুষ দেবার জন্য তৈরী—কিন্তু ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া কী অতই সহজ—

করুণাপতি আবার বললে—এই দেখ না, আড়াইশো টাকা তো মোটে মাইনে পাই মাস গেলে, কিন্তু দশটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার পেছনেই মাসে সাতশো টাকা পড়ে যায়—তারপর আজকালকার বাজারে হোস্টেল বোর্ডিংয়ের খরচটা ভাবো একবার—তা রস্ সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—বছরে বড়দিনের সময় পঁচিশ হাজার টাকা মেমসাহেবের কাছে দিয়ে আসি—কখনও আমায় বদলি করবেনা এখান থেকে—আর দেবার মধ্যে একটা জিনিষ দিতে হয়েছে—জেনারেল ম্যানেজারকে একখানা নতুন ক্যাডিলাক্—কাজটা একেবারে পাকা করে নিয়েছি ভাই—

বাইরে অন্ধকার হয়ে এল, সামনের বাগানটায় অনেক ফুলের বাহার।

কথাবার্তার মধ্যেও কয়েকজন মহাজন দেখা করে গেল, সকলের একই বক্তব্য, ওয়াগন যে কোনও প্রকারে ওয়াগণ চাই। করুণাপতির বাড়ীতে কয়েক-ঘণ্টা বসে মনে হলো পৃথিবীতে বুঝি মানুষের একটি মাত্র পরমার্থ কাম্য—তা' হচ্ছে ওয়াগন। ওয়াগনের যে এত চাহিদা, এত বাজার দর—তা কে জানতো। এক একটা ওয়াগনের জন্যে দুশো তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়ে যায়। রেলের পাওনা যা তা পরে হবে—আগে তো গেট-ফি দাও, পরে দর্শন।

সন্ধ্যে বেলা করুণাপতি বললে—যে জন্যে তোমায় ডাকা—সেইটে এবার বলি—

করুণাপতি কেমন গলাটা নামিয়ে আনল।

—বড়মুণ্ডা ষ্টেশনে আমার স্ত্রীর বেলায় একবার সেই ভুল করেছিলাম—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওষুধ খাইয়ে বউটাকে তো মেরেই ফেললাম—কিন্তু এবার আর ও রিস্ক নেব না—তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তোমাকে আমি খবর পাঠাতাম—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—তুমি কি আবার বিয়ে করেছ নাকি—

—না বিয়ে নয়, কিন্তু তবু ও ঝঞ্ঝাটে দবকার কী ?

আমি কিছু বলবাব আগেই করুণাপতি ধুতি পাঞ্জাবী পরে নিয়ে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিয়েছে।

চক্‌বাজারেব কাছে এসে একটা বাড়ীব সামনে ট্যাক্সি থামলো। নেমেই করুণাপতি বললে—এসো ডাক্তাব—চলে এসো—

মাথা নীচু কবে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। কিন্তু ওপরে উঠে ভারী ভালো লাগলো। করুণাপতিকে দেখে ঝি-চাকব ছুটে এসেছে। করুণাপতি গিয়ে একেবাবে খাটে বসে নির্মলাকে খবর দিতে বলল। সাদা ধবধবে উজ্জ্বল আলো, খানিক পবে নির্মলা এলো।

করুণাপতি বললে—ডাক্তাব, এবই কথা বলছিলাম—

এই সুদূব দেশে বাঙালী মেয়েকে কোথা থেকে সংগ্রহ কবলে করুণাপতি।

করুণাপতি বললে—এমন ওষুধ দেবে ডাক্তাব যাতে স্বাস্থ্যেব কোন ক্ষতি না হয—কী বলো নির্মলা— আজ তিন মাস মাত্র হযেছে—বেশী ভয়ের ব্যাপার নয়—এ তোমার পাঁচ ছয় মাস নয় যে

নির্মলা আমাব দিকে একবাব ভযে ভয়ে তাকালো। তাব পাণ্ডুব চোখের দিকে চেযে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। চোখেব সামনে নিজের ভাবী হত্যাকাবীকে দেখলে কেমন ভাব হয মনে, বলতে পাববো না। কিন্তু আমাব মনে হলো—চাউনিটা যেন অনেকটা সেই বকম—

করুণাপতি বললে—তাজপুব বড শহব—যা' কিছু ওষুধ পত্তব লাগবে, এখানে তোমায আমি সব যোগাড কবে দিতে পাববো—তাব জন্যে কিছু ভেবোনা —তবে দেখো ভাই আমাব ওই একটা অনুবোধ—এমন ওষুধ দেবে যাতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয—কী বলো নির্মলা—

নির্মলাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে, কিন্তু নির্মলা যেন কাঠেব পুতুলেব মত মুখ নিচু কবে চেযাবেব ওপব স্থিব হযে বসে বইল। সুডোল ফবসা দুটো পা যেন থব থব কবে কাঁপছে মনে হলো।

—তা হলে ওই কথাই বইলো—কাল ওষুধ পত্তব যোগাড কবে একেবারে নির্মলাকে দেখে যাবে—কী বলো—করুণাপতি আবাব বললে।

অনেকদিন আগেকাব সব কথা। তবু স্পষ্ট সব মনে আছে। সেদিন আর ফিবে যাওয়া হযনি, পরদিন বাত্রেব ট্রেনে গিযেছিলাম। করুণাপতির হাজার অনুরোধও আমাকে টলাতে পারেনি। যা' হোক, পবদিন সকালে করুণাপতি

যেতে পারেনি চক্ বাজারের বাড়ীতে। ওষুধপত্র নিয়ে আমি একলাই গিয়েছিলাম। ওর বুঝি হঠাৎ কাজ পড়ে গেল একটা।

নির্মলার সেদিনকার কথাগুলো যেন এখনও আমার কানে বাজছে—

নির্মলা অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলেছিল—আপনাদের দুজনের খুব বন্ধুত্ব বলে মনে হলো—কিন্তু আপনার বন্ধুকে একটা উপদেশ দিতে পারেন না—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কী? কী সে উপদেশ—

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল নির্মলা। আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি—।

তবু বার বার প্রশ্ন করার পর শুধু বলেছিল—না থাক্, উনি বড়লোক, কথাটা ওঁর কানে গেলে ক্ষতিই হবে আমার, মিছিমিছি হয়তো মাঝখান থেকে রেগে গিয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দেবেন—দেশে আমার মা উপোষ করবে, বাবার চিকিৎসা হবেনা, ভাইবোনেদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে—তার চেয়ে আপনি যা' করতে এসেছেন তাই করুণ—

নির্মলার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—তবে কি এতে তোমার অনিচ্ছে আছে?

নির্মলা বলেছিল—আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন কেন তুলছেন—আমার তো স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে নেই—আমার কাছে আমার বাবার চিকিৎসা, মা'র সংসার খরচ, ভাইবোনেদের মানুষ হওয়ার প্রশ্নটাই বড়—থাক কী করতে হবে আমায় বলুন—

দুপুর বেলা ফিরে এসে করুণাপতিকে বলেছিলাম—হলো না করুণাপতি—

করুণাপতি অবাক্ হয়ে গেল।—কেন?

—তিন মাস বাজে কথা—দেখে বুঝলাম ছ'মাস—এখন কোনও রকম রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। জীবন হানি হতে পারে—

—তা'হলে কী হবে? করুণাপতি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—একটা উপায় আছে।

করুণাপতি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

—একটা উপায়, নির্মলা মেয়েটি তো ভালো মেয়ে বলেই মনে হয়, আর তোমারওতো ঘরে স্ত্রী নেই—বিয়ে করো না কেন ওকে—

হো হো করে সাড়ম্বরে হেসে উঠেছিল করুণাপতি, বিয়ে? পাগল নাকি? এতগুলো ছেলের বাবা হয়ে। হো হো করে করুণাপতি সেদিন হেসে উঠেছিল। সেই রাত্রের ট্রেনেই আমি তাজপুর ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

তারপর করুণাপতির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চাকরী থেকে রিটায়ার করে

করুণাপতি কলকাতায় বাড়ী করেছিল। দেখা কচ্চিৎ হতো। একবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম তার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী হেড্ মিস্ট্রেস্ চাই। তেমন হেড্ মিস্ট্রেস্ পেয়েছিল কিনা, সে খবর পাইনি তবে শুনেছিলাম ছেলেমেয়েরা কৃতী হয়েছে।

রাস্তায় ঘটনাচক্রে একদিন দেখা হয়েছিল করুণাপতির সঙ্গে। বললে—ভাল হেড্ মিস্ট্রেস্ পাচ্ছিনা ভাই—তোমার সন্ধানে আছে কেউ?

তারপর বলেছিলো গোটা পঞ্চাশেক ফ্যান কিনবো, মোটা কমিশন দেবে এমন কোন পার্টি আছে—আর গোটা ছয়েক সেলাই-এর কল—

জিজ্ঞেস করেছিলাম—রিটায়ার্ড লাইফ কেমন লাগছে তোমার করুণাপতি?

করুণাপতি বললে—রিটায়ার করলাম কোথায় ভাই—এখন ওই ইস্কুল চালাচ্ছি—তা মাস গেলে ফেলে ছড়িয়ে শ' পাঁচ ছয় থাকে—আর অনারেবল প্রফেসান্ তো বটে—

সেই শেষ দেখা। তারপর বোঁচা কবে তথাগত হলো, ক্ষেন্তী কবে তপতী হলো—সে খবর কানে আসেনি।

বহুদিন পরে এবার কলকাতায় আসাতে 'করুণাপতি বালিকা বিদ্যালয়ে' করুণাপতির জন্মবার্ষিকী উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

সভায় ডায়াসের ওপর বসে ভাবছিলাম পুরনো সব কথা। তথাগতের পাশে ওর ছোট ভাই পরাশর—অনেকটা যেন নির্মলার মতই মুখের আদলটা। তবে শেষ পর্য্যন্ত নির্মলাকে কী বিয়ে করেছিল করুণাপতি? কিম্বা......কিম্বা...... কিন্তু সে কথাটা কল্পনা করতেও কেমন লজ্জা হলো।

তা' হোক—করুণাপতি আসলে যাই হোক, পৃথিবী হয়ত তাকে মহাপুরুষ বলেই একদিন জানবে। আমি নগন্য ডাক্তার—আমি চিরকাল বাঁচবো না। করুণাপতির কলঙ্কময় ইতিহাসের সব সাক্ষ্য যখন একেবারে মুছে যাবে—তখন আমিই বা কোথায়? কোলকাতার কোন বড় রাস্তা হয়ত করুণাপতির নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। ভেজাল ঘি-তেল খাইয়ে যারা লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের কত মর্মর মূর্তি কলকাতার রাস্তায় পার্কে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা। তবে মাঝখান থেকে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হয়ে থাকি। আগামীকালের স্কুলের ছাত্ররা হয়ত পাঠ্যপুস্তকের পাতায় হয়ত করুণাপতির জীবনী পড়ে নতুন আদর্শ গ্রহণ করবে—তাতে আমি বাধা দেবার কে?

কী জানি কী যে হলো, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও বললাম—"করুণাপতিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনতাম, করুণাপতি ছিলেন সত্যিকার করুণাপতি, সদাশয়, মহৎ, মহাপ্রাণ পুরুষ। অতি ছোট অবস্থা থেকে কেবল-

শুধু পুরুষকার, আত্মবিশ্বাস ও কর্মনিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে তিনি বড় হয়েছিলেন—তাঁর জীবনে অসত্যের বা মিথ্যার কোন স্থান ছিল না। তাঁর জীবন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সত্যের জয় একদিন অনিবার্য্য—সত্যনিষ্ঠ মানুষ একদিন স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই। বহুদিন আগে বহুবার করে বহু মহাপুরুষ ওই এক কথাই বলে গিয়েছিল। বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী, তাঁরা যা বলে গেছেন—করুণাপতি নিজের জীবন দিয়ে তা-ই কাজে পরিনত করে গেছেন—করুণাপতি বার বার বলতেন,—'ফাঁকি দিয়ে কিছু লাভ হয় না'—মহাপুরুষের এই বাণীই করুণাপতিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখবে—"।

তিলক কামোদ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

(১৯১২)

বেতারে থেমে গেছে ওস্তাদ মক্‌বুল হোসেনের শানাই বাজনা। তবু ঐ তিলক কামোদ রাগিণীর ঝংকার যেন এখনও কানের পর্দায় কাঁপছে। আর কাঁদছে। এমন মিঠে তিলক কামোদ যে শোনার মত শুনতে পেলে কান্না পায়।

আজ মক্‌বুল হোসনের তিলক কামোদ বাজানো শুনে দু জন গাইয়ের তিলক কামোদ গাওয়ার কথা মনে পড়ল।

তাঁদের একজন ছিলেন আমাদের পাড়ার গগন খাজাঞ্চি। দিদিমার একমাত্র নাতি; মরবার আগেই নাতিকে দিদিমা তাঁর বেশ কিছু নগদ টাকা আর বসত-বাড়িখানা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেন নি গগন খাজাঞ্চি, গানচর্চার ব্যাঘাত ঘটবে বলে।

দিদিমা মারা গেলে পর বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দোতলায় একা থাকতে লাগলেন গগন খাজাঞ্চি। দিদিমা-হীনতায় তাঁর বরং সুবিধাই হল গানচর্চার। বাড়ির উল্‌টো দিকে একটা ছোট্ট হোটেল ছিল, তার নাম "ভোজন-ভাবতী।" সেই ভোজন-ভাবতী থেকে দু বেলা ভাত মাছ ডাল তরকারি আসত, আর ভোরে বিকেলে চা আর টোস্ট আসত ঐ হোটেলেরই রেস্তোরাঁ বিভাগ থেকে। সুতরাং বাড়িতে ওসবের কোন হাঙ্গামাই ছিল না, ঝামেলার ভেতর মাসের শেষে বিল চুকিয়ে দেওয়া। তার জন্যে চেক-বই ছিল, তা থেকে চেক কেটে সই করে দিলেই হল।

অনেক দিন ধরেই আমাদের পাড়ায় "গাইয়ে" নামে তিনি এক ডাকে বিখ্যাত। পাড়ায় যখনই বারোয়ারী উৎসব কিছু হত—বিশেষ করে পূজোর সময়—আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইতেন গগন খাজাঞ্চি। তবলা, তানপুরো, হারমোনিয়াম সব তাঁর নিজের। এগুলো যাঁরা বাজাতেন তাঁরাও তাঁর নিজের লোক, পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হলে তিনি নিজেই দিতেন।

আমাদের পাড়ার নিমাই হালদার ছিলেন কালোয়াতি গানের বড় সমঝদার। তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গাইতেন গগন খাজাঞ্চি। আরও অনেক গাইয়ে।

তিলক কামোদ রাগিণীটাই তাঁর বেশী প্রিয় আর বেশী রপ্ত ছিল। চোখ বুজে গাইতেন "নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ সখিরি"—ওগো সখি, কেমন করে

জলের ঘাটে জল ভরতে যাব, পথের মাঝে যে শ্যাম নটবর ভারি নট-ঘট শুরু করেছে, ইত্যাদি।

এ গান যখনই শুনতেন গগন খাজাঞ্চির মুখে, নিমাই হালদার বলতেন, "আহা, এমন গান আর হয় না। বলিহারি, বলিহারি গগন, বলিহারি। চক্রপাণি ভট্‌চাযিব কাছে তালিম পেয়েছিলে বটে।"

কিন্তু পাড়ার আর সবার মতে নিমাই হালদারের এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। তাঁদের মতে গগন খাজাঞ্চি যে একেবারে যাচ্ছেতাই গাইয়ে তা অবশ্য নয়, কিন্তু তাঁকে এমন কিছু আহা মরি গাইযেও বলা যায় না। বড় জোর চলনসই। তা ছাড়া নেহাৎ পাড়ার লোক বলেই খাতির করে তাঁর গান শোনা, নইলে তার গান শোনবাব মত তেমন আব কি?

সে বার পাড়াব বারোয়াবী সরস্বতী পুজোয় বেশ ভাল চাঁদা উঠল। ঠিক হল গানের জলসা করা হবে দু দিন—এক দিন হবে ক্লাসিক্যাল মানে উচ্চাঙ্গ গান, অন্য দিন মডার্ন অর্থাৎ আধুনিক গান। বিখ্যাত খেয়াল আর ঠুংরি গাইয়ে ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবেব ভাইপো জুল্‌ফিকার খাঁ তখন এ শহরে রয়েছেন। বয়স তাঁর তেমন বেশী নয়, কিন্তু ওস্তাদী নাম ডাক বেশী। আমাদের পুজো কমিটির আমোদ-প্রমোদ শাখার সম্পাদক নীলাদ্রি দস্তিদার বললেন, "এবারের আসরে ওস্তাদ জুলফিকার খাঁকে আনা দরকার। দুর্দান্ত গাইছে আজকাল। দক্ষিণাও বেশী নয়, মাত্র তিন শ টাকা। ওর মত গুণীর পক্ষে এ কিছু নয়।"

"তা হলে আমাদের গগন খাজাঞ্চি কি দোষ করলে। তাকেও দক্ষিণা দাও।" বললেন দু-একজন গগন-দরদী।

"আচ্ছা, সে যথাসময়ে দেখা যাবে।" বললেন নীলাদ্রি দস্তিদার। শুনে বোঝা গেল আচ্ছাও নয়, যথাসময়ে ভেবে দেখাও হয়ে উঠবে না।

তা যাই হোক, গানের রাত্রে দলবলসহ এলেন তরুণ ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। বিখ্যাত কালোয়াতী যাদুকর সিকান্দার খাঁর ভাইপো। তিন শ টাকা তিনি আগাম নিয়ে নিলেন। তারপব গান ধরলেন। দু ঘণ্টা গেয়ে উঠলেন তরুণ খাঁ সাহেব। আর এক জায়গায় গাইতে হবে, সেখান থেকেও আগাম টাকা নিয়ে রেখেছেন।

খাঁ সাহেব উঠে যাবার পর গাইতে বসলেন আমাদের পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। শ্রোতাদের বেশি ভাগ উঠে যেতে চাইছিলেন। অনেক করে তাঁদের বসানো হল। বিরক্ত মুখে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে বসলেন তাঁরা। বললেন "খাঁ সাহেবের গানের পরে গগন খাজাঞ্চির গান। কিসের পরে কি।"

জমল না। জমল না গগন খাজাঞ্চির গান। তিনি গাইলেন তিলক কামোদ, নিমাই হালদারের ফরমায়েশ: "নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ সখিরি।" শুনতে শুনতে আমার দু চোখ জলে ভরে উঠল। ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখলাম আমারই মত অভিভূত হয়ে উঠেছেন নিমাই হালদার, চোখের জল মুছছেন কোঁচা বুলিয়ে। শুনলাম মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, "বেঁচে থাকো গগন। এমন গান আর হয় না।"

কিন্তু আসর জমল না। গগন খাজাঞ্চির গান থামতে দেখা গেল আসর তার আগেই চার ভাগের তিন ভাগ ফাঁকা হয়ে গেছে। ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র জুলফিকার খাঁর গানের পর চক্রপাণি ভট্চার্যের শিষ্য গগন খাজাঞ্চির গান প্রতিবেশীদের ভাল লাগে নি। আলোচনা শোনা গেল: "খাঁ সাহেবী তালিম হল গিয়ে আলাদা চিজ। জুলফিকারের ধাক্কা গগন সামলাতে পারবে কেন।"

এর কিছুদিন বাদে পাড়ায় আরেকটি আসর বসেছিল গান-বাজনার। জুলফিকার খাঁকে আনা হল। তিনি এবার চাইলেন পাঁচ শ টাকা। অনেক অনুরোধে কমিয়ে আগাম চার শ টাকায় রাজী হলেন। পাড়ার উদ্যোক্তারা গিয়েছিলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির কাছে। তিনি বললেন, "আমাকে দুশ টাকা দিতে হবে।"

উদ্যোক্তরা বিস্মিত হয়ে বললেন, "কি বলছেন আপনি? জুলফিকার খাঁ সাহেব পর্যন্ত মাত্র চার শ টাকায় রাজী হয়েছেন, আর আপনি দু শো টাকা চাইছেন? ক্ষেপে গেলেন না কি?"

"হ্যাঁ, ক্ষেপেই গেলাম। আমাকে গাওয়াতে হলে আগাম দু শ টাকা দিয়ে যান। তা না হলে আসুন, নমস্কার।" বললেন গগন খাজাঞ্চি। ফিরে গেলেন উদ্যোক্তারা খাজাঞ্চিব ধৃষ্টতার কথা ভাবতে ভাবতে।

খবরটা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। বিপিন চাটুয্যে, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ভট্চার্যি, দীপেন শাসমল প্রমুখ পাড়ায় যারা গানের সমঝদার বলে খ্যাত, তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির আশ্চর্য ধৃষ্টতার কথা ভেবে।

"লোকটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।" বললেন তিনকড়ি গাঙ্গুলী। "বামন হয়ে চাঁদের নাগাল পেতে চায়।"

মাথা খারাপ হয়েছিল কিনা জানি না, এবপর শোনা গেল বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সোজা কাশী চলে যাচ্ছেন গগন খাজাঞ্চি। সেখানেই বিশ্বেশ্বরের চরণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। বাকী জীবন মানে হয় তো অনেক বছর, কারণ

গোঁফ আর দাড়ি দুইই রাখতেন বলে বয়স তাঁর একটু বেশী মনে হলেও চল্লিশের খুব বেশী ছিল না।

চলে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। দুঃখ পেলাম আমি—ওঁর ঐ তিলক কামোদের গানখানা আমার কানে বড় ভাল লেগেছিল। নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ—আহা হা।

মন হয় তো নিমাই হালদারেরও খারাপ হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি গান শোনা ছাড়লেন না। জুলফিকার খাঁ ভাল গায়, এ কথা তিনি অস্বীকারও করলেন না। ক্রমে বিপিন চাটুয্যে, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ভট্‌চার্যি, দীপেন শাস্‌মল —এদের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করলেন জুলফিকার খাঁর সঙ্গে গগন খাজাঞ্চির কোন তুলনাই হতে পারে না। নিতান্ত গেঁয়ো যোগী বলেই অ্যাদ্দিন ভিখ পেয়েছিল।

গগন খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই হল নিখিল ভারত বৈজুবাওরা সংগীত সম্মেলন—বিখ্যাত গায়ক ৺বৈজুবাওরার পুণ্য স্মৃতি মাথায় নিয়ে। পাড়ার গান-প্রিয়রা দল বেঁধে গেলাম গান শুনতে। সম্মেলন মাত করে দিলেন এলাহাবাদের সঙ্গীত-সিংহ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। যেমন দাপটী, তেমনি লয়দার, তেমনি দরদ-ভরা, তেমনি সুরেলা। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই। রীতিমত গানের যাদুকর। ক্ষণজন্মা পুরুষ।

একদিন খাঁন বাহাদুর মির্জা আলি সাহেবের বাড়ির চারতলায় আমরা খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া মোলাকাৎ করতে গেলাম। খাঁ সাহেব খাঁন বাহাদুরের অতিথি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদেরই পাড়ার রায় সাহেব করুণাসিন্ধু মিত্তির। তিনি মির্জা আলি সাহেবের পরম দোস্ত। মির্জা আলিই ব্যবস্থা করেছিলেন খাঁ সাহেবকে যাতে আমরা একান্তে পাই, অন্য লোকের উপস্থিতির বাধা না থাকে।

সংগীত-সিংহ কি কঠোর সাধনা করে তবে সিংহ হয়েছেন তাই তাঁর নিজের মুখে শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। বিদায় নিয়ে আসবার আগে বললেন, "আমার এক ভাগনে আছে তার কথা আপনারা হয় তো শুনেছেন।"

"শুনেছি বটে।" বললেন বিপিন চাটুয্যে, যিনি শহরে বা শহরতলীতে ওস্তাদী গানের কোন বড় আসর পারতপক্ষে বাদ দেন না।

"শুনেছি," বললেন বিপিনবাবু, "তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, প্রকৃতি একটু উদাসী, দিনরাত সুরে ডুবে আছেন, এখনো তাকে আপনি কোথাও বাইরে গাইতে দেন নি, তিনি নিজেও জানেন না তিনি কত বড় গাইয়ে।"

"ঠিক শুনেছেন।" বললেন ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। "গানের

দুনিয়া শুধু জানে আমার এক ভাগনে তৈরী হচ্ছে, জানে না কি অদ্ভুত তৈরী হয়েছে। সে যখন আসরে গাইতে নামবে, তখন বড় বড় ওস্তাদের মুখ বিলকুল চুন হয়ে যাবে। আমাকে যদি ওস্তাদ বলেন তো আমার বয়সে ও হবে ওস্তাদের শাহেন্‌শা।"

"কি নাম ওঁর, ওস্তাদ সাহেব?"

"জানতে পারবেন দু-এক বছরের ভেতর।" বললেন ওস্তাদ সাহেব।

এইবারে বলি ওস্তাদ গুরশান খাঁর তিলক কামোদের কথা। একটু আগে থেকেই শুরু করি।

উক্ত ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে এলাহাবাদে সংগীত সম্মেলন শুন্‌তে চলে গেলেন নিমাই হালদার। সেই সম্মেলনে গাইবেন ওস্তাদ-সিংহ তোফাজ্জল হোসেন খাঁ সাহেবও। তাঁর এক দিনের গান এলাহাবাদের বেতার থেকে হাওয়ায় ছাড়া হল, আমরা বেতারে শুনলাম আমাদের শহরে বসে।

ফিরে এসে পাড়ার সঙ্গীতমোদী সবাইকে চমক লাগিয়ে দিলেন নিমাই হালদার। ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনের আশ্চর্য গান শুনে এসেছেন তিনি।

"কি নাম ওঁর?"

"জানি না। যেদিন গান শুনবেন সেদিনই নামও শুনবেন।" বললেন নিমাই হালদার।

"কবে শুনতে পাব ওঁর গান?"

"শীগ্‌গিরই শোনাব। তারও ব্যবস্থা করে এসেছি। আশ্চর্য ভদ্রলোক এই ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ। তোর চাইতে বেশী আশ্চর্য ওঁর এহ ভাগনে। আপনারা গগন খাজাঞ্চির তিলোক কামোদ শুনেছেন তো—সেই নীর ভবন ক্যাযসে জাউঁ? ঠিক এই গানখানাই শুনবেন তোফাজ্জল হুসেন সাহেবের ঐ ভাগনের মুখে। আকাশ-পাতাল তফাৎ, যাকে বলে হেভ্‌ন্ অ্যাণ্ড হেল্।"

আমরা অধৈর্য। আর তর সইছে না, বুক ফাটছে কৌতূহলে। কৌতূহল শীগ্‌গিরই মিটবে, ভরসা দিলেন নিমাই হালদার।

তার পর একদিন।

শৌখিন মহা-বড়লোক রঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে ঘরোয়া গানের আসর। গাইতে এসেছেন জুলফিকার খাঁ। রঞ্জন চৌধুরী নিমাই হালদারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গান শুনতে এসেছেন শহরের সেরা সেরা সঙ্গীত-বোদ্ধা, সেরা সেরা সংগীতজ্ঞ। আজ সেরা গান শোনাবেন শহরে এখনকার সেরা নামী গাইয়ে

জুলফিকার খাঁ। শোনা গেল ফাউ হিসেবে আর একজন গাইয়েও গান শোনাবেন। শোনা গেল না কে সেই গাইয়ে।

গান ধরলেন জুল্‌ফিকার খাঁ। সঙ্গৎ করলেন তবলচি নিয়ামৎ খাঁ। বাঘা তবল্‌চি, জুলফিকারের চাচার প্রিয়তম দোস্ত। সঙ্গে সারেঙ্গী বাজালে বিখ্যাত সারেঙ্গিয়া ওস্তাদ মন্নু খাঁ। গান থামার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাততালি, কেয়াবাৎ, বলিহারি ইত্যাদির জগাখিচুড়ি। গর্বিত বিনয়ে গোঁফে তা দিলেন জুলফিকার খাঁ। নিয়ামৎ খাঁ বললেন, "শুনলাম আর কে একজন নাকি গাইবেন। এর পর তিনি গাইবেন কি?" কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর, হাসিতে চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত— "এসো কার সাহস আছে এর পর গাইবার। এসো দেখি, গেয়ে কেমন জমাতে পার।"

এইবার উঠে দাঁড়ালেন গৃহস্বামী বঞ্জন চৌধুরীর বন্ধু আমাদের পাড়ার নিমাই হালদার। বললেন, "এ গানের পর অন্য কারও গান গেয়ে জমানো শক্ত। কিন্তু জুলফিকার খাঁ সাহেবের একটু বিশ্রাম দরকার, সেই সময়টুকু ভরবার জন্যে যিনি গাইবেন তাঁকে নিয়ে আসছি।"

নিয়ে এসে বসালেন তাঁকে। পাতলা, মাঝারি গড়নের চেহারা, পরনে পাজামা আর শেরওয়ানী, মাথায় তুর্কী টুপি, দুটি চোখ পুরু ফ্রেমের কালো কাচের চশমায় ঢাকা, গলা ঘিরে উলের মাফ্‌লার জড়ানো, পরিষ্কার কামানো মুখে ব্যথামলিন হাসি লেগে আছে। লোকটি হয় সম্পূর্ণ অন্ধ, অথবা ক্ষীণদৃষ্টি। সম্ভবত: একেবারেই অন্ধ।

"ইনি সম্প্রতি এসেছেন এলাহাবাদ থেকে।" পরিচয় দিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন নিমাই হালদার। "ওস্তাদ গুরগন খাঁ।"

গুরগন খাঁ ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন, "মাফ কিজিয়ে। ম্যায় ওস্তাদ নহী হুঁ, এক মামুলী গাবৈয়া। গাবৈয়া ভি নহী, অভীতক থোড়া হি সীখা ম্যায়নে। আপ লোগ মেরা গানা শুনেঙ্গে, ইয়ে আপলোগোঁকী বড়ী হি মেহেরবানী।

বিনীত প্রার্থনা পরম উদারতা দেখিয়ে মঞ্জুর করলেন ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। নিজের তানপুরো তুলে দিলেন দৃষ্টিহীন অথবা দৃষ্টিক্ষীণ গুরগন খাঁর হাতে, চাচা-প্রতিম নিয়ামৎ খাঁকে হেসে বললেন, গুরগন খাঁর সঙ্গে সঙ্গৎ করতে, ওস্তাদ মন্নু খাঁকে অনুরোধ করলেন গুরগন খাঁর সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাতে। তার পর পরম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে গুরগন খাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে ধূমপান করতে লাগলেন।

কিন্তু গুরগন খাঁ গান ধরতেই সারা আসরে শিহরণ জাগল। গানের মুখ ধরবার কী আশ্চর্য কায়দা। সেরা সেরা সমঝদারেরা তারিফ করে বলে উঠলেন,

"হায় হায় হায়!" সন্ত্রস্ত হয়ে আবার এদিক ঘুরে বসলেন বাঘা ওস্তাদ জুল্‌-ফিকার খাঁ। অনেকে লক্ষ্য করলেন, একটু যেন উদ্বেগের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে; সেই বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব আর নেই। আশ্চর্য সুর, আশ্চর্য লয়, আশ্চর্য মর্দানা অথচ মিঠে কণ্ঠস্বর গুরগন খাঁর। যাকে বলে বুলন্দ আওয়াজ। আর কি চমৎকার বন্দেজ অস্থায়ী অন্তরার।

চোখে চোখে কি যেন ইশারা বিনিময় হয়ে গেল তিন জনের ভেতর—জুলফিকার, নিয়ামাৎ আর মন্নু খাঁ। নিয়ামৎ তবলায় মহা প্যাঁচালো গাইয়ে-জব্দ করা বোল বাজাতে লাগলেন আড়ি কু-আড়িতে। লয়ের লড়াইতে নাকাল করবেন গুরগন খাঁকে। আসরের সবাই এ অশোভন ব্যাপার দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন। গুরগন খাঁর গান মাটি করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে নাকি নিয়ামৎ তবল্‌চী।

গুরগন খাঁ বিনয় করে বললেন, "সীধা ঠেকা বাজাইয়ে ওস্তাদ।"

ওস্তাদ নিয়ামৎ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললেন, "ক্যা আপ নয়া গাবৈয়া হ্যায় খাঁ সাহাব?"

গুরগন খাঁ মৃদু হাসলেন। আনাড়ী গাইয়ে, তবলায় একটু শক্ত বোল বাজালেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, এই বলে তাকে ঠাট্টা করছেন তবল্‌চী নিয়ামৎ। বললেন, "বহুৎ আচ্ছা, বাজাইয়ে য্যায়সী আপ্‌কী মরজী।" বলে বিষম ছন্দের শক্ত লয়ের তেলেনা ধরলেন একখানা:

"তানা ধিৎ তুম দ্রিতানা দেরে না, তানা দেরে না, তানা দেরে না।"

গুরগন খাঁকে লয়ের খেলায় বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেই বেকায়দায় পড়ে গেলেন নিয়ামৎ খাঁ। কয়েকবার শমে পৌঁছতে ভুল করে ফেলে হাস্যাস্পদ হলেন। আহত, অবসন্ন অসহায় ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেমন খেলা করে, নিয়ামাৎ তবল্‌চীকে নিয়ে সেই রকম অবলীলাক্রমে খেলতে লাগলেন গুরগন খাঁ। লয়ের সমুদ্রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে কাটতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন গানু তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ। অনেক তবল্‌চী-জব্দ-করা লয়বাজ কালোয়াত গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে ঝাণ্ডা উঁচা রেখে এসেছেন তিনি, আজকের মত এমন নাকাল কোন দিন হন নি। তাঁর ফরসা মুখখানা লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠল। নিয়ামৎ কিছুতেই ঠিকমত লয়ে আসতে পারছেন না দেখে সাময়িকভাবে গান থামিয়ে আবার তেমনি মৃদু অনুকম্পার হাসি হাসলেন গুরগন খাঁ। নিয়ামৎ খাঁর হাত থেকে বাঁয়া তবলা টেনে নিয়ে বললেন, "দেখিয়ে সাহাব, অ্যায়সে বাজানা।" বলে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন এ তেলেনার সঙ্গে কি ভাবে বাজালে ঠিক মিলবে। বিস্ময়ে 'কেয়াবাৎ' বলে উঠলেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নিয়ামৎ খাঁ।

নিজে গেয়ে গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কী নিখুঁত সঙ্গত আপন হাতে বাজাচ্ছেন গুরগন খাঁ। লয়ের ওপর এমন আশ্চর্য দখল তাঁর তবল্‌চী-জীবনে কমই দেখেছেন নিয়ামৎ। মানে মানে হার না মানলে পরে নাক আর কান দুই কেটে বিদায় নিতে হবে ভেবে নিয়ামৎ বললেন, "গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে ওস্তাদ।" অর্থাৎ অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বোঝা গেল বিষদাঁত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে নিয়ামতের, ওস্তাদ গুরগন খাঁ লয়ের প্যাঁচে তার মত কয়েকটি তবল্‌চীকে একসঙ্গে গুলে খেতে পারেন, একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন নিয়ামৎ। গান-মাটি-করা লয়-লড়াইয়ের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন আসরের সবাই, এইবারে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এইবারে সত্যিকারের সঙ্গীত হবে জমজমাট।

আমি বুঝলাম, আরও অনেকেরই বুঝতে বাকী রইল না এই গুরগন খাঁই সংগীত-সিংহ ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনে, দীর্ঘ গোপন সাধনার পর প্রকাশ্য আসরে গান গাওয়া তাঁর এই প্রথম। এঁর গান শুনে মুখ চুন করে বসে আছেন জুলফিকার খাঁ।

আমাদের পাড়ার যাঁরা ঝাঁক বেঁধে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় একমত হয়েই ফরমায়েস করলেন তিলক কামোদ। বড় মিঠে এই রাগিণী। আর এই তিলক কামোদই গেল বছর আমরা শুনেছি পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির মুখে।

"নীর ভরন ক্যায়সে জাউঁ সখিবি"—চেঁচিয়ে বললেন দীপেন শাসমল, বঙ্কিম ভট্‌চাযি, আরো অনেকে।

ফরমায়েশ রাখলেন গুরগন খাঁ। গাইলেন ঐ গানখানাই। দেখা গেল যেমন বন্দেজে গাইতেন গগন খাজাঞ্চি, খাঁ সাহেবের অস্থায়ী অন্তরার বাণী এবং বন্দেজ সেই একই রকম। শুধু......

"কিন্তু খাঁ সাহেবের কি আশ্চর্য গায়ন ভঙ্গী লক্ষ্য করেছ ?" বললেন আমাদের পাড়ার সমঝদারেরা। "ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের ভাগনে না হয়ে আয় না।"

গানের শেষে তবলচী নিয়ামৎ খাঁ আর সারেঙ্গী ওস্তাদ মন্নু খাঁ পর্যন্ত জুলফিকার খাঁর উপস্থিতি ভুলে গিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন :

"অ্যায়সা তিলক কামোদ কভী নহী শুনা খাঁ সাহাব। কহিয়ে ইয়ে তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহাবকা তালিম হ্যায় না ?"

"খুদাকা মেহেরবাণী, উর—"হাসলেন ওস্তাদ গুরগন খাঁ, কথাটা সমাপ্ত না করেই।

এরপর আমাদের পাড়াতেও কয়েকটা বৈঠকে আমরা গাওয়ালাম ওস্তাদ গুরগন খাঁ সাহেবকে। নিমাই হালদারের একান্ত অনুরোধেই গাইতে রাজী হলেন খাঁ সাহেব। বললেন অবশ্য, "অভীতক কুছ্ নহী সীখা। ক্যা সুনাউঁ ?"

খাঁ সাহেব। খাঁ সাহেব। খাঁ সাহেব। আমাদেব পাড়াব মহামানব হয়ে উঠলেন তিনি। এমন গাইয়ে আব হয না। অতুলনীয়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অভূতপূর্ব। ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁকে অনায়াসে ছাড়িযে যাবেন গুবগন খাঁ। পাড়ার অনেক গাইয়ে কোমব বাঁধলেন গুবগন খাঁকে এখানেই ধবে বাখবেন, আর তালিম নেবেন তাঁর কাছে। এমন ক্ষণজন্মা ওস্তাদকে ছাড়া যায় না।

কিন্তু একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল। ভাঙলেন গুবগন খাঁ নিজেই। তুর্কী টুপি আব চোখের ঠুলি খুলে ফেলে স্বপবিচযে প্রকাশ কবলেন নিজেকে—তিনি গগন খাজাঞ্চি। গুবগন খাঁ তাঁব ছদ্মবেশ মাত্র।

এব পব দিন দশেকেব ভেতবই সবাই বুঝে ফেললেন তাঁব গান আসলে উঁচুদবেব নয। কাশীধামেই সুতবাং ফিবে যেতে হল গগন খাজাঞ্চিকে।

আবাব আসর জাঁকিয়ে বসলেন ওস্তাদ জুলফিকাব খাঁ। বিপিন চাটুয্যে বললেন, "এ হল খানদানী গুণী। ফাঁকিবাজি কদিন টেঁকে ? গগন খাজাঞ্চি কি [illegible] কেং কেং কেং—"

কেরানীদাদুর রূপকথা

বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা)

(১৯১৭)

ছেলেবেলায় আপনারা ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমার রূপকথা শুনেছেন। আসুন, আজ আপনাদের সেই চিরপরিচিত কেরানীদাদুর রূপকথা শোনাই, শুনুন। র‍্যালি ব্রাদার্সের কেরানী ভবতারণবাবু, সারা বালীগঞ্জে 'দাদু' বলে পরিচিত। পঁইতিরিশ বছর একনিষ্ঠভাবে কেরানীগিরি ক'রে, দশ বছর হ'ল প্রায় রিটায়ার করেছেন। বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। দীর্ঘদিনের দশটা-পাঁচটার যান্ত্রিক অভ্যাসটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে যদি দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় ভবতারণবাবু তার বদলে কয়েকটা নতুন অভ্যাস রপ্ত করেছেন। যেমন, ভোরে ফার্স্ট-ট্রামে গঙ্গাস্নানে যাওয়া, স্নান সেরে এসে নিজে বাজার করা এবং বিকেলে গড়ের মাঠে গিয়ে কয়েক মাইল হাঁটা। ভবতারণবাবুকে এ-অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে "দাদু" ব'লেই ডাকে, কারণ তিনি খুব ভাল খোশ-গল্প জমাতে পারেন এবং অত্যন্ত রসিক লোক বলে প্রত্যেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। গড়িয়াহাটা বাজারের প্রত্যেক দোকানদার, আলু-পটল-ওয়ালা, মেছুনী, সব্জীওয়ালী তাকে বিশেষভাবে চেনে, আর বাজারে যান যেসব ভদ্রলোক তাঁরা তো চেনেনই। 'দাদু' যদি দৈবাৎ কোনদিন না আসেন, গোটা বাজারটা যেন ঝিমিয়ে যায়। বাজারেই আমার সঙ্গে দাদুর পরিচয়। এই বাজারেই তাঁর মুখে যেসব টুক্‌রো কথা ও কাহিনী শোনা যায়, তা কোন ঠাকুরদাদার ঝুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দু'একটা টুকরো কাহিনী বলি। বাজারে একদিন বেশ বড়ো সাইজের গালদা চিংড়ী উঠেছে। কে একজন ভিড়ের ভেতর থেকে দাদুকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: "খেয়েছেন এরকম চিংড়ী দাদু?" দাদুকে ঘাঁটালে আর রক্ষা নেই। দাদু বললেন: "এসব ছট্‌কা চিংড়ী হে, ছট্‌কা। একে কি আর গাল্‌দা বলে? গাল্‌দার খোলায় ভেলার মতন ভেসে আমরা সেকালে সাঁতার শিখেছি—আমাকে গাল্‌দা দেখাচ্ছ?" এই রকম, দাদুদের কালে রুই-মাছের ঘাইয়ের চোটে পুকুরপাড়ের বাড়ীঘরদোর নাকি কেঁপে উঠত, আজকাল সেই পুকুরও নেই, রুইও নেই। দুধ-ঘি দাদু স্পর্শ করেন না এখন, কারণ সেই গরুও নেই, দুধও নেই। দাদুর কালে দুধ জ্বাল দিয়ে রাখলে তাতে দেড়-ইঞ্চি পুরু সর পড়ত, আর ঘি খেলে হাতে অন্তত এক সপ্তাহ

গন্ধ লেগে থাকত। একদিন আধুনিক মিষ্টান্নের কথা উঠতে দাদু বললেন: "ঐ যে তোমাদের পয়োধি না কি হে! হুঃ! ঐ কি দই? দই খেইছি আমরা, তোমরা তা চোখেও দেখনি। গয়লা একহাঁড়ি দই দিয়ে গেলে, হাঁড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমরা দই টেস্ট করতাম। হাঁড়িটা খোলার মতন খ'সে যেত, দইটা হাঁড়ির মতন বেরিয়ে আসত। তাকেই বলে দই।" এই রকম অনেক কাহিনী কেরানী-দাদু বলেন, শোনার আগ্রহে বাজারের লোক তাঁকে তাতিয়ে দিয়ে শোনে।

সেদিন একটা প্রলয়কাণ্ড ঘ'টে গেল বাজারে। রোজকার মতন দাদু বাজার করতে এসেছেন, বাড়িতে জামাই এসেছে ব'লে একটু স্পেশাল বাজার ছিল। জিনিসপত্তরের দাম ভয়ানক চড়া, সুতরাং কিনতে কিনতে দাদুর মেজাজটাও চড়ছিল। রোজই তিনি কেনেন, কিন্তু আজ একটু বেশী কেনাকাটার জন্যে গোড়া থেকেই তিনি চটছিলেন। মাছ আর আলু কিনেই পাঁচ টাকা থেকে সিকে পাঁচেক বেঁচেছে। তাই দিয়ে অন্য সব শাকসব্জী কেনা সারতে হবে, তার ওপর দই-মিষ্টি তো আছেই। ব্যাপারটা লাগল ঝিঙে নিয়ে। তার ঠিক আগেই অবশ্য কাঁচকলা নিয়ে এক পর্ব হয়ে গেছে। দশ পয়সা জোড়া কাঁচকলা দেখে দাদু বলেছিলেন: "এই কাঁচকলা দশ পয়সা জোড়া?" তাতে নাকি কলাওয়ালা খেঁকিয়ে বলেছিল: "কাঁচকলার কি চেনেন আপনি?" গরম তেলে লঙ্কা পড়ল যেন। দাদু ক্ষেপে গেলেন, বললেন: "সত্তর বছর বয়সে কাঁচকলা চেনাচ্ছ আমাকে, কানটি ধ'রে বাজার থেকে বার ক'রে দেব।" এই নিয়ে বেশ এক ঝাপ্‌টা হয়ে গেল, তারপরেই ঝিঙের পালা এল। পাকা বুড়ো ঝিঙে ছয় আনা সের দেখে দাদু বলেছিলেন: "পেকে ঝুনো হয়ে গেছে, এই ঝিঙে ছ' আনা?" ঝিঙেওয়ালা ফাটা চোঙার মতন গলায় আওয়াজ ক'রে বললে: "বুড়ো মানুষ! কচি ঝিঙে চিনবেন কোত্থেকে? এই ঝিঙে ঝুনো? একেবারে কচি, এখনও দাঁত গজায়নি বাবু।" "আবার রসিকতা হচ্ছে" ব'লে দাদু ফিউরিয়াস হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে বাজারের লোক ঝিঙের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দাদুকে সকলেই চেনে। দাদু এর মধ্যে একগোছা ঝিঙে হাতের মুঠোয় তুলে ধ'রে রীতিমত বক্তৃতা শুরু ক'রে দিয়েছেন। বাজারের সীমানার বাইরে ফুটপাথে পর্যন্ত কয়েক-শ' লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

ঝিঙের ঝুঁটি ধ'রে দাদু বলছেন: "এই ঝিঙে ছ' আনা সের? হচ্ছে কি দিন দিন? গরুর খাদ্য, তাই ছ' আনা। কাঁচকলা দশ পয়সা, ডাঁটা দু' আনা, আলু বারো আনা, পটল বারো আনা, মাছ তো তিন সাড়ে তিনের কম

গেই,—এটা কি বাজার, না, কসাইখানা? আগেকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। টাকায় ষোলটা ইলিশ মাছ কিনেছি, বললে তো গাঁজাখুরি রূপকথা ভাববেন। কলকাতাতেই টাকায় চারটে ইলিশ দেদার বিক্রী হয়েছে। অত কথায় কাজ কি? এই কলকাতাতেই আট-নয় বছর আগে বাজারে দশ-বারো আনার বেশী কোন মাছের সের ছিল না, মাংস ছিল দশ আনা, আলু ছ' পয়সা, বেগুন দু' আনা, পটল তিন আনা, ঝিঙে ছ' পয়সা, কাঁচকলা এক পয়সা জোড়া, চার আনা দুধ, দেড় টাকা ঘি। এ তো আর সেকালের রূপকথা নয়, সেদিনকার বাজার দর। আর আজ? আজ এমন হয়েছে যে, এই চল্লিশ একচল্লিশ সালের কথাই আমাদের কাছে ঠাকুরদাদার রূপকথা ব'লে মনে হয়। একটা টাকার বাজার করলে একজন জামাই কেন, হাফ-এ-ডজন জামাই খেয়ে ফুরুতে পারত না। আর আজ বাড়িতে একটা জামাই এসেছে মশাই, পাঁচটা টাকা নিয়ে এসেছি, থৈ পাচ্ছিনে। "সেকালে দশটা টাকা খরচ করলে যে কেউ ভাল ক'রে বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করতে পারত—আজ একটা জামাই খাওয়াতেই বিশ টাকার ধাক্কা।"

কেরানী-দাদু বক্তৃতার মধ্যে যে এতটা সিরিয়াসলি বাজার দরের কম্প্যারেটিভ স্টাডি করবেন, কেউ তা ভাবতে পারেন নি। শুনে সকলের যেন সম্বিৎ ফিরে এল হঠাৎ। সকলেই জানে, চার টাকা মণ চাল ষোল টাকা দিয়ে খাচ্ছে, দশ পয়সা সের ডাল বারো আনা, সাত আনা সের সরষের তেল দু' টাকা দশ আনা, তাও সরষের নয় শেয়ালকাঁটার তেল, চার আনা সের দুধ এক টাকা, তাও অর্ধেক জল, আট আনা সের মাছ তিন টাকা, আট আনার কয়লা দু' টাকা, এমন কি তিন আনার আদা আড়াই টাকা। তবু যেন চেতনা নেই কারও, সবাই যেন আমরা কচ্ছপ হয়ে গেছি। মধ্যে মধ্যে বাজারে ও রাস্তাঘাটে মেজাজটা হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু সেটা যে তেল বা মাছের জন্যে তা কেউ বোঝে না। দাদুর বক্তৃতায় সকলের চাপা বেদনা যেন ভাষা খুঁজে পেল। সমর্থন ও সহানুভূতির বন্যায় দাদু প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম হলেন। সকলে বললে: "বাস্তবিক! এই তো সেদিনের কথা! অথচ আজ শুনলে মনে হয় যেন অশোক বা আকবরের আমলের কথা শুনছি, নিছক রূপকথা ব'লে মনে হচ্ছে। নিজেদেরই যদি তাই মনে হয়, তাহ'লে ছেলেমেয়েদের কাছে এগুলো রূপকথা ছাড়া কি?"

দাদু সোজা ফুটপাথে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাঁর সমর্থকের ভিড়। একজন বললেন: "গড়পড়তা প্রায় ছয় গুণ সব খাবার জিনিসের দাম বেড়েছে, রোজগার বেড়েছে কত?" আর একজন বললেন: "কেন? মাগ্‌গী ভাতা?"

দাদু বললেন: "আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। এই ক'বছরে সংসারের ছেলেপিলে বাড়েনি? তিনটে ক'রে গড়ে তো প্রত্যেক সংসারে বেড়েছে। তার খরচটা ধরছে কে? সুতরাং তোমাদের ঐ সব স্ট্যাটিস্টিক্স আর ফ্যামিলি বাজেট, সব ভুল।" সকলে হেসে ফেলল। "পয়সা শর্ট প'ড়ে গেল, আবার বাজারে আসতে হবে"—বলে দাদু হন্ হন্ ক'রে ঘরমুখো চললেন।

কেরানী-দাদুর রূপকথা এখানেই শেষ হ'ল। বাজারের কাঁচকলা, ঝিঙে যা ছিল সব বিক্রী হয়ে গেল। হবে না? খাবার লোক বেড়েছে কত কলকাতায়?

নৈশ পর্ব

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৯১৮)

দীনবন্ধু দাদামশাই বললেন, পূজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?

জবাব দিলাম, দার্জিলিং।

—কেমন লাগল?

—বিশ্রী।

—বিশ্রী কেন? শুনেছি সে এক আশ্চর্য জায়গা। পাহাড়, মেঘ, পাইনের বন, পাগ্‌লা ঝোরা, ম্যাল্ রোড্, জলাপাহাড, বার্চ হিল, ভিক্টোরিয়া ফল্‌স, লেবং—টাইগারহিলে সূর্য ওঠা—

আমি বললাম, সব বাজে। কন্‌কনে শীত, বিশ্রী বিষ্টি, পাহাড় ভাঙতে দম আটকাবার উপক্রম, আর সব চাইতে বিশ্রী কলকাতার নকল সবাবি, ম্যালের বেঞ্চিতে দল বেঁধে হাঁ করে বসে স্বাস্থ্যলাভের করুণ-চেষ্টা—

দাদামশাই গড়গড়ায় টান দিয়ে বললেন, হুঁ, চটেছ বলে বোধ হচ্ছে। কপোত-কপোতীর আনন্দভ্রমণটা তা হলে পূজোয় তেমন জমে ওঠেনি, কী বলো?

—মোটেই না।

একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে দাদামশাই বললেন, আরে ভায়া, এতো জানা কথা। তোমরা কি আর সত্যিকারের পাহাড়ে বেড়াতে জানো। তোমরা যাও প্রকৃতির ওপরে মানুষ কতখানি একহাত নিয়েছে তাই দেখতে। ওতে কি আর রস পাওয়া যায়? হ্যাঁ হিমালয়ে বেড়িয়েছেন কালিদাস। যেখানে 'মন্দাকিনী শীকরনির্ঝরাণাং বোঢাঃ মুহু কম্পিত দেবদারু—,' যেখানে 'বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগা' দেখে অকাল-সন্ধ্যা মনে করে 'যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং', যেখানে দেবধূপ আর মৃগনাভির গন্ধে—

বাধা দিয়ে বললাম, দাদু, এও সত্যি নয়। কালিদাসও পাহাড়ে সত্যিকারের বেড়াননি, যা করেছেন সেটা মানস-ভ্রমণ। মন্দাকিনী শীকর বায়ুতে কম্পিত দেবদারু কোথাও দেখতে পাইনি, আর পাহাড়ী অপ্সরী যাদের দেখলাম, তাদের পূর্ণিমার চাঁদের মতো লেপা-পোছা গোলগাল মুখ, কানে আড়াইসেরী গিল্টির গয়না, গলার খাঁজে খাঁজে ময়লা, গায়ে বোট্‌কা গন্ধ—

দাদু নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, থামো বঞ্জন, থামো। আচ্ছা ভায়া,

একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি তো বই-টই লেখো, তোমাদের হালের বইতে গলার খাঁজের ময়লা আর গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ছাড়া আর কি কিছু তোমরা খুঁজে পাওনা? একটা বাঁকা-আধখানা-দৃষ্টি নিয়ে জগৎটাকে দেখতে গিয়ে তোমরা একেবারে সব কিছুই নোংরা করে ফেলেছ!

আমি বললাম, দাদু, আপনি সেকেলে। আপনার মনটা পঞ্চাশ বছর আগে পড়ে আছে। নইলে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম, অনেক ভালো ভালো জিনিস বোঝাতে পারতাম। আধুনিক জীবন, আধুনিক সাহিত্য এবং আধুনিক দৃষ্টি—

পরাস্ত ভঙ্গিতে দাদু হাত তুললেন, বললেন, আর না, রক্ষা করো দাদা। আমরা দণ্ডধর চূড়ামণির দণ্ডাঘাতে জর্জরিত হয়ে কালিদাস পড়েছি, সেকেলে কলেজী মাষ্টারদের কাছে পড়েছি সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তোমাদের সঙ্গে তর্কে আমরা পারব কেন? তোমরা বলবে, আমরা ফুল্‌স প্যারাডাইজে বাস করি। তা আমাদের সেই ভালো—গলার খাঁজের ময়লায় ভরা বুদ্ধিমানের নরকের চাইতে আমাদের বোকার স্বর্গ নেহাৎ মন্দ জিনিষ নয়। সুতরাং ওসব থাক। যা বলছিলাম—আনন্দ-ভ্রমণটা তাহলে এবার আর জমল না?

বললাম, নাঃ। শুধু কতকগুলো টাকাই জলে গেল।

দাদু বললেন, তা তো যাবেই। ভায়া তোমাদের একালে সব বদলেছে—তোমাদের একেলে প্রেমের রং একেলে মেয়ের ঠোটের বিলিতী রংয়ের মতো—একটা চুমু খেলেই ফিকে মেরে আসে।

আমি আপত্তি করলাম, দাদু ভালগার হয়ে যাচ্ছেন—

দাদু বললেন, আরে ধ্যাৎ। কলমের ডগায় তোমরা ন ভূত ন ভবিষ্যতি যা খুসি তাই লিখবে, আর আমরা বুড়োরা একটু সোজাসুজি বললেই তা হয়ে গেল ভাল্‌গার। বাইরে ফিন্‌ফিনে ভদ্রতা, আর লেখবার সময় একেবারে আস্তাকুঁড় উজোড় করবে বসে বসে। আমাদের মনে মুখে এক—ওসব জোচ্চুরির কারবার নেই।

—এ একেবারে বিশুদ্ধ গালাগালি হচ্ছে দাদু—এটা আন্‌-পার্লামেণ্টারী।

—ওঃ বাবা! আচ্ছা, প্রত্যাহার করা গেল। কিন্তু কথাটা বলছিলাম এই, তোমরা আজকাল স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবার জন্যেও ছশো মাইল দূরে দৌড় দাও। মধুচন্দ্র যাপন করতে হয় পুরী চলো, নইলে ওয়ালটেয়ার, নয় সিমলা, নতুবা কাশ্মীর। আরে, প্রেম কি আর স্থান কালের অপেক্ষা রাখে? খাঁটি ভালোবাসা থাকলে ধাপ্‌ধাড়া গোবিন্দপুরেও তোমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অভিনব স্বর্গলোক করিবে রচন'। তা তো নয়—যে-রেটে ছুটোছুটি

বলছি, তাতে মনে হচ্ছে হনিমুন করবার জায়গা পৃথিবীতে তোমাদের আর মিলবে না, একেবারে পরলোক প্রস্থান করতে হবে।

—হুঁ, কথাটা ভাববার মতো।

—তার চাইতে আমাদের কালের গল্প শোনো। আর কার গল্প? আমার, আর তোমার দিদিমা বজ্রতারা, মানে তারার। আমাদের এই বাড়ী, সামনের এই খাল, পেছনের এই বাগান—এতটুকু জায়গা বরিশালের এতটুকু ছোট এই গ্রামে প্রেম কেমন ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে, সেটা শুনলে মস্ত একটা শিক্ষালাভ করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে এও বেশ বুঝতে পারবে যে অমন পাগলের মতো প্রেম করার জন্যে হিল্লিদিল্লি মথুরা ছুটে বেড়াবার কোনো মানে হয় না।

সামনে খালের ঘোলা জলে জোয়ার এসেছে, কচুরি পানাগুলো পাক খাচ্ছে সেখানে। ভিজে বাতাসে বাগানের সুপুরি গাছগুলো দুলছে চামরের মতো। কোথায় একটা দোয়েল শিস্ দিচ্ছে অনবরত। দাদুর পাকা চুলে সোনালি রোদ পড়েছে, গড়গড়ার ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে।

আমি ঘন হয়ে এগিয়ে বসলাম। দাদুর চোখ দুটি তখন স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে।

দাদু সুরু করলেন:

জানোই তো, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সর্দা আইন ছিল না। আট বছরের মেয়ে আর বারো বছরের ছেলে—দাম্পত্য জীবনটা বেশ কিছুদিন রাক্ষস-নীতিতেই চলেছিল। ভেংচি কাটা, চুলোচুলি, আঁচড়, কামড় ইত্যাদির পর্ব শেষ করে যখন যৌবন নিকুঞ্জে পাখী ডাকতে সুরু করলে, ঘটনাটা ঘটেছিল সেই সময়ে।

রসাশাস্ত্রে নানারকম নায়িকার উল্লেখ আছে, মুগ্ধা, ধীরা, প্রগল্‌ভা, প্রোষিত ভর্তৃকা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা, খণ্ডিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমার দিদিমাকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যেতে পারত ঠিক জানি না। পাড়াশুদ্ধ লোক আমার উপদ্রবে তটস্থ হয়ে থাকত, আর আমি হেন জানোয়ার সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম তোমার দিদিমার ভয়ে। নানারকম আজগুবি আর দুষ্টুমি খেয়ালে তোমার দিদিমার তুলনা ছিল না। ঝকঝকে স্বাস্থ্য ছিল, জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত। এখনকার মেয়েরা জাপানী ঘড়ির মতো, প্রত্যেকদিন তাদের কল-কব্জা বেকল হয়ে আছে। সে-যুগে মেয়েরা বাংলা দেশের উর্বর মাটিতে সতেজ লতার মতো ফুল-পল্লব নিয়ে বেঁচে থাকত, এযুগের মেয়েরা টবে জীয়ানো বিলিতী মৌসুমি ফুল, ডাক্তারি ওষুধের রস-সিঞ্চনে কোনোমতে আত্মরক্ষা করে আছে—

কদিনের জন্যে ফুল ফুটিয়েই একেবারে যবনিকা পতন। বীরাঙ্গনা নেই, বীরপুত্রও জন্মায় না।

আমি আবার প্রতিবাদ করলাম : দাদু, এটা বাজে কথা। এ যুগের ছেলে মেয়েরা যে ভাবে আজ রাইফেল বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে তাতে—

দাদু বললেন, তা দিচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আরো অনেক বেশি দিতে পারত—আবো অনেক এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে সব আলোচনা থাক-পুরোণো নীতিকথা তোমাদের শুনতে ভালো লাগে না। পুরোণো কালের গল্পই বলি।

সেদিন কী তিথি ছিল জানি না, কিন্তু মাঝরাত্রে ভারী চমৎকার চাঁদ উঠেছিল। আমাদের বাগানের সুপুরিবনের ফাঁক দিয়ে এলোমেলো জ্যোৎস্না পড়েছিল ঘরে, একরাশ মল্লিকা-ফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল বিছানায়। জানলার সামনে তারা দাঁড়িয়েছিল, আর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

তারা হঠাৎ বলে বসল, 'কী সুন্দর চাঁদ! যাবে?'

আমি বললাম, 'কোথায়? চাঁদে? ওখানে যাওয়া যায় না বোধ হয়। অন্তত সশরীরে।'

তারা ভ্রুভঙ্গি করে বললে, 'ফাজলেমী কোরো না! চাঁদে কে যেতে চাচ্ছে।'

—'তবে কোথায়?'

—'খালে।'

—'কেন? আত্মহত্যা করবে নাকি?'

—'না, না। নৌকো করে একটু বেড়াব।'

—'সর্ব্বনাশ! এই রাত্রে! পাগল নাকি!''

—'তুমি যাবে না?'

আমি বললাম, 'ক্ষেপেছ!'

তারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মনের ভেতরে বেশ করে শানিয়ে নিলে ব্রহ্মাস্ত্রটাকে। তারপর বললে, 'বেশ, কাল আমি বাপের বাড়ি যাবো।'

এর পরে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তবে চলো। কিন্তু এমন রাত্রিটা—খাসা ঘুমোনা যেত।'

তারা বললে, 'তুমি একটা ষাঁড়—খালি ঘুমোতেই ভালোবাসো।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'দাদু, একী হল? দিদিমার ভাষাটা তো ঠিক স্বামী সম্ভাষণের মতো নয়'।

দাদু বললেন, 'কেন ভায়া? দিদিমণি ইংরেজী করে তোমাকে শুধু বললে

সেটা বুঝি ভালো শোনাতো ? আমার কিন্তু বাংলা মতে ষাঁড়টাই পছন্দ হয়—অন্তত ষাঁড়ের ভেতরে পৌরুষের একটা কম্‌প্লিমেণ্ট আছে।'

—'কিন্তু ষাঁড় কি ঘুমের জন্যে বিখ্যাত ?'

দাদু বললেন, আঃ—ভারী বেরসিকের পাল্লায় পড়লাম তো। গল্প শুনতে গিয়ে যদি ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক তোলো তো পারা যায় না। 'অবসজ্ঞ কাক খায় জ্ঞান নিম্ব ফলে—ওরে মূর্খ, সেটাও বোঝো না ?'

বললাম, 'বুঝি। আপনি গল্প চালিয়ে যান দাদু।'

দাদু বলে চললেন, বিয়ের সময় মন্ত্র পড়েছিলাম: তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক হোক। সুতরাং হৃদয়েশ্বরীর হৃদয়ের বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল। চুপি চুপি সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম দুজনে। একবার চোরের মতো দোতলায় বাবার ঘরের দিকে তাকালাম, কিন্তু সেখানকার আলো নিবেছে এবং ব্যাঘ্রপুরুষ রাঘবেন্দ্র সেন চৌধুরীর বিখ্যাত নাসিকা-গর্জনে সমস্ত সেনবাড়ী মুখরিত হচ্ছে।

বাড়ীর নীচেই বাঁধাঘাটে নাজির একমাল্লাই নৌকোটা রেখে গেছে। তারা খুশি হয়ে বললে, বাঃ—বেশ হয়েছে।

আমি বললাম, 'বেশ তো হয়েছে। কিন্তু বৈঠা যে নেই। নৌকো বাইব কী করে ?'

তারা সাফ জবাব দিলে, 'সে আমি জানি না। তুমি জোগাড় করে আনো।' বলে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলাম, নারী জাতি এইরকমই বটে। তুমি তার জন্যে ডুব জলে নামলেও সে হাঁটু জলে পর্যন্ত নামবে না, দিব্যি প্রজাপতির মতো ফুর ফুর করে পাখা উড়িয়ে চলে যাবে।

বৈঠা আর পাবো কোথায়, খুঁজে পেতে দুখানা চ্যাপ্টা বাঁখারি জোগাড় করে আনা গেল। তারপরেই আর কী ? মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে ভাই। কিন্তু ওই পর্যন্তই—'আমি আর বাইতে পারলাম না' বলবার উপায় নেই।

খালের ঘোলা জল দুপাশের নারকেল-সুপুরি আর হিজলের ছায়ায় কালো হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে পড়েছে জ্যোৎস্নার ছিটে। ভাঁটা শেষ হয়ে গিয়ে এসেছে প্রথম জোয়ার—জলের কোলে কোলে বেতবনের গায়ে মিষ্টি হাসির মতো শব্দ হচ্ছে। অল্প অল্প হাওয়ায় জল মেতে উঠেছে,—দড়ির গোঁজটা তুলে নিতেই নৌকো দুলতে দুলতে এগিয়ে গেল। তারপর বাঁখারির বৈঠায় একটা টান দিতেই নৌকোটা একটা লম্বা বাঁক ঘুরে সেনবাড়ীর সীমা ছাড়িয়ে চলে এল।

আমি বললাম, 'কোথায় যেতে চাও?'

তাবা বললে, 'যেখানে খুশি।'

বললাম, 'একেবাবে নিরুদ্দেশ?'

তাবাব মুখে একটুকবো জ্যোৎস্না পড়েছিল। আধবোজা চোখে মুখের অপরূপ একটি ভঙ্গি কবে বললে, 'ভাবনা কী, তুমি তো সঙ্গে আছ।'

তা বটে। আমাব পৌরুষ জেগে গেল। ভায়া হে, নাবীব একটি কটাক্ষ-পাতে সুন্দ-উপসুন্দ বধ হল, বিশ্বামিত্রেব মতো মিলিটাবী মহর্ষির পরকাল ঝবঝরে হয়ে গেল, আমি দীনবন্ধু সেনশর্মা তো কোন্ ছাব। যা থাকে কপালে—বাঁখাবিব বৈঠাতেই হেঁইয়ো বলে টান দিলাম।

নিথব বাত। খালেব দুপাড়ে গ্রামে একটি প্রাণীও জেগে নেই কোথাও। জলেব রঙ যেন জবিদাব নীলাম্ববীব মতো—মাঝে মাঝে কেউ তাতে রূপালি পাড বসিযে দিযেছে। কোথাও কোথাও ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। নৌকোব শব্দে চঞ্চল হয়ে এখান ওখান থেকে টুপটাপ কবে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাং—পাতায় পাতায ঘুমন্ত পোকাবা চমকে উঠে ফব ফব কবে নৌকোয উড়ে এসে পড়ছে। আব বাতাসে ভাসছে জলেব গন্ধ, কাদাব গন্ধ, পচা কচুবিপানাব গন্ধ। নৌকো তব তব কবে এগিযে চলেছে।

আমাব যেন কেমন নেশা ধবেছিল—বাত্রিব নেশা। তোমবা দাদা শহরে থাকো, এমন বাত্রি তোমাদেব জীবনে কখনো আসেনা, এমন নেশাব স্বাদ তোমরা কোনোদিন পাওনি। দিদিমণিব সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা কবো পাগ্লাব মেলে—কলেব করুণাব ওপবে নিজেদেব ছেডে দিযে। সেখানে তোমাদেব কোনো নিজস্ব জগৎ নেই, সেখানে ভিড়—পৃথিবীশুদ্ধ বাজে মানুষেব হট্টগোল। কিন্তু আমবা সত্যি সত্যিই একেবাবে দুজনে চলেছি, 'একতবীতে কেবল তুমি আমি'। যেখানে খুসি আমবা যেতে পাবি—যতদূবে খুশি। এই খাল দিয়ে বেয়ে বেয়ে আড়িয়াল খাঁয, সেখান থেকে আবো এগিযে—মিষ্টি জল ছাড়িয়ে নোন্‌তা জলে, তারপবে আবো দূবে—সমুদ্রে। কূল নেই কিনাবা নেই—নীলেব মাথায় দুলে দুলে একেবাবে সৃষ্টিব শেষ প্রান্তে। আমি আব তাবা—মাঝখানে কেউ নেই, আমবা দুজনে একান্ত ভাবে নিরুদ্দেশেব পথিক।

তাবা চুপ করে শুয়ে আছে, আমি নৌকো বাইছি। আমার মনে ঘোর লেগেছে, তারার চোখে ঘুমেব আমেজ। স্বপ্নের মতো রাত্রি—ঘুমের মতো বাত্রি। পৃথিবী ঘুমুচ্ছে। দুধাবে নাবকেল-সুপুরির পাতায় বাতাসের শব্দ, যেন ঘুমেব মধ্যে পৃথিবী কথা কইছে। আশ্চর্য লাগছিল।

কিন্তু হঠাৎ রূঢ় জাগরণ।

খট্-খটাৎ করে নৌকোটা কিসের গায়ে ধাক্কা খেল, বৈঠার মুখে দড়ির মতো কী জড়িয়ে গেল খানিকটা। চমকে তাকিয়ে দেখি আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে নৌকো সোজা গিয়ে একটা ভেসালের মধ্যে ঢুকে বসেছে।

ভেসালের জাল পাতাই ছিল—বৈঠা জোর করে তুলতে গিয়ে খানিকটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবার খটাখট্ করে সেই বিশ্রী বাঁশের শব্দ।

আর যাবে কোথায়।

পরমুহূর্তেই একটা আকাশ ফাটানো চীৎকার উঠল পাশের অন্ধকার বাগান থেকে।

—'ও কাছেম ভাই—কাছেম ভাই।'

—'কী কও, কও কী?'

—'কোন্ হালার পো হালায় বুঝি ভেসালের মাছ ব্যাবাক উভাইয়া নেলে। আউগ্যা দেহি—'

—'আইতে আছি ল্যাজা লইয়া—হালাগো এক্কালে ফুড়িয়া ফ্যালামু—'

শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বিশ্বাস নেই—কিছু দেখবার আগেই পাড় থেকে ঝাঁ করে ল্যাজা মেরে দেবে, আর সে মার মানেই মোক্ষম। বিদ্যুৎ-বেগে আমি নৌকো ঘুরিয়ে ফেললাম, তারপর সোজা উজান বাইতে সুরু করলাম।

কিন্তু খালে তখন ভরা জোয়ার। আমাব সাধ্য কি নৌকো নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাই। দশ হাত নৌকো এগিযে নিতে গিয়ে আমার হাতের রগগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আর টের পেলাম, পেছনে চীৎকার উঠছে, 'ওই পালায়, হালারা পালায়। আউগ্যা কাছেম আউগ্যা—শোধ দিয়া থো—'

খালের জলে নৌকোর দ্রুত দাঁড়ের শব্দ। ওরা তাড়া করে আসছে।

আমি বললাম, 'তারা, সর্ব্বনাশ। ওরা তো এসে পড়ল।'

তারা উঠে বসেছিল। ভীত কণ্ঠে বললে, 'এখন কী হবে?'

—'চলো নৌকো ছেড়ে দিই। সামনেই একটা ছোট খাল আছে, তাই দিয়ে সাঁতরে পালিয়ে যাব। নৌকো নিয়ে পালানো যাবে না, নির্ঘাৎ ধরা পড়বো।

ঝুপ্ ঝুপ্। দুজনে জলে পড়লাম, পাশেই একটা ছোট অন্ধকার খাল—তাই দিয়ে তীরবেগে ভাঁটার জল নেমে যাচ্ছে। সবশুদ্ধ হাত চারেক চওড়া খাল, দুদিকে ঘন জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে আমরা সাঁতরে এগিয়ে চললাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিন্তু আপাতত অন্তত ওদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা দরকার।

ভাসতে ভাসতে খানিক এগিয়ে এসে নুয়ে-পড়া একটা মোটা হিজলের ডাল হাতে ঠেকল। সেইটে আঁকড়ে ধরে জলের ওপরে আমরা দুজনে ভাসতে লাগলাম। পারে ওঠা নিরাপদ নয়—যে জঙ্গল, বিষধর সাপ থাকবার প্রচুর সম্ভাবনা।

তারা ফিস ফিস করে বললে, 'এখন উপায় ?'

আমি বললাম, 'তোমার জন্যেই তো এই বিপত্তি। এখন বোঝো একবার মজাটা। কী সর্বনাশ হল দেখলে তো।'

তারা ফোঁস করে উঠতে গিয়েও চুপ করে গেল। বুদ্ধিমতী মেয়ে, নিজের অন্যায়টা বুঝতে পেরেছে। এর পর সময় বুঝে প্রতিশোধ নেবে।

বুকের নীচ দিয়ে খরবেগে অন্ধকার জল বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে অচেনা জঙ্গল, কাল মধ্যরাত্রি। আর হিজলের ডাল আশ্রয় করে দুজনে জলের ওপরে ভাসছি—অ্যাড্‌ভেঞ্চারের একেবারে চরম। এখন শেষ রক্ষা হবে কী করে সেইটেই সমস্যা। নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে বাড়িতে ফিরতে পাবলে হয়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার আস্তে আস্তে সাঁতরে আমরা বড় খালে ফিরে এলাম। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর কালিয়ে আসছে, হাত পা অসাড় হবার উপক্রম। চাঁদ এখন একেবারে মাথার ওপর—জরিদার নীলাম্বরীর মতো জলটা একেবারে সোনা হয়ে গেছে। কোনোখানে আমাদের নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই, হয় স্রোতের টানে ভেসে গেছে, নইলে ওরা টেনে নিয়ে গেছে সেটাকে। তা সেজন্যে ভাবনা নেই—নাজির নৌকো কাল উদ্ধার করতে পারবে।

শরতের রাত—বেশ একটুখানি শীতের আমেজ লেগেছে। কাঁপতে কাঁপতে আমবা পারে উঠলাম।

তারার এতক্ষণে মুখ খুলল।

—'অমন করে নৌকো ছেড়ে পালালে কেন ? আমাদেরই তো প্রজা ওবা'—

—'তা বটে। আর কাল যখন বাবার কানে কথাটা তুলে দিত তখন খড়মের ঘায়ে আমার পিঠের চামড়া যে উড়ে যেত সে খেয়াল নেই বুঝি ? তুমি যে নাটের গুরু সে কথা তো আর বলা যেত না, দুবুদ্ধির খেসাবতটা আমাকেই দিতে হত ভালো করে।'

তারা গুম হয়ে রইল।

অন্ধকার বাগান আর দীঘির ধার দিয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছি এমন সময় আর এক কাণ্ড।

—'কেডা, ওহানে কেডা যায় ?'

হেঁড়ে গলার হাঁক উঠল। গ্রামের চৌকীদার বলাই মণ্ডল।

—'সেরেছে!'

বলাই ফের হাঁক দিলে, 'কেডা, কথা কওনা দেহি?'

সভয়ে তাকিয়ে দেখি, একহাতে বল্লম উঁচিয়ে আর একহাতে লণ্ঠন বাগিয়ে বলাই আমাদের দিকেই নেমে পড়েছে—সদর রাস্তা ছেড়ে এগোচ্ছে বাগানের দিকে।

কেলেঙ্কারীর আরেক পর্ব।

আমি বললাম, 'তারা, আর উপায় নেই। এবার দৌড় দাও—'

ছুট্ ছুট্। বাগান ভেঙে ঊর্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম দুজনে।

বলাই চেঁচিয়ে উঠল: 'ধর্ ধর্—চোর পালায়—'

বল্লম বাগিয়ে সে আমাদের তাড়া করল।

আমরা প্রাণপণে ছুট্ছি—পেছনে পেছনে প্রচণ্ড চীৎকার করে তেড়ে আসছে বলাই। কী গলার জোর ব্যাটার! হাঁক পাড়তে পাড়তে গলার স্বর-গ্রামটাকে উদারা-মুদারা-তারা পেরিয়ে ফেলেছে, তার হুঙ্কারে দু-মিনিটের মধ্যে গ্রাম জেগে গেল।

চারদিক থেকে সাড়া আসছে: 'কই, কোন্ দিকে চোর?'

—'ওই ওই পালায়—'

আমাদের অবস্থা বোঝো ভায়া! একেবারে ঘেরাও হবার উপক্রম। কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়, যেন মন্ত্র বলেই সামনে দেখা গেল সেনবাড়ীর ফটক। জো করে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম, আঃ বাঁচা গেল।

কিন্তু দুঃখের তখনও অবশিষ্ট ছিল খানিকটা।

আমরা চমকে থেমে দাঁড়ালাম। বাবা ছুটে আসছেন, হাতে একটা মোটা লাঠি। পেছনে পেছনে বাড়ীতে যে যেখানে ছিল সকলে। অর্থাৎ এই মুহূর্তেই ধরা পড়তে হবে।

বাবা হাঁক পাড়লেন, 'কোথায় চোর রে বলাই?'

বলাই পাল্টা হাঁক দিলে, 'আপনার ফটকেই য্যান ঢোকতে দ্যাখলাম বড় কর্তা—'

—'আমার ফটকে! অ্যাঁ কস্ কি রে!'

একটা বাতাবীলেবুর গাছের নীচে আমরা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর একমিনিট—এখনি ধরা পড়তে হবে। আমাদের সর্বাঙ্গ ভিজে, গায়ে মুখে কাদা—কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই নেই।

বললাম, 'তারা, এবার গেলাম!'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারাই সব রক্ষা করলে। বিপদে পড়ে করালীকান্ত

চৌধুরীর মেয়ের মাথা সাফ হয়ে গেছে। অঘটন-ঘটন পটিয়সী নামটা কি আর নিরর্থক।

—'চোরে মেরেছে'—বলেই তারা বাঘিনীর মতো আমার মুখে নখ বসিয়ে দিলে। গালের একপর্দা ছাল নেমে গেল তার নখের আঁচড়ে। তারপর আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠবার আগেই একটা হ্যাঁচকা টানে আমাকে নিয়ে পাশের কাদাভরা পচা ডোবাটার মধ্যে গিয়ে পড়ল। আমার কানে কানে বললে : 'এইবার তুমিও চোর চোর বলে ডাক ছাড়ো।'

দাদু থামলেন। গড়গড়ার নলটা আবার মুখে বসিয়ে তাকালেন দেওয়ালের গায়ে দিদিমার ছবিটার দিকে। দিদিমার প্রসন্ন-উজ্জ্বল দৃষ্টিটা যেন দাদুকে সেদিনের স্মৃতিটা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, দাদু, গল্পের উপসংহার কই ?

দাদু আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

—উপসংহারটা যে ভালো করে বলতে পারত, সে বেঁচে নেই, দাদু। তাই আমাকেই বলতে হবে। বিশেষ কিছুই না—আমি চোরকে তাড়া করেছিলাম, জাপ্‌টে ধরেওছিলাম। তারাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল। চোর আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে একধাক্কায় দুজনকে ডোবায় ফেলে দিয়ে চম্পট দিয়েছে। এদিকে গাল দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছিল—কাজেই প্রমাণটা পাকা হয়ে গেল।

—সবাই বিশ্বাস করলে ?

—বলাই নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সন্দেহটা প্রকাশ করবার সাহস তার কি হতে পারে ? তা ছাড়া আমরা দুজনে এমন একটা কীর্তি যে করতে পারি এও কি কারো কল্পনাতেও আসা সম্ভব ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গল্পের পরেও আরো একটু গল্প রইল দাদু। গালের আঁচড়টা শেষ পর্যন্ত কী হল ?

—সেরে গেল। কিন্তু কী ওষুধে—তা বলবনা। যারা আঁচড়াতে জানে, তারা সারাতেও পারে। দিদিমণি যদি কোনদিন তোমার গাল আঁচড়ে দেয় তবে সেদিনই সেই বিশল্য-করণীর সন্ধান পাবে।

ব্রজবুলি

গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)

(১৯২৩)

নিতু বললে, থামুন মশাই, আপনি তো কনফার্মড ব্যাচেলর, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য শুনতে চাইনে। বিয়ে-থা আগে করুন।

বাধা দিয়ে সুনীল বোস বললে, দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাই ভাতকে অন্ন বলতে শুরু করেছ। তোমাকে আর বলব কি। বিয়ে করলেই যদি মেয়ে চেনার সাবজেক্টে অনার্স পাওয়া যেত, তাহলে তো দুনিয়াটা বেহেস্ত হয়ে উঠত। মেয়েদের চেনা কি অতই সহজ?

চিনবেন কি করে? ব্রজদা অমায়িক হেসে মন্তব্য করলেন, ওরা স্বরূপে কি কখনও ধরা দেন? সব সময় পদ্মরূপে বিরাজ করছেন। ঐ জন্যেই তো মহাজন ব্যক্তিরা ওঁদের নাম দিয়েছেন বিচিত্ররূপিনী। মেয়েদের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা—

শিবের ও অসাধ্য, মানুষ তো কোন ছার। ব্রজদা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন। বললেন, শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবিনে, তিন সপ্তাহ এক তাঁবুতে দিনরাত কাটিয়েও তিন তিনটে জাঁদরেল লোক টেরই পায়নি, যে, তাঁদের সঙ্গে রয়েছে ওয়ার্লড্ ফেমাস এক মহিলাও। বৃটিশ সরকার যাকে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার গিনি বকশিস করবে বলে ডিক্লেয়ার করেছিল।

হাঁ হয়ে যাবার মতই অভিজ্ঞতা বটে। ব্রজদা থামলেন। একটু পরে বললেন, গল্প কথা নয় একেবারে ট্রু-ফ্যাক্ট। স্বয়ং আমি তার সাক্ষী। আমরা মাতাহারির সঙ্গে তিন সপ্তাহ এক নাগাড়ে এক মিলিটারি ক্যাম্পে বাস করেছি। কিন্তু ঘুনাক্ষরেও টের পাইনি যে সেও আমাদের সঙ্গেই ঘুরছে ফিরছে খাচ্ছে এমন কি কখনো কখনো একই বিছানায় আমাদের সঙ্গে শুচ্ছেও। আর হোল মিলিটারি সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, মেয়ের মত মেয়ে বটে মাতাহারি। ঐ যে তোরা যা বললি, বিচিত্ররূপিনী, এ একেবারে সেই তাদেরই মহারাণী। আমি তো আমার লাইফে আর সেকেণ্ড মাতাহারি দেখলুম না। যেমন চোখ কানা করা রূপ আর তেমনি ক্ষুরধার তার বুদ্ধি, অমন দুঁদে যে এলায়েড ফোর্স তাকে একে-বারে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। বার বার এদের টপ সিক্রেট আউট করে দিয়েছে। এলায়েড্ ফোর্স যতবার জার্মানদের মোক্ষম মার দেবার

প্ল্যান করছে ততবারই দেখা গেছে, সেই প্ল্যান আগেভাগে জার্মানদের হাতে গিয়ে পড়েছে। আর জার্মানরা বাম-প্যাঁদান পেঁদিয়েছে এদের।

বৃটিশেরা বুঝতে পেরেছিল তাদের স্ট্র্যাটেজিক কোনো জায়গায় জার্মাণ স্পাই এসে হানা গেড়েছে। কিন্তু কে যে সেই স্পাই, কোথায় তার আস্তানা, কি কৌশলে সিক্রেট আউট করছে সেটা আর কিছুতেই ধরতে পারে নি, পারতও না, যদি এই শর্মা সে কাজটা না করে দিত। বলেই ব্রজদা নিজের বুকে আঙ্গুল দেখালেন।

ব্রজদা খানিক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, সেকি আজকের কথা। বোধহয় নাইনটিন সেভেনটিন-টেভেনটিন হবে। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ার তখন পুরোদমে চলছে। খুঁটিনাটি সব মনেও নেই ভাল করে। তবে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারি।

শোন তাহলে :

আই, এফ, এ, শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে মোহনবাগানের হয়ে খেলে বাড়ী ফিরছিলুম। আমার তেমন খেলবার ইচ্ছে ছিল না এবার। বাঁ হাঁটুর মালাটা ভেঙ্গে একদম চুরমার হয়ে গিয়েছিল কিনা। হাঁটতেও কষ্ট হত। কিন্তু গোরাদের সঙ্গে খেলা তো, রিসক নেয়া যায় না, হেরে গেলে একেবারে ন্যাশান্যাল প্রেষ্টিজ ডকে উঠবে বুঝলি নে। তাছাড়া সন্তোষের মহারাজার পার্সন্যাল রিকোয়েষ্ট, কিছুতেই না করতে পারলুম না। গোটা চারেক নিক্যাপ পরে মাঠে নামলুম। ব্যস ফোর টু শিল্ড।

যাহোক, বাড়ী ফিরতেই এক চিঠি পেলুম। লেটলাটের চিঠি। পত্র-পাঠ এসে দেখা করুন। জুরুরী। বড্ড বিরক্ত হলাম। ম্যাচ খেলে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, এখন কোথায় একটু রেষ্ট নেব না এই ঝামেলা। কিন্তু লাট মানুষ, দেখা করতে চেয়েছে কি আর করা, সেইভাবেই বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় নামতেই কে যেন পিছন থেকে ফিস্ ফিস করে বললে, রাস্তার মোড়ে কালো গাড়ী আপনার জন্যে ওয়েট করছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চাইলাম, কিন্তু কাউকে আর দেখলুম না। ব্যাপারটাতে একটা যেন রহস্যের গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়ল। ভাবলুম, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কারো কারসাজি আছে নাকি? না কি আমাকে নিয়ে কেউ মজা মারছে।

তোরা আজকালকার জেনারেশানতো, কি করতিস কে জানে? কিন্তু আমি ব্রজরাজ কারফর্মা, কোন জিনিসে হাত দিলে তার শেষ না দেখে

ছিলেন। ভারত মাতার সন্তান, পিছু হটার ছেলে নই। গটগট করে গাড়ীতে গিয়ে চাপলুম।

শেষ পর্য্যন্ত লাটসাহেবের বাড়ীতেই গেলুম। লাটসাহেব নিজে এসে আমাকে আদব আপ্যায়ন করলেন। অসময়ে ডিস্টার্ব করার জন্য অ্যাপলজিও চাইলেন। তারপর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, মিঃ কাবর্ফর্মা, ব্যাপারটা টপ্ সিক্রেট। শুধু আমি জানি আর আপনি জানলেন। তাই এরকম গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। তবে ব্যাপারটা শুনুন, আপনাকে আজই ফ্রান্সে রওনা দিতে হবে। লর্ড কিচেনারের হেড কোয়াটার্সে, তিনিই আপনাকে তলব করেছেন। এই দেখুন তাঁর চিঠি। লাট সাহেব ড্রয়ার থেকে সীল করা একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলুম ডিপ্লোমেটিক কভারের চিঠি। চিঠি খানা খুলে পড়লুম। বেশি ধানাই পানাই নেই। লড কিচেনার লিখেছেন: মাই ডিয়ার ব্রজ আমি তোমার সাহায্য চাই। ভেরি আর্জেণ্ট। অবশ্য সাধারণ বাঙালীর মত গুলিগোলা খেয়ে মরতে যদি ভয় না পাও, তাহলেই এস, প্রয়োজনের কথা সাক্ষাতে বলব। ইওরস্ লাভলি।

ঐ যে খোঁচাটা দিল কিচেনার, মরতে যদি ভয় না পাও, ওতেই কাজ হল। আমি রাজী হয়ে গেলুম। নাহলে এমনি প্লেণলি যদি বলত তা হলে যেতুম কিনা সন্দেহ। কারণ আমাদের সেকশানের বড়বাবু আমার পিছনে খুব লেগেছিল তখন। উইদাউট নোটিশে কামাই করাল শালা চাকরিই হয়ত খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু জাতের গায়ে খোঁচা মেরেছে, এ চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট না করে পারি। ভাবলুম, যায় চাকরি যাবে, তাবলে জাতের মুখে চুনকালি লেপতে কাউকে দেবনা।

লাট সাহেবকে বললুম, অলরাইট, আমি যাব। তবে দুটো কোয়েশ্চেন। লাট সাহেব বললেন, বলুন, আপনার কি জানবার আছে?

বললুম এক নম্বর কথা, অফিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করতে চাই। নইলে মাইনে কাটবে, চাই কি চাকরিও গন হতে পারে। আর দুনম্বর কথা, কবে যেতে হবে, কি করে যাব?

লাট সাহেব আমায় দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিলেন। এখনই যেতে হবে, জাষ্ট নাও। কি করে যাবেন, সেজন্য আপনি ভাববেন না। বৃটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন। এবার প্রথম প্রশ্নে আসি। আপনি একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখে আমার কাছে দিয়ে যান, আমি সেটা ম্যানেজ করব।

বাগ্যল হয়ে গেল কম্যসাল্য। এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ শরীরে লর্ড কিচেনারের হেড কোয়াটারে পৌঁছে গেলুম। কি পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেণ্ট। একেবারে তাক লেগে যায়। সাবমেরিনে করে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল। কোর্টউইলিয়াম থেকে উঠলুম আর নামলুম ক্যালেতে। কোথায় গঙ্গা আর কোথায় ইংলিশ চ্যানেল, বিজ্ঞান কি না করতে পারে।

লর্ড কিচেনারের তাঁবুতে পেঁছিতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ব্রজ তুমি আমায় বাঁচালে। জানতুম তুমি খবর পেলে আসবেই। তবু তোমায় না দেখা পর্য্যন্ত অশান্তিতে ছিলুম।

সেই রাত্রেই ডিনারের টেবিলে তিনি ফরাসী স্থলবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ফুসফুসিয়ের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, হিযার ইজ মাই ফ্রেণ্ড ব্রজ। কামিং ক্রম ক্যালকাটা। জেনারেল ফুসফুসিয়ে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে ফরাসী ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, মঁসিয়ে ব্রজ আমরা ফরাসীরা ইউরোপের বাঙালী বলে গর্ব অনুভব করি। একটা হিষ্ট্রিতে পড়েছি, নাপলিঁয়ব (তোরা যাকে গাড়োলের মত নেপোলিয়ান বলিস) রক্তেও বাঙালীত্ব ছিল। জেনারেলের ভুলটা শুধবে দিয়ে বললাম বাঙালীত্ব নয় বাঙালত্ব ছিল।

বাঙালী আর বাঙাল দুটো সেপারেট ক্যাটেগরি কিনা। আমার মধ্যেও বাঙালত্বই বেশী। আসলে আমবা বিক্রমপুরের অরিজিন। ক্যালকাটাতে ডোমিসাইলড্।

এমন সময় কোথেকে অপূর্ব সুন্দরী এক মাদী কুকুর এসে কুঁই কুঁই করে আমার বাঁ হাতটা চেটে দিল। কুকুবটার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই চমকে উঠলুম। জেনারেল ফুসফুসিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বারবার তার কুকুরটার বেয়াদবিব জন্য মার্জনা চাইতে লাখগলেন। ধমকে বললেন. জেন জেন, ও ঘরে যাও। কুকুরটা চলে গেল। বাঁ হাতটা তুলে দেখি একটা লাল ছোপ লেগে গেছে। অনেকটা আলতার ছোপের মতো।

জেনারেল বললেন ও কিছু নয়। জেনের লিপ্‌ষ্টিক মাখার অভ্যাস আছে। এটা ওর অদ্ভুত অভ্যাস। আমার জামা কাপড় প্রায়ই নষ্ট হয় ওর জন্য। আই অ্যাম সরি। জেনারেলের কৈফিয়ৎ শুনে হাসি পেল। ফরাসী কুকুরও লিপ্‌ষ্টিক মাখে। শালার জাতই আলাদা।

ডিনারের পর আসল কথা শুরু হল। ওরা দুজনে যা বিবরণ দিলেন, তার অনেক কথাই টপ্ সিক্রেট্। এমন কি এখনও তোদের তা বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, যে জার্মান স্পাইরা এই হাই কম্যাণ্ডের

সব সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের কাছে লর্ড কিচেনার ও জেনারেল ফুসফুসিয়ে খুবই বেইজ্জত হচ্ছেন। আর কিছুদিন এই ভাবে চললে ওদের দুজনের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে 'নো বডি ক্যান সে'। লর্ড কিচেনার জানালেন ওদের তরফের স্পাইরা যে যে খবর এনেছেন তাতে জানা গেছে ক্যাপ্টেন থ্রি এক্স বলে একজন স্পাই এদের সব খবর ফাঁস করে দিচ্ছে। তার পরিচয়ও জানা গেছে। ক্যাপটেন্ থ্রি এক্স যার নাম, তারই এক নাম মাতাহারি। পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। ছদ্মবেশে সর্বদা থাকে বলে কেউ তাকে স্বরূপে এ পর্য্যন্ত দেখেনি। (ঐ যে তোরা যাকে বিচিত্ররূপিনী বলিস, তাই আর কি) সব রকম ছদ্মবেশ ধরতে সে নিদারুণ ওস্তাদ। আরও জানা গেছে সেও এই ক্যাম্পেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কেমন করে এ সব খবর বাইরে পাঠাচ্ছে কেউ তা ধরতে পারেনি।

তোমার কথাই ধরনা, লর্ড কিচেনার বললেন, তুমি যে আসবে, সে কথা শুধু আমি জানি আর জেনারেল ফুসফুসিয়ে জানেন। আরও তো কেউ জানেনা, জানার কথাও নয় কারো। তবুও এখবর ফাঁস হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ওরা যে কি সাংঘাতিক রকমের অ্যাকটিভ্ বুঝো জ্যাম এখন ব্রজ মাতাহরির হাত থেকে তোমাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ওকে খুঁজে বের কর। জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে বৃটিশ ক্রাউন পঞ্চাশ হাজার গিনি পুরস্কার দেবেন।

তিন সপ্তাহ প্রায় কেটে যায় যায়। অফিসের ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু মাতাহারির কোন ট্রেসই করতে পারলুম না। শালা ইজ্জত ঢিলে হবার জো হল। লর্ড কিচেনার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফরাসীরা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। আমার রাতের ঘুম নষ্ট হল।

সেদিন গভীর রাত্রে আকাশ পাতাল ভাবছি শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ দেখি জেন নতুন একটা লিপ্‌স্টিক ঠোঁটে করে বেরিয়ে গেল। এর আগেও যে দুএকবার এরকম ঘটনা না দেখেছি তা নয়। কিন্তু এ নিয়ে মনে কোন প্রশ্নই জাগেনি। আজ হঠাৎ মনে হলো জেন যাচ্ছে কোথায় দেখিতো। তড়াক করে উঠে রবার সোলের জুতো পরে ওর পিছু চললাম। দেখি ওয়ারলেসের ঘরে ঢুকল। ওয়ারলেস অপারেটারের কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতেই সে তের মিটার ব্যাণ্ডের একটা সেট খুলে দিল। সেটা থেকে সুঁই সুঁই আওয়াজ বেরুতেই জেন কড়মড় করে নানানছন্দে লিপস্টিকটা চিবোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে সব রহস্য দিনের আলোর মতো ফুটে উঠল। ওঃ আমি যে গাড়োল। জেনারেলের ঘরে গিয়ে ওকে টেনে তুললুম। লর্ড কিচেনারকে ডাকলুম। বললুম, জেনের জন্য যে লিপ্‌ষ্টিক্‌ এনেছ দেখি, কুইক। জেনারেল প্রথমে অবাক হল। তারপরে দুটো লিপ্‌ষ্টিক্‌ বের করে দিল। একস্‌-রের আলো ফেলে দেখলুম প্রতিটি লিপষ্টিকের ভেতর সূক্ষ্ম এক ধরণের যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর তার গায়ে লেখা মেড্‌-ইন-জার্মানী, এখন সব জিনিষ পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সব যন্ত্র দিয়েই মাতাহারি তাহলে এতদিন বাইরে খবর পাঠিয়েছে।

আমরা তিনজন যখন সব ব্যবস্থা পাকা করে ওয়ারলেসের ঘরে গেলাম তখনও জেন পুরো লিপষ্টিক চিবিয়ে শেষ করতে পারেনি। এদিকে প্রায় ভোর হয়ে আসছে।

রিভলবারটি বার করে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললুম, গুটেনমর্গেন মাতাহারি। অর্থাৎ মাতাহারি সুপ্রভাত। জেন ছুট করে পাশের বাথ-রুমে ঢুকে পড়ল। জেনারেল গুলি করতে গেল। বাধা দিলুম। একটু পরে বাথরুমকে উদ্দেশ্য করে বললুম, ও পথে পালাবার সুবিধে নেই মাতাহারি। ধরা এবার দিতেই হবে।

এই প্রথম বাথরুমের ভিতর থেকে অপূর্ব সুরেলা এক নারীকণ্ঠ বেজে উঠল। ব্রজ তুমি একটা আস্ত ঘুঘু। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন দয়া করে পরবার কিছু দাও নইলে বের হই কি করে?

লর্ড কিচেনার বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি আর্দালীকে ডাকতেই আমি হুকু[illegible] বললুম যাও আমার ড্রেসিং গাউনটা নিয়ে এস।

প্রেমে পতন ছাড়া কিছু নেই!

দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল (নীলকণ্ঠ)

(১৯২৪)

০ ০ এক ০ ০

মনোদীপের মানসিক গোলমাল ফের সুরু হ'য়েছে। তার মানষীকে নিয়েই এই মানসিক গোলমাল। মানসী অর্থাৎ মানসী মল্লিক,—ইউনিভার্সিটির একমাত্র দ্রষ্টব্য—বসন্ত কেবিনের একটিমাত্র আলোচনার বিষয়,—সৌন্দর্য্য-সমালোচনার শেষ কথা। শুধু মনোদীপ মুখুজ্যের মনেই নয়—অনেকের মনের দীপেই আগুন জ্বালিয়েছে ওই চালিয়াৎ মেয়ে, অনেক মনোরোগের বীজ ছড়িয়ে (সেই সঙ্গে বিরহের দীর্ঘ নিঃশ্বাস-বিজড়িত অনেকের মুখ থেকে অনেক মনোলগ্ ঝরিয়ে) ঘরে বেড়ায় যে, এইমাত্র বাসে, তারপর ইউনিভার্সিটির দোতালার বারান্দায়, তারপরই ক্লাশের শেষ বেঞ্চের শেষ সীটে এবং সন্ধ্যাবেলায় সাদার্ণ এভিনিউ-এর ছোট্ট বাড়ীটার ছাদে দেখা যায় যাকে, —যেন কাণ পেতে কোন পরিচিত গাড়ীর হর্ণ শোনবার অপেক্ষায়।

প্রায় বছর খানেক আগে পূর্ণ থিয়েটারের অর্দ্ধেক পাসে, অর্দ্ধেক টিকিটে পূর্ণ পেক্ষাগৃহে মনোদীপ আবিষ্কার কোরলে তার মানসীকে ঠিক তার সীটের পেছনে। 'শো' তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ঘরের কিছু আলো জ্বলেছে, কিছু জ্বলেনি, সেই আবছা আলো আর অন্ধকারে মানসী মল্লিকের মুখের আধখানা দেখা গেলো। ব্যস, মুখ ফেরাতে পারলে না মনোদীপ। একটু আগেই সে ভেবেছিল তার মামাকে আজ একচোট নেবে, এই বাজে বই দেখাতে আনার জন্যে—এই বাজে আব বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি আর যাচ্ছেতাই (যা ইচ্ছে তাই বলবে ভেবেছিলো মনোদীপ); কিন্তু মামাকে একচোট নেবে কি, মনোদীপ নিজেই খুব চোট খেলো। এবং চোট খেলো সেই মারাত্মক জায়গাতেই —জুলিয়েৎকে দেখে রোমিওর লেগেছিল যেখানে, লাবণ্যকে দেখে অমিতর বেজেছিল যে স্থানে—এক কথায় বাংলা ছবিতে নায়িকাকে দেখবার আগেই নায়ক যেখানে হাত বুলোতে থাকে, অর্থাৎ তীর এসে লাগলো সোজা বুকে।

তারপর বাড়ী ফিরলো বটে মনোদীপ কিন্তু তার মন রইল বাড়ীর বাইরে। ঘুমোতে পারলো না সে, না পারুক স্বপ্ন দেখবার বাধা হোল না তাতে এবং অবশেষে সে স্বীকার কোরে ফেললো তার বন্ধু আলোকের কাছে। যাকে বলে সাফ-সমস্ত-স্বীকার! এবং বোলতে ভুললো না যে, এগারো

বারের বার এইবার তার জীবনে সত্যিকারের প্রেম দেখা দিয়েছে এবং এর আগের দশবার যা' সে সত্যি বলে মনে কোরেছিল, তা' যে একদম ভুয়ো এতদিনে সে তা' বুঝতে পেরেছে। আগেকার দশটি মেয়ে দশের শূন্যের মতো মিলিয়ে গেছে—এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে এই একটিমাত্র—এই 'একাদশীটি'। এবং সমস্ত স্বীকার কোরে আলোককে দিয়ে প্রতিজ্ঞা কোরিয়ে নিলো যে এ-কথা সে যেন ফাঁশ না করে।

০ ০ দুই ০ ০

আলোক খুব সম্ভবতঃ কথা রাখবার জন্যেই শুভেন্দুকে বারবার কোরে বলিয়ে নিলো যে মনোদীপের এই নোতুন প্রেমের খবর যেন কোন চতুর্থ ব্যক্তির কাণে না যায়। কিছু দিন বাদেই এই অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ অত্যন্ত গোপনেই ইউনিভার্সিটিময় ঘুরতে লাগলো।

মনোদীপ ততদিনে তার প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়েছে। অবশ্য ব্যর্থ-মনোরথ হয়নি সে। তার সঙ্গে পড়তো মালিনী হালদার। মনোদীপ শুনে-ছিলো মালিনী আর মানসী দূর-সম্পর্কের বোন। কাজেই মনোদীপ ঠিক কোরলে খুব কায়দা কোরে মালিনীর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে মানসী তাদের ওখানে আসে কিনা এবং আস্তে আস্তে মানসীর মানসিক সমস্ত খবরাখবর এবং মেয়েদের পেটে কিছু থাকলে তা' যে একদিন না একদিন বেরিয়ে পড়েই এ আর কে না জানে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুবই দুঃখের বিষয়—দুঃখ আর ভারী লজ্জার বিষয়—মালিনীই মনোদীপের সমস্ত মনের খবর জেনে ফেলেছে। মানসী সম্বন্ধে মনোদীপের যে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই—যদিও তার মতে মানসী সত্যই অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে—স্মার্ট আর লাভলী এবং মনোদীপ তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীদের অন্যতমা মনে কোরে কিম্বা ঠিক কোরে বল্লে বোলতে হয়, অন্য কারুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না, মানসীর কোন যোগ্য উপমা খুঁজে পায় না মনোদীপ—কবিতা কোরে বল্‌লে তাকে বোলতে হয় নিরুপমা। শুনে মালিনী শুধু হেসেছে। প্রথম প্রচেষ্টার কিছু দিন বাদেই নোতুন উৎসাহের সঞ্চার হোল মনোদীপের মনে। ইতিমধ্যে তাকে এলগিন রোডের মোড়ে স্প্ল্যানেডের চৌমাথায় অপেক্ষা কোরতে দেখা গেছে—বাসের জন্যে। তার বন্ধুদের ধারণা মানসীর জন্যেই তার এই অপেক্ষা—কিন্তু নিরপেক্ষ লোক থাকলে মনোদীপের বিশ্বাস. সে বুঝতে পারতো. মনোদীপের সঙ্গে মানসীর প্রায়ই যে দেখা হয়ে যায়—প্রায় রোজ রোজই দেখা হয় তাতে ওদের দু' পক্ষের কোন দোষ নেই।

এটা নিতান্তই পথের ঘটনা—দুর্ঘটনা বোলেই গণ্য করা চলতে পারে তাকে।

মনোদীপ দ্বিতীয় চাল চাললে। এবারে তার বাণ লক্ষ্যভেদ কোরবে বোলে মনে হোল। তবুও মনোদীপের বুক টিপ টিপ করে—চাল বাণচাল হ'য়ে যেতে কতক্ষণ? মানসীর এক বন্ধুকে পাকড়াও কোরলে—মালতী মিত্র—ওদের সঙ্গেই পড়ে। মনোদীপ একদিন তাকে রেস্তোরায় ধরে বল্লে: "আমার সঙ্গে একজনের আলাপ কোরিয়ে দিতে পারেন?"—

"কে? মানসীর সঙ্গে ত'—মালতীর মুখে হাসির ছিটে।

ঢোক গিল্লে মনোদীপ—"এঁ্যা—হঁ্যা, তাই—আপনি জানলেন কি কোরে—মানে আমার এমন কিছু—"

"ও-রকম দেখা হোলেই হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকলে সবাই জানতে পারে।"

"হাঁ কোরে আমি তাকিয়েছি—দেখেছেন আপনি?"

"না, আমি দেখিনি'—মালতী হাসিতে ফেটে পড়ে বল্লে—"তবে মানসী বোলছিলো—"

"মানসী বুঝি না দেখেই বুঝতে পারলো" এবার মনোদীপের পালা—"ও তা'হলে বোঝাই যাচ্ছে, আমি একাই দেখিনি—মানসীও ছিল দেখবার ব্যাপারে—অন্ততঃ আড়চোখেও দেখে থাকবে একবার।"

এইভাবে কথার পিঠে কথা, পিঠপিঠ কথা কাটাকাটি মারাত্মক খেলা কাটিয়ে উঠে মনোদীপ মালতীকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলো যে মালতী তার সঙ্গে মানসীর আলাপ করিয়ে দেবে।

যাবার সময় মালতী বল্লে—"আলাপ ত করিয়ে দেব, তবে আরম্ভেই প্রলাপ বকতে থাকবেন না আবার।"

মনোদীপ লাল হবার চেষ্টা কোরল লজ্জায় কিন্তু রং দোষে নীলচে মেরে গেল তার গাল। আর শুধু মনোদীপের কেন—পৃথিবীর সমস্ত 'লাল'-দেরই ত' আজকাল নীল হওয়ার চেষ্টাতেই ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

০ ০ তিন ০ ০

কিন্তু মালতীর অপেক্ষায় না থেকে মনোদীপ এবার নিজেই মালকোঁচা মারলো।

সুযোগের সদ্ব্যবহার কোরতে যারা জানে তারাই জানে লক্ষ্যভেদের কায়দা। ইউনিভার্সিটির লিফ্‌ট থেকে বেরুচ্ছে তখন মানসী। মনোদীপ

ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে খেতে যাচ্ছিলো রেস্তোরাঁতে। সেই মুহূর্ত্তে ওদের দু'জনের দেখা মুখোমুখী। মনোদীপের তখন মুহুর্মুহু হৃদ্‌কম্প হলেও—বারবার মানসীর গাল লাল হ'য়ে যেতে লাগলেও এবং তা লক্ষ্য কোরে মনোদীপের সমস্ত গোলমাল হযে যেতে থাকলেও সে বুঝলে 'এই হোল সময।' ইতিমধ্যে মালতী মারফৎ মানসীর খবর যা' পাওয়া গেছে তাতে বাতাস যে অনুকূলেই বইছে, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু ঠিক সময়ে নৌকো ভাসাতে না পারলেই ত' সব বেঠিক হ'যে যায়।

তাই মনোদীপ আর দেরী কোরলে না—মানসীকে সোজাসুজি বলে বসল: "এই যে, আপনার সঙ্গে আমি আলাপ কোরতে চাইছি আর আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?" মানসীর মস্ত বড় কালো চোখের পাতাজোড়া কাঁপছে দেখলে মনোদীপ, দেখে ফের সুরু কোরলে: "আপনি এ রকম ছেলেমানুষী কেনো কোরছেন—অবশ্য ছেলেমানুষী আপনাকেই মানায 'মানসী' যখন আপনার নাম।"

এবারে মানসী মুখ খুল্লো: "দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমি বিশেষ অভ্যস্ত নই।"

"কি মুশকিল?" মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ কোরে মনোদীপ বোল্লে: "আলাপ জিনিষটাকে অভ্যেসে দাঁড় করানোর মত অরুচিকর আর কিছু নেই।"

কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মনোদীপ এবার ভালো কোরে না দেখে থাকতে পারলো না মানসীকে। চাঁপা ফুলের রং-এর শাড়ীটার সঙ্গে কোথায় যেন ওর গায়ের রং-এর আশ্চর্য্য মিল আছে। সমস্ত মুখখানায় চোখে পড়বার মত শুধু ওর চোখ দু'টো। আর মানসীর চুল—এলোমেলো কোরে জড়ানো, মনে হয়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বুঝি ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে ওর পিঠে। কিন্তু মনে রাখবার মতো মানসীর চলার ভঙ্গী। আর ওর মধ্যে সবচেয়ে রমণীয় হোল, বিরক্ত বা খুসী হ'লে ওর সেই আশ্চর্য্য ভ্রূভঙ্গীর কায়দা।

এ সব দেখছে মনোদীপ, আশেপাশের ছেলেরা আরো অবাক হ'যে দেখছে ওদের দু'জনকে। এবারে সোজাসুজি মনোদীপ নিমন্ত্রণ পাঠালো: "আপনার কি ক্লাশ আছে মিস্ মল্লিক?"

"হ্যাঁ"—অত্যন্ত মৃদু গলায় মানসী জবাব দিলো: "ডক্টর দাশগুপ্তের ক্লাশ।"

"কী হবে ক্লাশ কোরে, আসুন না কোথাও গিয়ে বসা যাক"—মনোদীপ একটু জোর দিলে গলায়।

"না, আজ থাক, অন্য দিন হবে, এইমাত্র বাইরে থেকে আসছি।"

মনোদীপ তখন মনে মনে ভাবছে আর এগুবে কি-না, প্রথম দিনেই যদি বিগড়ে যায় মেজাজ, তা'হোলে মুশকিল হবে।

এমন সময় একদল ছেলে এলো মানসীর কাছে চাঁদা চাইতে। মনোদীপ ভাবলো—ছেলেরা কোন কথা শোনেনি তা তার—তা'হোলে চাঁদা ছেড়ে চাঁদা কোরে মার দিতে পারে তাকে। ছেলেরা চলে যেতে কি হেলো মনোদীপের—মানসীকে বোলে বসল সে: "আমার জন্য একটা দিন কি আপনি ক্লাশ কামাই কোরতে পারেন না?"

কিন্তু মানসীর মনে কি ছিলো কে জানে—রাজী হোয়ে গেলো সে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো ওরা দু'জন—ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর দু'টো।

০ ০ চার ০ ০

আলাপ হওয়ার পরের দিনই মালতী বল্লে মনোদীপকে: "you are too late" —মানসী জানাতে বলেছে আপনাকে।"

এক মিনিটও দেরী কোরলে না মনোদীপ, জবাব দিলে তক্ষুণি: "Never mind,—Better late than never"

মালতী হাসেন, তারপর বল্ল: "তা ত' বুঝলাম—দিলীপকে প্রাণের কথা না বল্লে প্রাণ বাঁচছিলো না-কি—সমস্ত খবর সবাইকে না জানালেই চলে না—না?"

"কেনো, দিলীপও কি?"

"হ্যাঁ দিলীপও"—মনোদীপকে কথা শেষ কোরতে না দিয়েই মালতী বল্লে: "দিলীপের প্রাণও ওইখানে সমর্পিত।"

বসে পড়লো মনোদীপ। এই সেদিন সমস্ত কথা দীলিপকে বলেছে সে—দিল্ খুলেই বলেছে সব —আর দিলীপই স্বয়ং লিপ্ত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। ছেলেগুলোকে বোঝাও ভার। দিলীপ ত সেই 'ইতিহাসে'র রোগা আর বেঁটে মেয়েটার জন্যে হাঁসফাঁস কোরে মরছিলো। এরই মধ্যে দৃষ্টি এতদূর গেছে—ওই বোকা ছেলেটার দূরদৃষ্টির প্রশংসা কোরতে হোল মনে মনে, আর নিজের উদ্দেশ্যে 'দূর-দূর' কোরতে হোল মনোদীপকে।

মালতী আরো খবর দিলো: "দিলীপ এরই মধ্যে কবিতা পাঠিয়েছে।"

"মিল দিয়ে"—প্রশ্ন কোরলে মনোদীপ।

"হ্যাঁ, মিল দিয়েই—আপনার মতো নয়, হিসেবে কোন গরমিল নেই তার।"

আর দেরী কোরল না মনোদীপ। মনে মনে মতলব ঠিক কোরে ফেলেছে সে। দিলীপের উদ্দেশে ছুটলো সে। সামনেই পেলো তাকে, ক্লাশ শেষ কোরে বেরুচ্ছিল সে।

"এই যে দীলিপ, তোমায দবকাব ভীষণ", মনোদীপের সম্ভাষণ গ্রাহ্য না কোরে দিলীপ বল্লে: 'তার চেযেও ভীষণ দবকাব আমাব কিছু খাওয়ার—ক্ষিদে পেযেছে খুব।'

"চলো চলো, খেতে খেতেই বলা যাবে—খাওযার কথা আমায় বলতে হয—খাওযাব সময়ই ত কথা বলতে আবাম।" অত্যন্ত উদাব মনে হোল মনোদীপকে এবং দিলীপেব উদব তখনকাব মত তাব জন্যে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো পেটে পেটে ('মনে মনে' বলাটাই ব্যাকবণ অনুমোদিত হোত—কিন্তু উদবেব কি মন আছে?)।

বেস্তোবাঁয ঢুকে দিলীপ নিজেই অর্ডাব দিলো। এগ কারী দাও এক প্লেট আব মোগলাই পবোটা নিযে এসো চট কোবে। হ্যা, তাবপব কি বলছিলে"—মনোদীপেব দিকে কৃপাদৃষ্টি দিলো দিলীপ।

"বলছিলাম মানসাব দিকে—দিব-বদল কোবেছ কবে থেকে?"—মনোদীপেব গলায ঝাঁঝ।

"সে কথা যদি বলো—তা হলে বলি তোমায, সত্যি কথা বলতে সুন্দবী মেযেদেব বেলায় আমাব দিক-বিদিক্ কোন জ্ঞানই থাকে না —সোজা জবাব দিলো দিলীপ আব অর্ডাব দিলো বযকে —"কোকো আউব পেস্ট্রি লে আও।"

"কিন্তু তোমায যদি ওব চেযেও সুন্দব মেযেব সঙ্গে আলাপ করিযে দিতে পাবি"—মনোদীপ টোপ ফেল্‌লো।

"কাব মতো সুন্দব?"

"এই ধবো, কাব মতো বলবো?" মনোদীপ একটু ভেবে বল্লে: "ধরো, শৈল চক্রবর্ত্তীব আঁকা ছবিব মত মেয়ে—ওই রকম নিখুত মুখ যদি পাও একখানা?"

"পেতেই চাই না মোটে, শ্রী শৈলব আঁকা মুখগুলো আসলেই বিশ্রীই।"

"ওঃ, শৈলকে সইল না বুঝি"—বাগে মনোদীপ কাঁপছে: "তোমার শ্রীমুখে এই কথাই শুনবো আশা কোবেছিলাম। তোমার মত মুখ্খুর মুখেই শুনতে হয় এ-সব।" বিল মিটিযে দিলীপ দেখলো তাব মোটা পার্সটা চুপসে কখন বোগা হ'য়ে গেছে। দু'জনে দু'দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

০ ০ পাঁচ ০ ০

তারপর ব্যাপার জটিল হোতে লাগল। মানসীর মন যে কার দিকে ঝুঁকেছে বোঝা শক্ত হোল। কখনো মনে হয়, দিলীপ বুঝি এগিয়ে গেছে বহুদূর। তারপরই মনোদীপ আর মানসীকে একসঙ্গে কফি খেতে দেখলেই বোঝা যায়, মনোদীপও পিছিয়ে নেই বেশী। এমন সময় উভয় পক্ষই মানসীর জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পেলো। দিলীপ এর আগেই মানসীর বাড়ীতে গেছে। মনোদীপকে মানসী নিয়ে যায় নি—তার জ্যোঠামশায়ের ভয়ে। মানসীর জ্যাঠার ব্যবহার ক্ষমা করেনি মনোদীপ—তার মতে পৃথিবীর সমস্ত শুভ ব্যাপারেই জ্যাঠামশায়দের অকারণ হস্তক্ষেপ আছেই (জ্যাঠাদের এটা হোল জ্যাঠামো—মনোদীপের ভাষায়) এবং এ নিয়ে মনোদীপের আক্ষেপের আর শেষ নেই। লোকে বলে, দিলীপের সঙ্গে মানসীর বিয়েতে কোন বাধা নেই এবং মনোদীপের সঙ্গে মেশায় তার পরিণতি বিবাহ পর্য্যন্ত গড়ালে সামাজিক গোলমালের আশঙ্কাতেই মানসীর জ্যাঠামশাই তাকে আমল দেননি।

মনোদীপ মনে মনে এঁচে নিলে—এই প্রথম দেখাতেই মনোদীপ যে কী চীজ—তা সে দেখিয়ে দেবে। শুধু একখানি সাষ্টাঙ্গ প্রনাম গোড়াতেই, ব্যাস। মনোদীপ জানে কোন অস্ত্রে কার মৃত্যু লেখা। জ্যাঠামশাইদের ধারণা যে, এ যুগের ছেলেরা অত্যন্ত দুর্বিনীত। এই ধারণাটা একবার ঘোচাতে পারলেই কেল্লা ফতে। তারপর শুধু সব কথায় ঘাড় নেড়ে যাওয়া। ব্রাহ্মণের ছেলের প্রণামের সামনে দিলীপ কেমন কোরে দাঁড়ায় দেখা যাবে।

০ ০ ছয় ০ ০

মানসীর জন্মদিনে মনোদীপ একটু দেরী কোরেই গেলো। গিয়ে দেখলো সাজানো ঘরে মানসী, তার মা ও জ্যাঠামশায় এবং একটু দূরে দিলীপ মানসীর ছোটভাইটাকে আদর কোরছে। ঢুকেই মনোদীপ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। নমস্কার করবার চেষ্টাই কোরতে পারলো না সে। মানসী—তার সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় কোন রকমে নমস্কার কোরল সে।

তারপর আস্তে আস্তে কথাবার্তা আরম্ভ হোল। জ্যাঠামশায়ের কথার অর্দ্ধেক হোল—এ যুগের ছেলেদের হুজুগেপনা নিয়ে। তার ভাইঝিকে কেন তিনি মিশতে দেন না কারো সঙ্গে এক দিলীপ ছাড়াই—দিলীপ তার ঘরের ছেলের মতই ও রকম ছেলে আর হয় না—জীবনে উন্নতি—, কোরবে

(হ্যাঁ ৭৫৲ টাকাব প্রোফেসাবী পর্য্যন্ত —মনোদীপ মনে মনে ভাবলো) ইত্যাদি নানান কথা চললো অনেকক্ষণ। যাবাব সময় মনোদীপ আর ভুল কোবল না। একবাবে সোজা নীচু হোল জ্যাঠামশায়েব পায়েব ওপর লোটান লম্বা কোঁচা সবিয়ে মনোদীপেব হাত এক পায়ে প্রণাম সেরে আর এক পায়েব দিকে গিয়েছে তখন। জ্যাঠামশাই যতই 'থাক থাক' কোরছেন মনোদীপ লজ্জায় বিনয়ে গলে গিয়ে ততই আবো নীচু হয়—কিন্তু একি— আরেক পা গেলো কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে ধুতিটাকে হ্যাঁটু পর্য্যন্ত তুলে ফেল্‌লো মনোদীপ। তুলে ফেলতেই সমস্ত পৃথিবী অন্ধকাব হ'য়ে এলো চোখে—আব সেই অন্ধকাবে সাব সাব তাবাব মত সর্ষে ফুল ফুটে উঠ্‌তে লাগল—যে-সব ফুল সে দেখেইনি কোনদিন। এবাব এলো দিলীপেব খুক্ খুক্ হাসি। কোনবকমে মানসীব জ্যাঠামশায়েব এক পায়ে দু'হাত বুলিয়ে নিয়ে প্রণাম সেবে উঠে দাঁড়ালো মনোদীপ। তাবপব আব দাঁড়ালো না একটুও। সোজা বেবিয়ে গেলো দবজা দিয়ে। দবজাব বাইবে গিয়ে একটু দাঁড়ালো। শুনতে পেলো জ্যাঠামশায়েব গলা: 'তুই শুধু আমায় অপমান কবালি মনু—কি দবকাব ছিল ওকে ডাকাব।''

মানসী কাঁদ কাঁদ গলায় কি জবাব দিলে। দিলীপেব গলা শোনা গেল জোবে— তখনি বাবণ কোবেছিলাম মানসীকে, ইচ্ছে কোবে অপমান কোবে গেলো তা নাহলে আসবাব সময় নমস্কাব আব যাবাব সময় প্রণাম কোবতে যাবে কেন?'

মনোদীপ চোবেব মতো বেবিয়ে গেলো।

০ ০ সাত ০ ০

এব পব মনোদীপেব সঙ্গে মানসীব আব দেখা হয়নি। মানসী তাব বন্ধুদেব কাছে মনোদীপেব এই অভদ্র ব্যবহাবেব কথা বলে বেড়িয়েছে। আব মনোদীপও বলতে ছাড়েনি: আমি কি কোবব—কি কোবে জানবো— অমন ত্রৈলোক্যনাথেব মতো মানসীব জ্যাঠামশায়েবও যে এক-পা থাকতে হবে এব কি অর্থ আছে। কোন অর্থই নেই মনোদীপেব কাছে—একমাত্র মনোদীপকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া।

প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে।

সাব সাব ছেলেবা উত্তব লিখে চলেছে—খাতাব পব খাতায়। নিরুত্তর

হ'লো বসে আছে শুধু ইউনিভাসিটির পয়লা নম্বরেব ঘোড়সওয়ার ('প্রথম শ্রেণী' যার বাঁধা) মনোদীপ মুখুজ্যে।

কলম হাতে কোবে বাইবেব দিকে চেয়ে আছে সে। খাতাব ওপর বারকয়েক 'মনসা মঙ্গল' লিখতে গিয়ে 'মানসী মঙ্গল' লিখে বাব কয়েক কাটলো মনোদীপ। তাবপর আবাব তাকালো বাইবের দিকে। স্পষ্ট দেখতে পেলো—তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ কোবে—শুধুমাত্র মানসিক যন্ত্রণা দেবাব জন্যেই মানসীকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে দিলীপ মিত্তিব—এ যাত্রা তাব সওয়া-পাঁচ আনাব মানসিকই জয়ী হলো মনোদীপেব সমস্ত অমানুষিক চেষ্টাকে খতম কোবে দিয়ে।